নির্বাচিত

শিখা

মুসলিম সাহিত্য সমাজের
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দলিল

সম্পাদক

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ফেব্রুয়ারি ২০০০

তৃতীয় বর্ষ] [১৩২৯

শিখা



সম্পাদক—

অধ্যাপক—কাজী মোতাহার হোসেন, এম-এ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের এসিস্ট্যান্ট লেকচারার



প্রকাশক—

সৈয়দ ইমামুল হোসেন

মডার্ণ লাইব্রেরী,

৭৪নং, নবাবপুর, ঢাকা।

[মূল্য ১৲ এক টাকা

সূ চি প ত্র

ভূমিকা

প্রথম বর্ষ। ১৯২৭। সম্পাদক : আবুল হুসেন

দ্বিতীয় বর্ষ। ১৯২৮। সম্পাদক : কাজী মোতাহার হোসেন

তৃতীয় বর্ষ। ১৯২৯। সম্পাদক : কাজী মোতাহার হোসেন




শিখা

প্রথম বর্ষ

১৯২৭

সম্পাদক : আবুল হুসেন

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'




খোশ-আমদেদ

কাজী নজরুল ইসলাম

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি।
ও-চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি॥
দখিনের হাল্‌কা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতী।
শবেরাত আজ উজালা গো, আঙিনায় জ্বলল দীপালি॥
তালি-বন ঝুমকি বাজায়, গায় 'মোবারক-বাদ' কোয়েলা।
উলসি উপচে প'ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি॥
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোলনাতে হায় দুলিছে শিশু।
ভাঙা ঐ দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি॥
এল কি অলখ-পথ বেয়ে তরুণ হারুন-অল-রশীদ।
এল কি আল বেরুনী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী॥
সানাইয়াঁ ভয়রোঁ বাজায়, নিদ-মহলায় জাগল শা'জাদী।
কারুনের রূপার পুরে নূপুর পায়ে আস্‌ল রূপ-ওয়ালী॥
খুশির এ বুল্‌বুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরীঁ।
লাল এ লায়লী-লোকে মজনু হর্দম চালায় পেয়ালী॥
বাসি ফুল কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি, রে ফুল মালি।
নবীনের আসার পথে উজাড় করে দে ফুল-ডালি॥

পদ্মা
২৭-২-২৭

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

এ.এফ. রহমান

সমবেত সাহিত্যপ্রাণ সুধীমণ্ডলী,

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমি সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' একটা নতুন উদ্যম—আমাদের সমাজের নতুন জাগরণের একটা সামান্য চিহ্ন। আপনারা যে দয়া করে তার সফলতা কামনা করে এই সাহিত্য সমাজের উৎসাহ বর্ধন করবার জন্য এসেছেন, সেজন্য আমাদের সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাহিত্যচর্চার এই ক্ষীণ ধারাটুকু যাতে স্রোতে পরিণত হয়, সেজন্য এই বার্ষিক সম্মিলনের সৃষ্টি। আপনাদের ন্যায় সাহিত্যানুরাগীদের শুভদৃষ্টি আমাদের প্রতি থাকলেই আমাদের সব আশা সফল হবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সাদর সম্ভাষণ জানাবার পর আর বিশেষ কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু যাঁরা আমাকে এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করেছেন তাঁরা তো ছাড়বেন না। তাই সংক্ষেপে দু'চারটি কথা নিবেদন করছি। আমি দেশের ও সমাজের সামান্য সেবক। আমি যা নিবেদন করছি তা কোনো গভীর জ্ঞানের কথা নয়, তবে যে যৎসামান্য আমার অভিজ্ঞতা জন্মেছে তাই বলতে চাই।

শুনেছি পরাধীন জাতির (Subject Race-র) কোনো পলিটিকস নাই। কথাটা সত্য না মিথ্যা তা আপনারাই বিচার করবেন। কিন্তু আমি দেখি আমাদের দেশে politics ছাড়া আর কিছুই যেন নাই, আর তাও যেন এক ধরনের। আমরা যেন কিছু একটাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলবার জন্যই ব্যস্ত। কিছু গড়ে তুলবার জন্য যেন আমাদের উৎসাহই নাই। দুরবীন দিয়ে শাসনকর্তাদের দেখতে দেখতে নিজেরা যে কি বা কি হয়ে যাচ্ছি তা ভাববার সময়ই হয় না। মুসলমানদের কথা বলছি তাঁরা যেন অতীতের স্মৃতির গৌরভেই মুগ্ধ, ঠিক যেন গোরস্থানে স্মৃতি স্তম্ভগুলো 'জেয়ারৎ' করে পুণ্যভাগী হয়েই তাঁরা নিশ্চিত হন। অবশ্য ঐতিহাসিকেরা বলবেন যে, অতীতই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। আমরা যে ভবিষ্যৎটার কথা চেষ্টা করি না। যে জাতি এককালে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল এবং উৎকর্ষ সাধন করেছিল, আজ যেন সর্বত্রই তার অধঃপতন। আমাদের

মধ্যে অতীতের সে রকম কোনো চর্চাও নাই,—ভবিষ্যতেরও কোনো আদর্শ নাই। আমাদের সামাজিক জীবন এত লক্ষ্যহীন বলেই আমরা সাহিত্যচর্চায় এত উদাসীন। ইতিহাসে দেখা যায় যে কোন দেশ বা জাতি উন্নতি করেছে পূর্বে সাহিত্যই তার জীবনীশক্তি ফুটিয়ে তুলেছিল। সাহিত্য জীবনীশক্তির পরিচায়ক। বলবার মতো কথা থাকলে ভাষার অভাব হয় না। আর বলবার মতো কথা না থাকলেই সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করে পরীক্ষা পাশ করাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাস জ্ঞানের আকর। কিন্তু সেই জ্ঞান শুধু নিজে উপলব্ধি করা জ্ঞানীর মতো কাজ নয়। জ্ঞান বা সত্য প্রচার করা; সমাজ, দেশ, পৃথিবী সত্যের আদর্শে গড়ে তোলা; সেই হলো মানুষের মত কাজ। আর সেখানেই সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হবে। অতীতের সমুজ্জ্বল ছবি আঁকতে হলে, ভবিষ্যতের আদর্শ দেখিয়ে দিতে হলে বা সত্যের সৌন্দর্য্য বিকাশ করতে হলে সাহিত্যই একমাত্র উপায়। সত্যের মত সাহিত্যও সীমাবদ্ধ নয়। যেমন পৃথিবীর সাহিত্যে আমার অধিকার আছে, তেমনি আমাদের সাহিত্য সর্ত্য হলে পৃথিবী তা আপন করে নেবে। জাতীয় জীবন-সংগ্রামে সাহিত্য একটি অস্ত্র। যুদ্ধের সময় জাতীয় সঙ্গীত (National anthem) যে কাজ করে শান্তির কালে সাহিত্যও ঠিক সেই কাজ করে। যে জাতির পরিবর্তন নাই, তার কোনো ইতিহাস নাই। যে জাতিতে সাহিত্য চর্চা নাই তারা নিজেদের ইতিহাসের উপর সমাধি মন্দির তুলে দিয়েছে।

আজকার সাহিত্য সম্মিলনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; এবং যাদের জন্য এই সাহিত্য সমাজের সৃষ্টি তাদের নিকট দু'একটি কথা নিবেদন করছি। আমারই জীবনে এমন একটা সময় দেখেছি যখন নিজের ভাষাটা না জানাই সভ্যতার চিহ্ন বলে ধরা হতো; আর নিজের ভাষাও একটু ইংরেজির অনুকরণে না বলতে পারলে সভ্যতার একটু হানি হতো। ফলে, একটা দলের সৃষ্টি হচ্ছিল যাঁরা ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। নিজের দেশের প্রতি তাঁদের কোনো সহানুভূতি ছিল না; ভিন্ন দেশও তাঁদের প্রতি কোনো সহানুভূতি করতো না। অবশ্য আজ সে অবস্থাটা (phase-টা) কেটে গেছে। তাতে একটু উপকারও হয়েছে। একটা প্রতিক্রিয়ার (reaction-র) ফলে আমরা আজ জাতীয় আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছি। বৈদেশিক সভ্যতা যে নিতান্ত সজোর সুতরাং সর্বগ্রাসী তা বুঝতে পেরেই সাহিত্যের দ্বারা নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলবার একটা উৎসাহ আমাদের হয়েছে। বাংলার আকাশে রবিও উদয় হয়েছে অনেকগুলো তারাও ফুটেছে। তবুও, একজন university-র ছাত্রকে যদি কোনো ভিন্ন জাতির দশজন বিখ্যাত লোকের নাম করতে বলি সে অনায়াসেই তা পারবে। নিজের দেশের দশ জনের নাম করতে হলে, সে অনেকটা ইতস্তত করবে। শেষে হয়তো দশ জনকে খুঁজেই পাবে না। নিজেদের ভাষায় অবনতি ও নিজেদের সাহিত্যে ঔদাসীন্যই তার কারণ। আবার

আমাদের নিজেদের উপরে বিশ্বাস এত কম যে আমরা যাই লিখি বা বলি ইউরোপের একটা 'হল মার্কের' ছাপ না পড়লে সে জিনিষটাকে খাঁটি বলে গ্রহণ করতেই আমরা রাজি নই। এমনকি আমাদের কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই দেখাতেই ব্যস্ত যে ইউরোপে পূর্বকালে যা ছিল বা আজ যা হয়েছে বা হচ্ছে ভারতেও ঠিক সে সবই ছিল। তা ছাড়া যেন ভারতের সভ্যতাই প্রমাণ করা যায় না। কালিদাসকে ভারতের Shakespeare না বললে যেন কালিদাসের মর্যাদা রক্ষা করা যায় না। এগুলো বলবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় শুধু আমাদের মনের গতি দেখিয়ে দেওয়া। অনুকরণ প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে নিজের উপর ক্রমশ বিশ্বাস হারিয়েছে ফেলছি। পৃথিবীকে নতুন কিছু দেবার আমাদের অধিকার বা ক্ষমতা আছে, তার ধারণাই যেন আমাদের হয় না। সাহিত্যের চর্চা করলে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে—অতীতের জ্ঞানের আলো ভবিষ্যতের তিমির ভেদ করে পথ দেখিয়ে দেবে এই আমার বিশ্বাস। মুসলমানদের এ বিষয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলেই হচ্ছে সেই প্রথম মুসলমানদের জলজীবন্ত উৎসাহ। তাঁরাই প্রচার করেছিলেন 'জ্ঞান, ধর্ম, কত কাব্য কাহিনী।'

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি। একটা বিষম আন্দোলন শুনতে পাই যে বাংলাদেশে মুসলমানদের মাতৃভাষা কি? দুই উপায়ে তার নিষ্পত্তি হতে পারে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি statistics নেওয়া যায়; অর্থাৎ বাংলাদেশে কত মুসলমান আছে, কত পুরুষ, কত স্ত্রী, কার কি ভাষা? তবে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে একটা নিষ্পত্তি হয়। তা নাহলে মাতৃজাতিকে জিজ্ঞাসা করতে হয় যে তাঁদের ভাষা কি? কিন্তু এই আন্দোলনের আর একটু অংশ আছে। বাঙালি-মুসলমানদের মাতৃভাষা কি হওয়া উচিত? এই সমস্যার মীমাংসা আপনারা করবেন। তবে আমার মনে হয়, আমার যদিও বিশেষ জানা নাই—যে জাতি বা ধর্ম হিসাবে ভাষা হয় নাই, দেশ হিসাবেই ভাষা হয়েছে। এক এক দেশের এক এক ভাষা। সুতরাং যে দেশে আমাদের বাস তার ভাষাও আমাদের। এস্থলে মুসলমানদের অন্তরের কথাটুকুও বলা উচিত। তাঁদের ধর্ম একটা প্রগাঢ় একতার সৃষ্টি করেছে। অন্তত ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হলেও মুসলমান সমাজে সাধারণভাবে উর্দু প্রচলিত আছে। যে কারণেই হোক উর্দুকে মুসলমানের ভাষা বলে গণ্য করা হয়েছে। এবং এই ভাষার বলেই মনের দিক থেকে একটা একতা আছে। সেই একতাটা নষ্ট করতে মুসলমানেরা স্বীকৃত হন না। এই জন্যই এ আন্দোলনের মীমাংসা হয় না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, যে দেশে বাস সে দেশের ভাষা না জানলে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় তা সহজেই বুঝতে পারেন। ঠিক যেন মনে হয় পেছনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যদিও এ বিষয়ের তর্ক ও মীমাংসা আপনারা করবেন, আমার মনে হয় না যে বাঙালি-মুসলমানের বাংলা

সাহিত্যের চর্চা করতে বা তার উৎকর্ষ সাধন করতে কোনো বাধা বিঘ্ন হতে পারে। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে বাংলার স্বাধীন মুসলমান সুলতানেরা বাংলা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। সম্ভবত তাঁদেরই উৎসাহে বাংলা ভাষা 'সাহিত্যিক' ভাষা হয়েছে। সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতে প্রথম আকৃষ্ট হয়ে বাংলার অধিপতি নাসির শাহের (১২৮২-১৩২৫) আদেশে মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয় এবং বিদ্যাপতি এই নাসির শাহকে সংগীতে অমর করেছেন। কোনো মুসলমান অধিপতি না রাজা কংস নারায়ণ কৃত্তিবাস দ্বারা রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন তা ঠিক জানা যায় না; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে নাসির শাহের উদাহরণ স্মরণ করেই এটা করা হয়েছিল।

হোসেন শাহ বাংলা ভাষার patron ছিলেন। ভগবত পুরাণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবার জন্য তিনি মালাধর বসুকে নিযুক্ত করেন। হোসেন শাহ গৌড়ের কাছে যে মাদ্রাসা তৈরি করেছিলেন তার উপরে তিনি লিখে দিয়েছিলেন যে 'হজরত মুহম্মদ বলেছেন, যদি চীন দেশে যেতে হয় তবুও'জ্ঞানের অনুসরণ করো।' এই মহৎ বাণীই আজ আমাদের আদর্শ হোক।

হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ মহাভারতের বাংলা অনুবাদে অক্ষয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। ফেনীর নিকটে পরাগলপুরের প্রাসাদে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রতিদিন বাংলা মহাভারতের আবৃত্তি করতেন এবং ছুটি খাঁর আদেশে কবি শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব বাংলায় অনুবাদ করেন। এই মুসলমান অধিপতি ও শাসন কর্তাদের উৎসাহে বহু সংস্কৃত ও ফারসি গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়। সংস্কৃতে অনুরাগী ব্রাহ্মণেরা বাংলা ভাষাকে বড় ভালো চোখে দেখতেন না, কিন্তু মুসলমান সুলতানদের উৎসাহেই বাংলার ক্রমোন্নতি হয়। পরবর্তী হিন্দু রাজগণও মুসলমানদের অনুকরণে বাংলা ভাষার অনেক উৎকর্ষ সাধন করেন। প্রায় প্রতি রাজদরবার বিখ্যাত বিখ্যাত বাঙালি কবিদ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। ক্রমে বাংলা সংস্কৃত ও ফারসির প্রতিযোগী হয়ে উঠলো। এ ছাড়া কত মুসলমান কবি বাংলাতে কত 'লোকসংগীত' সুধা লিখে গিয়েছেন তার তো সীমাই নাই। এটুকু বলবার উদ্দেশ্য এই যে মুসলমানের উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের এত উন্নতি। এখন যদি বাঙালি-মুসলমান আবার বাংলা সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন তবেই তাঁরা জাতীয় কীর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পারবেন। মুসলমান জাতির ইতিহাস যিনিই পড়েছেন তিনিই জানেন যে সাহিত্যে তাঁদের অমর কীর্তি। আধুনিক মুসলমানদের সাহিত্যবিমুখ হওয়া আর জাতিকে খর্ব করা ও সর্বনাশের পথে তুলে দেওয়া এক কথা।

আর একটি কথা। দেশে জাতীয় উন্নতির একটা হাওয়া চলছে, কিন্তু দেশের আকাশে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কালোমেঘও দেখা দিয়েছে। একে অন্যের বিষয়ে

সম্পূর্ণরূপে না জানতে পারলেই মনোবিবাদ হয়। এই সাম্প্রদায়িক মনান্তর দূর করবার জন্য সাহিত্য কতটা সাহায্য করতে পারে, তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। সেদিক দিয়েও প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিকের সাহিত্য জিনিষটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করা প্রয়োজন। আজ মুসলমান যদি শুধু নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, আর জ্ঞান-জগতের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে না পারেন, তবে তার উন্নতি এখনও অনেক দূরে।

আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি। প্রথমেই বলেছি দুরবীন দিয়ে নিজেদেরকে দেখবার চেষ্টা করেছি, তাই কিছু অপ্রিয় কথাও বলতে হয়েছে। কিন্তু যে নিজের দোষত্রুটিটুকু ধরতে পারে সেই কৃতকার্য হতে পারে। এই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' একটা অসীম অভাব দূর করবার জন্যই হয়েছে। এ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি নতুন স্পন্দনের চিহ্ন। এই ক্ষীণ প্রবাহটুকু কালে একটি স্রোতে পরিণত হয় এই প্রার্থনা করি। এই সাহিত্যের পূজায় আপনারা যে কষ্ট স্বীকার করে নিজ নিজ অর্ঘ্য নিয়ে যোগদান করেছেন তজ্জন্য অভ্যর্থনা সমিতি চিরকৃতজ্ঞ। আপনারা আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার উপকরণ আমাদের নাই। গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলেই হয়।

সভাপতির অভিভাষণ
তসদ্দুক আহমদ

যে দিন বন্ধুবর মৌলভি আবুল হুসেন আজিকার এই সভায় পৌরহিত্য করিবার জন্য তাঁহার ফরমান জারি করিয়া বসিলেন সে দিন কি হৃদকম্পই না উপস্থিত হইয়াছিল! অনেক অজুহাত পেশ করিয়াও যখন রেহাই পাইলাম না তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা এই গুরুভার গ্রহণ করিতে রাজি হইলাম। তখন ভাবি নাই ভারটা কিরূপ গুরুতর হইতে পারে। এক দিকে বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইবার ভয়, অপর দিকে নিজেকে এই সাহিত্যিকমণ্ডলীর নিকট হাস্যাস্পদ করিবার আশঙ্কা—দুই দিকের টানে যে কি নাজেহাল হইয়াছিলাম তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিবে না। অবশেষে 'আমিত্ব'-কেই আড়াল করিয়া দাঁড়ানো স্থির করিলাম; বন্ধুবর্গেরই জয় হইল। আজিকার সভার সকল সাফল্য, সকল গৌরব আমার প্রীতিভাজন বন্ধুবর্গেরই; আমি তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নহি।

বন্ধুগণ, আজিকার এ সম্মানের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনাদের এই শুভ অনুষ্ঠানে যে আমাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিবার সুযোগ দিয়াছেন তজ্জন্য নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আজ এই সভায় যে দুই চারি কথা বলিব তাহা হয়ত কাহারও ভাল লাগিবে, কাহারও লাগিবে না। তবে এটুকু ঠিক যে, যে সমাজে বাস করি সেই সমাজ ও তাহার সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ ভাবিয়াছি তাহাই অকপটে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাধ্যমতো চেষ্টা করিব। প্রশংসার আশা বা নিন্দার ভয় করিব না। কারণ আমি বেশ জানি যে এই জোর-করিয়া-চাপাইয়া-দেওয়া পৌরহিত্য শেষ হইলেই পুনরায় আমার সেই নিভৃত গৃহকোণটির আশ্রয় গ্রহণ করিতে আপনারা আমাকে কেহই বাধা দিতে পারিবেন না। দেশের আইন তাহাতে আপনাদিগকে একটুও সাহায্য করিবে না।

মাতৃভাষা

নিজের কথা এতটা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ জানি যে নিজের কাছে যতই মধুর হউক না কেন, অপরের নিকট তাহা সর্বদাই শ্রুতিকটু। কিন্তু মাতৃভাষার এমনি মহিমা যে কথা বলাটাই যেন আনন্দের বলিয়া মনে হয়। বাংলা

যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধা বোধ হয় না। কারণ তাহা না হইলে আমার নিজের মা-কেই অস্বীকার করিতে হয়। এতটা অধোগতি আপনাদের আশীর্বাদে এখনও আমার হয় নাই। তবু নাকি শুনি এই বাংলাদেশে এমনও অনেক মুসলিম আছেন যাঁহারা বাংলা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন। তাঁহারা নাকি বলেন 'শরিফ' অর্থাৎ সদ্বংশজাত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে মাতৃভাষাটাকে না বদলাইলে চলিবে না। আপনারাই পাঁচজনে বিচার করুন শিক্ষকতা করি বলিয়াই কি নিজের মা-কেও বেত্র হস্তে তাড়না করিব, 'অতঃপর তুমি তোমার ভাষা বদলাইয়া ফেলিবে, নতুবা তোমাকে মা বলিয়া স্বীকার করা আমার পক্ষে অপমানজনক হইবে?' এই বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ৪,৭৫,৯২,৪৬২, তার মধ্যে ২,৫৪,৮৬,১২৪ জন মুসলিম নরনারী। বন্ধুগণ, ভাবিয়া দেখুন এই এতগুলি মুসলিম নরনারীর ঘর, বাড়ি কাটিয়া খাট, বিছানা, বাক্স, তোরঙ্গ, জমি জিরাত সিন্দবাদের ন্যায় স্কন্ধে লইয়া 'শরাফত হাসেল' করিবার জন্য যেখানে বাংলা ভাষা নাই এরূপ প্রদেশে উঠিয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা কি সম্ভবপর? অপরপক্ষে উর্দু ভাষাকে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামসমূহে কলমের জোরে চালাইবার যে নিষ্ফল প্রয়াস কিছুদিন পূর্বে হইয়াছিল তাহাও বোধ হয় আপনাদের অনেকের নিকট অবিদিত নহে।

বাঙালি-মুসলিমের সাহিত্যের অভাব

এক সম্প্রদায় বলেন, 'আমরা বাঙালি-মুসলমান যে ভাষায় কথা বলি তাহা ঠিক বাংলা নয়; উর্দু, ফারসি, আরবি-বহুল এক মিশ্র ভাষা। সেই ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত।' কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা মস্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে। আমির হামজা বা হাতেম তাইয়ের পুঁথি, কাসাসুল-আম্বিয়া বা সোনাভানের পুঁথি যে ভাষায় রচিত তাহা আমাদের সমাজের বহুতর ব্যক্তির আদরের জিনিষ হইতে পারে কিন্তু তাহা সাহিত্য হিসাবে পৃথিবীর লোকের নিকট আদরণীয় বা অনুকরণীয় কোনো কালেই হয় নাই। তাহা হইলে আজ শুধু বটতলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

সাহিত্য জিনিষটা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। এই বাংলাদেশে আমরা হিন্দু মুসলিম দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায় বহুকাল যাবৎ একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। সাহিত্যকে গঠন করিবার জন্য ও পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু বলিতে লজ্জাবোধ হয় আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। যখন বাংলা সাহিত্য হিন্দু সমাজের বহু কৃতী সন্তানের দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ গঠিত, পুষ্ট ও বর্ধিত হইতেছিল তখন আমরা

কেবল সমরখন্দ ও বোখারা, আরব ও ইস্পাহানের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ইংরাজি শিক্ষার প্রথম আমলে যেমন অদূরদর্শী জননায়কগণের প্ররোচনায় পড়িয়া আমরা 'কাফের' হইবার ভয়ে ইংরাজি ভাষাকে প্রত্যাখান করিয়াছিলাম, বাংলা ভাষার উদ্বোধন কালেও আমরা সেইরূপ দূরে দাঁড়াইয়া নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছি, আর পরের গালি খাইয়া নীরব হজম করিয়াছি। আমি এখানে সেই হোসেনশাহী যুগের মুসলিম কবিগণের কথা উত্থাপন করিতেছি না, কারণ যদিও তাঁহারা এখন প্রত্নতত্ত্ববিদগণের খোরাক যোগাইতেছেন তথাপি সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিবার জন্য আমাদের সাহিত্য জীবনকে কতদূর কর্মঠ ও বলিষ্ঠ করিয়াছেন তাহা আমাপেক্ষা আপনারাই নিশ্চয় ভাল বুঝিবেন। আসল কথা, প্রধানত যে উপাদান দিয়া জাতীয় জীবন গঠিত হয় তাহা নির্ধারণ করিতে আমাদের বহু কালক্ষয় হইয়াছে; এখনও সম্যক উপলব্ধি হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে আশা হয় আপনাদের ন্যায় অনুষ্ঠানের যতই বৃদ্ধি হইবে ততই পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমরাও জনসমাজের অপর দশ জনের ন্যায় আদৃত, সম্মানিত হইতে থাকিব।

মানুষ সংসারে একাকী বাস করিতে পারে না। সঙ্ঘ বা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকাই তাহার অভ্যাস। সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধ নানা প্রকারে ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠে। এই সম্বন্ধ নির্ণয় ব্যাপারে মানুষ ভাষার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে এবং অপরের নিকট নিজেকে বোধগম্য করে। মনের ভাবকে মূর্তরূপে প্রকট করিবার জন্য মানুষের কী প্রচেষ্টা! সঙ্গীতে, কাব্যে, চিত্রে, অর্থবোধক শব্দের আকারে, নানা উপায়ে মানুষ স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে যে যে উপায় দ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাই সাহিত্য। যে জাতির এই সকল উপায় যত কম সেই জাতি সাহিত্য হিসাবে তত দরিদ্র। এই মাপকাঠি দিয়া দেখিলে বাঙালি-মুসলিম সমাজ আজ পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজ অপেক্ষা কত দরিদ্র! সাহিত্য আমাদিগকে জ্ঞান দান করে, আনন্দ দান করে, কর্মের জন্য প্রেরণা সঞ্চার করে। আমরা এমনি হতভাগ্য যে আমাদের না আছে জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি, না আছে আনন্দ উপভোগ করিবার ক্ষমতা, না আছে কর্মের জন্য উৎসাহ। যে সাহিত্যের অমৃতধারা আমাদিগকে নানা জ্ঞানে পুষ্ট করিতে পারিত, নতুন বলে বলীয়ান করিতে পারিত, কর্মে উৎসাহিত করিতে পারিত, আমরা অর্বাচীনের ন্যায় তাহা অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। আজ আমরা অপরাপর সম্প্রদায়ের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হই, কিন্তু আমাদের দুরবস্থার জন্য যে আমরাই প্রধানত দায়ী তাহা এক বাতুল ব্যতীত আর কে অস্বীকার করিবে?

মুসলিম সাহিত্যের প্রকৃতি

এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমাদের সাহিত্যের প্রকৃতি কি হইবে? বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের আবহমান কালের অবহেলার জন্য তাহা ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক এরূপে গঠিত হইয়াছে যে তাহাতে আমাদের নিজস্ব কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের ধর্ম, আমাদের পূর্বতন ইতিহাস, আমাদের সমাজ, আমাদের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, বাংলা সাহিত্যের অপর উপাসকগণের হইতে বিভিন্ন। অথচ বাংলা সাহিত্যই আমাদের একমাত্র সাহিত্য। এই অবস্থায় সেই সাহিত্যকে আমাদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের বাঁচিবার উপায় কি? আমার মনে হয় যে দেশে আমরা বাস করি, যে দেশের আবহাওয়ায় আমরা প্রতিপালিত, সে দেশের অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত থাকিয়াও আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব (individuality) রক্ষা করিতে সক্ষম। যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলি তাহা হইলে আমরা মুসলিম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহি। সাহিত্য যখন সকলেরই সম্পত্তি, তখন সকলেই তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিবার সমান অধিকারী এবং সে জন্য সমান দায়ী। আমি আমার অংশটুকু দিলাম, আপনি আপনার অংশটুকু দিলেন, এই ভাবেই সাহিত্য বাড়িয়া উঠিবে। হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাহাদের অংশ পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন এবং দিতেছেন; আমরা আমাদের অংশ দিই নাই; এখন দিতে আরম্ভ করিয়াছি। ক্রমেই আমাদিগকে অধিকতর পরিমাণে দিতে হইবে। তখন আমরা বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম দুই ভাই একই ভাষা-জননীর পীযূষধারা পান করিয়া বলীয়ান হইব।

তারপর দেখুন চেনা পরিচয় হইলেই তবে আত্মীয়তা হয়। সাত শত বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে আমরা একত্র বাস করিতেছি কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে কতটুকু চেনেন। বরং মুসলিম হিন্দুকে কিছু চেনেন কিন্তু হিন্দু মুসলিমের সম্বন্ধে খুবই কম জানেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারি না। কারণ আমরা আমাদের পরিচয় এত দিন দিই নাই। এখন দিতে হইবে। নহিলে দেশের ভয়ানক অকল্যাণ হইবে। এই বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের প্রকৃত পরিচয় দিব। তখন দেখিবেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি কত বাড়িয়া যাইবে। যদি আমাদের মধ্যে বাস্তবিক কোনো গুণ থাকে, যদি আমাদের ধর্মের প্রকৃত মর্ম তাঁহারা অবগত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন সৌহৃদ্য ও সখ্যভাব স্থাপিত হইতে তিলার্ধ বিলম্ব হইবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধ থাকিতে পারে, ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের অনৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু যদি আমরা সকলেই প্রকৃত মনুষ্য-পদ-বাচ্য হই তাহা হইলে সুপরিচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একের অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাব দূর হইবে। এই মিলন সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সাধন করিতে হইবে। রাজনৈতিক Pact-এর দ্বারা কখনও সম্ভবপর হইবে না।

মুসলিম সাহিত্যের আদর্শ – ইসলাম

আমাদের সাহিত্য কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়। বন্ধুগণ, অতীতকালে আমরা নবাব ছিলাম, বাদশাহ ছিলাম, সেই স্বপ্ন দেখিতে আমি আপনাদিগকে বলিতেছি না। সেই স্বপ্নের নেশায় এতদিন ভরপুর ছিলাম বলিয়াই আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক জগতকে বিস্মৃত হইয়া যখন মানুষ কেবল অতীতকালেই বাস করিতে চায় তখন সংসারপথে তাহাকে কেবল ঠোক্করই খাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অতীতকে একেবারে ভুলিতে পারি না। মনুষ্যজীবনে, সমাজ-জীবনে অতীতের অনেক রেখাপাত থাকিয়া যায়, সেগুলিকে মুছিয়া ফেলা যায় না; মুছিয়া ফেলা সমীচীনও নয়। অতীতের সহিত বর্তমানের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। অতীতকে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই, কারণ তাহা বর্তমানের সহিত এক সূত্রে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। আমরা অতীত হইতে আমাদের inspiration (প্রাণশক্তি) গ্রহণ করিব। অতীতের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, কলাশিল্পকে বর্তমান, কালোপযোগী করিয়া জগতের সমক্ষে আমাদের গৌরব পতাকা উড্ডীয়মান করিব। আমাদের নাই কি? ছিল না কি? যে ধর্মে হজরত রসুল-করিম মুহম্মদ মোস্তফার ন্যায় নেতা, পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা আছেন, যে ধর্মে কোরান-মজিদের ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ বিদ্যমান, সেই ধর্মাবলম্বীগণের দুনিয়ার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য আবার চিন্তা?

মানুষ স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয় এবং সেই অনুকরণ সে তাহাকেই করিতে চায় যাহার প্রতি তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে বিদ্যমান। হজরত মুহম্মদ মোস্তফাকে অনুকরণ করিতে না চায় এমন কোনো ভক্তপ্রাণ মুসলিম আছে? এইখানে বোধ হয় ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমাদের সমাজে যে 'মিলাদ পাঠের' ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহার ন্যায় বড় প্রহসন আর কিছু হইতে পারে কি না সন্দেহ। আমরা ভক্তিভরে হজরত মুহম্মদের নাম শ্রবণ করি, চোখে 'বোসা' (চুম্বন) দিই, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে কয়জন খোঁজ রাখি? নানাপ্রকারে অলৌকিক, আজগুবি গল্পের অবতারণা করিয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াই আমরা মিলাদ সমাপন করি। শিরনি (মিষ্টান্ন) বস্ত্রপ্রান্তে বাঁধিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাই। যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হইত তাহা আমাদের নিকট চিরদিন লুক্কায়িত থাকিয়া যায়। বন্ধুগণ, ধর্ম জিনিষটা গৃহকোণে উঠাইয়া রাখিবার জিনিষ নয়। আবশ্যকমতো তাহাকে সম্ভ্রমের সহিত উচ্চাসন হইতে নামাইয়া, করণীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর পুনরায় সেই আসনে উঠাইয়া রাখিলে কর্তব্য শেষ হয় না। ধর্ম দৈনন্দিন জীবনের ভিতর দিয়া সদা প্রবহমান। কথাবার্তা, কাজকর্ম, প্রত্যেক বিষয়েই ধর্মাচরণ আবশ্যক। তাহার জন্য হজরত মুহম্মদের ন্যায় আদর্শ ও মহামূল্য কোরানের উপদেশাবলী থাকিতে আমাদিগকে অন্যত্র যাইবার আবশ্যক কি? 'মুসলিম' বলিয়া শুধু গগনভেদী চীৎকার করিলে বা

মসজিদের সম্মুখে বলপূর্বক বাজনা বন্ধ করিলেই জীবনটাকে 'সেরাতুল মোস্তাকিম' (সরল পথে) চালিত করা সম্ভবপর হইবে না। আমাদের সমাজে একদল লোক আছেন যাঁহারা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালনে পাকা মুসলিম, কিন্তু ইসলামকে তাঁহারা বড় সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখেন; ইসলামের সার্বভৌমিক উদারতা তাঁহাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে না। সামান্য কারণেই তাঁহাদের ধৈর্যচ্যুতি হয়। তাঁহারা মনে করেন যে ইসলাম এমনি ক্ষণভঙ্গুর যে ব্যক্তিবিশেষের সামান্য ভুলচুকেই ইসলামের সর্বনাশ হইবে, ইহা রসাতলে যাইবে। আর এক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেন; মুসলিমের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু ইসলামের অবশ্য করণীয় হুকুমগুলি মানিয়া চলা দুর্বলতার চিহ্নস্বরূপ মনে করেন; মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিয়াই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইবার দাবি করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বাক্যে এবং কার্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে অপরের শ্রদ্ধা সহজে পাওয়া যায় না। যাহা বিশ্বাস করি বলিয়া মুখে প্রচার করি তাহা যদি কার্যে পরিণত করিতে পরাঙ্মুখ হই তাহা হইলে আমি চরিত্রবান বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারি না। Reformed Hindu এর ন্যায় Reformed Muslims হইতে পারি কিন্তু খোদ ইসলামকে সংস্কার করিতে গেলে ভিত্তিটাই শিথিল হইয়া যাইবে। তাহার উপর সৌধ স্থাপনের চেষ্টা করা বৃথা হইবে। জীবনসংগ্রাম বলুন, বিজ্ঞান বলুন, শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, সবই একটা আদর্শের (ideal) অপেক্ষা করে। সেই আদর্শ না থাকিলে সাধনায় স্পৃহা হয় না; আবার সাধনা না থাকিলে সিদ্ধি লাভও হয় না। আমাদের সাহিত্যকে ইসলামের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে; প্রকৃত ইসলাম দ্বারা তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ইসলামের সঞ্জীবনী সুধায় সিঞ্চিত হইয়া আমাদের সাহিত্য অমর হইবে। প্রত্যেক মুসলিম নরনারী সেই সাহিত্যসুধা পান করিয়া অমর হইবে। প্রত্যেক মুসলিম বালক বালিকার শিরায় শিরায় তন্তুতে তন্তুতে সেই শক্তি তড়িতপ্রবাহের ন্যায় কার্য করিবে। সাহিত্যকে এরূপ গড়িতে হইলে অক্লান্ত পরিশ্রম আবশ্যক, প্রকৃত সাধনা আবশ্যক, আলস্য পরিহার আবশ্যক। এই নিগৃহীত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের আপনারাই ভবিষ্যৎ কর্ণধার, ভবিষ্যৎ আশাস্থল। এটুকু আশা করা কি অন্যায় হইবে যে আপনারা ইসলামের সেই উচ্চ আদর্শকে বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেরাও বরেণ্য হন, মুসলিম সমাজকেও ধন্য করেন?

প্রাতঃস্মরণীয় স্যার সৈয়দ আহমদ, মৌলানা শিবলি, হালি, নজির আহমদ বেলগ্রামী, মোহসেনুলমুলক, ইকবাল, গালিব প্রমুখ মনীষীগণ উর্দু সাহিত্যকে পৃথিবীর মধ্যে এক অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। আমাদের বাঙালি-মুসলিম সমাজেও এইরূপ লোকের আবির্ভাব আবশ্যক। আপনাদের ন্যায় নবীন কর্মীর দল যতই পুষ্ট হইবে ততই সে আশা পূর্ণ হইবার সময় নিকটবর্তী হইবে সন্দেহ নাই।

মুসলিম সাহিত্য গঠনের উপায়

ইসলামের ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা আপাতত আরবি, ফারসি এবং উর্দু ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। সাধারণের মধ্যে এইসব ভাষার প্রচলন আমাদের বাংলাদেশে তত বেশী নাই। ইহার কোনোটিকেই দেশবাসীর মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা করাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই সকল ভাষাবিদগণের নিকট আমাদিগকে বহুদিন পর্যন্ত ইসলামের ভাবধারার জন্য ঋণী থাকিতে হইবে। যাঁহারা ঐ সকল ভাষা জানেন তাঁহাদিগকে বাংলা ভাষায় ইসলামের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আবশ্যকমতো ইসলামী ভাবাপন্ন শব্দাদি ধীরে ধীরে বাংলা ভাষায় প্রচলন করিতে হইবে। তাহাতে হিন্দু সাহিত্যিকগণ প্রথম প্রথম আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন কিন্তু আপনাদের শব্দের প্রযোজ্যতা বা ভাবের মহত্ত্বতা উপলব্ধি করিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না। ভাষা ও সাহিত্য এইরূপেই শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। জীবিত ভাষামাত্রেই এইরূপে তাহার বর্তমান সম্পদ লাভ করিয়াছে। আমাদের কোনো কোনো নবীন কবির আরবি ও ফারসি শব্দ-বহুল পদ্য-সাহিত্য আপাতত টীকা, টিপ্পনী সম্বলিত হইলেও সেই সময় সুদূরপরাহত নয় যখন সেগুলি সাহিত্যের বুকে বেমালুম স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া বসিবে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সমাজে বলুন, সাহিত্যে বলুন এমনকি মানব-শরীরেও যখনই কোনো নতুন কিছু প্রবেশাধিকার লাভ করিতে চায় তখনই বিষম দ্বন্দ্ব, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় কিন্তু কালে সেই নতুনই পরম পুরাতন, পরম মিত্র হইয়া দাঁড়ায়। আজ যদি টেবিলকে পীঠিকা, থিয়েটারকে রঙ্গমঞ্চ, সিনেমাকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আদালতকে ধর্মাধিকরণ বলিতে যাই তাহা হইলে আপনারা প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিবেন। সেরূপ নিপুণ শিল্পীর ন্যায় আপনি যদি ইসলামী ভাব বা উক্ত ভাব সম্বলিত বৈদেশিক শব্দসমূহ সহজসরলভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করান তাহা হইলে ভাষা বা সাহিত্যের উপর নিশ্চয়ই কোনো অত্যাচার করা হইবে না। তাই বলিয়া ইদানীং মক্তব ও মাদ্রাসার জন্য মধ্যে মধ্যে যে একপ্রকার অস্বাভাবিক সাহিত্য দেখিতে পাই তাহাতে সাহিত্যের পুষ্টি সাধন না হইয়া বরং অনিষ্টই হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, এই কার্য অত্যন্ত নিপুণতার সহিত করিতে হইবে এবং যিনি এ বিষয়ে তত সিদ্ধহস্ত নন তিনি যদি এ চেষ্টা না করেন তাহা হইলেই ভাল হয়। যাঁহারা এ কাজে পাকা, তাহারাই করুন; আমরা সকলে তাঁহাদের অনুসরণ করি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। বঙ্গ সাহিত্যের কোনো কোনো খ্যাতনামা লেখকের অনুকরণে আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল লেখক দেখা দিতেছেন যাঁহারা তাঁহাদের অর্থটা ভাষার বাঁধুনিতে ও ভঙ্গিতে লুকাইয়া রাখিতে চান। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই অর্থটাকে দুর্বোধ করেন অথবা

নকলের নাকালের মধ্যে পড়িয়া করেন তাহা বুঝিতে একটু কষ্ট হয়। হয়তো বা আমারই বুদ্ধির দোষ; কিন্তু আমার মনে হয় 'বড্ড বোঝা যাচ্ছে' এই ভয়ে যদি ইচ্ছা করিয়াই দুর্বোধ হন তাহা হইলে তাঁহারা পাঠকবর্গের প্রতি অবিচার তো করেনই পরন্তু সৎসাহিত্যেরও সৃষ্টি করেন না। সৎসাহিত্য তাহাকেই বলিব যাহা আপনার ভিতরকার সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থ পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে জগতের লোকের নিকট তাহাদের উপকারার্থে নিবেদিত হয়। এরূপ সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। আবার শিক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শিক্ষার আগার। জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা লাভের সময়।

আমরা স্কুল কলেজে বিদ্যাভ্যাস করি; বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়াই মনে করি আমাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। সংসারক্ষেত্রেও আমাদের যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় আছে। প্রকৃত শিক্ষার্থী কখনও বলে না 'আমি সব শিখিয়াছি, আমার আর শিখিবার কিছু নাই।' এই সংসাররূপ বিদ্যামন্দিরে বিনয়াবনত হইয়া যেখানে যেটুকু ভাল পাই তাহাই লাভ করিবার জন্য সর্বদা জাগ্রত, সর্বদা সচেষ্ট থাকাই শিক্ষার্থীর ধর্ম। দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া আমাদিগকে সংসারপথে চলিতে হইবে। তবেই আমরা গৌরব লাভ করিব; সম্মানিত হইব। সাহিত্য প্রচারকল্পে এইরূপ তপশ্চরণ করিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

শিক্ষার বাহন

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষার এরূপ প্রয়োজন সেই শিক্ষার বাহন কি হইবে তাহা লইয়া আমাদের দেশে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হয় এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। কারণ যাহা সহজ, সরল বুদ্ধিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান তাহাকে তর্কের জালে আচ্ছন্ন করিয়া আসল কথাটাকে হারাইয়া ফেলি কেন? মানুষের ভাবসমুদ্রে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয় তখনই ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাবরাশি যদি আমার মাতৃভাষাতেই প্রথম মূর্ত হয় তাহা হইলে তাহার প্রকাশই বা কেন অন্য ভাষাতে হইবে? হইতে পারে ইংরাজি আমাদের রাজভাষা, হইতে পারে উর্দু, আরবি, ফারসি আমাদের ধর্মের ভাষা কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার বাহন হইবার জন্য উহাদের একটিও তো উপযুক্ত নহে। ইংরাজি শিখিলে আমাদের সংসার জীবনে উন্নতি হইতে পারে, আমাদের নিকট জ্ঞানরাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন হইতে পারে; উর্দু, আরবি, ফারসি শিখিলে আমরা ইসলামের তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ অনেক জানিতে পারি সত্য কিন্তু যখন এই সকল জ্ঞানরাশিকে আমার নিজস্ব করিতে হইবে আমার রক্ত, মাংস, অস্থির ন্যায় আমারই এক মানসিক ও নৈতিক উপাদানে পরিণত করিতে হইবে তখন তাহা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবপর

হয় আমি বুঝি না। এ সম্বন্ধে আমি অধিক বলিতে চাহি না কারণ ইতিপূর্বে ইহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই আপনাদের কাছে নিবেদন করিলাম।

আধুনিক ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক। জগতটা আজকাল ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। নানা দেশের, নানা ভাষার লোক আসিয়া আজ আমাদের কুটিরদ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা কূপমণ্ডূকের ন্যায় মাথা লুকাইয়া থাকিলে আর চলিবে না। সুতরাং অপরের সহিত মনের ভাবের আদানপ্রদান করিবার জন্য, লেনদেনের জন্য মাতৃভাষা ব্যতীত আমাদিগের আরও কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করা দরকার। আজকাল পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহে মাতৃভাষা এবং ব্যক্তিবিশেষের জন্য একটি প্রাচীন ভাষা ব্যতীত এক বা ততোধিক আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। বাঙালি-মুসলমানের জন্যও আমার মতে অন্তত দুইটি আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য। যেহেতু ইংরাজি রাজভাষা, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান ভাষা এবং সাহিত্যের হিসাবে বড় সম্পদশালী ভাষা অতএব ইংরাজি আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। তারপর উর্দু ভাষাও আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। উর্দু ভাষা আয়ত্ত করা বিশেষ কঠিন নহে, যেহেতু ইহাকে জীবিত ভাষা বলা যাইতে পারে। তারপর উর্দু ভাষার সাহায্যেই বঙ্গীয় মুসলমানের পক্ষে বাংলা সাহিত্যকে আমাদের উপযোগী করা অল্পায়াস সাধ্য হইবে। এজন্য আমি উর্দু ভাষা শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী। তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর একটি বক্তব্য এই যে সর্বসাধারণের জন্য উর্দুর কোনো প্রয়োজন নাই। যাঁহারা কেবল উচ্চ শিক্ষাভিলাষী কেবল তাঁহাদিগকেই উর্দু শিক্ষা করিতে হইবে। যেমন ফরাসি বা জার্মান না জানিলে আজকাল কোনো পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না সেইরূপ এখানেও এই নিয়ম হওয়া আবশ্যক যে উচ্চ শিক্ষাভিলাষী মুসলিম ছাত্র মাত্রেই উর্দু ভাষাভিজ্ঞ হইবে। তারপর আরবি আমাদের কোরানের ভাষা; যাঁহারা কোরানের রত্নরাজি আহরণ করিবার জন্য অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন না তাঁহাদিগের মূলভাষা শিক্ষা করা দরকার। এই ভাষা শিক্ষা বিভ্রাট লইয়া আমাদের বহু সময় কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে পথও আবিষ্কৃত হয়। আমরা যদি মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি তাহা হইলে আমাদিগকে আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত সাধকের ন্যায়, ভক্তের ন্যায় বিনম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত এই কঠিন সমস্যার সমাধানে কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে। আলাদীনের প্রদীপ আমাদিগকে কেহ হাতে তুলিয়া দিবে না। একদিনেই আমাদের 'মুসলিম সাহিত্য সমাজকে' সর্ববিষয়ে গরীয়ান করিতে পারিব না।

মুসলিম সাহিত্যিকগণের কর্তব্য

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের অভাব এবং মুসলিম সাহিত্যিকগণের কর্তব্য সম্বন্ধে দুই-চারি কথার উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। নবীন লেখকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই তাঁহারা সাহিত্যের আসরে নামিয়াই অন্তত কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহাদের কবিত্বশক্তির পরিচয় দিবার জন্য এক দুর্নিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কবিত্বের পরিচায়ক স্বরূপ চাঁদের আলো, কোকিলের কুহুধ্বনি, পত্রের মর্মর শব্দ, স্রোতস্বিনীর কুলকুল রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া চটিজুতা, পুঁইশাক, মিনি বিড়াল প্রভৃতি কোনো বিষয়ই বাদ যায় না। বোধ হয় এটা কালমাহাত্ম্যের দরুনই হয়। যৌবনের প্রথম উন্মেষে সমস্ত পৃথিবীটাই রঙিন মনে হয়। তখন কল্পনারথে চড়িয়া বাস্তব জগতের উপর কেবল চোখ বুলাইয়া যাওয়া হয়। সুতরাং সংসারের বন্ধুর, কঙ্করময় পথগুলি তখন চোখে পড়ে না। তারপর যত বয়ঃবৃদ্ধি হইতে থাকে ততই বাস্তবের সহিত পরিচয় ঘনীভূত ও গাঢ়তর হয়। তখন কবিত্ব, হা-হুতাশ, ধীরে ধীরে উড়িয়া যায়। ইহা হইতে আপনারা মনে করিবেন না যে আমি কাব্যসাহিত্যের নিন্দা করিতেছি। কাব্যের যে কি মহিয়সী ক্ষমতা তাহার প্রমাণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি রহিয়াছে। তবে তাহা কাব্যের মতো কাব্য হওয়া চাই। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের এখন যে ঘোর দুর্দিন তাহাতে অসার কল্পনার দাস হইয়া আলনশকরের আকাশ কুসুম গড়িয়া কালক্ষয় করিলে আর চলিবে না। সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জন্য আল্লাহতালা যাহাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন তাহার ষোল-আনা সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ধরুন শিশু-সাহিত্য; মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে আমাদের দেশের সেই পুরাতন কথকতা, গৃহের বৃদ্ধাদিগের সেই কেচ্ছাকাহিনী সবই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাহাদের স্থান অধিকার করিবার জন্য দক্ষিণারঞ্জন, যোগীন্দ্র সরকার, সুকুমার রায়চৌধুরীর ন্যায় আমাদের মুসলিম সমাজে কয়জনের আবির্ভাব হইয়াছে? যা দুই একজন দেখা দিতেছেন তাঁহারাও যথেষ্ট সহানুভূতি পাইতেছেন কিনা সন্দেহ। বালকদিগের জন্য জলধর সেনের ন্যায় পাকা লেখকও কলম ধরিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই; কিন্তু আমরা সে দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছি বলিয়া মনে হয় না; অথচ শৈশব এবং কৈশোরই ভাল বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। চরিত্রলেখকই বা সে রকম আমাদের মধ্যে কই? বসওয়েল, হালি, যোগীন্দ্র বসুর ন্যায় চরিতাখ্যায়ক কি আমাদের বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে জন্মিতে নিষেধ আছে? ওমর খাইয়ামের অনুবাদ করেন কান্তিবাবু, নরেন্দ্রবাবু, কোরান ও হাদিসের অনুবাদ করেন গিরীশবাবু। আমরা কবে আমাদের মহামূল্য রত্নরাজি অনুবাদের সাহায্যে পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিব? বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম', হকবা 'তারানা' আমাদের মধ্যে কবে শুনিব? রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য কৌতুক, ন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা,

দিলীপকুমারের সংগীতচর্চা, পুলিনদাসের লাঠিখেলা সবই আমাদের মধ্যে চাই। তবেই আমাদের সাধনার ফল পাইব। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি, দার্শনিক হইতে না পারি, জগদীশ বোস বা প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিক হইতে না পারি, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক হইতে না পারি কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের আদর্শ ছোট হইবে কেন? খোদার আরশ টলাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান না দিয়া যদি আমাদের প্রকৃত অভাব মোচনে সকলে নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে বদ্ধপরিকর হই তাহা হইলে সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত হইতে আমাদের অধিক বিলম্ব হইবে না। আপনাদের আজিকার এই অনুষ্ঠান দেখিয়া মনে হয় রোগ নির্ণীত হইয়াছে। প্রতিকারের ব্যবস্থাও অচিরেই হইবে।

বন্ধুগণ, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া সেই পরম করুণাময় সর্বনিয়ন্তা আল্লাহতালার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সকল চেষ্টা, সকল পরিশ্রম সার্থক করুন, আমাদিগকে বিজয়মাল্যে বিভূষিত করুন, আমাদের সাহিত্যসেবাকে সফল করুন। আমিন!

বাঙালি-মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা
কাজী আবদুল ওদুদ

বাংলার লোকদের দোষ-ত্রুটি নিশ্চয়ই খুব কম নয়। তবু মনে হয়, এদেশের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে, কোনো অপেক্ষাকৃত অল্প কালের ব্যবধানে মানুষের চিত্তের অপূর্বতার নব নব প্রকাশ এদেশে ঘটেছে। কিন্তু বাংলার ঐতিহাসিককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বাংলার গৌরবসামগ্রী এই যে সমস্ত আন্দোলন যেমন বৈষ্ণব আন্দোলন, ব্রাহ্ম আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি, এ সমস্তের অন্তরে মুসলমান নামধেয় বাংলার এক বিশাল মানব সমাজের কি দান, তাহলে মোটের উপর তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ভিন্ন তাঁর হয় তো আর গত্যন্তর থাকে না।

বাংলার মুসলমানের আত্মপ্রকাশের এই দীনতা লক্ষ্য করেই আমাদের কোনো কোনো সমালোচক বলতে চান—বাঙালি-মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা, আর্থিক সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বিচার করে দেখবার অবসর কোথায়? সেই গোটা সমাজটাই যে একটা সমস্যা!

এই শ্রেণীর সমালোচকদের কথার গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করবেন সন্দেহ নাই। সে সমাজ যদি এমন কোনো শক্তিমানের সূতিকাগার না হয়ে থাকে—যাঁর কর্মপ্রেরণা সেই সমাজের লোকদের অন্তরে নব নব আশা ও উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে ও অন্যান্য সমাজের লোকের চিত্তে শ্রদ্ধা ও আনন্দ জেগেছে, তাহলে তার অবস্থা শুধু শোচনীয় নয় অত্যন্ত চিন্তনীয়। তারই ইঙ্গিত করে যদি কেউ বলেন, বাংলার মুসলমান সমাজ হীন উপকরণে গঠিত হবে তাতে শুধু অসহিষ্ণু হয়ে আর কি লাভ হবে।

কিন্তু বাস্তবিক কি বাংলার ইতিহাসে মুসলমানের কিছু মাত্র দান নাই? সেকালে মুসলমান নবাব বাদশাদের দানের কথা ধরতে চাই না; বাংলার সাধারণ যাঁরা পুরুষানুক্রম এই বাংলার মাটির উপর জন্মেছেন ও শেষে এই মাটিতেই দেহরক্ষা করেছেন তাঁরা কি সব প্রকারে এতই দরিদ্র ছিলেন যে শুধু প্রাণ ধারণের অতিরিক্ত কোনো কিছু কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করবার সৌভাগ্য তাঁদের হয় নাই যাতে করে শনৈঃ শনৈঃ-গ্রথিত দেশের ভাব ও কর্ম-সৌধে তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত থাকতে পারে? এই প্রশ্নটি এক সময়ে আমাকে কিছু বিব্রত করেছিল। কিন্তু শীঘ্র এই কথাটি বুঝে আনন্দিত হয়েছিলাম যে, বাংলার মাটির উপর মুসলমান তরু শুধু নিষ্ফল হয়ে

দাঁড়িয়ে নাই। অতীতের কুষ্ঠি ঘেঁটে দেখবার তেমন সুযোগ আমার হয় নাই, তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দেখতে পাই, বাংলার স্মরণীয় নীলবিদ্রোহে প্রধানত মুসলমান চাষীই লড়েছিল। অন্যায়ের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রাণপণবলে সে-ই বলেছিল—'মানব না'। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নীল-দর্পণে এক 'তোরাব'কে অমর করেছেন। কিন্তু মুসলমান চাষীসম্প্রদায়ে 'তোরাব' একশ্চন্দ্র নয়, বহু নক্ষত্রের অন্যতম। আর বহুদেববিহীন, অস্পৃশ্যতা-নির্মুক্ত মুসলমান সমাজের কোলেই এই 'তোরাব'এর দল শোভে ভাল।

এই নীলবিদ্রোহের মুসলমান চাষীর কথার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শিক্ষা বিস্তারে মহসীনের দানের কথা (তাঁর দানে প্রথম ৩০ বৎসর হিন্দু মুসলমান সমভাবে উপকৃত হয়েছেন), ঢাকা নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ঢাকার নবাবদের দানের কথা মনে হয়েছিল, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, এঁরা তো মুসলমান সমাজে নিঃসঙ্গ নন। কি কারণে নিশ্চয় করে বলা শক্ত, ধনবান মুসলমানেরা ধনকে কোনোদিন বহুমূল্য মনে করতে পারেন নাই, তাই দানের ধারা অনায়াসে তাঁদের চার পাশে ছড়িয়ে পড়তে বাধা পায় নাই; আর তাতে করে মানুষের অঙ্গনে নিত্যই নব নব আনন্দ কুসুম ফুটেছে। একালের চাঁদ মিঁয়া, ফাজেল মোহাম্মদ প্রভৃতিরও দানের কথা যখন ভাবতে যাই তখন বুঝতে পারি, অর্থব্যয়ে চিরঅকাতরচিত্ত মুসলমানের এঁরা অযোগ্য উত্তরাধিকারী নন।—এই যে মানুষের দল, মুখের ভাষা যাদের ভিতরে অকর্মণ্য, কিন্তু যাদের জীবনের ভিতরে উপলব্ধি করা যায় যেন আদিম কুর্মের নীরব বীর্য, অথবা আদিম প্রকৃতির প্রাচুর্য, এদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনবগত থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু দেশের জীবনোৎসবে এদের সেবার স্পর্শ লাগে নাই, অথবা ভবিষ্যতে এদের এই প্রাণ-অবদান জাতির আঙিনায় 'রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে না' একথা অবিশ্বাস্য বলে ভাবতে স্বতই ইচ্ছা হয়।

২

সাহিত্য জীবনবৃক্ষের ফুল, জাতি বা সমাজ বিশেষের মগ্নচৈতন্যের রসের যোগানে তার বিকাশ ঘটে; সেই গূঢ় রস বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে সঞ্চিত আছে কিনা তাদের সাহিত্য সমস্যার আলোচনা সম্পর্কে তার সন্ধান নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু শক্ত প্রশ্ন এই হবে, সাহিত্যে সেই রসের যোগ্য স্ফূর্তি আমরা কবে দেখব? এর উত্তরে যদি বলা যায়, তা কি করে বলব, তাহলে অনেকেই শুধু ক্ষুণ্ন হবেন না, বিরক্ত হবেন। কিন্তু এ ভিন্ন এ প্রশ্নের আর কিইবা উত্তর আছে? সাহিত্যের বিকাশকে কতকটা তুলনা করা যেতে পারে ফুলফোটার সঙ্গে। ফুল গাছের মূলে আমরা পরম যত্নে জল ঢালতে পারি, দেশ বিদেশ থেকে তার জন্য ভাল সারও আনতে পারি, তবু ফুল ফুটবে কিনা, অথবা ভাল ফুল ফুটবে কি না সে

সম্বন্ধে যেমন হুকুম করতে পারি না, সাহিত্য সম্বন্ধেও তেমনি সমাজের ভিতরে স্কুল কলেজ লেবরেটারির স্থাপনা, বিচার বিতর্কের সৌকর্য সাধন ইত্যাদির পরও পরম আগ্রহে কালের পানে চেয়ে থাকা ভিন্ন আর আমাদের কি করবার আছে।

সাহিত্য সমস্যা বাস্তবিকই কোনো সমাজের সত্যকার সমস্যা নয়। সাহিত্যের বিকাশ যখন কোনো সমাজের ভিতরে মন্দগতি অথবা হতশ্রী হয়ে আসে তখন বুঝতে হবে হয়তো তার এক মৌসুম শেষ হয়ে গেছে, তারপর কিছুদিন কতকটা নিষ্ফলভাবেই কাটবে অথবা তার জীবনায়োজনে বড় রকমের ত্রুটি উপস্থিত হয়েছে। এই শেষের অবস্থা যে কোনো সমাজের পক্ষে মারাত্মক।

বাংলার মুসলমান সমাজে এ পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের উদ্গম হয় নাই; শুধু এই ব্যাপারটিই তার আত্মসম্মানের পক্ষে হয়তো মারাত্মক নয়। কিন্তু সে সমাজের লোক যে এ পর্য্যন্ত জীবনের কেনো ক্ষেত্রেই তেমন গৌরবের আসন লাভ করতে পারে নাই, বরং তাদের মর্যাদা সম্বন্ধে জানতে হলে অনুসন্ধান করে জানতে হয়, এতেই তার অবস্থা সম্বন্ধে আশঙ্কা আপনা থেকে এসে পড়ে। আর, তার অবস্থা ভাল করে চেয়ে দেখতে গেলে চোখে পড়ে সত্যই বাংলার মুসলমানের জীবনায়োজন মারাত্মক ত্রুটিতে পরিপূর্ণ যাতে করে মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ পর্যাপ্ত বিকাশই সেখানে সম্ভবপর হচ্ছে না—সাহিত্য সৃষ্টির কথা সেখানে ভাবা যায় কি করে?

এই সম্পর্কে নানা গুরুতর কথার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। বলা যেতে পারে, সে সমস্তের কেন্দ্রগত কথা এই—ইসলাম কিভাবে মানুষের জন্য কল্যাণপ্রসূ হবে সেই কথাটাই হয়তো আগাগোড়া আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। আমাদের পূর্ববর্তীরা ইসলামের যে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন তা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন; অন্তত তাকে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে যেভাবে লাভ করেছি তার সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অপবাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়। স্পষ্টভাবেই আমাদের সামনে গ্রহণীয়রূপে-বিধৃত ইসলাম নারীর অবরোধ সমর্থন করেছে, সুদের আদান-প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়েছে, ললিতকলার চর্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা। এই সমস্ত কথাই আমাদের নতুন করে ভেবে দেখতে হবে, ভেবে দেখতে হবে, মুসলমান সমাজের মানুষদের কর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতায় এইভাবে যে অনেকখানি নতুন রকমের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করা হয়েছে এতে করে কি সত্যিকার কল্যাণ লাভ হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার পিছনে যে সাধু উদ্দেশ্য আছে একথা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয়। সংযম ও পবিত্রতা, পরিশ্রম ও করুণপ্রাণতা, এবং সুন্দর ও মহনীয়ের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা; এ সমস্তের কথা যাঁরা মানুষকে বলতে চেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু

আমাদের নতুন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন এই জন্য যে, সংযম ও পবিত্রতাকে নারীর অবরোধের দ্বারা, পরিশ্রম ও করুণপ্রাণতাকে সুদের আদান-প্রদান নিষেধের দ্বারা ও সুন্দর মহনীয়ের প্রতি শ্রদ্ধাকে মানুষের বুদ্ধি শৃঙ্খলিত করার দ্বারা সম্ভবপর করে তুলতে প্রয়াস পেলে অসম্ভব কিছুর প্রতি হাত বাড়ানো হয় কি না, অন্যকথায় তাতে করে মানব প্রকৃতির উপর অত্যাচার করা হয় কিনা, যার জন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

যতটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমাদের হয়েছে তাতে মনে হয়, ইসলামের যে রূপ দিতে প্রয়াস পাওয়া হয়েছে, অথবা মানুষকে ইসলামের সার সত্য গ্রহণের উপযোগী করবার জন্য যে পথে চালিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে তাতে করে মানুষের উপর সত্যই অত্যাচার করা হয়েছে। যে ব্যবস্থায় বড় সত্যের পানে মানুষের চিত্তের আকর্ষণ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে ইসলামের সমাজ ব্যবস্থায় তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই; সে ব্যবস্থায় যতখানি বিজ্ঞানদৃষ্টি আছে তার চাইতে অনেকখানি বেশি আছে ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতা। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি বুঝাতে চেষ্টা করব। ইসলামের শ্রেষ্ঠ সত্য তৌহিদ মানবচিত্তের চিরমুক্তির বাণী। বার বার মানুষ তার কীর্তির শৃঙ্খলে আদর্শের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। Every idea is a prison, every heaven is a prison, আর সেই বন্ধনের প্রত্যেকটির সামনে দাঁড়িয়ে বলবার যোগ্য এই বাণী—'নাই, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ উপাস্য নাই'; আর সাম্য এই মুক্তি ও অগ্রগতির চিরসহচর। মানুষের এই অগ্রগতিতে সংযমের প্রয়োজন নিশ্চয়ই কিছুমাত্র কম নয়, যেমন নদীর জন্য কূলের বাঁধের প্রয়োজন কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু কূলের বাঁধের পত্তন করে তো নদীর সৃষ্টি হয় না, নদীর প্রবাহ আপন প্রয়োজনে কূলের বাঁধের সৃষ্টি করে চলে। মানুষের অগ্রগতির জন্যও প্রয়োজনীয় যে সংযম তারও তেমনিভাবে ভিতর থেকে জন্ম হওয়া চাই। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংযমের সত্যিকার মূল্য মানুষের জীবনে কত সামান্য! তাই মানুষের যে বন্ধু চান, ইসলামের এই বড় সত্যের পানে মানুষের চিত্ত উন্মুখ হোক, তাঁর কাজ কি এই হওয়া উচিত নয় যে মানুষের সর্বাঙ্গীণ পরিপোষণ ও পরিবর্ধনের সহায়তা তিনি করবেন? কোনো সর্বাঙ্গীণ পরিপোষণ ও পরিবর্ধন যার হয় নাই এই দূর পথের যাত্রী হবার সত্যিকার অধিকার তার কোথায়? এর পরিবর্তে বাইরে থেকে বিধিনিষেধ ও অবরোধ চাপিয়ে চাপিয়ে যে সব মানুষকে সংযত করবার চেষ্টা করা হয়েছে তাদের চিত্তের স্বাভাবিক স্ফূর্তিরই তো কিছুমাত্র অবকাশ দেওয়া হয় নাই! তারা যে বড়জোর অর্ধবিকশিত মানুষ! তারা কি করে কবে মুক্তিপথযাত্রী!

তারপর ললিতকলার চর্চাকে যে মুসলমান সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে কোনো মস্তিষ্কবান ব্যক্তি একে সমর্থন করতে পারেন? নিশ্চয়ই

নেতাদের এই হুকুমে মুসলমান তার এত দীর্ঘ জীবন সৌন্দর্য ও আনন্দবিহীন হয়েই কাটায় নাই; কিন্তু আমাদের ভেবে দেখবার দিন এসেছে যে সাধারণ সমাজের সম্মতিক্রমে আনন্দ ও সৌন্দর্য চর্চাটা করতে পারে নাই বলে তার সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তিতে কতখানি বাধা পড়েছে।

এখানে হয়তো কথা উঠবে, ইসলামে অনেকখানি puritanism আছে, এবং তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার দরকার করে না। আমি নিজেও ইসলামের এই puritanic ধাতের জন্য লজ্জিত নই; শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই যে puritanism এক বৃহৎ মানবসমাজের শ্রেণীবিশেষের বরণীয় হতে পারে তাতে করে সেই সমাজের স্বাস্থ্যের ও সৌন্দর্যের কিছু আনুকূল্যই ঘটে কিন্তু puritanism-কে এক বৃহৎ মানব সমাজের বরণীয় করে তুলতে প্রয়াস পেলে puritanism তো ব্যর্থ হয়ই—সেই সমাজেরও দুর্ভাগ্যের অবধি থাকে না।

এর একটি দৃষ্টান্ত প্রায় সমসাময়িক কালের বাংলাদেশে আমরা পাই। বাংলা সাহিত্যে বাংলার উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য কোনো দান নাই। অর্থাৎ এমন দান যার জন্য বাংলার চিত্তে শ্রদ্ধা জেগেছে, তা আপনারা জানেন। কিন্তু বাংলার লোকসংগীতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের দান সাদরে গৃহীত হয়েছে, যেমন পাগলা কানাইয়ের গান, লালন ফকিরের গান ইত্যাদি। এইসব গানের ভিতরে বুঝতে পারা যায়, ইসলামের একেশ্বরতত্ত্ব গান-রচয়িতাদের মনে স্থান পেয়েছিল। আর তারই সঙ্গে তাঁদের চারপাশের বাউল সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা ইত্যাদি মিশেছিল,—সব মিলে কোনো এক অসীমের সংবাদে তাদের চিত্ত তৃপ্ত ও মধুর হয়েছিল। মাতৃভাষায় রচিত এইসব গান এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছে, আর চাষীদের অভাবগ্রস্ত জীবনে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়েছে—তাদের অনন্তের ক্ষুধা অনেক পরিমাণে মিটিয়েছে। কিন্তু মানুষের অন্তরের বেদনার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন আমাদের আলেম সম্প্রদায় শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে শিক্ষা ও সাধনাহীন সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করা পল্লীর মুসলমান চাষীর এই গানের ফোয়ারা বন্ধ করে দিয়েছেন। পরিপূর্ণ ইসলাম মানুষের জন্য যে কল্যাণ ও শান্তি বহন করে এঁদের সাধ্য নাই সেই সম্পদ এই চাষীদের দ্বারদেশে এঁরা পৌছে দেন; শুধু মাঝখান থেকে হালাল হারাম সম্বন্ধে দুই-একটা হুকুম শুনিয়ে ও puritanism এর গোঁয়ারতুমিতে এদের জীবন নিরানন্দ করে দিয়ে তাঁরা কর্তব্য শেষ করেছেন। এই চাষীদের জীবনকে কিছু সুন্দর ও মহান করবার জন্য এইসব গানের কতখানি সামর্থ্য ছিল আমাদের পুনরায় সেকথা ভাবতে হবে না কি?

এই সম্পর্কে একটি ভাববার মতো কথা আমাদের সামনে এসে পড়েছে। সেটি এই যে কি নিজের সমাজে কি অন্য সমাজে সত্যিকার মুসলমানের চেষ্টা হোক ইসলামের স্বরূপ মানুষের সামনে ফুটিয়ে তোলা। সেই চেষ্টায় তার কিছু মাত্র

শৈথিল্য প্রকাশ না পাক। কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে অপরের ইসলাম বা ইসলামের অংশবিশেষের গ্রহণ ব্যাপারে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকুক। 'ধর্মে বলপ্রয়োগ নিষেধ' কোরআনের এই মহতী বাণী মুসলমানের জন্য সত্য হোক।

একথাটি বলবার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। অন্য সমাজের লোকদের উপর ধর্মের ব্যাপারে কিছুতেই আমরা জবরদস্তি করতে পারি না, একথা আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি মনে স্থান দেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের ভিতরকার লোকদের জন্যও যে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য সে কথা ভাবতে আমাদের অনেকেই হয়তো রাজি নন। এ সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। ধর্ম বিষয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা মানতে হবে, আমার এই কথার উত্তরে তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে মুসলমান কাকে বলব? আমি বলেছিলাম যাদের সাধারণত বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ যারা এ সমাজে জন্মেছে অথবা এতে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁর সঙ্গে এই তর্ক হচ্ছিল, আমাদের উভয়ের জনৈক বন্ধুর কোনো তথাকথিত অনৈসলামিক কথার আলোচনা সর্ম্পর্কে। তিনি আমার মত মানতে কিছুতেই রাজি হতে পারছিলেন না। শেষে একটি কথা বলে তাঁকে ভাবিয়ে তুলতে চাইলাম, বললাম, দেখুন আজ উনি যা বলছেন হয়তো দুদিন পরে নিজেই ওখান থেকে ফিরে আসবেন; একটা struggling soul-এর বেদনা আমাদের সমাজ বুঝবে না! কিন্তু তিনি অম্লান বদনে বললেন, তা যখন তাঁর struggle শেষ হয়ে যাবে তখন যেন আবার তিনি মুসলমান সমাজে ফিরে আসেন।

মুসলমান সমাজের কর্মকর্তারা যে কি আশ্চর্যভাবে পাষাণপ্রতিমার সেবক পাণ্ডাদের মতো পাষাণচিত্ত হয়ে পড়েছেন, মানুষের মনের কত কামনা কত বেদনা কত ভাঙাগড়া এ সম্বন্ধে তাঁরা যে কত চেতনাহীন হয়ে পড়েছেন সেসব কথা আজ না ভাবলে আমাদের দুর্দশার পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে না। মানুষের জীবন সুন্দর হোক কল্যাণময় হোক, সেখানে যেন আমি আমার সশ্রদ্ধ সেবা পৌঁছে দিতে পারি, এ ভাব যেন তাঁদের মনের ত্রিসীমায়ও ঘেঁষে না। তার পরিবর্তে মানুষের মাথায় কতকগুলো বিধিনিষেধ ছুঁড়ে মেরেই আল্লাহর সৈনিক হওয়ার গৌরব তাঁরা উপলব্ধি করতে চান!

মুসলমান সমাজে যে সমস্ত নরনারী বাস করে তারা শুধু মুসলমান নয়, তারা মানুষ—দেশ-বিদেশের নানা ধর্মের নানা বর্ণের মানুষের আত্মীয়। সেই বিশ্ববৃহৎ মানবসমাজের নানা আশা আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা বিফলতার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হচ্ছে এই বাণী যে, মানুষ দুঃসাহসী, তার অনন্ত ক্ষুধা; জড় জগতের বন্ধনই সে মানতে রাজি নয়, চিন্তার জগতের তো কথাই নাই। মানুষের এই বাণীর সার্থকতার কোনো আয়োজন কি মুসলমান সমাজে করতে হবে না? যা সুন্দর শুধু তাই দিয়ে দৃষ্টি আবৃত করে কি মুসলমান তার সৌন্দর্য বুঝতে পারবে? না একথাও সে বুঝবে যে এর জন্য

সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সেই সুন্দর বস্তুকে কিছু দূরে স্থাপন করা, যাতে করে সমস্ত জগত তার চোখে প্রতিভাত হবে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সেই বস্তুর সৌন্দর্য সে উপলব্ধি করবে?—চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির মুক্তি (emancipation of intellect) এতে শুধু মানুষের অধিকার থাকা উচিত নয়, এই হচ্ছে তার জীবনপথে বিধাতার দেওয়া পাথেয়। যেমন করেই হোক এই পাথেয়ের ব্যবহার মানুষ করে, তবে অনেক সময়ে ভয়ে ভয়ে করে বলে তার অন্তঃপ্রকৃতির যথোপযুক্ত পুষ্টিলাভ হয় না।

সাহিত্য জ্ঞানের সুরভি, তাই জ্ঞানচর্চা সমাজে অব্যাহত থাকলে সাহিত্যের জন্য আর কোনো ভাবনা থাকে না। কিন্তু সেই জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় মুক্ত-বুদ্ধির, অথবা তারও চাইতে বেশি প্রয়োজনীয় সমাজজীবনে বৈচিত্র্যের—মুক্ত-বুদ্ধি যার সন্ততি। অবরোধ ও নিরক্ষরতার চাপে আমাদের সমাজের অর্ধেক শক্তি ব্যক্তিত্বহীন ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে; সেই অর্ধেকের সংস্পর্শে এসে অপরার্ধেরও চিত্তবিকাশের অবকাশ কোথায়? মানুষের চিত্ত যার আঘাতে জেগে উঠবে সেই বৈচিত্র্য এমনি করেই আমাদের সমাজে দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

সুন্দর ও সবল জীবনের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন তার এত অভাব বাংলার মুসলমান কি করে পূরণ করবে, এ কথা ভাবতে গেলে সত্যই অবসন্ন হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আশার অবকাশও যে নাই তা নয়। বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে সেই গূঢ় জীবনরস যদি সত্যই সঞ্চিত থাকে তবে তার এই সঙ্কট সময়ে তার কোলে তার বীরপুত্রদের জন্ম হবে যারা তার সমস্ত অভাব সমস্ত বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের যোগ্য সূতিকাগার রূপে, তৌহিদের যোগ্য বাহন রূপে। ইসলামের যে তৌহিদ মুক্ত নির্বারিত জ্ঞান ও পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের শিখরই তার যোগ্য অধিষ্ঠানভূমি! মুসলমান অকারণে ভীত হয়ে সেই অমূল্য মানিককে অন্ধ বিশ্বাসের গুহায় লুকিয়ে রেখে তার সার্থকতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

৩

সাহিত্যের বিকাশের জন্য সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সুব্যবস্থিত সমাজ জীবনে জীবনের বহু ভঙ্গিমতাকে যথেষ্ট যত্ন ও শ্রদ্ধা নিয়ে লালন করবার। সেই দিক দিয়ে যে সব ত্রুটি বাংলার মুসলমান সমাজে রয়েছে তার মারাত্মকতা কত বেশি তাই একটু বিস্তৃতভাবে বলতে প্রয়াস পেয়েছি; তবু হয়তো পরিষ্কার করে বলতে পারি নাই। আপনারা নিজেদের চেষ্টায় সেই অসম্পূর্ণতা পুষিয়ে নেবেন। (এ সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে পড়ছে। ইসলামের ইতিহাসের অমৃতফল বলে মুসলমান যে সব নিয়ে গর্ব করেন সেই মোতাজেলা দর্শন, সুফী সাহিত্য, মোগল স্থাপত্য যাঁদের কীর্তি—তাঁরা আমাদের অবলম্বিত ইসলাম-ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই।)

কিন্তু কেউ কেউ বলতে পারেন কালের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের সমাজ ব্যবস্থার আবশ্যক পরিবর্তন আপনা থেকে হয়ে যাবে; কাজেই সে সব কথা না তুলে বর্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব কথা বাংলার মুসলমানের চিত্তকে আন্দোলিত করছে তার যোগ্য মীমাংসার চেষ্টা করাই সমীচীন, তাতে করেই ধীরে ধীরে আমাদের সব ক্রটি স্খালিত হয়ে যাবে আর আমাদের সমাজও সুন্দর ও সুব্যবস্থিত অবস্থায় দাঁড়াতে পারবে।—এ কথার উত্তরে শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে যে কালের ভাণ্ডারে অনন্ত রত্ন রয়েছে কিন্তু প্রাণপণে না চাইলে তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যায় না। এই প্রাণপণ চাওয়ারও পিছনে অবশ্য ইতিহাস আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কখনো যেন আমাদের ভুল না হয় যে যারা পেয়েছে তারা সমস্ত দেহ-মন দিয়ে চেয়েছে।—তা ছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণত যে সব সমস্যা আজকাল বাংলার মুসলমানের চিত্তকে আন্দোলিত করছে বলে বোধ হচ্ছে সে সব বাস্তবিকই তাঁদের সামনে প্রবল চেহারা নিয়ে দাঁড়ায় নাই। উর্দু বাংলা সমস্যা যে সত্যই তাঁদের জন্য কোনো সমস্যা নয় তার প্রমাণ তো বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা তাঁদের সামান্য ক্ষমতার ভিতর দিয়েও প্রতিনিয়তই দিচ্ছেন; আর বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহারের অনুপাত সমস্যাও সাহিত্যে বাঙালি-মুসলমানের খুব অল্প দিনের শিক্ষানবিশির পরিচায়ক; আরো কিছুদিন গেলেই ও সম্বন্ধে তাঁদের খেয়াল আপনী থেকে দুরস্ত হয়ে যাবে এমন আশা করা যায়, কোনো সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন শুধু শব্দের নয় বর্ণ ও গন্ধযুক্ত শব্দের, অন্য কথায় শব্দের গায়ে বর্ণ ও গন্ধ মাখিয়ে দিতে পারে এমন চিত্তের, এতটুকুও বুঝবার ক্ষমতা বাঙালি-মুসলমানের হবে না এ ধারণা নিয়ে তাঁদের সাহিত্য সমস্যার আলোচনা করা নিশ্চয়ই বিড়ম্বনা। তবে এই সব সমস্যার সম্পর্কে একটি কথা ভাববার আছে। এই সব সমস্যার ভিতর দিয়ে বাংলার আধুনিক মুসলমানের একটি বিশেষ কামনা ফুটে বেরুতে চাচ্ছে, সেটি এই—'বাংলার মুসলমানকে সত্যকার মুসলমান হতে হবে'।

মুসলমানের এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করলে প্রধানত দুইটি চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তার একটিকে বলা যেতে পারে প্রতিক্রিয়া, অন্যটি ক্ষোভ অর্থাৎ অনুশোচনা। বাংলা সাহিত্য আজ জগতের দৃষ্টি একটুখানি আকর্ষণ করতে পেরেছে এবং তাতে এর সত্যকার অধিকার আছে। কিন্তু তবু সত্যের অনুরোধে সাহিত্যরসিকদের নিশ্চয়ই বলতে হবে এ সাহিত্য এখনো খুব বেশি পরিমাণে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য; মানুষের দুঃখ ও আনন্দের প্রকাশের চাইতে হিন্দুর বিশেষ দুঃখ ও বিশেষ আনন্দের চর্চাই এতে বেশি। 'বাংলার মুসলমানকে মুসলমান হতে হবে' এ হচ্ছে অনেক পরিমাণে মুসলমানের অন্তরে বাংলা সাহিত্যের হিন্দুত্বের প্রতিক্রিয়া। এখানে হয়তো তর্ক হবে—হিন্দুও মানুষ আর বিশেষকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার, কিন্তু তাতে করে আমার কথাটির ঠিক উত্তর দেওয়া হবে না।

আমি এখানে বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য সম্বন্ধে এই কথাটুকু বলতে চেয়েছি যে বাংলা সাহিত্যে হিন্দুর যে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পাওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তা অনেকখানি অস্বাভাবিক রকমে হিন্দু, অর্থাৎ বিশ্বের আঙিনার এক পাশে তার বিশেষ রুচি ও বিশেষ দুঃখ নিয়ে ফুটে উঠে যে হিন্দু জগতের সঙ্গে তার অবস্থার মোকাবেলা করতে চাচ্ছে সে হিন্দু নয়, কিন্তু বিশ্বের মানবযাত্রীদের পাশ কাটিয়ে তার চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কূটতর্কে সময় কাটাচ্ছে যে হিন্দু সেই হিন্দু। অবশ্য যারা একবার নিচে পড়ে গেছে তাদের উদ্ধারের ইতিহাস অনেক পরিমাণে যে ঘুরপাক খাওয়া ইতিহাস হবে এ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের দুর্ভাগ্যের জের যে আমরা কতকাল টেনে চলব তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এইখানে যে হিন্দুর হিন্দুত্বের সংঘাতে তার প্রতিবেশী মুসলমানের অন্তরে শুধু সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই জেগেছে।

ক্ষোভ অথবা অনুশোচনার ভাবটিকে এই প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষোভ অথবা অনুশোচনার ভিতরে যে আর একটি কথা আছে সেটি না বুঝলে আধুনিক বাঙালি-মুসলমানের উপর অনেকখানি অবিচার করা হবে। সেটি তার মনের এই একটি বেদনার কথা যে ইসলাম সুন্দর, ইসলাম মহান, কিন্তু তার যোগ্য প্রকাশ আমরা আমাদের সাহিত্যে দেখছিনে কেন? এই যে বাঙালি-মুসলমানের অন্তরে একটুখানি সত্যকার বেদনা জেগেছে এ তার শুভাদৃষ্টেরই পরিচায়ক—

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে;
তুমি আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে।

কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের সামান্য একটু নিবেদন করবার আছে, সাহিত্যে যে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রিষ্টান নাই তা নয়; কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টানের আর সাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টানের এক চেহারা নয়। সাম্প্রদায়িক হিন্দু অথবা মুসলমান তার দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে প্রধানত জগতকে এই বুঝাতে প্রয়াস পায় যে সে আগে হিন্দু অথবা মুসলমান তারপরে মানুষ। কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু অথবা মুসলমান অন্তরে অন্তরে জানে সে আগে মানুষ তারপরে হিন্দু অথবা মুসলমান। মানুষের অন্তরের গভীরতম আনন্দ ও বেদনা নিয়েই সাহিত্যের কারবার, সেইখানে সাহিত্যিক মানুষকে তার সম্প্রদায় ও জাতির আবরণ উন্মোচিত করে দেখেছে তাই মানুষে মানুষে আত্মীয়তাই সে বেশি করে উপলব্ধি করে। সুতরাং সাহিত্যে জাতি ও ধর্ম ভেদ যেন কতকটা একই ফুলের দেশ ও কালের ভেদ—ভেদ শুধু পাপড়ির বিন্যাস ও রঙের গাঢ়তার বৈচিত্র্যে।

তাই বাংলার সাম্প্রদায়িক মুসলমান আজ ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ও কতকটা সত্যকার বেদনায় ইসলামের যে চিত্র মনে মনে আঁকছেন বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানের হাত দিয়ে তারই অবিকল প্রতিচ্ছবি নাও বেরুতে পারে বরং সেই সম্ভাবনাই বেশি। তবে ইসলাম সম্বন্ধে যদি সত্যকার বেদনা তার চিত্তে জেগে থাকে তবে সাহিত্যে তার এক অনুপম রূপ নিশ্চয়ই ফুটে উঠবে। কিন্তু সাহিত্য যেমন চিরদিন অনুপম তেমনি চিরদিন অভিনব, তাই সাম্প্রদায়িক মুসলমান তার এই কামনার ধনকে প্রথমে নাও চিনে উঠতে পারে।

সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালি-মুসলমানের মনের গোপনে আরো বহু সমস্যা আছে, যেমন ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসের কোনো কোনো পর্যায়ের দিকে আমাদের আজ বেশি চাইতে হবে অথবা আমাদের মাতৃভাষায় সাহিত্যের কোনো কোনো অংশ আমরা সাদরে গ্রহণ করব, কোনো কোনো অংশ বর্জন করে চলব ইত্যাদি। কিন্তু এসব বিচারে প্রবৃত্ত হতেও আমরা প্রস্তুত নই, কোনোা আগে থাকতে এসব বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আর টাকা পাবার আশায় টাকার থঁলি তৈরি করা সমান রকমের আহাম্মকি। এসব বিচার করবে প্রত্যেক সাহিত্যস্রষ্টাই নিজে, আর কি গ্রহণ করবে আর কি বর্জন করবে সেটি নির্ভর করবে তার রুচি ও শক্তির উপর। তবে একটি কাজ করে বাংলার সাম্প্রদায়িক মুসলমান বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানদের কিছু সাহায্য করতে পারেন সেটি হচ্ছে কোরআন হাদিস ও প্রাচীন মুসলমান গ্রন্থকারদের ভাল ভাল বইয়ের বাংলা তর্জমা প্রকাশ করা। অনেক সময় দেখা গেছে অতি সামান্য উপকরণ থেকেও সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টাদের হাতে অনেক বড় সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। একটি ফুলকি তাঁদের কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য যেন যথেষ্ট। কিন্তু সেই সামান্য উপকরণটুকুও তো হাতের কাছে চাই।

আর একটি কথা বলে এই আলোচনা শেষ করব। আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য আমাদের আজকাল চাইতে বলছেন উর্দু সাহিত্যের দিকে। সে চাওয়াটা মোটেই দূষণীয় নয় বরং যত বেশি চিত্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ততই আমাদের জন্য মঙ্গলকর। কিন্তু এর ভিতরে যে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে বাংলা সাহিত্যে বাংলার মুসলমানের অনুপ্রেরণা দেবার মতো কিছু নাই, স্পষ্ট ভাষায়ই বলতে চাই—ওটি দেখার ভুল। উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নাই; তবে যে সমস্ত সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করে বাঙালি-মুসলমানকে তাঁদের প্রতি ভক্তিমান হতে বলা হয় তাদের কয়েক জনের লেখার সঙ্গে আমার অল্প কিছু পরিচয় আছে এবং সেই পরিচয়ের বলে আমি বরং এর উল্টো কথাই বলতে চাই, বলতে চাই, বাংলার মুসলমানের অন্তরে প্রেরণা দেবার মতো জিনিষ বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যেই বেশি আছে।

বাংলার গত এক শত বৎসরের ইতিহাস যে কোনো দেশের পক্ষে গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের স্রষ্টাদের এ পর্যন্ত সাধারণত দেখা হয়েছে হিন্দুর চোখ দিয়ে অর্থাৎ সামান্য সাফল্য-লাভে-গর্বিতচিত্ত হিন্দুর চোখ দিয়ে। সেই আস্ফালন থেকে মুক্ত হয়ে অথবা তাতে বিরক্ত না হয়ে যদি তাকানো যায় এই শত বৎসরের রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, রাজনারায়ণ, রামতনু, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির দিকে—যদি ভাবা যায় একটা মুমূর্ষু জাতির দেহে জীবন ফিরিয়ে আনবার জন্য কি প্রাণপণ সাধনা এঁরা করেছেন, সে সাধনায় কত উদ্বেগ, কত অভিমান, কত নৈরাশ্য, কত উল্লাস, তখন এইসব শক্তিমানদের কাব্যে কারো জাতি-অভিমান বিজাতি-বিদ্বেষ ইত্যাদির অর্থ আপনা থেকে পরিষ্কার হয়ে আসে। আর সত্য ও কল্যাণ পথে আমাদের অগ্রজরূপে এঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনও আমাদের অন্তরে সহজ হয়ে পড়ে।

তারপর বাংলা সাহিত্যের কথা। এর ভিতরে দোষ যে ঢের আছে সে সম্বন্ধে আগেই কিছু বলা হয়েছে; কিন্তু সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও এতে ভাল যেটুকু সম্ভবপর হয়েছে তাকে ডিঙিয়ে যাবার মতো কিছু উর্দুতে পাই নাই, বরং বড় সাহিত্যের যে একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ মুক্তবুদ্ধি তার যতটুকু বিকাশ বাংলাতে হয়েছে ততটুকুও সেখানে চোখে পড়ে নাই। তাছাড়া চিন্তার জগতেও বাঙালি-ম্‌সলমান শুধু টুপি দেখে আত্মীয় ঠাওরাবে এ মনোভাব সম্বন্ধে শুধু এই বলা যায় যে যত শিগগির এ দূর হয়ে যায় ততই আমাদের লজ্জা কমে।

দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষ যে যেখানে সত্য ও কল্যাণের সন্ধানী হয়েছে সে আমার ভাই; একথা যদি মুসলমান প্রাণ খুলে না বলতে পারে তবে বৃথাই তার সাম্য ও একেশ্বরতত্ত্বের অহঙ্কার।—আর শুধু মুসলমানের সাহিত্য সৃষ্টি নয়, তার সমস্ত নবসৃষ্টির উৎস এইখানে বাঁধা পড়ে ক্রন্দন করবে।

বাংলার লোকসংগীত
আবদুল কাদির

উত্তরে রাজমহলের বিস্তীর্ণ পাহাড়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে আসাম ও আরাকান পর্বতরাজি, আর দূর পশ্চিমে বিন্ধ্যাচল, এই বিচিত্র প্রকৃতি ঘেরা ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার বৃহৎ উপত্যকাটিতে আবহমান কাল ধরিয়া ভক্তের পর ভক্ত, ভাবুকের পর ভাবুকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে; আর চিন্তা ও প্রেমের স্রোত একের পর একে আসিয়া সমস্ত ভূভাগখানিকে আন্দোলিয়া, মাতাইয়া দিয়া গেছে। 'পৃথিবীতে এই দেশখানি নিতান্ত অল্প পরিসর হইলেও ইহার মূল্য পৃথিবীর ইতিহাসে অল্প নহে। ইহার মাটির এমনি ধারা যে ইহার অধিবাসী আপনা হইতেই কোমল ভাবুক প্রাণ; ইহার জাতিটাই কবির জাতি। আর গেঁয়ো কৃষকের দল—তারা যে মাতা বসুন্ধরার স্বভাবশিশু, চির আনন্দবাদী সন্তান; বিশেষত বাংলার চাষী—নিতান্ত সরলস্বভাব সহজ ভাষী; তারা ফসল বোনা, নিড়ানি দেওয়া আর ফসল কাটার সাথে সাথে বিভিন্ন ঋতু বিবর্তনের নিকট-ভোগ-সংস্পর্শে থাকিয়া থাকিয়া আরো অধিক করিয়া কবি প্রাণ! এমনতর হওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক—কারণ কৃষিপ্রধান দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ মানুষের চিরন্তন সুকুমার বৃত্তিগুলিকে সুপ্রকাশের পথে বিপুলভাবে সাহায্য করে। কৃষকেরা সারা জীবন প্রকৃতির বুকের কাছে থাকিয়া থাকিয়া তাহা হইতে প্রচুর রস সঞ্চয় করে; তাহাদের সেই রস-স্নিগ্ধ সরল অন্তরে প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য অতিসহজেই প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিতে পায়। ভরা বর্ষার অপরাহ্নে ভাটিয়ালবাহী 'মধুকর' পানসীর হালে বসিয়া, গো-খুর রেণু-রাঙা গো-চারণের মাঠে 'কঙ্কের' মতো উদাস বাঁশি হাতে লইয়া, জোছনা রাতে সারিন্দা বা একতারার ঝঙ্কারে, কিম্বা ক্লান্ত ঘুম-পাওয়া দ্বি-প্রহরে মন্দিরা বাজাইয়া বাজাইয়া তারা আগত ঋতু বা কালের সহিত সায় দিয়া যায়। পশ্চিমে শ্রাবণ-বাদলের গুরু গর্জনে চাষীরা 'কাজরী' গানের বর্ণোৎসবে বাহির হয়, জীবনকে বৎসরকার চাওয়া শ্যামলানন্দে আপ্লুত করিয়া লয়।

বৌদ্ধ যুগের মানিক চাঁদ, আদিকবি মীননাথ, চাঁদ কবি হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিনের গোস্বামী কৃষ্ণকমল পর্যন্ত বাংলার চাষী দেশের প্রাদুর্ভূত কবি বা পদ কর্তাগণের আদর্শ ও ভাবধারার সাথে যোগ ও ভোগ দিয়া চলিয়াছে; কবিওয়ালা ঈশ্বর গুপ্তের পর হইতে এই সমঝদাররা আর পা মিলাইয়া চলিতে পারিল না;

তাহারা কোটিশ্বর দাসের ভাসান যাত্রা আর আমীর সাধুর বিরহ-বিলাপ নিয়াই আপনার ভাঙা খড়ের ঘরে আত্মভোলা হইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। দেশের পরবর্তী কবির ভাগ্যে বিদেশের নোবেল প্রাইজ ঘটিল, কিন্তু চাষীর তন্দ্রাস্তব্ধ কানে উক্ত কবি-গোষ্ঠীর আবির্ভাব সংবাদটাও পৌঁছিতে পাইল না। এই কবিরাও এই উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের পানে একটু সহানুভূতির চক্ষে চাইবার বা তাঁহাদের নব পথে ইহাদের জীবনের সত্যকে একটুখানি গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিল না।

হিন্দুধর্মের অবাধ্য সন্তান বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যেই যুগে সংস্কৃতের অবাধ্য সন্তান প্রাকৃতবাংলাসাহিত্যমণ্ডপ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, সেই যুগের অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর কৃষকেরা 'যোগীপাল', 'মহীপাল', 'গোপীপাল' প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের নীতিসূত্রে গাথা স্তুতি গানে নিতান্ত আমোদিত হইত। এই স্তুতি-গান গৌড়িয় যুগেও পূর্ণ মাত্রায় বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছিল; আজও পল্লীতে সংগীতানুষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষকদের নামে স্তুতি রচনার প্রচলন আছে, অবশ্য তাহা নানা অবস্থা বিপর্যয়ের পর ভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। কবীন্দ্র ও গুণরাজ খাঁ যেমন করিয়া পর্যায়ক্রমে নসরত খাঁ ও পরাগল খাঁর স্তুতি গান গাহিয়াছেন, যেমন করিয়া বিজয়গুপ্ত কানা হরিদত্তকে তাচ্ছিল্য করিয়া সে-স্থলে নিজের আসন পাতিতে আসিয়াছেন, তেমন করিয়া আজকালও গ্রাম্য কবিওয়ালা ও গায়েনগণ তাহাদের অভ্যর্থনাকারী ও গুরুজাঁর বন্দনার সাথে সাথে অনেক স্থলে বিগত বা বিপক্ষীয় গায়েনগণের খুঁত বা অপযশ গাহিয়া তাহাদের পালা আরম্ভ করে।

বাংলার লোক-সঙ্গীতে 'মেয়েলী সংগীত' এক উপাদেয় জিনিষ। 'বসন্ত রায়ের ব্রতের গীত,' 'খেলা-কীর্তন' বা 'গোপিনী-কীর্তন, 'ধামালী' বা 'ধামাইল', 'সহেলা' বা 'সই পাতার গীত,' 'বিবাহের গীত' প্রভৃতি এই 'মেয়েলী-গীতির' অন্তর্ভুক্ত। 'বিবাহের গীত'—'স্নানের গীত', 'বরযাত্রার গীত', 'অন্নপান', 'বাসর-মিলন' প্রভৃতি অংশে বিভক্ত। বেতন-ভোগী মেয়েরা ২/৩ জনে গলা মিলাইয়া এই 'বিবাহের গীত' গাহিয়া থাকে। বৌদ্ধদের আমল হইতে আহরিত এই আচারটিকে আজও পাড়াগাঁ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

ছড়াই হইয়াছে বাঙালি কৃষকের গানের আদি সম্পদ। ময়নামতীর গান, নাথ-গীতিকা সূর্যের ছড়া, রূপকথা, চণ্ডী ও মনসার আদি গান, এই সকল ছড়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছড়া বাংলার সমস্ত জেলা-খণ্ডেই ছড়াইয়া ছিল।

প্রাচীন বাংলা গানের পুষ্টি সাধনে সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায়, পদ্মাবতী ও চণ্ডী বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। শিব-সংকীর্তন, শিব-মাহাত্ম্য, প্রভৃতি তখনকার শৈব কীর্তনীয়াদের সৃষ্টি। শনির পাঁচালী, ষষ্টির পাঁচালী প্রভৃতির পাশাপাশি 'হরি-লীলা' বলিয়া সত্যনারায়ণের যে 'ব্রত-কথা' শুনা যায়, তাহাতে 'সুলোচনা ও

মাধবের' এক উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। গেঁয়ো কৃষকেরা আজো ২/৩ জনে মিলিয়া একত্রে সুর করিয়া সুন্দরীর গীত, বড়ুইর গীত, বানিয়ার গীত প্রভৃতি গীতের পাশে 'মাধবের গীত' নামে আখ্যাত এক প্রকার গীত গাহিয়া থাকে। 'সুন্দরীর গীতের' সুন্দরীর স্বামী 'কানাইর' 'মাধবের গীতের' সর্পদংশিত 'মাধবের' মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, উক্ত 'ব্রত কথার' মাধব, 'মাধবের গীতের' মাধব ও 'কানাইর' মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? রামেশ্বরের পর হইতে মিশ্রদেবতা সত্যপীরের কথাও শিব-কীর্তন—বিশেষ করিয়া ভক্ত রামপ্রসাদের পর হইতে শ্যামা-কীর্তন অধিকভাবে পল্লীতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সেই যুগে এই ভাব সাধারণ মানুষের জীবনে যে কতটুকু বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার ধারণার একটি উপাদান—মৃজা হুসেন আলি ও জাফর খাঁর মতন দুইজন মুসলমান শাক্ত কবির আশ্চর্য আবির্ভাব; মৃজা হুসেন আলি কালী পূজাও করিত বলিয়া কথিত আছে।

কবি জনার্দন যে ছড়াগুলি ব্রত-কথার রূপে জনসমাজে ছড়াইয়া ছিলেন, পরবর্তীকালে মঙ্গল চণ্ডীর ভক্ত যুগল কবিকঙ্কন ও অন্যান্যরা সেই সকলকে গাঁথিয়া গাঁথিয়া ষোল পালা গানে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। শিব সংকীর্তন ও রায়-মঙ্গলকে ছাড়াইয়া নানা কারণে চণ্ডীর গীতিই দেশে অধিক সমাদর ও প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই চণ্ডীর কীর্তি সংবলিত চণ্ডীকাব্য, পদ্মপুরাণ, শ্রীধর্মমঙ্গল প্রভৃতিতে যে সকল উপাখ্যান রহিয়াছে তন্মধ্যে পদ্মপুরাণের বিপুলার নয়ন-গলানো কাহিনী পল্লীতে সর্বাপেক্ষা প্রশস্তি ও প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। লহনা, খুলনা, ফুল্লরার কাহিনী যে কেন চাষীদের মাঝে এতটুকু সমৃদ্ধি লাভ করিতে পাইল না, তাহার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। এই সর্প-সঙ্কুল ও ব্যাঘ্র-সমাকুল বাঙালি জনপদে দক্ষিণের রায়ের, বিশেষ করিয়া সর্প ভীত কশ্যপ মুনির মন হইতে উৎপন্না মনসার আরতি গেঁয়ো চাষীদের সন্ত্রস্ত অন্তরের সর্বপ্রধান পূজা হইয়াছিল। আবার বিষহরি ও চণ্ডীর পূজা তৎকালে বিশেষ অর্থকরী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায় ছিল। তাই ৩১ জন কবিকে আমাদের মনসা-গীতি রচনা করিতে দেখিতে পাই। আজো যখন পল্লী যাত্রা-ওয়ালা গাহিয়া যায় : 'জাগই ওহে বেহুলা—সায় বেণের ঝি/ তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি?—(কেতকাদাস)'; তখন 'পাণ্ডুনাগ' 'ধাঙ্গুড়িয়া সাপ' বা কোনো অদৃশ্য সর্প দংশনের চকিত বিষ-বেদনা যেন গেঁয়ো চাষীর প্রাণের কোমল তন্ত্রী রনিয়া রনিয়া ওঠে। 'এই বার বুঝা যাবে চাষী বানিয়া' (দ্বিজ বংশীদাস)...'চাঁদের ছয় পুত্র আজি আসহ দংশিয়া' (রাবণ পণ্ডিত) প্রভৃতি বিকট উক্তিতে মনসার সর্বধ্বংসী ক্রোধ ও ধূর্ততা, এবং তাহারই পাশে চাঁদ বেনের অদ্ভুত বীরত্ব, দৃঢ় ব্রত; সবার উপরে বেহুলার রূপ, সৌম্য মূর্তি, দৃঢ় পাতিব্রত্য, অটল অতুলনীয় সতীত্ব, হাস্য মনে সকল দুঃখ সহন—প্রভৃতিতে বিভূষিত হইয়া যে স্বর্গীয় চিত্রটি শ্রোতা চক্ষুর সম্মুখে পরে পরে মূর্ত হইয়া ভাসিয়া উঠে—সরল চাষীর

মন তাহাতে অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়া ধনা মনার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে পদে পদে লখিন্দরের জীবন ভিক্ষা করিয়া করিয়া কলার কল্প মান্দাসে সম্মুখে অগ্রসর হয়। এই ভাসান-সংগীত জগতের সম্পদ ভাণ্ডারে এক অভাবনীয় অভিনব সামগ্রী।

এই ভাসান-গীতি দেশের সাধারণ অসাধারণ সকল মানুষের জীবনে যে কি আশ্চর্য কার্যকরী হইয়াছিল, তাহার একটা নিদর্শন— 'দস্যু কোনোরামের পালাগীত' যাহারা শুনিয়াছেন তাহারা পাইবেন। এই পালা-গীতোক্ত ঘটনা ষষ্টদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিশোরগঞ্জ জালিয়ার হাওরে ফুলেশ্বরী নদীর তীরে ঘটে। ময়মনসিংহে এই গীত ভিন্ন মধুমালা, কাঞ্চনমালা, পুষ্পমালা, শঙ্খমালা, মালঞ্চমালা প্রভৃতি গীতি-উপাখ্যানেরও উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের বিফলমনা 'কালকেতু ব্যাধ'কে 'কংস নদীর' তীরে কতকটুকু জল খাইয়া অবসন্ন দেহে বিশ্রাম করিতে দেখি। এই কংস নদী কোথায়? ময়মনসিংহের কংস নদীর দক্ষিণে 'বাঘরার হাওরে' 'দেওয়ান ভাবনা'র কাহিনী— আশেপাশেই 'ছুরত জামাল', 'দেওয়ান ঈশা খাঁ মছলন্দ আলি', 'জুলুমৎ খাঁ', 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান', 'কটু মিঞা', 'বাহাদুর খাঁ', 'মনোহর খাঁ দেওয়ান', 'পহ্লন খাঁ', 'গহুর রাজা ও সাহারবানু', 'দেওয়ান মদিনা', 'রূপবান', 'তৈমুমগুলাল ও চৈতন শীলা', 'জানে আলম ও আনজেনাহার' প্রভৃতি পালাগীতগুলি সমসাময়িক পল্লী কবিদের দ্বারা রচিত ও কীর্তিত হয়। ত্রিপুরা, উত্তর-পূর্ব ঢাকা, দক্ষিণ-পশ্চিম ছাতক, পূর্ব ময়মনসিংহ প্রভৃতি ভূ-ভাগসমূহে এই পালা-সংগীতগুলি গাহিয়া আজিও গায়েনরা দীর্ঘরাত্রি জাগরণ করিয়া থাকে। এই গীতগুলির বিশেষত্ব— ইহাতে ধনধান্যময়ী বঙ্গ পল্লীর সহজ সৌন্দর্য সরল গ্রাম্য ভাষায় ও ভাবে সুব্যক্ত। ইহাতে কৃত্রিমতা বা অতি কল্পনার ছড়াছড়ি নাই, আছে নিতান্ত সরল অনুভূতি। শাস্ত্র বা সংস্কারের বাঁধা বন্ধন এই গীতিগুলির চরিত্রে দাগ কাটিতে পারে নাই; মুকুন্দরাম ঘনরাম বিজয়গুপ্তের উপর যে সংস্কৃত-আদর্শ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এই খানে কোনোপ্রকার প্রভাব বা দৌরাত্ম্য খাটাইতে পায় নাই। বাংলা গ্রাম্য গানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হইয়াছে সংস্কৃত-পূর্ব যুগে, আর এই গাথাগুলি রচনার আমলে। এই পালা সমূহের বর্ণিত জনপদগুলি প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব, সেনবংশ প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম কৌলিন্য বা আচার উপদেশ, শরীয়তের দৃঢ় অনুশাসন ও কামরূপ বাসীদের শেষকালের তান্ত্রিকতা প্রভৃতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার সম্পদ হিসাবে দাশুরায়ের পাঁচালিকেও শ্রেষ্ঠত্বে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছে। পল্লীতে নানা-প্রকার বিপ্লবই এই গাথাগুলির উৎপত্তি পক্ষে সহায়তা করিত; পল্লীর সত্য ও প্রাণকে পরম বেদনায় উপলব্ধি করিয়া পল্লীর কবি তাহার সাময়িক ঘটনার

সন্নিবেশে এই পালাগীত রচনা করিতেন। উত্তর পশ্চিম ত্রিপুরার 'ওলফৎ আলির গীত' যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা পালাগীতের এবংবিধ উৎপত্তি-মীমাংসায় সন্দিহান হইবেন না, নিশ্চয়!

এই পালাগীতের প্রায় সমস্তগুলিতেই 'বারমাস্যা' নামে এক সাধারণ উপাদেয় অংশ দৃষ্ট হয়। আদিকাল হইতে প্রচলিত গ্রামের বিদ্যাসুন্দরগুলিতে এবং ভেলয়া প্রভৃতি গীতি-পুঁথিতেও এই বারমাস্যা বাদ পড়িয়া যায় নাই। উপাখ্যান সম্বলিত বারমাস্যা ছাড়া ছোটো ছোটো স্বাধীনভাবে রচিত শুধু-বারমাস্যাও বৃদ্ধাদের মুখে পাওয়া যায়। বারমাস্যাগুলিতে রচকের সমসাময়িক যুগের ষড় ঋতুব বিবর্তন বিকাশ, তৎকালিক সাধারণ জীবন যাপন, আহার বিহার, পোষাক পরিধান প্রভৃতি সম্বলিত নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তত্ত্বের সন্ধান মিলে। বিপুলার ও লীলার বারমাসি ২/৪/১০ লাইন মুখস্থ গাহিতে পারে না, এমন চাষী আজো উত্তর ত্রিপুরায় অল্প দৃষ্ট হইবে। বারমাসি বাঙালি চাষীর অতি আদরের ও সম্ভোগের সামগ্রী 'চাঁদ বিনোদে'র জাতি ভাই কৃষাণেরা আজিও—

পঞ্চগাছি বাতার ডুগুল হাতেতে লইয়া।
মাঠের পানে যায়...বারমাস্যা গাইয়া ॥

পৌরাণিকী নীলাম্বর ও ছায়ার স্বর্গভূমিতে শাপভ্রষ্ট হইয়া পরজন্মে কালকেতু ও ফুল্লরা রূপে আবির্ভাবের স্বরূপে এই সকল পালাগীতের কোনো কোনোটিতেও আমরা নায়ক নায়িকাদের পূর্বজন্মের একটা রহস্য-ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। বিপুলার গীতে—

বেউলার পূর্বকথা শুন মন দিয়া ॥
ঊষা অনিরুদ্ধ নামে গন্ধর্ব আছিল।
নৃত্যগীত করিবারে ইন্দ্রপুরে গেল॥
কাঁচা মৃত্তিকার সরা তাতে ভর করি।
দেবেরে মোহিতে নাচে ঊষা যে সুন্দরী ॥
.... হংসাসনে বিষহরি আইলা নিজ কাজে॥
পদ্মার কপটে ঊষার তাল যে ভাঙিল।
ক্রুদ্ধ হৈয়া দেবরাজ শাপ তারে দিল ॥

শাপে অনিরুদ্ধ লক্ষ্মীন্দর ও ঊষা বেহুলা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। আমরা 'পালী' নামক অন্যতম গীতির ও প্রায় সবগুলিতে গায়েনদের প্রারম্ভেই একটা পূর্বজন্মে ইতিবৃত্ত গাহিতে দেখিতে পাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ—'গুলেবাকাউলির' পালা গীতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গানের ভিতর দিয়া পূর্বজন্মের একটা ব্যাখ্যা বৌদ্ধদিগের আমল হইতেই বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। আমরা

জীবনকে আদি অন্ত রহিত একটা প্রহেলিকা ধারণা করি, কিন্তু এই গ্রাম্য কবিগণ জীবনের আদ্যন্ত নির্দেশ করিয়া দিতেন।

বৌদ্ধ আদর্শের এমনতর প্রভাব বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অংশেও পরিদৃষ্ট হয়, এমনকি বিদ্রোহী বৈষ্ণব সাহিত্যের উপরও ইহার প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। গুন রাজখাঁ ও তৎপরবর্তী সমস্ত পদকর্তা ও কবিওয়ালাদের নিজকে 'নির্গুণ' 'অধম' 'দীন হীন' দাস প্রভৃতি বলিয়া আখ্যাত করাটা বৌদ্ধদের হইতে আমদানি করা বিনয়। এই বিনয় নিষ্ঠা পল্লী বৈষ্ণবদের জীবনেও আশ্চর্যভাবে রূপ নিয়াছিল। সাধারণ প্রাকৃত-বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধদের সৃষ্টি ও দান; বলিতে গেলে সংস্কৃতাদর্শধ্বংসকারী বৌদ্ধরাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নির্মাতা! বৌদ্ধদের শূন্যবাদের দুরন্ত প্রভাব পরবর্তী জাতি সমূহ এমনকি এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য বাঙালিও কোনোমতে এড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। তৎকালিক মায়াবাদ নানাভাবে জীবনে বনাম সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। এই সভ্য যুগেও ব স্থলে ম, ও ন স্থলে ল প্রভৃতি কথিত ভাষায় প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বৌদ্ধদের স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতির প্রভাবান্বিত ফল! বৌদ্ধ আমলের গান—গোপীচান্দের ভয় প্রদর্শনে অদুনার—

তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা
রাঙা চরণ বেড়িয়ে লমু পালাইয়া যাবু কোথা।

এই উত্তর—নানাভাবে বাংলা-গীতি-সাহিত্যে ও মুর্শীদ্যাগানে বারংবার আহরিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ সভ্যতার অন্তর্ধানে শৈব ধর্ম বিষয়ক কীর্তনই বাংলায় প্রথম বিকশিত হয়। অতঃপর শাক্তদের ও বৈষ্ণবদের প্রাধান্যে এই শিব-কীর্তন আর অধিকদূর বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে, পদাবলী বাংলার জনপদ ছাইয়া ফেলে; স্বয়ং চৈতন্যদেব 'স্বরূপকে' দিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পড়াইয়া শুনিতেন। ব্রজবুলির চরম শোভা দাতা গোবিন্দদাসের বহুভঙ্গিম ও বহুরঙ্গে বিকশিত পদাবলী বঙ্গ পল্লীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছায়াপাত করে; গণসমাজ লৌকিক দেবদেবীর মণ্ডপে অশ্রু ধৌত রাধিকাকে আপনাদের দুঃখ বেদনা দিয়া গড়িয়া বরণ করিয়া লয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উদ্দাম পূর্বরাগের প্রেমাবেশ হিন্দু মুসলমান সকলদের মধ্যে একটা ভাবোন্মত্ততা জাগাইয়া দিয়াছিল তাই আমরা সেই যুগে সৈয়দ মর্তুজা ফকীর হবিব প্রভৃতি সাতজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির সাক্ষাৎ পাই; শ্রীরাধিকাকে উল্লিখিত কবিরা আপনাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অনাদ্যনন্ত কালের জাগ্রত শ্রীকৃষ্ণ রূপী চেতনার বিলাস রূপিনী হ্লাদিনী শক্তি রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। পাগলা কানাইর গান এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের নিরক্ষর চাষী তাহার প্রিয়তমা বধূর মধ্যেই যুগ যুগান্তর ধরে চলে আসা রাইকে অপেক্ষা

করিতে দেখিয়াছে—আবার সে বাস্তব জগতের এই মানসীর মধ্য দিয়াই বাঁশির সুরে সুরে সেই অনাদি সুরলক্ষ্মীর উদ্দেশে উদাস হইয়া ছুটিয়াছে। শ্রীচৈতন্য প্রভু যেমনভাবে ভাববিহ্বল অবস্থায় হরিনাম করিতে করিতে তমালকে জড়াইয়া কাঁদিয়াছেন, কদম্ববৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন, পুণ্যনগরের ব্রাহ্মণের কথায় কৃষ্ণোদ্দেশে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়াছেন কিংবা মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণ ভ্রমে আকুলিত হইয়া উঠিয়াছেন বাংলার চাষীও তেমনিভাবে উন্মত্ত হইয়া গাহিয়াছে—

আমি কি হেরিলাম জলে গো, নবীন কালিয়া রূপ।
কি হেরিলাম, কি হেরিলাম, কি হেরিলাম গো ॥
কালা—ভঙ্গী কর‍্যা দাঁড়াইয়াছে চওড়া তমাল তলে।
কালা—যার পানে চায়, তারে মারে যুগল নয়ানে গো ॥
কেহই বলে মেঘ-ই মেঘ-ই, কেহ-ই বলে কালা।
তোমরা নি দেখ্যাছ সই মেঘের গলায় মালা গো ॥
যদি কালা মেঘ হইত, যাইত রেঁ ঝরিয়া।
তবে কেন দেখিতাম রূপ কদম্ব হেলাইয়া গো ॥

যেই মুর্শীদ্যা গান—গেঁয়ো বাঙালির কান্নাতুর হৃদয়ের আদি গান, তাহাতে বৈষ্ণব লীলা মাধুর্যের যথেষ্ট সংমিশ্রণ রহিয়াছে। মুর্শীদ্যাগানে বৌদ্ধনিদর্শন মায়াবাদ ও লুই সিদ্ধাইর গুরুবাদ, বৈষ্ণবের লীলাবাদ ও অবতারবাদ, ইসলামের পীরবাদ ও সুফীবাদ এক আশ্চর্য সমন্বয় ও সঙ্গৎ লাভ করিয়াছে। কেচ্ছা, রাখালী, পালী, বারমাস্যা, সকল প্রকার গ্রাম্য গানের অশ্রুধারায় নিষিক্ত হইয়া এই মুর্শীদ্যা গানের ক্রমোৎপত্তি। এই কান্নার সাধনা—আত্মমুক্তির বেদনার সুরে সিক্ত, পল্লীপ্রাণের করুণ অভিব্যক্তি! যে গানে মুর্শীদ অর্থাৎ গুরু অর্থাৎ মানুষ ভজনা রহিয়াছে—তাহাই মুর্শীদি গান। বৌদ্ধরা যেমনভাবে অনুষ্ঠানাদি করিয়া প্রেত আনয়ন করিত, মুর্শীদি দলের লোকদেরও তেমনিভাবে সাধারণত দরগাহে উরূছের অনুষ্ঠান করিয়া 'গাছা' আনিতে দৃষ্ট হয়।

বাংলাদেশে সাধারণ ইসলাম যেভাবে প্রচারিত হয়, তাঁহা জনসমাজ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আলেমদের-দেওয়া-ইসলাম বাঙালি চাষীদের জীবন অনেকাংশে আশ্চর্য রকমে বিফলিত হইয়া গিয়াছে—শরীয়তের হুবহু প্রচলন বাংলার মাটি সহিতে পারে নাই, তাই মুসলমান চাষী সংগীতাদি সম্পর্কে শরীয়তী নিষেধকে উপেক্ষা করিয়া বৈষ্ণবীয় লীলাবাদের ছায়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। শাহজালাল ও প্রসিদ্ধ বারো আউলিয়াগণ বাংলার পল্লীতে যে আদর্শ ও তত্ত্বজ্ঞান বহন করিয়া আনেন, বাংলার তত্ত্বজ্ঞান ভক্তরা সেই মূসহকে আপনাদের ভাবধারায় বিমিশ্রিত করিয়া একটু উপভোগ্য করিয়া লয়। পশ্চিমাগত আউলিয়াগণ যত বড় জাগ্রত জীবন ও বীর্যবন্ত মারফতী সাধনাই নিয়া এদেশে আসুন না কেন, এদেশের

শাহ ঈলাল ফকীর, কুসুম-দীয়ার ফকির, তিনু ফকীর, কালু ফকীর, গণী ফকীর প্রমুখ ভক্তগণ প্রচারিত মারফতী বিদ্যা ও সুফীবাদকে আপনাদের জীবনে বৈষ্ণবীয় লীলামাধুর্যে ঢালিয়া গ্রহণ করিলেন।

মারফতী গানে যে আমরা অধিক ও বিশেষ করিয়া হজরত আলী, বিবি ফাতিমা, এমাম হাসান, হোসেনের প্রশংসাদি শুনিতে পাই—তাহার কারণ উক্ত পন্থী ফকীরদের মতে হজরত আলীই হইয়াছেন 'সাঁই দরদী'কে পাইবার পথের একমাত্র সিংহদরজা। তাই আধুনিক ফকিরী গানে বিশ্বমাতা (?) বিবি ফাতিমা সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত তত্ত্বাদি সংকুল উপাখ্যান সংলগ্ন হইয়া আছে।

মুর্শীদি গানে আমরা দেহ-তত্ত্ব আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক গভীর ভাবাত্মক নানা মীমাংসার সন্ধান পাই। মানুষ এই জীবনের রহস্যগুলি জ্ঞাত হইবার জন্য চিরকালই অল্পবিস্তর সন্ধানী; নিজেদের মধ্যে সেই সন্ধানী শক্তির অপ্রাচুর্য হেতু অক্ষমদের এই পীরের আশ্রয় লওয়া ব্যাপারটা মানব-সুলভ! বাংলার পল্লীতে যে সাধু ফকীর এহেন দুই একটি জটিল প্রশ্নের যৎকিঞ্চিৎ সমাধান করিতে পারিয়াছেন, তাহারই চতুষ্পার্শে দুর্বল নিরক্ষর লোকেরা দলে দলে মুরীদ সাজিয়া কিছু আলোক লইতে আসিয়াছে। আমরা লালন ফকীর, শ্যানাল ফকীরের লক্ষ লক্ষ শিষ্য দেখিতে পাই। লালন ফকীর ধর্মমতে হিন্দু, ব্রাহ্মণ বা মুসলমান, কোনোমতেই সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাহার হজ্, কোরবানি প্রভৃতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সকল এক বিশ্ব-ধর্মের মুক্ত সুরের আভাস দেয়। তিনি মদীনার হজরত মুহম্মদকে আসল মুহম্মদ বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, তাহার মতে সত্যকার নবি অন্ধকার ধন্ধকার নৈরাকার কুয়াকার এই চারি 'কারে'র উপরে অবস্থিত। যাহা হউক লালন ফকীরের তত্ত্বাদি—'কোনো্ বনে গেলি রে কানাই? ও তুই দাঁড়ারে—আমি পথের পদ চিহ্ন পাই, প্রভৃতি লীলা-রস-সিক্ত সংগীতকে ছাড়াইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভানুশা, ঈলাল শা'র তত্ত্ব মীমাংসা রাধা কৃষ্ণের লীলাবাদের কুয়াশা কাটিয়া মানুষের সামনে তুলিতে পারে নাই। ভানুশা একখানে গাহিতেছেন—

ও শ্যাম কালিয়াও, কালা কালা বলি যারে, সে থাকে গোয়ালার ঘরে
সে কি জানে প্রেমের বেদনা, বন্ধেরে নিয়া এত প্রেম জ্বালা ও ॥'

ঈলাল শা'র একটি গানে আছে—

সই, সই, কালারে যদি পাইতাম গো ॥

বস্তুত তাঁহাদের সঙ্গীতে শুধু অনন্তের সন্ধান আর বিরহের কান্নাই গুমরিয়া ওঠে!

পল্লীঅন্তরের এই রাধা কৃষ্ণ মালাধর বসুর ভাগবতের রাধা কৃষ্ণ নয়! বিরহী সারিন্দার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে, মেঠো বাঁশির সুরে সুরে গো-চারণের মাঠে ত্রিবেণীর ঘাটে ভজনালয়ের আড়ালে বসিয়া বাংলার লোকসাধারণ আপনাদের দুঃখ বেদনা

বিরহ দিয়া এই রাধা কৃষ্ণকে কল্পনা করিয়াছে; আর গংকুড়ের ধ্বনির সাথে সাথে ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিয়াছে। আরবি ভাষায় নিতান্ত ব্যুৎপন্ন বিংশ শতাব্দীর সংরক্ষণবাদী মুসলমান মৌলবী সাহেবও এই বৈষ্ণবাদর্শের দুরন্ত প্রভাব হইতে কোনোমতে মুক্ত হইতে পারেন নাই; নিম্নে একটি গানের উল্লেখ দ্বারা মন্তব্যটা স্পষ্ট করিয়া দিতেছি —

সোনা বন্ধু ও—তুমি বই আর কে আছে সংসারে ও ॥
এ ছার জীবনের আশা, আমায় করলে নৈরাশা
আর কি অমন জনম দিবা মোরে, ও বন্ধো ॥
ও বন্ধুও! এ তব মসজিদ কোরানে, কুলুবিল মমিনানে,
আরশেলিল্লাহ্ পরে ও
আসিয়া মানুষের সঙ্গে, নানান্ রঙ্গের খেলা করে
এখন পাই না তোরে মম কল্পপুরে, ও বন্ধো ॥
ও বন্ধু ও! একদিন রাত্রে কুঞ্জে এসে দুই একাসনে
হস্ত দিলা মাথার পরে ও
ছাড়বে না ছাড়বে না বলে, কত আশা দিয়াছিলে
এখন সে সব কথা নাই তোমার অন্তরে, ও বন্ধো ॥
ও বন্ধু ও! দেখেছি এই ব্রজ পুরে, ধেনু বৎস মাঠে চরে,
গাভী যখন যায় চলে দূরে ও
বৎস যখন হাম্বা করে, গাভী আয় গো ত্বরা করে
সেরূপ আমি আহাদ পড়্যাছি তোর দূরে, ও বন্ধো।।

পরবর্তী যুগের মহাজন পদাবলী বা মুসলমানদের এই মারফতী গানের পূর্বরূপ রহিয়াছে বৌদ্ধ যুগের সহজিয়া সিঙ্গার গানে ও দোহায়। বৌদ্ধ সহজিয়ারা লোকপ্রিয় পট মঞ্জরী বঙ্গাল রাগে জনসাধারণে তাহাদের প্রচার গাহিয়া আমোদিত হইত। 'কাহ্ন' সম্বোধনটা সেই যুগেও দৃষ্ট হয়। বুঝিবা তাহারই মোহন প্রভাবে অনেক মুসলমানী মারফতী গানে 'গউর' 'কালা' ও 'কানাই' সম্বোধনটা নিতান্ত প্রচলিত হইয়া গেছে। মারফতী ফকীরদের মধ্যে একটি সাধারণ কাহিনী এমনতর শোনা যায়! একদা হজরত আলি আসিয়া হজরত মুহাম্মদকে জ্ঞাত করান যে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুরের আঘাতে তাহার নামাজের নিত্য ব্যাঘাত ঘটে। অতএব আদেশ পাইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মস্তকচ্ছেদ করিতে প্রস্তুত। হজরত শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার পূর্বে হজরত আলীকে তাহার মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া বদনমণ্ডল দেখিয়া লইতে আদেশ করেন। আদেশমতো বাঁশির সুর অনুসরণ করিয়া করিয়া যখন আলি বংশীবাদনে-সমাহিত-মন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইলেন, তখন ক্রোধে তাঁহার হস্তস্থিত জুলফিকার কাঁপিয়া উঠিল।—কৃষ্ণকে হত্যা করিতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছেন; হঠাৎ

হজরতের শেষ অনুরোধ তাঁহার মনে উদিত হইল।—তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখাচ্ছাদন মোচন করিয়া চকিত হইয়া দেখিলেন যে যাহাকে তিনি বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তিনি যে হজরত মুহাম্মদ স্বয়ং! ইত্যাদি।—মুহাম্মদ ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ই যে একই ব্যক্তি এই মিথ্যা ধারণাই গ্রামের বিস্তর মুসলমানদের মধ্যে গাঢ়তর রূপে বদ্ধমূল। এই অংশে রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের প্রভাব অনেকটা রহিয়াছে। এই রামাই পণ্ডিত কবীরের মতো একজন প্রবর্তক কবি; ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মিলন ইচ্ছায় তিনি সদ্ধর্মের প্রচলন করেন। তৎকালে তীর্থিক ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধর্ম বিতণ্ডার ফলে পশ্চিমবঙ্গে এই সদ্ধর্মের ও পূর্ববঙ্গে গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত নাথমার্গের উৎপত্তি ঘটে। হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতিরা এই নাথ মার্গেরই প্রচারক কবি।

আনন্দ বঞ্চিত হইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না; শুধু ধর্মের গোঁড়ামি আর অনুশাসন জীবনে কয়দিন একাধিপত্য করিতে পারে? তাই বাংলায় প্রচারিত সাধারণত ইসলাম রূপ বদলাইয়া আনন্দ মাধুর্যের সহিত নিজেকে জীবনে খাপ খাওয়াইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। এই জন্য তথাকথিত ফকীর ও শা'দের—হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হইতেই লক্ষ লক্ষ লোককে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির দরুন নব ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেরুদণ্ড নিতান্তই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল—বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের সাথে সাথে শ্রীচৈতন্যের উদ্বেল ভক্তি ও প্রেমোচ্ছ্বাস পরবর্তীকালের বৈষ্ণবদের জীবনের বিলাসমত্ততা ও ব্যভিচারের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, যাত্রা-অভিনয়ে শ্রীভগবানের মানবরূপে আবির্ভাবের যে দৃশ্যসকল দেখা তাহাই হইয়াছিল তৎকালীন বৈষ্ণবদের তপস্যাহীন জীবনের একমাত্র স্বপ্ন; অতএব সেই যুগে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে তথাকথিত ফকীরদের দ্বারা এহেনভাবে প্রচারিত ইসলামের একেশ্বরবাদ সুফীবাদ সর্বমৈত্রী সমস্ত বাংলাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। তাই শরীয়ত প্রচারকদিগকে এই মুসলমান বাউলদের জীবনের সত্য ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি; বাউল ধ্বংস ফতওয়া ঝাড়িলে শুধু চলিবে না; বাউল ফকীরদের আদর্শকে আজ সম্ভবমতো শুদ্ধ করিয়া সাংসারিক বৈচিত্র্যমুখী আনন্দকামী জীবনে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈষ্ণব লীলাবাদের চরম পরিণতি রহিয়াছে গ্রাম্য 'গাড়ু গানে'। এই গান সাধারণত অনেক স্থানে দুই দলে গাওয়া হয়। কিঙ্কিণীর সুরে সুরে চাষী যুবকের মন সম্মুখের সমস্ত ভোগ কামনার ছবি হতে অতি দূরে উদাস হইয়া চলিয়া যায়। বন্দনা ভজনা সালাম হইতেই সমের সাথে সাথে সমস্ত জনসভা চীৎকার করিয়া উঠে। প্রত্যেক পালা বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত যথা—বংশী, গোস্ট, বিরহ, সন্ন্যাস, সিনান, জল-ভরন, উদাস, বিচ্ছেদ, সখি, সন্ধ্যা, নিন্দুয়া বা নিদ্রা, স্বপন, ভোর,

কোকিল, প্রভাত, ফুলতোলা প্রভৃতি। এই অঙ্কগুলিতে রাধা-কৃষ্ণের জীবনের সাধারণ দিনের কল্পিত ঘটনা সম্বলিত সংগীত, সংগীতের খেয়াল ও সম একে একে গীত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের ভজনাদি এই গীতিখণ্ডগুলিতে এক পরমাশ্চর্য সরল রূপ লাভ করিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে মিলনের কোনো অংশ নাই, শুধু একটানা বিরহ আর অনন্তের প্রতীক্ষা।

উত্তর পূর্ব ঢাকাতে অল্প দিন পূর্বে 'নিমাই-সন্ন্যাস' গাহিবার জন্য 'গুষ্ট' ও 'খেলা' নামে যুগল কবিওয়ালার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। প্রতিভাবান বীর কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরেও আমরা মুসলমানী প্রভাব বিস্তরভাবে দেখিতে পাই, বহুকাল দুই সমাজের একত্র বসবাসের ফলে হরি ঠাকুরকে উর্দু জবানে বক্তৃতা করিতে দৃষ্ট হয়; কিন্তু 'গুষ্ট' ও 'খেলায়' সন্ন্যাস-গীতি এই শতাব্দীর হইলেও ইহাতে কোনোপ্রকার মুসলমানী বা বাহিরের প্রভাব তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

বাঙালি-মুসলমানের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাবমুক্ত যে গান পল্লীতে প্রচলিত আছে সে—'জারি' গান! 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি পুঁথি মুখস্থ ও হজম করিয়া গ্রাম্য জারিওয়ালা এই গানের সৃষ্টি করিয়াছে। পল্লীর ধর্ম-বিপ্লব, রাজনৈতিক গোলযোগ, সামাজিক হট্টগোল, বা কোনো প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামাদি কেন্দ্র করিয়া এই গান সাধারণত রচিত হইত ও হয়। এই জারী গানের পেছনে পল্লীর এক সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায়। 'কবিগানের' মতো এই জারিগানও দুই পক্ষে আড়াআড়ি করিয়া অগ্রহায়ণ বা পৌষের অপরাহ্নে কাঁধ ধরিয়া ধরিয়া গীত হয়। দলের কবি মুখে মুখে গান রচনা করিয়া দিয়া যান, আর সকলে সমস্বরে তাহা গাহিয়া যায়। ইহাতে প্রতিপক্ষের উপর অজস্র কটূক্তি, বিদ্রূপ বর্ষণ করা হয়, ও সাথে সাথে পাল্টা জওয়াব প্রদত্ত হয়। সংগীত সমাপ্তির পর দুই দলে একত্রে ভুরিভোজনের সময় জয়-পরাজয়ের নির্ধারণটা নিয়া সরল রহস্যালাপ করা হয়।

'পালী গান' বলিয়া যে গান 'গায়েন'রা শীতের রাত্রে গাহিয়া থাকে, সেই গানের উপকরণই বোধ হয় সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন পুঁথি লেখকগণ তাঁহাদের পুঁথি সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটিও পল্লী হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছিল। 'বানেছা' 'শ্যামারুক' প্রভৃতি পালী গীতের সহিত উক্ত নামীয় পুঁথিগুলির মিল যথেষ্ট রহিয়াছে। এই গীতের উপাদেয় চৌদিশি বন্দনা—'পূবেতে বন্দনা করলাম পূবে ভানুশ্বর, / একদিকে উদয় রে ভানু, চৌদিকে পশর'—ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অর্ধেক গান ও অর্ধেক কথা বিমিশ্রিত যে কেচ্ছা গাওয়া হয় তাহাতে রূপকথার অনেক কাহিনী পরিদৃষ্ট হয়। হালকা আমোদ লাভের জন্য গেঁয়ো চাষীরা এই গানের বৈঠক করিয়া থাকে, অনেকে অনেক কিছু উপলক্ষে এই গান মানত করিয়া থাকে—ইহার পিছনে এক অদ্ভুত সংস্কার সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

পল্লীবালক বালিকারা শেষ চৈত্রে দারুণ অনাবৃষ্টির দিনে ‘মেঘ রাজার গান’, পুতুল বিয়েতে ‘বিয়ের গান’, ‘নায়ড়ে আসার গান’, ঘোর বাদলার দিনে বৃষ্টি ভেজা ‘শিবা ঠাকুরের বিয়ের গান’ প্রভৃতি গাহিয়া থাকে। তাহারা কেচ্ছা ও রাখালী শুনিতে শুনিতে মাঝে নায়ক নায়িকার আবেদন উত্তর, বাদ প্রতিবাদ প্রভৃতি মূলক অনেক ‘কেচ্ছার গান’ শুনিয়া থাকে।

আজকাল অন্নচিন্তায় পল্লীর কৃষক সংগীতচর্চার অবকাশ করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর সংরক্ষণশীলদের দৌরাত্ম্যে তাহাদের জীবন যে ভাবে সংগীত-রস হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে অতি অল্প কালের মধ্যেই বাঙালি-মুসলমানের সমস্ত প্রকার লোক-সংগীত যে লুপ্ত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাংলার লোকসঙ্গীতে বাঙালি-মুসলমানের কি পর্যন্ত দান ও সৃষ্টি রহিয়াছে তাহার সীমা নির্দেশ সুসাধ্য নহে; কারণ উক্ত বিষয়ের উপকরণ চাষীদের মুখে মুখে—তদ্ব্যতীত সম্মুখে সংগৃহীত উপাদান কিছু মাত্র নাই। অত্যল্প কাল পরই এই raw materials বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।—অতীতের এই গৌরবের উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করার পক্ষে আজ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে যথেষ্ট উদ্যম দৃষ্ট হয় নাই। ইহা একটা জাতির পক্ষে গূঢ় পরিতাপ ও দুর্নিবার লজ্জার বিষয়, বলিতে হইবে!!

এই প্রবন্ধে লেখক বৈষ্ণবধর্মকে একটি মৌলিক ভাবধারা বলে মনে করে কয়েকটি মত প্রকাশ করেছেন—তা ঐতিহাসিক সত্যসম্মত নয়। ইসলামের প্রভাবই যে বৈষ্ণবভাবধারার জননী সে কথা অনেক খানি প্রমাণিত হয়েছে ; যদিও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবেই শ্রীচৈতন্য সাধারণ হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ইতিহাসের কথা না হলে বোধ হয় লেখকের মতের বিপক্ষে আমাদের বলবার কিছু ছিল না। ইসলামের সূফীবাদ যেমন হজরত মুহাম্মদকে বেড়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে সেরূপ বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ শ্রীকৃষ্ণকে বেড়ে লালিত হয়েছে। সে ভাবধারার আদি উৎস হয়তো ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বেও কোনো ঐতিহাসিক যুগে ছিল কিন্তু ইসলামের সাম্য, একেশ্বরতত্ত্ব, মুহাম্মদের প্রতি ভক্তি, পীর ভক্তি প্রভৃতি আদর্শ সে ভাবধারার একটি শ্রী ও রূপ দিয়েছে এবং সেইটাই বাংলার ধাতের জিনিষ। এজন্য অনেক মুসলমান কবি বা ফকিরের গানে বৈষ্ণবীয় ভাব দেখে বিস্মিত হতে হয়। আবার মুসলমান ও বৈষ্ণবের মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায় সেটা হয়তো তাদের পূর্ববর্তী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হতেই প্রাপ্ত; কারণ অনেক বৌদ্ধ বাঙালি পীরের হাতে মুরীদ হয়ে মুসলমান হয়েছিল।—সম্পাদক

বাঙালি-মুসলমানের সামাজিক গলদ
আনোয়ারুল কাদির

'সমাজ মাত্রই অতি গুরুতর বস্তু। সমাজ শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র।'

মুসলমান সমাজটি একটি অতি গৌরবের বস্তু, ইহার ইতিহাস অপূর্ব। ইহার বন্ধন প্রণালী অভিনব এবং অনন্যসাধারণ। ইহার আদর্শ পবিত্র এবং ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে যত গরীবই হউক না কেন ইহার মৃত্যু অসম্ভব। ইহা প্রাচীন মিশরীয়, আসীরীয়, পারসীক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজের কবর থেকে উঠে নতুন জন্ম নতুন দৃষ্টি ও নতুন শক্তি নিয়ে সমগ্র জগতকে মোহিত স্তম্ভিত করেছে। ইহার বয়স অল্প; কিন্তু 'সিংহ শাবক ক্ষুদ্র হলেও মদবিমলীন হাতীরে হানে'। তাই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সুসভ্য ইংরাজ লর্ড স্বেচ্ছায় মুসলমানের ধর্ম গ্রহণ করেছেন। বাস্তবিক ইসলামের সাম্য এমন চমৎকার, ইহার পালন (practice) এত সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক যে আশা করা যায় যে এমন একদিন আসবে যখন সকল মানুষই ইসলামকে বরণ করে নিতে বাধ্য হবে; যেমন বাধ্য হয়েছেন গুরু নানক, রাজা রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠন করেছেন। কিন্তু তাঁরা যে পথে চলতে চেয়েছেন সে পথ নির্দিষ্ট হয়েছে ইসলামের দ্বারা। এদেশের অত্যন্ত রক্ষণশীল অতি প্রাচীন ও বিরাট হিন্দু সমাজও ইসলামের প্রভাবে অনেকখানি বিচলিত। হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি জাতিভেদ আজ ইসলামের সংঘর্ষে টলমলায়মান। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে এই জাতিভেদ চলে যাবে এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপিত হবে। নামের জন্য কিছু এসে যায় না। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান শিখ ব্রাহ্ম এগুলি শুধু নাম। নাম যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে ইসলাম কতখানি কাজ করেছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সে ভবিষ্যতেই বুঝা যাবে। আপাতত আমরা দেখতে চাই হজরত মুহাম্মদ জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য যে যে পথ নির্দেশ করে গিয়েছেন আমরা ঠিক সেই পথে চলছি কি না। বর্তমানে যাঁরা ইসলামের খলিফা এবং যাঁরা এই সমাজভুক্ত তাঁদের কার্যকলাপের উপর আমাদের মুসলিম সমাজের

ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। শুধু একটা delicious hope নিয়ে সুখে নিদ্রা দিলে ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা কাকেও বলে দিতে হবে না। আজকাল মুসলমান সমাজ যে রাহুগ্রস্থ অবস্থায় কাল কাটাচ্ছে এ সত্য গোপন করে কোনো লাভ হবে না। এ দেশে অতীতে মুসলমান শাসন কালে যে সমস্ত অনাচার ও অত্যাচার হয়েছে তার ফল যেমন ভোগ করছি আমরা আজকাল, আমরা যদি না শোধরাই তাহলে আমাদের পরবর্তী সমাজের যে কি অবস্থা হবে তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। অতীতের অনাচারের ফলে যে আমাদের এই দুর্দশা একথা কেহ কেহ স্বীকার করতে নাও পারেন কিন্তু বর্তমানের সুকৃতির ফলে যে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাল হবে একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করবেন না।

বর্তমানে আমাদের সমাজে পিতার শাসন, মাতার পোষণ, ভ্রাতার সহানুভূতি, বন্ধুর প্রীতি এগুলির কিছুই নাই; তাই সমাজ একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দায়িত্বজ্ঞান, সততা, অর্থ ও একতা এগুলির কিছুই নাই। যে সমাজে এগুলির অভাব সে সমাজ কখনও উন্নতিপথে অগ্রসর হতে পারে না। শুধু যে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না তা নয়, এই জীবন সংগ্রামের জগতে তার বেঁচে থাকার আশা করা অন্যায় : এখানে যে যোগ্য সেই টিকে থাকতে পারবে, যে অযোগ্য সে টিকবে না। আমাদের সমাজকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাই আমরা, তবে আমাদের সমাজকে বেঁচে থাকার যোগ্য হতে হবে।

আমাদের যোগ্য হওয়ার কতকগুলি অন্তরায় আজকাল দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা। বাংলার মুসলমান সমাজের বয়স নিতান্ত কম নয়; কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমাদের মধ্যে একজন রুশো, একজন পেসটালজী, একজন হারবার্ট স্পেনসার জন্মান নাই। আমাদের সমাজ একজন রাজা রামমোহন, একজন বিদ্যাসাগর, একজন বঙ্কিমচন্দ্র, একজন পিয়ারীচরণ, একজন রামতনু লাহিড়ী, একজন রাজনারায়ণ বসু কি একজন স্যার আশুতোষ তৈরি করতে পারেনি। ইহার একমাত্র কারণ আমরা শিক্ষা চাই না। আমরা বিদ্যা চাই না, জ্ঞানের মর্যাদা বুঝি না, সাহিত্যের আদর করি না। তাই আমাদের মধ্যে বিদ্বান নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক নাই। আমরা দান ভালবাসি তাই আমাদের মধ্যে দাতা আছে এবং দাতা আছে বলেই ভিক্ষুকের অভাব নাই। সেইরূপ আমরা যদি শিক্ষা ভাল বাসিতাম তবে শিক্ষাদাতা, শিক্ষিতজন ও শিক্ষান্বেষী কোনোটির অভাব হতো না।

শিক্ষার আদর আমরা করি না একথা সত্য। শিক্ষা আমরা চাই না একথা আরো সত্য। উচ্চ গভর্ণমেন্টের কর্মচারী ১০০০ টাকার উপর বেতন পান। তিনি সরকারি বাড়িতে থাকেন। তাঁর দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে পরের বাড়িতে রেখে দিয়েছেন। কেন না তিনি বলেন যে ছেলে যে স্কুলে পড়ে সে স্কুল তাঁর কোয়ার্টার্স (সরকারি

বাড়ি) থেকে অনেক দূরে। জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা কুসংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে সুশিক্ষার জন্য ছেলেকে কখনোই কাছ ছাড়া হতে দেন নাই। এই দুই পিতার নিজ নিজ সন্তানের শিক্ষার জন্য আগ্রহ তুলনা করলে কি বলা উচিত যে আমরা শিক্ষা চাই বা শিক্ষা ভালবাসি? আমাদের অভিভাবকগণ শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁদের অনেকেই বালকদের শিক্ষার জন্য কেবল স্কুল কলেজের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত। বালিকাদের শিক্ষার কথা মনেও স্থান পায় না।

একদল অভিভাবক আছেন যাঁরা এখনও স্কুল কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে শিক্ষার বিরুদ্ধে। তাঁরা যে কোনো শিক্ষার সপক্ষে তা ঠিক করে বলা কঠিন। প্রথমে তাঁরা ইংরাজি শিক্ষা কাফেরী এলেম বলে বর্জন করার ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাঁরা ধর্ম শিক্ষা চান। ধর্ম শিক্ষার জন্য কলিকাতা, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে মাদ্রাসা ছিল। মাদ্রাসা পাশ করে পেটের অন্নের সংস্থান হয় না। তখন কি করা যায়? অধুনা নতুন ধরনের মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। এখানে ইংরাজি শিখতে বাধা নাই। তবে বেশি ইংরাজি শিখলে হয়তো গো'না হবে এরূপ ভাব মনের কোণ কানচি খুঁজলে বোধ হয় বেশ কিছু কিছু পাওয়া যাবে। যা হোক এই সমস্ত নতুন মাদ্রাসা থেকে পাশ করে আমাদের যুবকগণ জীবনসংগ্রামে কতটুকু জয়লাভ করতে সক্ষম হবে তা এখনও বলা যায় না। তবে মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে যে আমরা বুদ্ধির মুক্তি চাই না। আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, দর্শন, বিজ্ঞান আর যত যা কিছু সব বাদ দিয়ে ধর্ম শিক্ষাটুকু হলেই ব্যস বলতে চাই। তাও কি কখনও হয়? কবি বলেছেন :

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি
সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?

বুদ্ধির মুক্তি না হলে ধর্মশিক্ষা হতে পারে না। ধর্মের আদেশ ও নিষেধ পালন করার জন্য বুদ্ধির দরকার! বুদ্ধির অভাবে আজকাল আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্মভাব লোপ পেয়েছে। এখন গোঁড়ামিই আমাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোঁড়ামির দরুন আমাদের অবস্থা যা হয়েছে তা ভাবলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কোনো কিছু বলার জো নাই। সমাজের প্রচলিত অর্থহীন কোনো সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে যে বলবে তাকে তখনই কাফের, জাহেল, গোমরাহ, গাঁওআর ইত্যাদি বলা হবে। যা হোক আমাদের এই গোঁড়ামির প্রধান কারণ এই যে আমরা ধর্মের সব বিধি নিষেধগুলির কতকগুলি সহজ অর্থ করে নিয়েছি। এইরূপ সহজ অর্থ করার দরুনই যে আমাদের এই দুর্দশা একথা অস্বীকার করার সময় চলে গেছে। ফলাফল দেখে বিচার করা মানুষের স্বভাব। নিরপেক্ষ চোখ দিয়ে দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে অর্থহীন কঙ্কালসার সংস্কারের স্তূপ আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না।

সহজ অর্থ করার দরুন আমাদের ধর্মের সার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই, রসুলোল্লাহর নামে দরূদ পড়া, রসুলুল্লাহর নাআত, মিলাদ শরীফ, ঈদ, বকর, ঈদের সময় কিছু ঘটা আর বক্তৃতায় নামাজ-রোজা, হাজ্জ্ব, যাকাৎ, ফেৎরা এগুলির প্রশংসা করা। এগুলির পেছনে যে আরো কিছু থাকতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দেবার কোনোও দরকার সমাজ অনুভব করতে চান না। আমাদের মানুষ হতে হবে— বলবান, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান মানুষ হতে হবে একথা আমাদের মনেও হয় না। নামাজ রোজা যদি অর্থশূন্য হয় তবে সে নামাজ রোজার কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি। যদি নামাজে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহ আকবার' বলার সময় সেই 'রহমানুর রহিম মালিকি ইয়াও মিদ্দিনের' ধারণা মনে না জাগে; যদি 'মালিকি ইয়াও মিদ্দিন' বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অপরাধের কথা মনে করে ভয়ে শরীর ও মন শিহরিয়া না উঠে; যদি সেই শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে 'ইয়া কানাআবোদো ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন' বলে সচকিত হয়ে সেই জীবনস্বামীর কৃপা ভিক্ষার কথা মনে না জাগে; যদি প্রাণের গভীরতম নিকেতন থেকে 'এহদেনাস সেরাতাল মোস্তাকিম' না বলতে পারি তবে সে নামাজের সার্থকতা কোথায়? যদি 'সোবহানা রব্বেল আজীম' ও 'সোবহানা রব্বেল আলার' অর্থ না বুঝি তবে রুকু ও সেজদার সার্থকতা কোথায়? প্রতি ওয়াক্তে নামাজের সময় যদি নিজের দোষ গুণের হিসাব না লই, যদি অনুভব না করি যে তাঁরি সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরি কাছে আমার দুঃখ বেদনা নিবেদন করছি, নিজ কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি; নিজের দুর্বলতা অনুভব করে অনুতপ্ত হৃদয়ে যদি সেই করুণাসিন্ধুর করুণা ভিক্ষা না চাই তবে সে নামাজের মূল্য কতটুকু? আর যদি 'ফাওয়াএলুল্লেল মোসাল্লিনাল্লাজিনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন' মানে এই হয় যে দিনের মধ্যে পাঁচবার স্থা বিশেষে দাঁড়িয়ে কিছু কসরৎ কর তাহলে সেই মহাপবিত্র মহান পয়গম্বর হজরত রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হেসসালামের প্রতি ঘোর অবিচার করা হবে। নামাজের এইরূপ সহজ অর্থে গোঁড়া মুসলমান সন্তুষ্ট হতে পারে কিন্তু জগৎ সে মুসলমানকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবে না। ফলেও দাঁড়িয়েছে তাই, বর্তমান জগৎ মুসলমানকে কাঁটা মনে করছে। এদিকে এই সহজ অর্থের ফলে মুসলমান নিজেও ধর্মে কোনো মজা পাচ্ছে না।

মানুষের জীবন নানা স্বাদের জন্য লালায়িত। শারীরিক বলের অধিকারী হওয়ায় যেমন স্বাদ আছে, মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলের অধিকারী হওয়ায়ও ঠিক সেইরূপ বা ততোধিক স্বাদ আছে। মানুষ আপনাআপনি সে সব স্বাদ পেতে চায়। শুধু হুকুম পালনে সে স্বাদ পাওয়া যায় না—বিশেষ করে যদি হাকিমকে পুরোপুরি না জানা যায় আর তার গুণে পুরোপুরি মুগ্ধ না হওয়া যায়। আমাদের হজরত ১৩০০ বৎসর দূরে পড়ে আছেন। সমাজের নেতাদের উচিত জনগণকে সেই পবিত্র পয়গম্বরের সম্যক পরিচয়ের সুবিধা করে

দেওয়া। তা না করে শুধু হাওয়াই প্রশংসা করে আর কেতাব আছে কোরান আছে পড়ে দেখ এই সোজা পথ দেখিয়ে দিলে তারা তা মানবে কেন? সত্যকে পাবার জন্য সেই মহাপুরুষের কঠোর সাধনা, তাঁর ত্যাগ জীবনব্যাপী আবেগ তপস্যা, জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা এসবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে বর্তমান। নিজেদের জীবনে সেই ত্যাগ সেই সাধনা সেই তপস্যা বাদ দিয়ে যদি আমাদের সমাজের নেতারা জনগণের কাছ থেকে প্রকৃত ভক্তি আশা করেন তবে সে আশা বৃথা। আমাদের যাঁরা ধর্মগুরু হওয়ার দাবি রাখেন উপযুক্ত শিক্ষা অভাবে তাঁদের অনেকের জীবন সুন্দর নয়; তাঁরা নিজেরা খুব সুস্থ-চিত্ত, জ্ঞানবান, বলবান, বুদ্ধিমান মানুষ নন। তাঁদের মুখের কথার দামও তাই খুব বেশি নয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা থাকা সত্বেও আমাদের মৌলবী মৌলানারা জনগণের উপযুক্ত আহার যোগাতে পারছেন না। ফলে ধর্মের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে না। আমাদের মধ্যে অনেক স্থলেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকটি একেবারে লোপ পেতে বসেছে। এসব দিকে স্বাদ পাবার সুবিধা ও সুযোগ না পেয়ে পাশবিক ধর্ম পালন করে স্বাদ মিটাতে হচ্ছে। মানুষ স্বাদ মিটাতে বাধ্য।

অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের অনেকেরই বেলায় জীবনে নীতি বা শ্লীলতা বলে যে জিনিষটা তার অনেকখানি অভাব। আদিম দিনে নারী ছিল তার (পুরুষের) প্রথম ও প্রধান সম্পত্তি, তার ইন্দ্রিয় ক্ষুধার খাদ্য, তার পরিশ্রম করার যন্ত্র, তার বাণিজ্যের জন্য তার আদান প্রদানের শ্রেষ্ঠ উপহার। যদি আপনারা অনুমতি করেন তবে আমি বলতে চাই যে আমাদের সমাজ সেই আদিম দিনের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে ও পশুর মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্যই নাই। পশুর মতো কেবলমাত্র আহার নিদ্রা ও আর একটা ব্যাপারই হচ্ছে আমাদের কার্য, এবং শুধু বংশ বিস্তারই আমাদের অস্তিত্বের একমাত্র সার্থকতা। খবরের কাগজে যে সমস্ত অনাচারের কথায় জগতের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হচ্ছে সেগুলি বাদ দিলেও অনেক সম্ভ্রান্ত ও অর্ধ-সম্ভ্রান্ত পরিবারেও একথা অনেকখানি সত্য। বিনা কারণে ২/৩/৪ বিবাহও অনেক স্থলেই দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো জায়গায় ধর্ম সঙ্গত হিসাবে নয় বটে, পাশবিক ধর্ম চার এর অধিক নারী সঙ্গেও থাকে। এবং কখনও কখনও সন্তান-সন্ততিরাও উত্তরাধিকার সূত্রে এটা পেয়ে আসছে। এমনও শুনা যায় যে আমাদের মধ্যকার গণ্য মান্য ধার্মিক পুরুষেরাও কখনও কখনও সুন্দরীর মোহে পড়ে চার বিবির এক বিবিকে বিনা অপরাধে তালাক দিয়ে সেই সুন্দরীর (কুমারীই হোক বা বিধবাই হোক) পাণিগ্রহণ করতে বাধা অনুভব করেন নাই! ধর্মের সহজ অর্থের মানে এই; আর তার সার্থকতা এইখানে! আর কলমা করে নেওয়াটা আবার এমনই সোজা যে কেবল মোহর ঠিক হলেই হল। বাড়িতে মামাটি দেখতে সুন্দরী অমনি তাকে কলমা করে নেওয়া হল।

কলমা করে নিলেই সাত খুন মাফ। কারণ ধর্মের সহজ অর্থবাদীদের মতে কিছুই অন্যায় হল না। এদিকে সে মামাটির স্বামী কিছু গোলমাল করতে চেয়েছিল তা কিছু টাকা সুদে ধার করে নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করা গেল। লোকটা অভাবগ্রস্ত; টাকা পেয়ে মনে করলো বেশ তো ভালই হল খাবারও কিছু যোগাড় হল আর আবার একটা নতুন বিবি পাবার সুযোগ হল। জেনা করা মহা পাপ, তার সহজ অর্থ এই হল কলমা করে ফেল। হারামকে হালাল করার এরূপ ব্যবস্থাকে প্রশংসা করা যায় না।

পশু-প্রকৃতি এত প্রবল হয়েছে যে অনেক সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রতিবেশী সমাজের পতিতা নারীদের কলমা করে নিয়ে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এইসব ভ্রষ্টচরিত্র পতিতা নারীরা কি কখনও বলবান, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, চরিত্রবান সন্তানের জননী হতে পারে? তবে কেন সমাজ এর জন্য লালায়িত? আমার মনে হয় ভ্রষ্ট-চরিত্র নরনারীদের বাহির থেকে এনে আমাদের সমাজের বোঝা বাড়ানোর মতো শক্তি বর্তমানে আমাদের নাই। সমাজে যারা আছে তাদের হেদায়েৎ করা, প্রথমে নিজের ঘর সামলানো সমাজের প্রধান কর্তব্য। অবশ্য যদি কেউ আশ্রয় চায় ইসলাম এত নির্মম নয় যে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে।

একবার শুনলাম একজন বিখ্যাত পীরসাহেব এক প্রিয় মুরীদের বালিকা স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে চক্রান্ত করে মুরীদকে বললেন, তোমার বিবি তালাক হয়ে গেছে। মুরীদ বেচারা তার স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ ছিল। পীরের ফতোয়া শুনে সে প্রমাদ গণল। যা হোক পীরসাহেব বললেন, 'তা একটা উপায় আছে। তুমি বিবি তালাক দেও, আমি নিকাহ্ করি, পরে আমি ছেড়ে দিলে তুমি নেকাহ্ করবে। অন্য কারও সঙ্গে নিকাহ্ হলে তোমার স্ত্রী যেরূপ সুন্দরী তাতে সে হয়তো ছাড়তে চাইবে না, আর আমি তো বুড়া মানুষ, আমাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।' আমাদের শরা অনুসারে কেউ কোনো কারণে বিবি তালাক দিলে সেই বিবিকে নিয়ে পুনরায় ঘরসংসার করার পূর্বে ঐ বিবির অন্য একজনের সঙ্গে নিকাহ্ ও কিছুকাল ঘরসংসার করা দরকার, এ খবর তো আমাদের জানা আছে। এখানেও তাই হল। পীরসাহেব নাকি ঐ বিবিকে ছাড়তে চান নাই। পরে নানারূপ কথা কানে এসেছে। আমাদের মধ্যকার আজকালকার পীরসাহেবদের সম্বন্ধে নানা কথা কানে আসে। এসম্বন্ধে দুঃখ নিবেদন করে সহানুভূতি পাবার আশা কম। পীরসাহেবদের বদদোয়া, তাঁর বংশধরগণের লাআনৎ, সমাজের অন্যান্য জনগণের অভিশাপ এগুলি তো আছেই। তার উপর আবার কথা হচ্ছে যে আমরা দুর্বল মানুষ, পদে পদে ভুল, পদে পদে বিপদ তো লেগেই আছে। যখনই একটা বিপদ এসে উপস্থিত হবে তখনই সমাজ বলবে এবং বিশ্বাস করবে যে পীরের বদ দোওয়াতেই এরূপ হয়েছে। সমাজের কার্য্যকারণ-সম্বন্ধজ্ঞানহীন জনগণের ভক্তি ক্রমেই বেড়ে যাবে এই ভয়েও পীর সাহেবদের বিরুদ্ধে কিছু বলার ইচ্ছা থাকলেও বলতে বাধা বোধ হয়। আধ্যাত্মিক

বলে বলীয়ান পীর সাহেবরা এবং তাঁদের আল আওলাদরা সমাজকে উন্নতির পথ দেখানো তো দূরের কথা জলে ডুবাতে যে বসেছেন সে কথা ভাবতে চোখে জল আসে না এমন নির্বোধ জগতে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাবে শুধু আমাদের এই বাংলার মুসলিম সমাজে।

অবশ্য পীর ফকীর ওলি দরবেশের ও ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা জগতে ইসলামের যতগুলি দান তার অন্যতম। এ জিনিষটা কাজে লাগাতে পারলে খুবই ভাল। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রকৃত শাসন না থাকার দরুন আমরা পীর ফকীরকে যাঁচিয়ে নিতে পারছি না। তাই অনেক মেকী চলে যাচ্ছে। বুদ্ধির মুক্তি হলে এসব মেকী সহজেই ধরা পড়বে। অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচারের উপযুক্ত শাসন তখন সম্ভবপর হবে।

ধর্ম সম্বন্ধে মোটের উপর আমার বক্তব্য এই যে আমাদের প্রিয় পয়গম্বর হজরত রসুলে করিম সাল্লাল্লাহো আলায়হেস সালাম ধর্মের যে এমারৎ রচনা করে গিয়েছেন তা আমরা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি। তিনি পুতুল ভেঙে যে নিরাকার অথচ চেতনশক্তি আল্লাহতাআলার পূজা করতে বলছেন তা আমরা ভুলে গিয়েছি। এখন আমরা আবার কতকগুলি অনুশাসনরূপী অর্থহীন পাষাণপ্রতিমার পূজায় নিযুক্ত। এরূপভাবে আমাদের দুর্দশা ঘুচবে না এবং ইসলামকে জীবন্ত রাখতে পারব না। ইসলাম জীবন্ত রাখার জন্য আমাদের সমাজে যে যে গোঁড়ামি ঢুকেছে তা সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

একতাই হচ্ছে সমাজের বন্ধন। ইসলামের একতা ভ্রাতৃভাবের উপর নির্ভর করে। আমরা বলি আমরা সকলেই বাবা আদম ও হাওয়া মা'র বংশধর। কিন্তু আজকাল আমাদের ভিতর জাতিভেদ এসে ঢুকেছে। এইটিই সমাজের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। আমাদের ভিতর একতার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বংশের বড়াই। যে-ভ্রাতৃত্বের উপর নির্ভর করে মুসলমান সমাজ সমস্ত জগতকে মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও দিশাহারা করেছিল সে-ভ্রাতৃভাব আজ আমাদের মধ্যে নাই। ভারতবর্ষে এসেই শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান এই চারি বর্ণের পরিচয় তো পাওয়া গিয়েছিলই। এখন তো দেখা যায় হাজার রকমের পদবী, আতরাফ, আশরাফ, শরীফ, রাজীল, সৈয়দ, খোন্দকার, কাজী, মোল্লা, মুফতী, মুনসী, শাহ, পীর, সিদ্দিকী, হুসায়নী, হাশেমী, ফারুকী, সরদার, জোৎদার, বিশ্বাস, গোলদার, মণ্ডল, দফাদার আরো কত কী তার অন্ত নাই। দুই বাহু বিস্তার করে পরম আবেগে ভাই মুসলমান বলে যাদের শাহানশাহ বাদশাহ বুকে বুকে ভিক্ষুকের সঙ্গে আলিঙ্গন দিয়েছেন সেই মুসলমান আমরা বলি কি না ওরা আতরাফ, আমরা আশরাফ, আমরা শরীফ আর ওরা রাজীল। গোলামের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দেওয়ার মতো উদারতা যে জাতির রাজাদের ছিল, যে জাতি যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে বিজাতীয়ের কন্যাকে রাজরাণীত্বে

বরণ করে নিয়েছে আজ অধঃপতনের দিনে তাদের মধ্যে এত সঙ্কীর্ণতা ঢুকেছে এ দেখে না জানি সেই মানবপ্রেমিক পবিত্র পয়গম্বর কত আফসোস করছেন। অবশ্য আমি মানি যে পরিচয়ের জন্য কিছু তারতম্যের দরকার হতে পারে কিন্তু তাই বলে মানুষ মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখবে, হেকারৎ করবে, এ আমার বুদ্ধির বাইরে। এ সম্বন্ধে বেশি আলোচনা করতে ইচ্ছা নাই। কারণ সংস্কার এত দৃঢ় হয়ে আছে যে যত কিছু বলা হোক না কেন উপযুক্ত শিক্ষা না-পেলে এ সংস্কার থেকে মুক্তি পাবার ভরসা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে একটা কথা বোধ হয় অবান্তর হবে না। বংশের তারতম্য করতে গিয়ে আমাদের শিক্ষিত বা তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রায় উঠে যেতে বসেছে। এর ফলাফল কী হবে তা ভেবে দেখা দরকার।

ভ্রাতৃভাবের অভাবের দরুন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতির অভাব হয়েছে। দ্বেষ হিংসায় সমাজ ক্রমেই অবনতির দিকে চলেছে। এখন আমাদের একমাত্র ভরসা concession বা সরকারের দান বা অনুগ্রহের উপর। পরের দয়ার দানে প্রকৃত শক্তি অর্জন সম্ভবপর হবে না। পরে কতটুকু দিতে পারে আর তাতে কি পেট ভরে? আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে চান যে অবস্থা অনুসারে কিছু special treatment বা বিশেষ ব্যবস্থা দরকার; নাহলে চলে না। এমন চলা আমার মতে না চলা অপেক্ষা লজ্জাকর। বহুকাল ধরে তো আমরা concession concession করছি। পেয়েছিও তো কিছু কিছু। কিন্তু অগ্রসর হয়েছি কতটুকু? সরকারের দয়ার (concession) আশায় প্রকৃত মানুষ হওয়ার চেষ্টা আমাদের মধ্যে একদম নাই; থাকতে পারে না। যাদের কনসেশনের দিকে দৃষ্টি তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান জন্মাতে পারে না। যাদের আত্ম-সম্মান-জ্ঞান নাই তারা পরপ্রত্যাশী হতে বাধ্য। পরপ্রত্যাশীর অন্য নাম ভিক্ষুক। ভিক্ষুক সমাজের লজ্জা, সমাজের বোঝা, উন্নতির কাঁটা। ধনী আত্মীয়ের উপর উদরান্নের জন্য নির্ভর করা যেমন ভিক্ষাবৃত্তিরই নামান্তর; সরকারের দিকে কনসেনের (দয়ার) জন্য তাকিয়ে থাকাও সেইরূপ ভিক্ষুকতা। আমাদের বিদ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমশীলতা কোনোরূপ যোগ্যতা নাই। বরং এ সমস্ত বিষয়ে অন্যের চাইতে কম অথচ সরকারের দয়ার উপর নির্ভর করে শতকরা ৮০ জনের চাকুরি চাই এ ভাবটা যত শীঘ্র আমাদের মধ্য থেকে দূর করা যায় ততই আমাদের মঙ্গল, প্রতিবেশীর মঙ্গল, জগতের মঙ্গল, নচেৎ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকব। জগত অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে ও বলবে ঐ যে সব ভিক্ষুকের দল।

আমাদের কেহ কেহ বলবেন চাকরি ভিন্ন উপায় কি? বেশ তো চাকরি যদি আমরা চাই তবে উপযুক্ত হয়েই চাই না কেন? উপযুক্ত হওয়ায় আপত্তি কেন? এইরূপ কনসেশন পেয়ে আমাদের মধ্যে যারা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের অনেককেই

দেখা যায় যে তাঁরা হীনবীর্য খোশামুদে বা cipher হয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন। তাঁদের ভিতরের দারিদ্র্য ঢাকার জন্য বাইরের আড়ম্বর, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহারের ঘটায় তাঁদের টাকাপয়সা উড়ে যায়। নিজেরা অযোগ্য, ঘরে ও বাইরে তাঁদের সন্তানসন্ততিরও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নাই। ফলে দাঁড়াচ্ছে এক পুরুষ দুই পুরুষেই সব উন্নতি খতম। ঘরের খুঁটি না থাকলে প্যালা দিয়ে কতকাল ঝড় থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়? ও সব কনশেনে আমাদের মুক্তি নাই। আমাদের নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে শিখতে হবে।

কেউ কেউ বলছেন কিছু টাকাপয়সা না হলে স্কুল কলেজে পড়ানো যায় না। ছেলে মেয়ে কি করে মানুষ করা যাবে? কিন্তু মানুষ যে হতে চাইবে তাকে কেউ রুখতে পারে না। বিদ্যাসাগরকে কে রুখেছিল? নবীন সেনকে কে রুখেছিল?

চাকরি ভিন্ন অন্য উপায়ের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে। চাকরি কটা আর কজনে পাবে? অন্য উপায় আছেও যথেষ্ট। চাষবাস, ব্যবসা, বাণিজ্য কি আমাদের ভরণ পোষণের উপায় করে দিতে পারে না? এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভুমির ক্রোড়ে বসে বঙ্গ মাতার স্তন্য পীযূষ অবহেলা করে মেলিনস ফুড (mellins food) খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার আশা কি উচিত, না যায়? ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিদেশী মাড়োয়ারী সুরতী পার্শী ইত্যাদি বড় বড় সওদাগরেরা যদি এদেশে ঐ পথ অবলম্বন করে ক্রোড়পতি হয়ে বহু বি-এ, বি এস-সি, এম-এ, এম এস-সি-কে চাকর নকর করে রাখতে পারে তবে আমরা কেন পারি না? আমাদের সমাজে হাফেজ মোহাম্মদ হুসেন সাহেবের মতো আরো ঢের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। এসব দিকে আমরা যেতে চাই না কারণ আমাদের দৃষ্টি রয়েছে ঐ কনসেশনের দিকে। যত দিন কনসেশনের মোহ না কাটবে ততদিন আমরা এদিকে কৃতকার্য্য হতে পারব না। যেদিন ঐ মোহ কেটে যাবে সেই দিনই আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখতে পাব উন্মুক্ত গগনের মুক্ত আলোকে যে, মাতা বসুন্ধরা মোটেই কাঙালী নন; মোটেই কৃপণা নন। স্বাধীন চেষ্টা করলেই বুঝতে পারব সৃষ্টিকর্তা আমাদের কিছুই কম করে দেননি; আর তখন আমাদের মাথা হাত পা চক্ষু কর্ণ সকলেই আমাদের সাহায্য করবে; উপায় আপনিই এসে হাজির হবে। তখনই আমরা 'ইন্না আতয়না কাল কাওসার' কোরান শরীফের এই মহাবাণীর প্রকৃত সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারব।

অবশ্য যদি দু'এক জন লোক নতুন পথে চলেন এবং সমাজ তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে সহানুভূতি না দেখায় তাহলে এই দু'এক জনকে হয়তো হাবুডুবু খেতে হবে; হয়তো তাঁরা সফলকাম হতে পারবেন না। তাঁদের সফলতার জন্য সমাজের সাহায্য এবং উৎসাহ একান্ত দরকার। সমাজে একতা ও ভ্রাতৃভাব না থাকলে সে উৎসাহ অসম্ভব।

আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রতি বিদ্বেষ আমাদের সমাজের আর-একটি গলদ। প্রতিবেশীর সহিত শত্রুতা করা কোনোও মতে উচিত নয়। ইসলাম জগতে শান্তির বার্তা বহন করে আনার দাবি করে। কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করলে শান্তিস্থাপন করা যায় না। তাছাড়া হিন্দু মানুষ। হিন্দুকে ভালবাসতে শিখতে হবে। মানুষকে ভালবাসতে না শিখলে মানুষের উপকার করা যায় না। আর হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে একরূপ সুখ শান্তিতেই আছে বলে মনে হয়, তাই বলে তাদের দুঃখ দারিদ্র্য আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়। তাদের হিংসা করে আমাদের নিজেদের শক্তিক্ষয় ভিন্ন অন্য কোনো লাভ হবে না।

আপাতত ধর্মান্ধ মুসলমান মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে যে অশান্তির সৃষ্টি করেছেন তা কখনই প্রশংসনীয় নয়। এদেশে মুসলমান বাদশাহরা নিজেদের প্রাসাদেও মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে বাধা অনুভব করেননি, আমরা কি মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করতে পারি না? আমাদের নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধা হয় এতে কিন্তু এতে আমাদের গো'না হবে একথা আমি স্বীকার করতে রাজি নই। হিন্দুরা বাজনা বাজাবে, আমরা তো বাজাব না? তাদের সবিনয়ে অনুরোধ করা গেল তারা যদি না শুনে তাতে আমাদের কেন গো'না হবে? যদি কেউ বলেন, তাতেও আমাদের গো'না হবে তবে তাঁদের কাছে আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি কি করতে বলেন তাঁরা এর জন্য? এর জন্য কি সব মুসলমানের জান্ দিতে হবে? যদি তাই হয় তবে তার জন্য কি সকলেই প্রস্তুত? আর এর জন্য জান্ দিতে যাওয়াটা কি প্রকৃতপক্ষে উচিত? তাছাড়া যেটা কাজে পরিণত করা হবে না সেটা বলে শুধু গোঁড়ামির পরিচয় দেওয়ার সার্থকতা কি? এই লড়াইয়ে যে সব মুসলমান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাদের পরিবারের অবস্থা কি? আর যে সব গরীব মুসলমান কাঁথা কাপড় বিক্রি করে স্ত্রীপুত্রের মুখের অন্ন বন্ধ করে টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ করে জেলের হাত এড়িয়ে সপরিবারে অনাহারে মরতে বসেছে তাদের অবস্থা কি তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন?

গান বাদ্য আমরা বলছি আমাদের ধর্ম-বিরুদ্ধ; কাজের বেলায় কি আমরা তা মানছি? যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি ধর্ম-বিরুদ্ধ ব্যাপারে মুসলমানরা কি কম ভিড় করছেন? শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের মধ্যে এমন কটি আছে যেখানে হারমোনিয়াম গ্রামোফোন কখনও শোনা হয়নি, বা সেতার বা এসরাজ নিয়ে গানবাজনা হয়নি? নাই বললে মোটেই বেশি বলা হয় না। তাহলে এ গানবাজনায় এত আপত্তি কেন? আর এ নিষেধের মূল্য কতটুকু? মুসলমান যদি গান বাজনা হারাম করত তাহলে মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করার যে দাবি আমরা করতে চাচ্ছি সে দাবির জোর বেশি হতো—না এখন বেশি। মুসলমান

নিজের বাড়িতে বাজনা বাজাচ্ছেন অনেকেই নানারূপ গো'ণার কাজে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে সমাজ একেবারে চুপ, কিছু বলছে না অথচ অন্য ধর্মাবলম্বী লোক তাদের ধর্মপালন করবে তাতে আমাদের আপত্তি। যাঁরা বাজনা বাজানোতে আপত্তি করছেন বা দেখছেন তাঁদের দৃষ্টি হারজিতের দিকে কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত 'ইন্নাল্লাজিনা লা-ইয়োহেব্বুল মোফসিদীন'।

আমাদের অনেকে মনে করছেন হিন্দুরা আমাদের গরু কোরবানিতে আপত্তি করে অনেকস্থানে জয়ী হয়েছেন। এখন যদি তারা তাদের বাজনা বাজিয়ে যায় তাহলে ক্রমে ক্রমে সর্ব বিষয়ে ওদের কাছে আমাদের হেরে যেতে হবে। শেষে মুসলমান সমাজ একেবারে বিলুপ্ত হবে। আমাদের গোঁড়ামির দরুন আমাদের অবস্থা যা হয়েছে তাতে বিলুপ্ত হতে কতটুকু বাকি ঠিক করা দায়। অবশ্য যদি এ সমাজ বিলুপ্ত হবার উপযুক্ত হয় তবে বিলুপ্ত হওয়াই যে জগতের মঙ্গল!

আমাদের সমাজের পুরুষেরা অযোগ্য অক্ষম কনসেশন প্রত্যাশী, পরমুখাপেক্ষী, মেয়েরাও তেমনি অশিক্ষিতা, বিলাসী, গৃহিনীপনায় অপটু, শারীরিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যহীন। সংসারে সর্ববিভাগে সুবন্দোবস্তের অভাব, সময়মতো স্নান, সময়মতো আহার অসম্ভব; ঘর দোর, বিছানা বালিশ সব নোংরা, কাপড়জামার অযত্ন, টাকাপয়সা কোনো কিছুতে বরকত নাই, চারিদিকে বিশৃঙ্খল, এক একটি পরিবার যেন এক একটি জমাট নিরানন্দের পাহাড়। হাড়ভাঙা মেহনত করে বুকের রক্ত জল করে অর্থ উপার্জন করে পুরুষ। সেই অর্থের যদি সদ্ব্যবহার না হয় তাহলে মানুষের শরীর মেজাজ চরিত্র কেমন হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। এদিকে ছেলেপিলেরা শাসন মানে না তাদের চাকর বাকরের হাওয়ালা করে দেওয়া হয়; গরীব হলে তো কথাই নাই—বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া হয়। রাস্তার এই সব ছেলেপিলেরা শুনে ও শিখে সহধর্মী বালকগণের মধুর গীতঝঙ্কার, যাতে তারা কারও মা বোনকে পর্যন্ত বাদ দেয় না, স্থলচর জলচর সকল জন্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে দেয়।

রাস্তায় চলতে মুসলমান বালক বালিকার অস্বাভাবিক আলাপ ও গতিবিধি দেখলে আপনারা রাগই করুন আর যাই বলুন মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করি। আমার মনে হয় আমার চক্ষু ও কর্ণ জন্মের মতো অপবিত্র হয়ে গেছে। স্বপ্নের অতীত নতুন অতি নতুন তার চেয়েও নতুন আলাপ কানে শুনেছি এবং যে যে দৃশ্য রাস্তায় দেখেছি, তা প্রকাশ করার কথা ভাবতেই পারা দায়। আরো এর চাইতে ক্ষোভের বিষয় কি হবে যে কোনো কোনো সন্তানসন্ততির পিতা আমাকে বলেছে ওসব কিছু আমাদের শেখা দরকার না হলে ওদের যদি কেউ গাল দেয় তো ওরা চুপ করে গাল শুনে আসবে? সমাজ কি এসব বিষয় শাসন করার কথা কখনও ভাবছে?

এই সমস্ত ছেলেদের আর শাসনে আনা যায় না। অবশ্য মারের ভয়ে তারা সামনে বেশ জড়সড় লেহায তমিজ দোরস্ত কিন্তু পড়াশুনার বেলায় একেবারে উল্টা। বাবা গালি দেন 'যেমন মা তেমনি ছা'; মা বলেন 'ও ওদের রক্তের গুণ'। ঝগড়াঝাটি কথাকাটিতে সময় কেটে যায় বাড়িতে সবার মেজাজ রুক্ষ। ছেলে পিলেদের ভালবেসে আদরযত্ন করে পড়ানোর চেষ্টা হয় না। তারাও মা বাপের উগ্র চেহারা দেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। দু'এক দিন হয়তো বাবা বসলেন ছেলেদের নিয়ে পড়াতে। ছেলে পড়াশুনা কিছু হয়তো বলতে পারল না আর অমনি প্রহার। এত মার মুসলমান ছেলেরা খায় যে তা ভাবলে তাদের জীবনটা যে চোর-ডাকাতের (Criminal) জীবনের মতো হবে না এ আশা করা অন্যায়। সন্তানের প্রতি এমন নির্মম ব্যবহার অন্য কোনো জাতের লোকে করে বলে আমার ধারণা নাই। এই নির্মমতা আবার ব্যাপক হয়ে পড়ে। যে স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ভালবাসতে পারে না, সে কাকেও ভালবাসতে পারে না। তাই সহিষ্ণুতা, প্রেম, প্রীতি সবই হারিয়ে বসে সে। দেখতে পাওয়া যায় মতের একটু বিরুদ্ধে একটা কথা কেউ বললেই অমনিই সে হিন্দু ঘেঁষা নয়তো আতরাফ বা রাজীল কওমের লোক নয়তো একদম জাহেল ইত্যাদি গালে যদি সে না শোধরায়, তাহলে সে একেবারে কাফের। সামান্য মতের বিরুদ্ধে কথা বললে সাত পুরুষের সম্পর্ক ভুলে যাই। যাদের প্রাণে ভালবাসার এত অভাব, তারা কেমন করে বড় হবে বা ভাল হবে।

ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শিখাতে হলে তাদের ভালবেসে শিক্ষা দিতে হবে; তাদের কিছু স্বাধীনতাও দরকার। সমাজেও স্বাধীনতা দরকার, নিজের জন্য নিজের ভাববার অধিকার মানুষকে দিতে হবে। বুদ্ধির মুক্তির দরকার। কেবল বিধি নিষেধের স্তূপের চাপে কাহিল থাকলে বুদ্ধির মুক্তির সম্ভাবনা নাই। কেবল Authority-র দোহাই দিয়ে বা কেতাবের উপর নির্ভর করে চললে আমাদের উন্নতি হবে না। আমি অবশ্য বলছি না যে কেতাব অমান্য করতে হবে। আমি বলতে চাই কেতাব পড়ে তার অর্থ বার করতে হবে।

অর্থ মানে সহজ অর্থ নয়। আমার নিজের জীবনের মধ্যে কেতাবের বাণীর অর্থ খুঁজতে হবে। এটুকু স্বাধীনতা দিতে হবে। সমাজকে তা সহ্য করার মতো উদারতা (Toleration) শিখতে হবে। নাহলে ফল এই দাঁড়াবে যে আমরা মিথ্যাবাদী বা কপটাচারী হব অথবা সমাজচ্যুত হব। সমাজচ্যুত হওয়া বরং ভাল তবু মিথ্যাবাদী বা কপটাচারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এইরূপ একএকজন করে যদি বাদ দেওয়া যায় তবে সমাজ থাকবে না। কেউ কেউ বলবেন যে ওরূপ একগুঁয়ে ২/৪ জন লোক সমাজচ্যুত হলে সমাজের কিছুই এসে যায় না। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। ক্রোড়পতিও পথের কাঙাল হয় বাদশাহদের বংশধরেরাও ভিক্ষুক (কনসেশন প্রত্যাশী) হতে বাধ্য হয়েছে! বাস্তবিকই মুসলমান সমাজ এইরূপ করে অনেকখানি দুর্বল হয়েছে।

এক সময় জাস্টিস আমীর আলী কাফের আখ্যা পেয়েছিলেন এবং সমাজ থেকে তিনি দূরে দূরে বাস করেছেন। এইরূপ আরো ছোট বড় অনেকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যারা সমাজকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। সমাজের বন্ধন অনেকখানি শিথিল হয়ে পড়েছে। শিয়া সুন্নির ঝগড়া এবং সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়ে হানিফী ও মোহাম্মদীদের লজ্জাকর ঝগড়ায় সারা সমাজটা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

হাতের পাঁচটি আঙুল সমান নয় তবু সর্ব কর্মে দেখতে পাওয়া যায় তাদের ভিতর কি চমৎকার মিল। যে কোনো কাজে সবাই মিলে একে অন্যের বা আর সবার সাহায্য করছে এবং প্রত্যেকটি আঙুলের অস্তিত্বের সার্থকতা ফুটে উঠছে যেমন অন্যের সঙ্গে তার সহযোগিতায় তেমনই তার আপন আপন কাজেও। মানুষের বেলাযও ঐরূপ পাঁচ জনের পাঁচটা মত সহ্য করে নিতে হবে। এরই নাম toleration, এই toleration অভাবেই আমাদের বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব নাই। একে অন্যের সাহায্য করতে কমই দেখতে পাওয়া যায়। একে অন্যের জন্য ভাবে না। মোটের উপর আমাদের চালচলন রীতিনীতি দেখে আমাদের সমাজকে একটি সমাজ বলতে ইচ্ছা হয় না। সমাজ বলতে যে বন্ধন বোঝা যায় সে বন্ধন ব্যক্তিকে ব্যক্তির সঙ্গে বাঁধে। সে বন্ধনই নাই। আমাদের সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের চাইতে অনেকখানি দূরে। আত্মীয়তা নিকট সম্বন্ধ নাই। এখানে ঢাকায় দেখি university প্রফেসারেরা তাদের ছাত্রদের সঙ্গে আপনি সম্বোধন করেন। শিক্ষক ছাত্রের যদি এতখানি আত্মীয়তার অভাব থাকে সেখানে যুবকগণের কাছে কি আশা করা যায়?

একবার শুনেছিলাম Dr. Suhrawardy দুঃখ করে বলেছিলেন, 'I have the misfortune to belong to the Muhammadan community'। আমাদের ছাত্রমহলে এ নিয়ে খুব একটা জোর আন্দোলন চলেছিল এবং অপ্রিয় সমালোচনাও হয়েছিল। ডাক্তার সোহরাওয়ারদি একথা বলেছিলেন কি না জানি না তবে উত্তর কালে আমি একথাটি অনেকবার মনে মনে বলতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের সমাজের গলদসমূহের কথা যখন মনে হয়, যখন কনসেশনের কথা ভাবি, যখন শাদী নিকাহ, পোলাও কোর্মা আর শারাফতের কথা শুনি; খবরের কাগজে নারীর উপর অত্যাচারের কথা চোখে পড়ে; মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে খুন খারাবাতের দৃশ্য মনে পড়ে তখন ডাক্তার সোহরাওয়ারদির কথায় যে একসময় চটেছিলাম তার জন্য মনে মনে লজ্জিত হই এবং তার কথাটা মেনে নিতে ইচ্ছা হয়। এসব কথা মনে হলে বলি ইসলাম যে শান্তির জন্য লালায়িত বলে দাবি করে সে দাবি আল্লাহর দরবারে গ্রাহ্য হবে কিনা জানি না তবে মানবসমাজের দরবারে যে তা সন্দেহ করা হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সব হারিয়ে আমরা এখন চাচ্ছি লাঠি ছোরা তরবারি ও সরকারের দয়ার দানের সাহায্যে জিততে। লাঠি ছোরা তরবারি এমনকি গোলাগুলির সাহায্যে যে জয় সে

টেকে না একথা আমাদের (মুসলমানদের) অনেক পূর্বে বোঝা উচিত ছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যায় যে মুসলমান এসবের কোনোটা বাদ দেয় নাই। বাদশাহদের হুকুমে দেশে দেশে রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে; আর্তের আর্তনাদে গগনমণ্ডল প্লাবিত হয়েছে। কিন্তু কই সে প্রতাপ? কোথায় আজ সেই হীরামুক্তা মণিমাণিক্যের ঘটা; কোথায় আজ সেই দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা।

রাজ্য তার স্বপ্নসম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে
সব সৈন্যদল।
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি'পরে!
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনা কল্লোল সাথে নহবৎ মিলায় না তান;
তার পুরসুন্দরীর নূপুর নিক্বণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
মরে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।

এই তো হয়েছে; এর পর আরো কি হবে তা জানেন তিনি যিনি 'আলেমুল গায়েব রাব্বিল আলামীন মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'।

তাই বলি—যদি থাকে প্রাণ তবে আসুন আমরা সবাই একবার সমাজকে বলি :

ওরে তুই ওঠ্ আজি
আগুন লেগেছে কোথা?

সংগীতচর্চায় মুসলমান

কাজী মোতাহার হোসেন

কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য ও সংগীত, এই চারিটি বিদ্যাকে 'আলঙ্কারিক কলা' বলা যাইতে পারে। ইহারা নানাবিধ রসের প্রকাশক ও উদ্দীপক। 'এই চারিটি বিদ্যারই সমান উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্য স্বভাব-বর্ণন। কথার দ্বারা স্বভাবের অনুকরণ করা কাব্যের কার্য, রঙ দ্বারা স্বভাব অনুকরণ চিত্রের কার্য; গঠন ও আকৃতি দ্বারা স্বভাব অনুকরণ ভাস্কার্যের কার্য। সেইরূপ সুরের দ্বারা স্বভাব অনুকরণ করা সংগীতের কার্য। কেবল মানব মনের ভাব ও আবেগ বর্ণনা করাই সংগীতের একমাত্র কার্য নহে—বাহ্য জগতের সমুদয় শব্দময় কার্যই সংগীতের বর্ণনীয়।' এজন্য কণ্ঠ যেখানে অপারগ সেখানে আমরা বংশী, তার বা অন্য কোনো যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করি। আবার কথা ও সুরের ভিতরকার গতিচ্ছন্দও একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ছন্দপতন হইলে সুমিষ্ট সুরও বেসুরা বোধ হয়—তাহার রসোদ্দীপিকা শক্তি অনেকাংশে কমিয়া যায়। এইজন্য সুরগুলি তালে তালে সুসঙ্গতভাবে উচ্চারণ বা বাদন করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে বোধ হয় শারীরিক গতিভিঙ্গ, করতালি, পদক্ষেপ প্রভৃতির ব্যবহার হইত। পরে সেইগুলি উৎকর্ষ লাভ করিয়া নৃত্যকলায় পরিণত হইয়াছে। এখন আমরা গান, বাদ্য ও নৃত্য তিনটিকে সংগীতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানি।

রসানুভূতি মানবজাতির প্রকৃতি-দত্ত অমূল্য সম্পদ। এজন্য সৃষ্টির আদি কাল হইতে সংগীত সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই কোনো না কোনো ভাবে বিদ্যমান আছে। সভ্য সমাজ হইতে অতিদূর দূরান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে একতারা বা দোতারা এবং দুই বা ততোধিক ছিদ্রবিশিষ্ট বংশীর ব্যবহার দেখা যায়।

মানুষের এই স্বাভাবিক বৃত্তি যতই চাপিয়া রাখা যাউক না কেন, কোনো না কোনো রূপে তাহার প্রকাশ অবশ্যই হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ধার্মিক মুসলমানগণ প্রায় কোনো সময়েই সংগীতকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। তথাপি দেখিতে পাই, উচ্চকণ্ঠে সুললিত স্বরে আজান দেওয়া হয়, কেরাত করিয়া সুমিষ্ট স্বরে কোরান শরিফ পাঠ করা হয়। ইহা ছাড়া পরমার্থ সম্বন্ধীয় গজল,

কাওয়ালি প্রভৃতির অন্ত নাই। মিলাদ শরিফে যে প্রকারে দরুদ পড়া হয়, এবং হজরতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য যে ওজনের সমস্বরে 'সালাম আলায়কা' পড়া হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই সংগীত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রকারেরাও আমোদে নিয়ম-নাস্তি হিসাবে বিবাহের সময় দফ্ বাজাইয়া গান করা জায়েজ রাখিয়াছেন। ইহা হইতে অন্তত এটুকু প্রমাণ হয় যে নানারূপ সামাজিক ও ধর্ম-নৈতিক বিধিনিষেধের ভিতরেও অনুষ্ঠান-প্রিয় মুসলমানগণের স্বাভাবিক সংগীত-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার যৎসামান্য পন্থা আছে।

হজরত মুহম্মদ আবির্ভূত হইবার পূর্বে আরব দেশে এক শ্রেণীর গায়ক ছিলেন, তাঁহারা পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া দফ্, তার, কামান্দজা কিংবা গসবা সহযোগে গান করিতেন। ইঁহারা একাধারে কবি ও গায়ক দুই-ই ছিলেন। আরবদের ন্যায় কবিতা-প্রিয় জাতির মনোরঞ্জনের জন্য গানের শুধু সুর হইলেই যথেষ্ট হইত না—অর্থ ও পদ-বিন্যাসের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইত। বোধ হয় সে গানের প্রকৃতি অনেকটা সুর-সমন্বিত আবৃত্তি (recitation), কিংবা আমাদের দেশের কবি-গানের মতো ছিল।

ইসলাম প্রচারের প্রথম দিক দিয়া অনেক দিন যাবত আরব সংগীত বিশেষ কোনো উৎসাহ পায় নাই। তাহার কারণ, সে সময় লোকের মন আধ্যাত্মিক উন্নতি চিন্তায় অতিশয় ব্যগ্র ছিল, এবং জাতির উন্নতির জন্য যে সমস্ত গুণ অনুশীলন করিলে সত্ত্বর কার্য সিদ্ধির সম্ভব তাহাই প্রাণপণ উৎসাহে অভ্যাস করিতে করিতে সংগীতের উপযুক্ত অবসরও তেমন ছিল না। বিশেষত হজরত মুহম্মদ ধর্মাভ্যাস হিসাবে সংগীতের উপকারিতা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন—তাহার প্রমাণ, তিনি বলিয়াছেন, 'পানিতে যেমন শেওলা জন্মায়, সংগীত বা গীত হইতে হৃদয়ে তেমনি কৃত্রিমতা জন্মে'; 'যদি সংগীতকে আরাধনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে সে আরাধনা কেবল হাত-তালি এবং বংশী-বাদনেই পর্যবসিত হইবে'।

যদিও শুনা যায় হজরত ওমর (৬৩৪) কবিতা বা গান রচনা করিতেন, এবং হজরত ওসমান (৬৪৪) ইবনে সৌরেজ নামক গায়কের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তবুও ইঁহাদের সময় সংগীত জন সমাজের এক প্রকার অনাদৃত অবস্থায়ই ছিল। Salvador সাহেব তাঁহার গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে হজরত আলীর (৬৫৬) খেলাফত সময় সাহিত্য, কাব্য ও অন্যান্য ললিতকলার ন্যায় সংগীত-চর্চার দিকেও লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হজরত মাবিয়ার (৬৬১) রাজত্বকালে গ্রীসদেশের অনেকাংশ আরবদের অধিকারভুক্ত হয়। তখন তিনি রাজসভার অসংখ্য সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে গ্রীক সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য গ্রন্থ-রাজি অনুবাদ করিবার আদেশ দেন। এইরূপে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে গ্রীকদের বহু সংগীতগ্রন্থও আরব্য ভাষায় অনূদিত হয়। এই সময় হইতে আরব সংগীতে গ্রীক-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু

স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইতিপূর্বেই আরবিয়েরা পারস্য দেশ জয় করিয়া তাঁহাদের সংগীতকে আপন করিয়া লইয়া এক বিশিষ্ট সংগীত পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিলেন—যাহাকে আরব্য পারস্য সংগীত রীতি বলে।

আমরা দেখিতে পাই, অষ্টম শতাব্দীতে সংগীত আরবদের শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। এমনকি কয়েকজন খলিফাও সংগীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খলিফা এজিদ (৬৮০) সংগীত রচনা করিতেন; প্রথম ওলিদ (৭০৫) বংশীবাদনে অভ্যস্ত ছিলেন। খলিফা আবুল আব্বাস (৭৪৯) এবং মনসুর (৭৫৪) গায়ক ও বাদকদিগকে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতেন। খলিফা মাহ্‌দী (৭৭৫) নিজে সুগায়ক ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র বিশ্ব-বিখ্যাত হারুন-অর-রশিদকেও রীতিমত সংগীত-শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই হারুন-অর-রশিদ খলিফা হইবার পর (৭৮৬) সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সংগীত, উপন্যাস প্রভৃতি উন্নতিকল্পে যেরূপ অবারিতভাবে রাজকোষ,উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত কীর্তি কাহিনী আজও আরবের মুখে মুখে ধ্বনিত ও গীত হইয়া থাকে। তিনি যেমন একদিকে অগণিত মসজিদ নির্মাণ করেন, সেইরূপে অন্যদিকে অসংখ্য স্কুল কলেজেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে সংগীতও রীতিমতো ভাবে আলোচিত হইত—এমনকি কয়েকটিতে কেবলমাত্র সংগীতই শিক্ষা দেওয়া হইত।

নবম শতাব্দীতে সংগীত-শাস্ত্র (theory) সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদি লিখিত হয়। কবি সালিল ৭৮০ খৃস্টাব্দে 'শব্দবিজ্ঞান' ও 'তাল-জ্ঞান' নামক দুইখানা পুস্তক লিখিয়া যান। আর একজন লেখক ওবেদুল্লা-বিন-আবদুল্লা 'স্বর ও সঙ্গীতের সুর-বৈচিত্র্য' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার পর ৮৬২ খৃস্টাব্দে বিখ্যাত দার্শনিক আলকিন্দী সংগীত বিষয়ক ছয়খানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করেন : (ক) রচনা প্রকরণ, (খ) স্বর বিবরণ, (গ) প্রাথমিক সংগীত, (ঘ) লয় ও তাল প্রকরণ, (ঙ) বাদ্যযন্ত্র, (চ) কবিতা ও সংগীতের সমন্বয় রহস্য। তাঁহার শিষ্য আসমত-বিন-মুহম্মদ 'সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' নামক একখানা বৃহৎ পুস্তক রচনা করেন।

আরবদের মধ্যে কেবল যে পুঁথিলেখা বিদ্যারই বিশেষ আলোচনা হয়, তাহা নহে। ক্রিয়াসিদ্ধ সংগীতেও বড় বড় ওস্তাদ আরবদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, (১) ইব্রাহিম মসৌলী (৭৪২-৮০৩) আরব সংগীতের পিতৃ-স্থানীয়,—কারণ তিনি নিজে তো একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেনই, তাহা ছাড়া তিনি অসংখ্য কৃত-বিদ্য শিষ্য তৈয়ার করিয়া যান; (২) জোবায়ের-ইবনে-দাহমান রাজসভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, এমনকি তিনি পুরস্কারস্বরূপ দুইটি গ্রামের জায়গীর লাভ করেন; (৩) মাবেদ-মাদিনী গায়করূপে সমস্ত আরব দেশ ভ্রমণ করিয়া যশোলাভ করেন; (৪) জাসিদ হাওয়া সর্বপ্রথমে অন্তঃপুরে সুশিক্ষিতা গায়িকাদ্বারা গান করাইবার প্রথা প্রচলিত করেন; (৫) কোরায়েশ সংগীত-সাধন বিষয়ে একখানা

পুস্তক প্রণয়ন করেন; (৬) খলিফা মোতাওয়াককিলের পুত্র আবু আয়কা তিন শত গীত রচনা করেন; (৭) মসৌলির পুত্র ইসহাক অনেক সংগীতগ্রন্থের প্রণেতা ও প্রচারক ছিলেন; (৮) সুকবি এবং সুগায়িকা ওরায়েব অনেক গীত রচনা করেন—তাঁহার নাকি একুশ হাজার তান কণ্ঠস্থ ছিল। ইহা ছাড়া, মুহম্মদ ইবনল হারেস, সেলসেল, মোকারিক, আলগারিদ, ইবনে জর্জে-সুমা প্রভৃতি বিখ্যাত ছিলেন। এই শেষোক্ত দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী সভা-গায়ক ছিলেন। খলিফা হারুনের রাজত্বকালে অনেক নতুন গীত রচিত হয়, তৎসমুদয় সংগ্রহের নিমিত্ত জালেদ ইবনল এবং অন্য দুইজন গায়ক লইয়া এক কমিশন গঠন করা হয়। তাঁহারা নব-সংগীতের এক প্রকাণ্ড খসড়া প্রস্তুত করেন।

কিন্তু বোগদাদের গৌরব বেশি দিন অক্ষুণ্ন থাকে নাই। আমরা এখন বোগদাদকে যশের উন্নততম শিখরে আরূঢ় রাখিয়া এইবার আরবাধিকৃত স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার দিকে দৃষ্টিপাত করিব। স্পেনীয় খলিফা প্রথম হাকাম (৭৯৬) কর্তৃক আহূত হইয়া বোগদাদের একজন বিখ্যাত ওস্তাদ, সারজাব কর্ডোভায় আগমন করেন। ইনি পূর্ব-কথিত খ্যাতনামা ইব্রাহিম মসৌলীর একজন উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। ইনি ৮২১ খৃষ্টাব্দে কর্ডোভায় এক সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শীঘ্রই সেভিল, গ্রানাডা, ভ্যালেনশিয়া এবং টলেডো নগরেও সংগীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভার বিদ্যালয় পরিণামে উপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ উভয়বিধ সংগীতের জন্যই বিখ্যাত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে যেমন তানসেন, স্পেন, আরব ও মিশরে তেমনি আল ফারাবীর (মৃ. ৯৫০) নাম ঘরে ঘরে প্রচারিত। তাঁহার সংগীত পুস্তক এখনও সম্মান সহকারে রক্ষিত আছে। আলী হিস্পানী (মৃ. ৯১৮) আর একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে—তথাপি 'কিতাবুল আগানী'তে তাঁহার সংগীত ও অন্যান্য রচনা পাঠ করিয়া লোকে আনন্দ লাভ করে। গ্রানাডার লোকপ্রিয় গায়ক আবু-বকর-এবনে-বাজেহ আরস্তুঁর 'শব্দ-বিজ্ঞানের' সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। ঐ যুগের আরও কয়েকজন গায়কের নাম—বিনজায়দান, রাবি ইউনুস, রাব্বি মুসা, ওয়াদিল, মোহেব, আবিল এবং সরজাবের শিষ্য মৌসালী।

আরবদের সংগীত ও সংগীতপুস্তক-সম্বন্ধে উপরে যে বিবরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে খ্রীস্টিয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে আরব সংগীত বেশ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। এই সংগীত যে কেবল আরবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। বস্তুত পার্শী, তুর্কী, মিশরী, তাতারী প্রভৃতি সমুদয় মুসলমান জাতিই প্রায় তুল্যরূপে এই সংগীত-ঐশ্বর্যের রসভোগ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ আরবি মুসলমানদের কোরানের ভাষা, এজন্য অন্যান্য ভাষার তুলনায় এই ভাষার প্রভাব স্বভাবত ধর্মপ্রাণ মুসলমান জাতির উপর অধিক

মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়; বিশেষত ইসলামের মূলীভূত এককতার ফলে, যাহা একদেশের মুসলমানের সম্পদ, তাহা শীঘ্রই সর্বদেশীয় মুসলমানের সাধারণ সম্পদে পরিণত হয়। আর একটা প্রধান কারণ, তখন আরবেরাই কি বল-বিক্রমে, কি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শনে, পৃথিবীর অন্য সমুদয় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের অনুকরণ করা তখন অন্য জাতির পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। আরদের নিকট হইতেই তৎকালীন ইউরোপ জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সংগীত ব্যাপারেও ইউরোপ আরবের নিকট বিশেষত আরবাধিকৃত স্পেনের নিকট ঋণ-সূত্রে আবদ্ধ।

স্পেনে এক অপূর্ব সমন্বয়-কার্য সংগঠিত হয়। সেখানকার সংগীত বিদ্যালয়গুলিতে যে কেবল আরব-পারস্য পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা নহে। লুপ্ত-প্রায় গ্রীক-পদ্ধতির পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাও ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। কালক্রমে উভয় পদ্ধতিই কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া এক অভিনব পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। আজ পর্যন্ত পূর্ব-আরবে প্রাচীন প্রথা প্রচলিত থাকিলেও স্পেন, আলজিরিয়া, টিউনিস, মিশর প্রভৃতি স্থানে এই মিশ্র পদ্ধতি অনুসারেই গান গাওয়া হইয়া থাকে। আজও মাদ্রিদের রাজপথে আরব-পারস্য-গ্রীক রীতির তান-মূলক গান যথেষ্ট শোনা যায়, তাহা বোধ হয় খ্রীস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গান। এর পর ইউরোপীয় সংগীতে অনেক পরিবর্তন, অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাঁহাদের এখন আর তাল-প্রধান (Melodic) সংগীত নাই—এখন তাহা সংযোগ-প্রধান (Harmonic music)। এমনকি, পূর্বকালে গীর্জায় যে তান-প্রধান গ্রেগরীয় সংগীত (Gregorian music) শুনা যাইত, তাহাও এখন সংযোগ-প্রধান করিয়া গাওয়া হয়। প্রাচীন রোমীয়দের আটটি 'গ্রাম' বা স্বরান্তর প্রকাশের ধারা ছিল; গ্রীক ও আরবেরা চৌদ্দটি 'গ্রাম' ব্যবহার করিতেন। কিন্তু বর্তমান ইউরোপে কেবলমাত্র Major Scale এবং স্থল-বিশেষে Minor Scale এই দুইটি মাত্র 'গ্রাম' ব্যবহার করা হয়। এজন্য আজকাল ইউরোপের অনেক সংগীতজ্ঞ বলিতেছেন যে, কেবল একটি বা দুইটি মাত্র 'গ্রাম' অবলম্বন করিয়াই যেমন বিচিত্র সংযোগ-প্রধান সংগীতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে পরিত্যক্ত গ্রামগুলি পুনরায় গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে ও পরস্পর সংযোগে এই প্রণালীতে সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট ভাবোদ্দীপক সংগীতের সৃষ্টি করিয়া বর্তমান সংগীতের বৈচিত্র্য শতগুণ বর্ধিত করা যাইতে পারে। (Salvador Daniel-কৃত 'Arab Music and Musical Instrument' দ্রষ্টব্য)

যাহা হউক, এইবার আমরা ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের ভারতীয় সংগীতের উপর মুসলমানের প্রভাব কিরূপ কাজ করিয়াছে, সংক্ষেপে তাহাই একটু আলোচনা করিব। এস্থলে বলা আবশ্যক যে ভারতীয় সংগীত ও আরব্য পারস্য

সংগীত উভয়েই সম-প্রকৃতিক। উভয়েই তান-প্রধান সংগীত এবং তবলা বা ঐরূপ কোনো তাল-রক্ষণ যন্ত্রের সহিত গীত বা বাদিত হয়। উভয়েই রাগ-রাগিণীর দৃঢ় বন্ধন আছে—পাশ্চাত্য সংগীতের ন্যায় লৌকিক প্রভাবের (individual fancy) ততটা স্থান নাই। যে গমক বা মীড় ইউরোপীয় সংগীতজ্ঞের কানে বিষবৎ লাগে, তাহা ভারতীয় ও আরবিয় সংগীতের একটা শ্রেষ্ঠ ভূষণ। আবার যন্ত্র হিসাবেও ভারতের বীণা, আরবের রবাব; ভারতের বেহালা আরবের কামান্দজা; ভারতের মুরলী, আরবের গসবা; ভারতের ঢোল, আরবের দফ্; ভারতের ত্রিতন্ত্রী আরবের কৌইত্র বা কিথারা; ভারতের জয়ঢাক, আরবের আতাম্বর। এইরূপে দেখা যায় যে ভারতের যে কাজের জন্য যে যন্ত্র আছে, আরব পারশ্য তাতার প্রভৃতি দেশেও সেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অনুরূপ যন্ত্র বর্তমান আছে।

ভারতীয় সংগীত মুসলমানী সংগীতের সমভাবাপন্ন হওয়াতে এদেশের পাঠান ও মোগল বাদশাহদের পক্ষে তাহার রস গ্রহণ করা সহজ হইয়াছিল। রস গ্রহণ করিতে না পারিলে, তাঁহারা ভারতীয় সংগীতের প্রতি এতটা মনোযোগ দিতেন কিনা সন্দেহ। বাস্তবিক পক্ষে মুসলমান বাদশাহরা এদেশের সংগীতকে যেভাবে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সংগীত সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তৎসহ আরব পারশ্যের নতুন রাগ-রাগিণীর সংমিশ্রণে অতি বৈচিত্রময় মনোহর সংগীতের সৃষ্টি করেন। রাগ-রাগিণীর সংখ্যা এত বর্ধিত হয় যে, তাহাদিগকে ঠাট হিসাবে, গাইবার সময় হিসাবে, ঔড়ব খাড়ব হিসাবে প্রভৃতি নানা উপায়ে শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। এ কাজটি মুসলমানেরাই করিয়া গিয়াছেন, তাহা না করিলে বর্তমানে আমরা যে সমস্ত রাগ-রাগিণীর পরিচয় পাই, তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই। 'দ্বাদশ মল্লার' 'অষ্টাদশ কানাড়া' 'সপ্ত-সারঙ্গ' 'নব-নট' 'দ্বাদশ চৌড়ী' প্রভৃতি নাম হইতেই, মুসলমান বাদশাহদের আমলে ভারতীয় সংগীত যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'গীত সূত্রসারের' উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, 'মুসলমান সম্রাটদিগের সময় হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। এজন্য তৎকালে সংগীতের যে প্রকার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা পূর্বকালাপেক্ষা অধিক ব্যতীত অল্প নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাই উন্নতির প্রধান কারণ ও উত্তেজক। অতএব তাহারই প্রভাবে হিন্দুস্থানী লোকের সংগীত-জ্ঞান, রচনা-কৌশল এবং কর্তব-শক্তি প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছে; কোনো, নবাব বাদশাহরা ভূয়োভূয়ো উৎসাহ-দান দ্বারা বহুকাল ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্রোত প্রবল রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে নতুন নতুন রাগ-রাগিণীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, নতুন নতুন সংগীতযন্ত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার উন্নতির অনেক লক্ষণই দেখা যায়। কেবল সংগীতের দুর্বোধ্য সংস্কৃত গ্রন্থের

অনুশীলন হয় নাই বলিয়া, সংগীতের অবনতি হওয়া স্বীকার্য হইতে পারে না। ঐ সকল গ্রন্থে বর্ণিত ২২ প্রকার শ্রুতি, ২১ প্রকার মূর্চ্ছনা, ২৩ প্রকার গমক, ৬৩ প্রকার বর্ণালঙ্কার, শত সহস্র প্রকার তান, ইত্যাদির কেবল মাত্র নাম শিখিয়া ওস্তাদদিগের কি উপকার হইত?

অতি প্রাচীন কালে যে সমস্ত রাগ রাগিণী ছিল, তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ উন্নতি হইলে প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়। ইহার উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আদিম কালে অর্থাৎ বৈদিক যুগে মাত্র তিনটি স্বরে গান হইত। পরে ক্রমে ক্রমে সপ্ত-স্বরের সৃষ্টি হয়। 'কুশীলব যখন রাজসভায় রামায়ণ গান করিয়াছিলেন তখন তাহা শুদ্ধ-সপ্ত স্বরেই গীত হইয়াছিল। বিকৃত ১২ স্বর যোগ ছিল কিনা সন্দেহ।' (ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের 'ঐতিহাসিক রহস্য' তৃতীয় ভাগ হইতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত) 'কৌশল এক হইলেও আদিম মানব হৃদয়ে তাহার সর্বাংশ স্ফূর্তি গায় নাই বলিয়াই একেবারে ১৯ স্বরের জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে হইয়াছে'। মুসলমানদিগের সময়ও সুর সংখ্যার দিক দিয়া না হউক, বৈচিত্র্যের দিক দিয়া সংগীতের অনেক উন্নতি ঘটিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'উপপত্তি ভিন্ন গান ও গৎ প্রভৃতি কর্তবাংশের উদাহরণ কিছুই পাওয়া যায় না।' 'প্রাচীন কালের ব্যবসায়ী লোকে যে ঐ সকল সংস্কৃত গ্রন্থের মতানুসারে সংগীত সাধনা করিত, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে।' (কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'গীতসূত্রসারের' উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য)

সুতরাং প্রাচীন হিন্দু সংগীতের সহিত আধুনিক হিন্দুস্থানী সংগীতের তুলনা করা বড়ই দুষ্কর। তবে শুনা যায়, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে এখনও নাকি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারেই সংগীতচর্চা হইয়া থাকে। তাহাকে কর্ণাটি ও দ্রাবিড়ী সংগীত বলে। তাহা ছাড়া মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙালি সংগীতও হিন্দুস্থানী সংগীত হইতে ভিন্ন। কলিকাতায় সর্বপ্রকার সংগীতই আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু গুণিগণ সকলে একবাক্য হইয়া মুসলমান প্রভাবান্বিত হিন্দুস্থানী সংগীতকেই শ্রেষ্ঠ ও মনোহর বলিয়া স্বীকার করেন—তাই এদেশে কর্ণাটি, মহারাষ্ট্রী বা বাঙালি ওস্তাদ অপেক্ষা হিন্দুস্থানী ওস্তাদদেরই সমাদর অধিক।

পাঠান রাজত্বকালে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী স্বয়ং উত্তম গায়ক ছিলেন। বিখ্যাত সাধক ও গায়ক আমীর খসরু তাঁহার সভাকবি ছিলেন। এই সময় দক্ষিণ দেশে নায়ক গোপাল নামক একজন বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া সমুদয় বিখ্যাত ওস্তাদকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে আলাউদ্দীনের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে আমীর খসরুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হয়। কিভাবে তাঁহাদের প্রতিযোগিতা হইল, এবং কিরূপে জয় পরাজয় নির্ণীত হইল, তাহার কোনো বিবরণ এ পর্যন্ত

সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমীর খসরুর চেষ্টা ও উৎসাহেই প্রথমে মুসলমানেরা হিন্দু-সংগীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি সেফর্দ্দা, ইমন, ইমন কল্যাণ, ইমন পুরিয়া ও ইমন বেহাগ রাগিণী সৃষ্টি করেন। আবার ইনিই বীণার অনুকরণে সেতার যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। কথিত আছে, বর্তমান কালে যে ঢংএ ধ্রুপদ গাওয়ার রীতি আছে, গুণি-শ্রেষ্ঠ আমীর খসরুই তাহার প্রবর্তক। মোগল সম্রাট আকবর শাহের সময় স্বনামধন্য তানসেন তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তানসেনের কীর্তি সম্বন্ধে নানাবিধ কাহিনী প্রচলিত আছে; সে সমস্ত আর বলিবার আবশ্যক নাই। তিনি দরবারী কানাড়া, মিয়া সারঙ্গ, মিঞা মল্লারের সৃষ্টিকর্তা। আকবর বাদশাহের রাজত্বকাল ভারত-সংগীতের এক গৌরবময় যুগ। তাঁহার উৎসাহ না পাইলে কখনোই হরিদাস স্বামী, তানসেন, তানতরঙ্গ, মানতরঙ্গ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গায়ক এবং বীণকার ফিরোজ খাঁর ন্যায় গুণী ব্যক্তি এত সুপরিচিত হইতে পারিতেন না এবং পরবর্তী যুগের সংগীতের উপর তাঁহারা এরূপ স্থায়ী চিহ্নও অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিতেন না। (আকবর বাদশাহ স্বয়ং উৎকৃষ্ট পাখোয়াজী ছিলেন)

জৌনপুরের অধীশ্বর সুলতান হোসেন সিরকী 'খেয়াল' গানের সৃষ্টিকর্তা। তাহা ছাড়া ইনি সোহাটোরী, সুখরাইটোরী, নাচারীটোরী, জৌনপুরীটোরী, মুলতানী বারোয়া, পিলু, মালিগৌরা, হোসেনী কাড়ানা ও সাহানা রাগিণীর সৃষ্টি করেন।

মিঞা বখশু সুখল বেলাওল ও বাহাদুরী টোরী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

লাক্ষ্মৌ নিবাসী গোলাম নবী টপ্পা গানের সৃষ্টি-কারক।

ইহা ছাড়া তানসেনের পুত্রদ্বয় মানতরঙ্গ, তানতরঙ্গ; তানসেনের ছাত্রদ্বয় চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ; বিখ্যাত খেয়ালীদ্বয় সদারঙ্গ, অদারঙ্গ; কলাবৎ নূর খাঁ; টপ্পাগায়ক হাম্‌দম, সদারঙ্গের শিষ্যদ্বয় শক্কর, মাক্ষণ; গোলাম রসুল; মুহম্মদ খাঁ; সজ্জু খাঁ; সেখ বিচ্ছু; মির্জ্জা আক্কেল; মিয়া গম্বু; বীণকার নাসির আহমদ; হাস্‌সু খাঁ; করিম খাঁ; হার্দ্দ খাঁ; কাশী নিবাসী বীণকার মহম্মদ খাঁ; সারঙ্গী নবীবক্স; বড় মিঞা; ছোট মিঞা; বীণকার ওয়ারিশ আলী খাঁ; রবাবী বাসদ খাঁ; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সাদকলী খাঁ; সেতারী এমদাদ খাঁ; শারঙ্গী উজির খাঁ প্রভৃতি গুণিগণ সমগ্র ভারতব্যাপী যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। (ইহাদের অধিকাংশ নামই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সংগীতসার' হইতে গৃহীত।) একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, এই সকল গায়কেরা স্বয়ং অসংখ্য সংগীত রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং যন্ত্রীরাও প্রত্যেকে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর গৎ প্রস্তুত করিয়া সংগীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি গান পূর্বে ছিল না। এগুলি বাদশাহী আমলের সৃষ্টি। এজন্য ইহাদের প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এদেশে কেবল ধ্রুপদ (বা ধ্রুবপদ) গানেরই প্রচলন ছিল, এবং তাহার যথেষ্ট উন্নতিও হইয়াছিল। প্রবন্ধ, হোরি (বা হোলি গান),

তেলেনা, যুগলবন্ধ রাগমালা প্রভৃতি ধ্রুপদের অন্তর্গত। ধ্রুপদের রচনা বিস্তৃত, এবং তাহা আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চারি অংশ বা কলিতে বিভক্ত। প্রথম অংশে, সুর মধ্য-সপ্তকে থাকিয়া রাগিণীর মূর্তি প্রকাশ করে; দ্বিতীয় অংশে, মধ্য-সপ্তক হইতে তারা-সপ্তক পর্যন্ত আরোহণ করিয়া আবার অবরোহণ ক্রমে আস্থায়ীর সহিত মিলিত হয়; তৃতীয় অংশে সাধারণত মধ্য-সপ্তক হইতে মন্দ্র-সপ্তকে অবতরণ করিয়া নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশ করে; তৎপর চতুর্থ অংশে আবার তারা-সপ্তক পর্যন্ত উঠিয়া রাগিণীর সম্পূর্ণ বিস্তার দেখাইয়া ক্রমে আস্থায়ীর সহিত মিলিত হয়। ধ্রুপদ গান করা বড় কঠিন কার্য, তাহার কারণ এই নহে যে কঠিন কঠিন তালে ধ্রুপদ গান করা হয়,—কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, ধ্রুপদের পদ অতিদীর্ঘ, তাহাতে অনেক দমের প্রয়োজন। ধ্রুপদের সহিত মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজের সঙ্গত হয়। সাধারণত চৌতাল, ধামার, সুর-ফাঁক, ঝাঁপতাল, রূপক, ঢিমেতেতালা প্রভৃতি তালই বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদে ব্যবহৃত হয়। মৃদঙ্গের চামড়ার উপর ভিজা ময়দার ঢিপি করিয়া তাহার উপর আঘাত করিলে যে অতি গুরুগম্ভীর আওয়াজের সৃষ্টি হয়, তাহার তালে তালে রাগরাগিণীর বিস্তার-পূর্বক যে ধীর মন্থর গতিতে ধ্রুপদ গাওয়া হয়, তাহাতে সমগ্র মজলিসে এক শান্ত, সৌম্য, উদাত্ত ভাবের সৃষ্টি হয়—তখন আপনা হইতেই ঐ গাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গে মনে একপ্রকার পবিত্র ভঙ্গি-ভাবের উদয় হয়। প্রাচীন কালে ধ্রুপদের বাগবিন্যাস কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষ করিয়া জানিবার উপায় নাই। এখন তানসেন, দুঁদি খাঁ, মিঞা বকসু, বাবা সুরদাস প্রভৃতির রচিত অনেক উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গান প্রচলিত আছে। এখন এইগুলিই প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যে পরিগণিত। পাঞ্জাব প্রদেশে ধ্রুপদের চর্চা অধিক। সেখানকার সংগীতাধ্যাপক মৌলাদাদ ও ইলিয়াস বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জৌনপুরের অধীশ্বর সুলতান হোসেন সিরকী ধ্রুপদ ভাঙিয়া খেয়াল গানের সৃষ্টি করেন। খেয়ালের রচনা ধ্রুপদ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। ইহার মাত্র দুইটি কলি আছে, আস্থায়ী ও অন্তরা। কদাচিৎ তিন চারিটি কলিও থাকে। খেয়ালের রচনা একটু দীর্ঘ হইলে এবং কিছু শ্লথ করিয়া গাইলে, ইহাকে ধ্রুপদ হইতে পৃথক করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। কারণ, ধ্রুপদের অধিকাংশ তালই জলদ-ভাবে খেয়ালে ব্যবহৃত হয়। তবে 'ধ্রুপদের সুরফাঁক, তেওরা, সওয়ারী তালের ন্যায় ছন্দ খেয়ালে ব্যবহার নাই', আবার 'খেয়ালের আড়া ও মধ্যমান তালের ন্যায় ছন্দ ধ্রুপদে ব্যবহার নাই'। খেয়ালে ক্ষুদ্র তান বা গিটকারী ব্যবহৃত হয়, ধ্রুপদে হয় না; আবার ধ্রুপদে যে প্রকার গমক ব্যবহৃত হয় খেয়ালে তাহা হয় না। হিন্দু খেয়ালের মধ্যে সদারঙ্গ ও অদারঙ্গের হিন্দী খেয়ালই সর্বোৎকৃষ্ট, এজন্য তাহাই অধিক প্রচলিত। সদারঙ্গ, অদারঙ্গ বাদশাহ মহম্মদ শাহের দরবারের সম্মানিত গায়ক ছিলেন। খেয়াল ও ধ্রুপদ উভয়ই ঈশ্বর-বিষয়ক গানের উপযোগী। খেয়ালে সুরের খেলা অধিক হয় বলিয়া,

ইহা ধ্রুপদ অপেক্ষা মিষ্ট। পক্ষান্তরে ধ্রুপদের গতি ধীর ও গম্ভীর বলিয়া বিরাট ভাব প্রকাশের জন্য ইহাই অধিকতর উপযোগী। মোটের উপর সংগীত মানুষের প্রাণের ভাষা, এবং তাহার আদর জনসাধারণের রুচির উপর নির্ভর করে। রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গানের প্রকৃতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য খেয়াল প্রথমাবস্থায় ধ্রুপদী ওস্তাদদের ব্যঙ্গ সহ্য করিয়াও এযাবৎ জীবিত আছে—এমনকি ধ্রুপদকে প্রায় আসনচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে।

খেয়ালের পর টপ্পা। টপ্পার মূল অর্থ লম্ফ, তাহা হইতে চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা। বোধ হয় টপ্পার গতিভঙ্গী চঞ্চল ও লঘু বলিয়া এই প্রকার গানের 'টপ্পা' নাম হইয়াছে। টপ্পা বলিতেই আমরা শোরী মিঞার টপ্পা বুঝি। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু লাক্ষ্ণৌ নিবাসী জানি খাঁর পুত্র গোলাম নবীই টপ্পার সৃষ্টি কারক। শোরী নাম্নী তাঁহার এক প্রিয়তমা প্রণয়িনী ছিলেন। এজন্য তিনি গাইবার সময় শোরী-মিঞার ভনিতা দিয়া গাইতেন। কাপ্তেন উইলার্ড সাহেবের মতে টপ্পা রীতির গান পাঞ্জাব প্রদেশের উষ্ট্রচালকদের জাতীয় সংগীত ছিল। 'শোরী মিঞা' সুকৌশলযুক্ত সাধনা দ্বারা ঐ গানকে বিশেষ সুললিত ও কারিগরি-বিশিষ্ট করিয়া, ইহাকে সভ্য সংগীত আসরে গাইবার উপযুক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি উহা সভ্য-সমাজে আদর লাভ করিয়া আসিতেছে। সভ্য-সমাজে প্রচলিত টপ্পারীতির গান অল্পদিন হইল সৃষ্ট হইয়াছে। এজন্য এখনও ইহার আয়তন ক্ষুদ্র, এবং সমস্ত রাগিণীতে টপ্পা গান গাওয়াও হয় না। প্রাচীন রাগিণীর মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, কালেংড়া, দেশ, সিন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি এবং আধুনিক রাগিণীর মধ্যে কাফি, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোয়াঁ, মাঝ, ইমনি ও লুম এই কয়েকটি মাত্র টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে টপ্পাধরনে অন্যান্য রাগিণী গাওয়া সম্ভবপর নহে। ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে হইতে নিশ্চয়ই টপ্পায় আরও অধিক সংখ্যক রাগিণীর ব্যবহার হইবে। তাহা ছাড়া সম্ভবত টপ্পার আয়তনও বর্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহাতে সঞ্চারী ও আভোগ যুক্ত হইবে। তাহার লক্ষণ এখনই দেখা যাইতেছে। 'প্রায়ই দেখা যায়, ওস্তাদেরা পিলু, ঝিঁঝিট, বালেয়াঁ প্রভৃতি আলাপ করিবার সময় ইহাদের সঞ্চারী ও আভোগের উপযোগী অঙ্গ বাহির করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপ চেষ্টার ফলে এই সব আধুনিক রাগিণীও বর্দ্ধিত হইয়া প্রাচীন রাগের তুল্য হইয়া যাইবে।' বলা বাহুল্য, প্রাচীন রাগ-রাগিণীসমূহও এইরূপ ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বর্ধিতায়ন হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। (কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'গীত সূত্রসার', ৮২পৃ.)। অনেকের ধারণা আছে যে আদিরসাশ্রিত গানকেই 'টপ্পা' বলে। কিন্তু তাহা নহে। কারণ আদিরসের গান খেয়াল ও ধ্রুপদেও বিস্তর আছে। তবে টপ্পার প্রকৃতি লঘু এবং গতি চঞ্চল ও দ্রুত হওয়াতে ভগবৎ-প্রেমের শান্ত ভাবের সহিত ইহার তেমন সামঞ্জস্য হয় না। এইজন্য সচরাচর ইহাতে হাস্য-কৌতুক, ব্যঙ্গ, আনন্দ, প্রণয় প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির গানই গাওয়া হয়।

ঠুংরী জাতীয় যে গান লাক্ষ্ণৌয়ে প্রচলিত, তাহা টপ্পারই অন্তর্গত। 'শোরীমিঞার' রচিত গানকেই ওস্তাদেরা টপ্পা বলিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য টপ্পাকে নামান্তরে ঠুংরী বলা হয়। খেয়ালের সঙ্গে যেমন ধ্রুপদের নিকট সম্বন্ধ, সেইরূপ টপ্পার সহিতও খেয়ালের নিকট সম্বন্ধ এক শ্রেণীর গান আছে, যাহা টপ্পা ও খেয়ালের মধ্যবর্তী—উভয়ের প্রকৃতিই ইহাতে বর্তমান, এজন্য ওস্তাদেরা ইহাকে 'টপ-খেয়াল' নাম দিয়াছেন।

ইহা ছাড়া খেয়াল টপ্পার অন্তর্গত 'কাওল-কালওয়ানা', 'গুল-নকশ', 'জিগর', 'সোহেলা', 'গজল' এবং 'দেওয়ালীগান' (দেওয়ালী রাগ সম্বন্ধে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সংগীত সারের' ৩৮৭ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য) মুসলমানেরা সৃষ্টি করিয়া এদেশে প্রচলিত করিয়াছেন। কাজী মামুদ নামক একজন গুজরাটি গায়ক প্রথমে 'জিগর' গানের সৃষ্টি করেন। আজমীর শরীফের দিকে কাওয়াল নামক এক শ্রেণীর গায়ক আছেন, তাঁহাদের গানকে কাওল-কালওয়ানা এবং তালকে কাওয়ালী তাল বলে। অনেক সময় গানকে কাওয়ালী গান বলে। হিন্দুদের যেমন কীর্তন, মুসলমানদের মধ্যে তেমনি কাওয়ালী ধর্ম-সংগীত রূপে ব্যবহৃত হয়।

সংগীতে উৎসাহদাতাদের মধ্যে সম্রাট আলাউদ্দিন, সম্রাট আকবর, বাহাদুর শাহ্ মুহম্মদ শাহ এবং পরবর্তীকালে মেটেবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুস্থানী সংগীতে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, এযাবৎ কাল মুসলমানেরা সেই প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিখ্যাত গায়ক বাদক প্রভৃতি বেশির ভাগই মুসলমান। এমনকি বর্তমান হিন্দুস্থানী সংগীত উপপত্তি হিসাবে হিন্দু-সংগীত হইলেও, তাহা ক্রিয়া সিদ্ধাংশকে কি ভাষা হিসাবে, কি ঢং হিসাবে মুসলমানী সংগীত বলিলেও কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না।

যন্ত্র হিসাবে ধরিতে গেলেও, বীণা ভারতের আদি যন্ত্র—ইহাতে রাগাদির আলাপ করা হয়। আবার ইহার সমকক্ষ রবাব যন্ত্রও এদেশে (বিশেষত দিল্লীর নিকটবর্তী রামপুরের নবাব দরবারে) প্রচলিত আছে। রবাব আরবিয় যন্ত্র, ইহাতেও ভারতীয় রাগাদির সুন্দর আলাপ হয়। বীণার আওয়াজ হৃদয়স্পর্শী হইলেও অত্যন্ত ক্ষীণ। এজন্য মুসলমানেরা বীণাকে বড় করিয়া শরদ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। বীণা বা শরদে রীতিমতো আলাপ করিতে হইলে বহুবর্ষব্যাপী সাধনার দরকার।

পূর্বেই বলা হইয়াছে আমীর খসরু বীণার অনুকরণে সেতার যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। প্রথমে ইহাতে মাত্র তিনটি তার সংযোজিত থাকিত। ক্রমে পাঁচ তার সাত তার হইতে হইতে এখন ইচ্ছাধীন বহু তার যুক্ত হইয়া থাকে। ছোট সেতার গৎ বাজাইবার পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। রাগ-রাগিণীর বিস্তৃত আলাপের নিমিত্ত বাদশাহী আমলে সেতারকে বড় করিয়া অধিক তার যুক্ত করিয়া সুর-বাহার যন্ত্রের

সৃষ্টি হইয়াছে। যিনিই এ যন্ত্র শুনিয়াছেন, তিনিই ইহার সুর-বাহার নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

বংশী এদেশের অতি প্রাচীন যন্ত্র। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই যন্ত্রের সৃষ্টি-কারক কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারেন। আমরা এই পর্যন্ত জানি যে তিনি মোহন-বাঁশরী বাজাইয়া গোপিনীদের মনোরঞ্জন বা মনোহরণ করিতেন। বাস্তবিক বংশীর স্বর এমন সুমিষ্ট ও চিত্তহারী যে তাহাতে মন উধাও হইয়া যেন কোনো এক মায়াময় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে। গভীর রাত্রে কিংবা, সায়ংকালে উদাস করা বাঁশীর সুরে শ্রবণ মন আকৃষ্ট হয় না, এমন লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কোমল ও প্রেম-বিহ্বল উদাস ভাব ভারতবাসীর জাতীয় বিশিষ্টতা। বাঁশিতে এই দুইটি ভাব প্রকাশিত হয় বলিয়া সমাজের স্তরে স্তরে, (অন্য সমস্ত বিষয়ে পশ্চাৎপদ) কৃষকদের মধ্যেও ইহার আদর হইয়াছে। কিন্তু ইহার স্বর অতি ক্ষীণ এবং আনন্দের সুর যেন ইহাতে ঠিক ধরা দেয় না। এ অভাব দূর হইয়াছে বাদশাহী আমলের শানাই দ্বারা। উৎসবে এবং নহবতে শানাই বাজে; ইহার স্বর জোরালো এবং আনন্দব্যঞ্জক।

কানুন যন্ত্র আরবদেশ হইতে কাবুল ও ভারতবর্ষে আনীত হয়। মিঞা তানসেনের বংশধর পিয়ারসেন কানুন বাজাইয়া খ্যাতি লাভ করেন। আজকাল কানুনের ব্যবহার খুব কমিয়া গিয়াছে। আরব্য কানুনে ৭৫টি ছোট বড় তার সংযোজিত আছে। জলতরঙ্গে যেমন ছোট বড় পেয়ালায় আঘাত করিয়া নানারূপ স্বর উৎপাদিত করা হয়, কানুনেও তেমনি এই সমস্ত তারে, কাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া স্বরোৎপাদন করিতে হয়।

গানের সহিত সঙ্গতের জন্য সারঙ্গী এ দেশের অতি প্রাচীন এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্র। কোমলকণ্ঠী গায়িকা বা বাইজীদের গানের সহিত এবং আধুনিক সৃষ্ট যাত্রাগানেই আজকাল ইহার প্রচলন দেখা যায়—তাহা ছাড়া অন্যত্র ইহার আদর বড় দেখা যায় না। কাশীধামের প্রসিদ্ধ সারঙ্গী নবী-বক্স, সেতার ও সারঙ্গী এই দুইটি যন্ত্রের সমাবেশ করিয়া এস্রাজ বা এসরার যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। তদবধি ভদ্র সমাজে, বিশেষত আধুনিক শিক্ষিত সমাজে মহিলাদের ভিতর ইহার প্রভূত আদর হইয়াছে। গায়ক গায়িকার কণ্ঠের সহিত সারঙ্গীর ন্যায় এস্রাজেরও উত্তম মিল হয়। কণ্ঠসঙ্গীতের অনুকরণ করিতে অন্য কোনো যন্ত্রই এই দুইটির সমকক্ষ নয়।

খেয়াল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তবলারও সৃষ্টি হয়। পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর ধ্বনির সহিত খেয়ালের সামঞ্জস্য হইতেছে না দেখিয়া ওস্তাদেরা পাখোয়াজ দ্বিখণ্ডিত করিয়া তবলার সৃষ্টি করেন। সঙ্গে সঙ্গে তবলার উপযোগী বোলবানীও প্রস্তুত হইয়া গেল। ক্রমে বোলবানীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় নানারূপ কৌশলে তবলা বাজাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তাহার ফলে খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি গানের লজ্জৎ (মনোহারিত্ব) শতগুণে বর্ধিত হইয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় ঢোলককেও আধুনিক যন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মুসলমান রাজত্বের সময় কিংবা তৎপূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন।

যাহা হউক, পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে মুসলমানদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় সংগীত, বিশেষত আমরা যাহাকে হিন্দুস্থানী সংগীত বলি, তাহার প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। এইবার বর্তমান ওস্তাদদের অনেকের ভিতর যে একটা প্রধান দোষ স্পর্শ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াই বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। আজকাল ওস্তাদ সম্প্রদায় অধিকাংশই নিরক্ষর হওয়াতে তাঁহারা সংগীতের প্রাণবস্তুটা যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। গান আরম্ভ করিয়াই কেবল মুখভঙ্গী ও তানের পর তান, তানের পর তান। গানের পদ পূর্ব হইতেই জানা না থাকিলে, বৈঠকে শুনিয়া তাহার অর্থবোধ করিবার আশা দুরাশা। তাঁহারা যাহা উচ্চারণ করেন, তাহা অস্পষ্ট এবং ভ্রমপূর্ণ। সংগীতের মনোহারিত্বের দিকে ইহাদের লক্ষ্য কম, ওস্তাদি দেখাইবার বা তবলা বাদকের সহিত ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি যেন অধিক। কাজে কাজেই ওস্তাদি গান সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছে না, ফলে ওস্তাদেরা ক্রমে ক্রমে সাধারণ লোকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। গান চিত্তাকর্ষী করিতে হইলে, তাহার সহিত প্রাণের সংযোগ থাকা চাই—নইলে রস সঞ্চার হইবে কোথা হইতে? প্রাণের যোগ সাধন করিতে গেলে হয়তো বা রাগরাগিণীর প্রাচীনরূপ কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে দোষ কি? চিরকালই তো সেইরূপ হইয়া আসিয়াছে—প্রতিভার আবির্ভাবে চিরকালই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধন ছিন্ন হইয়া নতুন নতুন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে—প্রথমে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও পরিণামে নতুনেরই তো সর্বদা জয় হইয়াছে। বাংলার সঙ্গতে নতুনের ঢেউ লাগিয়াছে। কীর্তন, ভাটিয়ালী, টপ্পা, পাঁচালী প্রভৃতিও আছেই; তাহার উপর ব্রহ্ম-সংগীত যুক্ত হইয়াছে। আবার কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ নতুন নতুন সুর উদ্ভাবন করিয়া শিক্ষিত সমাজের মনোরঞ্জক অসংখ্য সরস গানের সৃষ্টি করিয়াছেন। এগুলি সাধারণত টপ্পা ঠুংরী ধরনে গীত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানী ওস্তাদেরা লোক-ধর্ম বিস্মৃত হইয়া এখনও ইহার উপর হাড়ে হাড়ে চটা। তাঁহাদের এই উদারতার অভাবে বাংলাদেশের আশানুরূপ সংগীতের উৎকর্ষ হইতেছে না। কিন্তু বর্তমানে সংগীত-ধারা যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে বোধ হয় যে ওস্তাদেরাও শীঘ্রই আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্র-সংগীত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। তখন তাঁহাদের নিপুণ কণ্ঠে সুকৌশলযুক্ত হইয়া রবীন্দ্র-সংগীতের চমৎকারিত্ব আরও বর্ধিত হইবে। এজন্য আশা হয় যে সেদিন খুব সন্নিকট যখন আমরা বাংলাদেশে এক গৌরবময়, তেজোময়, প্রাণময় অভিনব সংগীতের যুগ দেখিতে পাইব।

বাঙালি-মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা

আবুল হুসেন

বাঙালি-মুসলমানের জীবনের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি সে জীবন নিতান্ত হীন, নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্ত সংকীর্ণ। অর্থ বলুন, রুচি বলুন, আনন্দ বলুন, কিছুই সে জীবনে নাই। মানুষের জীবনধারণের জন্য যতটুকু না হলে চলে না সেইটুকু মাত্রই তার সম্বল। চতুর্দিক হতে তার সমস্ত সম্পদ সরে যাচ্ছে। সমাজের গৌরব যা দিয়ে বাড়াতে হয় তার কিছুই তার নাই বললে অত্যুক্তি হবে না। আজ বাঙালি-মুসলমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট কোনোটিতেই নাই। সম্পদ ও কল্যাণ যে পথে আসে সে পথ তার পক্ষে রুদ্ধ হয়ে আছে। কেবল ভিক্ষুক, কারানিগৃহীত, লাঞ্ছিত, পরপদদলিত, পরাশ্রয় ভিখারীর দল বেড়ে চলেছে। আজ প্রায় দেড় শত বৎসর হতে চললো ব্রিটিশ পতাকা এদেশে উড়ছে। সেই পতাকার তলে দাঁড়িয়ে হিন্দু আজ বিশ্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে বিশ্বসম্পদ আহরণ করতে শুরু করেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট প্রভৃতি সমস্ত বিভাগে হিন্দু আজ প্রতিপত্তি অর্জন করে স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্মের গৌরব বর্ধন করেছে। আর আমরা মুসলমান সমস্ত সম্পদের পথ রুদ্ধ করে অবনতির চরম সীমায় দ্রুত অগ্রসর হয়েছি। এই পার্থক্যের কারণ কি? কেন মুসলমানের এ দুর্গতি?

এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দিতে গেলে বলতে হবে আমাদের শিক্ষা নাই—আমরা জ্ঞানের সঙ্গে বহুদিন হতে বিরোধ করে বসেছি এবং দর্শন বিজ্ঞান আর্টকে আমাদের শিক্ষা কেন্দ্র হতে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি—এই ভয়ে, পাছে তাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম আমাদের এতই নাজুক! ব্রিটিশের সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত মন যখন এদেশে আসল এবং আমাদের আড়ষ্ট মনকে আঘাত করল তখন হিন্দু সে আঘাতে জেগে উঠে সে মনকে আলিঙ্গন দ্বারা বরণ করে নিল আর আমরা সে আঘাতে জাগতে তো চাই-ই নাই বরং চোখ রাঙিয়ে সে মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ইউরোপের জ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি—কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের সে নিদারুণ ভুলের কোনো সংশোধনেরই চেষ্টা করি নাই। বরং সে ভুলকে বর্তমানে আমরা আরো জোর করে আঁকড়ে ধরেছি। অথচ এই বলে আমরা সান্ত্বনা পাই যে, একদিন মুসলমানই ইউরোপকে তার দর্শন

বিজ্ঞান শিখিয়েছিল। কিন্তু এটুকু আমরা বুঝি না যে, আজ আমরা কড়ার ভিখারী— আমাদের মুখে সে গর্ব, সে আস্ফালন আদৌ শোভা পায় না।

আজ যদি আমরা সে গৌরবের অধিকারী হতে চাই এবং তার দাবি করতে চাই তাহলে আবার আমাদের মধ্যে ইবন খালদুনের মতো ঐতিহাসিক, আল-গাজ্জালী, ইবন রোশদ, ইবন সিনার মত দার্শনিক, হজরত ওমরের মতো চরিত্রবান রাষ্ট্রবিদ, গেবরের মতো বৈজ্ঞানিক, আবু হানিফার মতো তত্ত্বদর্শী প্রতিভার আবির্ভাব হওয়া চাই। তাহলে আমরা অতীতের সত্যকে প্রমাণ করতে পারব— নতুবা আমাদের মুখে সে অতীতের গৌরব-কাহিনী অন্যের নিকট অলীক উপকথা বলে প্রতীয়মান হবে। নিজকে খাড়া করে, নিজেকে সৃষ্টি করে অতীতকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরই অন্য নাম অতীতকে নতুন করে সৃষ্টি করা। এই নবসৃষ্টি সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে। হিন্দু আজ নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে নানা জ্ঞানে বিভূষিত হয়ে তার অতীতের প্রতি বর্তমান জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ আজ আমরা তাদেরও সমকক্ষ হতে পারছি না কেন? তার কারণ সুশিক্ষার অভাব। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি চিত্তবিকাশ ও মস্তিষ্ক-সম্প্রসারণের অন্তরায় হয়েছে। এই শিক্ষাপদ্ধতি কেমন করে যুগের প্রয়োজন মিটাতে পারে সেই হচ্ছে সমস্যার সমস্যা।

দেশের কল্যাণ-বৃদ্ধি যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় তাহলে মোটের উপর বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারও পক্ষে উপযোগী নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা বিভিন্ন এবং তার ফলও বিভিন্ন—এজন্য আমি এস্থলে শুধু মুসলমানের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধেই বলতে চাই। এই শিক্ষা পদ্ধতির ফলে মুসলমান সমাজ অনেকটা অন্যান্য উন্নতিমুখী জাতির উপর ক্রমশ বোঝাস্বরূপ (drag) হয়ে উঠছে—তা এখনই ভাল করে সমঝে দেখা প্রয়োজন। বর্তমান জগতের যে যে দেশে মুসলমান আছে সেই সেই দেশে তাদের অবস্থা নিতান্ত হীন। তাদের দুরবস্থা তত্তৎদেশের অমুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ সাহেবের পত্রে পড়লাম যে, ফ্রান্সের মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থা বাংলার মুসলমানদের চেয়ে খুব ভাল নয়। গত বৎসর অধ্যাপক লিমের মুখে শুনেছিলাম চীনের কোটি কোটি মুসলমান নিতান্ত দুঃস্থ নিরক্ষর ও নির্বোধ। এ সমস্ত কথায় আস্থা স্থাপন আমরা নাও করতে পারি, কিন্তু একথা ঠিক যে, বর্তমান জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কোনো দেশের কোনো মুসলমান কোনো উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কিছুই করেননি। বর্তমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট ঘেঁটে দেখুন মুসলমানের সৃষ্টি কিছু নাই বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য আমার জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। যদি কেউ আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন তবে আমি খুব বাধিত হব। কিন্তু যদি এই কথা সত্য হয় তাহলে কি খুব

লজ্জার কথা নয়? এই যে জ্ঞানের রাজ্যে মুসলমান একেবারে গরহাজির; এর কারণ কি? যে মুসলমান এক দিন নতুন নতুন তথা আবিষ্কার করে মানুষের শ্রী, কল্যাণ ও জ্ঞানকে বহুমুখী করে ছড়িয়ে দিয়েছিল তারই বংশধর আজ বিপুল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এটা ভাববার কথা।

মুসলমানের এই দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডা. Crozier তাঁর 'Progress and Civilisation' গ্রন্থে বলেছেন, 'Islam did open up an outlet for social aspect of human thought and aspiration but soon its secret structure began to reveal itself and was found to be incapable of expansion, devoid of sympathy and fatal to material and intellectual advancement. The Koran professed to be not only a spiritual revelation but a scientific treatise; to close not only the book of inspiration but the book of knowledge. It accordingly discouraged all attempts of man to discover the order of the world and thereby to improve his condition; while its central doctrine led him to repose indolently on the decrees of an inexorable fate. The consequence was under this belief human mind stagnated; as we see at this hour in those nations that are deeply imbued with its spirit, progress, civilisation and morality lie rotting together.' অর্থাৎ 'সত্যই ইসলাম মানবচিন্তার ও আকাঙ্ক্ষার সামাজিক দিকটা বিকশিত করবার জন্য একটা পথ উন্মুক্ত করেছিল; কিন্তু শীঘ্রই ইহার মূল ভিত্তি ও গঠন প্রকাশিত হয়ে পড়ল—ফলে দেখা গেল ইহার উপর সৌধনির্মাণের আর উপায় নাই—এবং ইহা বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোরান যে কেবল ধর্মগ্রন্থ বলে দাবি করে তাহা নহে, ইহা সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলে পরিচিত। কোরানের আবির্ভাবে শুধু যে খোদার বাণী রুদ্ধ হয়েছে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও রুদ্ধ হয়েছে। কোনো পুস্তক নাই বা হবে না যা কখনো কোরানের সমকক্ষ হবে, এই হল মুসলমানের ধর্মমত। কাজেই, এই বিশ্বাসের বশবর্তী-মুসলমান জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের সর্বচেষ্টা ত্যাগ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্বকীয় জীবনের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টাও ত্যাগ করেছে। তকদিরের উপর সমস্ত দোষ চেপেই সে নিষ্কৃতিলাভ করতে চাচ্ছে। এতে মুসলমানের মন ও কর্মস্রোত রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই দেখতে পাই যেখানে মুসলমান সেখানে উন্নতি, সভ্যতা ও নৈতিক-বল সমস্তই একধারে ধসে যাচ্ছে।' একথা হয়তো ষোল আনা ঠিক নয়; কিন্তু এর মধ্যে যে সত্যটুকুর ইঙ্গিত আছে সেটা আজ প্রণিধানযোগ্য।

এখন আমাদের ঘরের দিকে তাকাই। আজ আমরাও যে উন্নতিমুখী হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল শুভ চেষ্টায় আমাদের দুর্বুদ্ধি ও দুর্গতির দ্বারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছি তা বোধ

হয় প্রমাণ করতে হবে না। তারই কারণ নির্ধারণ করা এ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আজ আমাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করতে হবে যে ব্রিটিশ এদেশে পুরাপুরি আধিপত্য বিস্তার করেই দেশবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমত সে ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলমানের আইন কানুন জানতে হলে তাদের পরিচিত ভাষা ও গ্রন্থের চর্চা করা প্রয়োজন। এজন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ খৃস্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা এবং জোনাথান ডানকান ১৭৯১ খৃস্টাব্দে বেনারেসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা মাদ্রাসা সর্বপ্রথম ব্রিটিশ-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র। সরকার এই উভয় শিক্ষাকেন্দ্রে প্রভূত অর্থব্যয় করতেন। ১৭৮৪ অব্দে বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার দ্রুত চলতে থাকে। স্যার উইলিয়াম জোনস প্রমুখ পণ্ডিতগণের গবেষণায় আরবি ও সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা বহুলপরিমাণে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ১৮১৩ অব্দে লর্ড মিন্টো দেশীয় বিদ্যার সঙ্গে ইউরোপীয় জ্ঞান-চর্চার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ১৮২৩ অব্দ পর্যন্ত মিন্টোর প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই। ১৮২৩ অব্দে উক্ত টাকা আরবি ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত করবার জন্য ব্যয় করা হয়।

ইতোমধ্যে দুইটি কারণের আবির্ভাবে সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়। প্রথম কারণ খৃস্টান পাদ্রিদের চেষ্টা এবং দ্বিতীয় কারণ ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য কলিকাতার তৎকালীন চিন্তাশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দুনেতৃবর্গের স্বতঃপ্রণোদিত দাবি ও আন্দোলন। স্কটিশ চার্চ-কলেজ ও মাদ্রাসা খ্রীস্টিয়ান কলেজ পাদ্রিদের কীর্তি; আর হিন্দু কলেজ হিন্দুনেতৃবর্গের সেই আন্দোলনের ফল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করবার প্রয়োজন এখানে নাই; কিন্তু যে মহাপুরুষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ছিলেন তাঁর দুই-একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম 'ইউরোপীয় শিক্ষা'র জন্য ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছিলেন। ইংরাজি শিক্ষা আরব্ধ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইংরাজিতে দক্ষ হয়েছিলেন; শুধু ভাষায় নয়, ইংরাজি দর্শন, ইতিহাস ও কালচারে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। তখনও দেশে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রামমোহন শিক্ষা-ক্ষেত্রে নতুন প্রণালী অবলম্বন করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই নব-পদ্ধতি দ্বারা তিনি দেশবাসীর গতানুগতিক স্থিতিশীল মনের উপর পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং অতীতের কুসংস্কার ও ধারণা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত উজ্জ্বল হয়ে দেশবাসীকে গলা ছেড়ে এই নব-শিক্ষায় আহ্বান করেছিলেন। কলকাতায় যখন প্রথম সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তখন তিনি তাঁর প্রতিবাদ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তে আধুনিক আর্ট কলেজের আদর্শে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ জেমস বলেন, 'To him must

be ascribed the introduction of liberal education in Bengal' অর্থাৎ বাংলার আধুনিক শিক্ষার জন্য সমুদয় বাহাদুরি রামমোহনের প্রাপ্য ! তিনি এই সম্পর্কে বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লিখেন তার মধ্যে তিনি সংস্কৃত-শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক কথা প্রকাশ করেন। এস্থলে তিনি বলেন, 'This Seminary (Proposed Sanskrit School) similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society.' অন্য এক স্থলে তিনি বলেন, 'It had been intended to keep the British nation in ignorance of real nowledge. The Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the Schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit System of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object cf the Government: it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus.' এই পত্রে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ফারসি, আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষায় যে এদেশের কোনো কল্যাণ সাধিত হবে না এবং ইংরাজে শিক্ষা ব্যতীত যে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হবে না তাহা রামমোহন সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এই দূরদর্শিতার ফলে এদেশের যুগসঞ্চিত দৃঢ়নিবদ্ধ ধারণাকে উচ্ছেদ করতে তিনি যে বিপুল সহায় হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। বাংলা তথা ভারতের সৌভাগ্য যে সে যুগে রামমোহনের মতো মহাপুরুষ জন্মেছিলেন এবং তার সঙ্গে মহাচেতা ডেভিড হেয়ার ও সার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট সংযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু দুঃখের সহিত লিখতে হবে যে সে যুগে এমনকি আজ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে রামমোহনের মতো পাশ্চাত্যজ্ঞানদীপ্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই। রামমোহন যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেন তখন মুসলমান রাজ্যহীন হয়ে ক্ষোভে দুঃখে ইংরাজকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে থাকে সুতরাং ইংরাজি শিক্ষার কথা তার মুখে উঠতেই পারে না। মানুষ সাধারণত প্রাচীনপন্থী স্থিতিশীল। শিক্ষা-

ক্ষেত্রে একথাটি আরও সত্য। ওয়ারেন হেস্টিংস এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমান সমাজকে স্থির করবার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত করেন। দূরদর্শী হিন্দু নেতৃবর্গ কালবিলম্ব না করে এবং মুসলমানের মতো আক্ষেপে দিন না কাটিয়ে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করবার জন্য হিন্দু কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দু কলেজ কালক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়। মুসলমান সমাজ কলকাতা মাদ্রাসা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল। কলকাতা মাদ্রাসার পর চট্টগ্রাম ঢাকা হুগলী মাদ্রাসা ব্যতীত সরকার ১৯২৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি-মুসলমানদের জন্য অন্য কোনো শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই কিংবা ১৯২৬ সালের প্রতিষ্ঠিত সাদাত কলেজ ব্যতীত মুসলমান সমাজ স্বাধীনভাবেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনো শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে নাই। তার কারণ মুসলমান সমাজে তার জন্য তীব্র কোনো আন্দোলন হয় নাই। হিন্দু নেতৃবর্গ যাহা ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করতে সরকারকে বাধ্য করেছিলেন তাহাই মুসলমান সমাজ পেয়েছে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মাত্র ১৯২৬ সালে। এই হিসাবে ধরলে বলতে হবে মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের একশত নয় বৎসর পশ্চাতে। এই একশ নয় বৎসরের জের যদি পূরণ করতে হয় তাহলে যে আজ মুসলমানকে কি করা উচিত তাহাও মুসলমান নেতৃবর্গ অবগত নন। যদি ১৮১৭ সালের হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের সহিত বর্তমান ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষকদের তুলনা করি তাহলে বুঝতে পারা যায় মুসলমান সমাজে প্রকৃত শিক্ষার জন্য কোনো ক্ষুধা নাই কিংবা তার জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষাও নাই। ডিরোজিওর মতো শিক্ষক হিন্দু সমাজের শিক্ষাকে কতখানি উন্নত করেছেন তা ভাবলে সত্যই ইসলামিয়া কলেজের ব্যবস্থা দেখে নিতান্ত নিরাশ হতে হয়। বর্তমান মুসলমান সমাজ কি ডিরোজিওর মতো লোককে আর এখন পেতে পারেন? কখনও নয়। এমন অবস্থায় ইসলামিয়া কলেজের যে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাহা আরও অধিকতর উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে দেওয়া উচিত ছিল। এইরূপ অল্প উপকরণ দিয়ে এই কলেজ কেমন করে মুসলমানের জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করতে সমর্থ হবে তা ভেবে পাই না। যে সমস্যার সমাধানকল্পে হিন্দুসমাজ হিন্দু কলেজ পেয়েছিল আজ একশত বৎসর পরে আমাদের সেই সমস্যাই বিষম হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু ঐ সমস্যা ঠিক ১৮১৭ সালের ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করলে প্রকৃত সমাধান পাওয়া যাবে না। আজ আমাদের নতুন করে সে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

একশত বৎসর পূর্বে হিন্দু সমাজ সংস্কৃত শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্যজ্ঞানকে বরণ করেছিল—আর একশত বৎসর পরে আমরা সেই আরবি শিক্ষাকেই পুনঃপ্রবর্তিত করেছি নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহে। **প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না সে বুদ্ধি আজও আমাদের হয় নাই।** আজ তাই আমরা

প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরাজি জুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা দিচ্ছি।

সেনসাস ঘেঁটে দেখি একটি হিন্দু ছেলে ৮ বৎসর বয়সে যা আয়ত্ত করে ঠিক তাই আয়ত্ত করে একটি মুসলমান ছাত্র ১১ বৎসর বয়সে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত উচ্চশিক্ষায় মুসলমান হিন্দুর কাছে হটে যেতে বাধ্য। এর কারণ মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার জন্য উৎকট উদ্বিগ্নতা। শিশু কথা না বলতে শিখতেই দুর্বোধ্য আরবি শব্দের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য হয়। হয় পিতা না হয় শিক্ষক বেত্রহস্তে সেই আরবি শব্দ কণ্ঠস্থ করাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। প্রতিদিন প্রাতে যখন শিশু প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যের সহিত একটু পরিচয় করবে ঠিক সেই সময় তাকে কোরান বগলে কি কাঁধে করে মসজিদে যেতে হয়। সেখানে উস্তাদজীর সেই নিদারুণ বেত্রাঘাতের সহিত তার জীবনযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই নিষ্ঠুরতার দৌরাত্ম্যের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের ধর্মশিক্ষা আরম্ভ হয়। অতি কষ্টে আরবি শব্দ কণ্ঠস্থ করতে করতে তার শিক্ষার প্রতি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুকুমার-মতি শিশু অনেকেই এই নিষ্পেষণের চাপে একেবারে ভেঙে পড়ে। একদিকে তাদের সম্মুখে আরবি ভাষা অন্যদিকে উস্তাদজীর তাম্বি ও বেত্রাঘাত—এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে মুসলমান শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। এই জবরদস্তির ফল যে বিষময় হয়েছে সমাজপতিরা আজও তা খতিয়ে দেখছেন না—কোরান খতম করে অনেকেই শিক্ষার হাত হতে চির বিদায় গ্রহণ করে এবং উত্তরকালে তারাই নানাবিধ অধর্মের অনুষ্ঠান করে। কোনো দার্শনিক বলেছেন, morality enforced is immorality in fact. জবরদস্তিতে ধর্মশিক্ষা দিলে তার ফল বিপরীত ফলে। মুসলমান সমাজের মধ্যে আজ যারা নানা কু-আচারে লিপ্ত তাদের বাল্য জীবনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে তাদের অনেককেই উস্তাদজীর একমাত্র সম্বল সেই বেত্রাঘাত খেতে হয়েছে এবং সেই বেত্রাঘাতই তাদিগকে বিপথে চালিয়েছে। শিক্ষার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা যে এহেন কোরান শিক্ষার আশু-ফল তা প্রমাণ করার জন্য বেশি কষ্ট পেতে হয় না। যে সমস্ত ছাত্র মসজিদে কোরান পড়েছে তাদের কয়জন শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করেছে? আর যারা সৌভাগ্য-ক্রমে কোরান শিক্ষার পর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তারা সাধারণত পরিণত-বয়স্ক—কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের শক্তি দুর্বোধ্য ভাষা কণ্ঠস্থ করতে করতে যথেষ্ট পরিমাণে কাহিল হয়ে পড়ে এবং তাদের মানসিক স্ফূর্তি একেবারেই থাকে না। এমন অবস্থায় মুসলমান ছাত্র অনেকটা আধমরা হয়েই যেন শিক্ষালাভ করতে যায়। তার নিকট হতে বেশি আশা করাই বাতুলতা এজন্য আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ-বশত মুসলমান সমাজের সারথিগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করলেন। সে ফতোয়ার বিষময়

ফল আজও সমাজের শিরায় শিরায় বর্তমান। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান শিক্ষার্থী মাদ্রাসাতেই ভর্তি হয়েছে কিন্তু ইংরাজি বিদ্যালয়ে খুব কম আকৃষ্ট হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাই বাঙালি-মুসলমানদের জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ হয়ে মৌলবী সাহেবগণ গ্রামে গ্রামে ধর্মশিক্ষা দিয়ে স্ব স্ব উদরান্নের সংস্থান করেছেন। তাঁদের সেই ধর্ম-ব্যবসায়কে উঞ্ছবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। তাঁরা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে নিরক্ষর গোমরাহ নির্বোধ মুসলমানকে শিষ্যত্বে বরণ করে তাদের মূর্খতাকে ক্রমশ পাকিয়ে তুলেছেন। যে সমস্ত উপাখ্যান, উপকথা, আউড়ে তাঁরা ইসলামের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইসলামের প্রবর্তক মহাপুরুষ মুহম্মদকে নানা কুসংস্কারের আবর্জনায় আবৃত করে তাদের সম্মুখে ধরেছেন এবং তদ্দারা শ্রমক্লান্ত পানাহার-অন্বেষণে সদাব্যস্ত পল্লীবাসী-মুসলমানদের ধারণা ও বুদ্ধিকে যেরূপে বিকৃত করেছেন তাতে আজ তারা এক অপরূপ জীবে পরিণত হয়েছে। তাদের জীবনে শ্রী নাই—তারা এ দুনিয়ার সৌন্দর্য সম্পদ সুখ বৃদ্ধির জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করতে শিখে নাই। কালক্রমে শিক্ষা ও সম্পদ অর্জনের উপযোগী জ্ঞান অভাবে যখন গ্রাম্য মুসলমানের সংগতি কমতে শুরু করল ও সঙ্গে সঙ্গে মৌলবী সাহেবগণের উঞ্ছবৃত্তিও অর্থলাভের প্রতিকূল হতে লাগল তখনই তাঁরা অর্থকরী অর্থাৎ 'চাকরি করা' বিদ্যা ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তখন ইংরাজি শিক্ষা জায়েজ করবার জন্য নানা হাদিস খুঁজে বের করা হল। তাঁরা গ্রামে গ্রামে দুই একটি ছেলেকে ইংরাজি বিদ্যালয়ে দিতে থাকলেন এবং তাঁদের আদর্শ দেখে নিরক্ষর পল্লীবাসী মুসলমানও ইংরাজি বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরাজি বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র ক্রমাগত বর্ধিত হয়েছিল। ১৮৭৪ অব্দে ক্রফট সাহেব তাঁর রিপোর্টে লেখেন, 'অবস্থাপন্ন মুসলমান ছাত্র ইংরাজি বিদ্যালয়ে দ্রুত প্রবেশ করেছে।' দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দেখান, '১৮৭২ অব্দে ঢাকা বিভাগে মাত্র ৮৫৬ জন মুসলমান ছাত্র ছিল এবং ১৮৭৪ অব্দে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ১৩২৬১ জন ছাত্র হয়।' ভূদেববাবুও বলেন, 'দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি পাবনা প্রভৃতি জেলার ভদ্র মুসলমানগণ কোরান শিক্ষা ব্যতীত আরবি বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে নাপসন্দ করেন এবং ক্রমশ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলি তাঁদের আদরণীয় হয়ে উঠছে।'

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরবি শিক্ষার প্রতি মুসলমান জনসাধারণের (masses) বিশ্বাস ও ভক্তি এবং ইংরাজি শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ অক্ষুণ্ন হয়ে রইল। বিশেষত মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ মৌলবী সাহেবগণ তাঁদের পেশা বহাল রাখবার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক ঐ বিশ্বাস (credulity) অটল করে রাখতে সহায় হলেন। পক্ষান্তরে ইংরাজি শিক্ষিত মুসলমান আরবি শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। এইরূপে মুসলমান সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে

পড়লেন। উভয় দলের সঙ্গে কোনো রফা বা বনিবনাও হল না; বরং একে অপরের নিন্দা অপবাদ দিয়ে সমাজের জনসাধারণকে বিব্রত করতে লাগলেন। জনসাধারণ মৌলবী সাহেবদেরই প্রভাবে যুগসঞ্চিত কুসংস্কার-পীড়িত হয়ে ইংরাজি শিক্ষিতগণকে ঘৃণা করতে লাগল। তারা তাঁদের প্রচারিত ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকল। প্রকৃত শিক্ষার কথা তাদের কানে কে পৌঁছায়? ইংরাজি শিক্ষিতগণ সরকারের চাকরিতেই জীবন কাটাতে লাগলেন। ক্রমে মুসলমান সমাজে চিন্তাশীল লোকের আবির্ভাব হল না! ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা আরবি শিক্ষাকে আধুনিক দর্শন বিজ্ঞানের প্রভাবে নতুন করে প্রবর্তিত করবার কথা মুসলমান সমাজের মনে জাগল না। আরবি শিক্ষা যে আধুনিক জগতের জীবন-সমস্যা সমাধানের অনুকূল নয় সে কথাও মুসলমান আদৌ বুঝল না। মধ্যযুগের প্রবর্তিত কালাম, মনতক, বালাগাৎ শিক্ষার জন্য শক্তি ও অর্থক্ষয় যে বর্তমান যুগের পক্ষে অনেকখানি নিরর্থক সে কথা গলা ছেড়ে বলবার মতো শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব আজও মুসলমান সমাজে হয় নাই। ইংরাজি ও আরবির যে সমন্বয়ে বর্তমান যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে তেমন সমন্বয়ের চেষ্টা আজও হয় নাই। ফলে, ইংরাজি আরবি দ্বন্দ্ব এখনও প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকায় সমাজ-মনের ঋজুতা ও একাগ্রতা সম্ভবপর হচ্ছে না। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব চুকিয়ে ফেলবার জন্য কিছু চেষ্টা যে হয় নাই তা বলা যায় না। দুঃখের বিষয় সে চেষ্টায় এমন কোনো শক্তিমান পুরুষের হাত পড়েনি—যাঁর জ্ঞান ও রুচি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ-সাধন করতে পারে এবং মুসলমানের মুক্তির জন্য যাঁর বুদ্ধি ও অনুভূতি সম্পূর্ণ সজাগ। যে চেষ্টা হয়েছে তার ফলে ১৯১২ সালে পুরাতন আরবি মাদ্রাসাগুলির পরিবর্তে নতুন মাদ্রাসায় ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবর্তন কিছুই হয় নাই—পাঠ্যতালিকায় ইংরাজি ও বাংলা সংযুক্ত হয়েছে, কেননা তা না হলে চাকরি পাওয়া দুষ্কর। সরকারের ঘরে চাকরি জুটাতে হলে ইংরাজি জানা দরকার—কিন্তু জনসাধারণ শুধু ইংরাজি শিখতে নারাজ অথচ চাকরির জন্য উদ্বিগ্ন। এমন অবস্থায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করে কিংবা আধুনিক জগতের দাবীর দিকে লক্ষ্য না করেই নব মাদ্রাসা-শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত করা হল। তাতে পুরাতন মাদ্রাসার সমস্তই থাকল কেবল এক ফারসির পরিবর্তে ইংরাজি ভাষা ও উর্দুর পরিবর্তে বাংলা শিখবার ব্যবস্থা করা হল। এই পদ্ধতি মুসলমান সমাজের যে মনঃপূত হয়েছে তা সরকারের কাগজপত্র হতে প্রমাণ করা যায়। মুসলমান জনসাধারণ এখন ছাত্রকে মধ্যইংরাজি বা উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে পাঠায় জুনিয়ার ও সিনিয়ার মাদ্রাসায়। তাদের ধারণা এক গুলিতে দুই বাঘ পড়বে—দীনও হবে দুনিয়াও হবে। ছেলেরা ইংরাজি শিখে আর কাফের হবে না তাদের লুঙ্গি, টুপি, কুর্তা সমস্তই ঠিক থাকবে—মনের মধ্যে কোনো বদখেয়াল ঢুকবে না মাতাপিতার আর শঙ্কার কারণ থাকবে না। এমন চমৎকার শিক্ষাপদ্ধতি

আর কোথা পাওয়া যাবে? এইরূপে জনসাধারণের অন্ধ-বিশ্বাসকে (credulity) এমনি করেই ব্যবহার করা হয়েছে যে M.E. ও H. E. School হতে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। শিক্ষবিভাগের রিপোর্টে দেখি :

	১৯২৩-২৪	**১৯২৪-২৫**	**১৯২৫-২৬**
H.E. School—	শতকরা ১৫.২%	শতকরা ১৪.৪%	শতকরা ১৩.২%
M.E.School—	শতকরা ১৯.৪%	শতকরা ১৮.৫%	শতকরা ১৬.৪%

কারণ মক্তব ও নবপ্রবর্তিত মাদ্রাসা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং মুসলমান অভিভাবক মাদ্রাসাতেই ছাত্র পাঠাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন।

	১৯২৩-২৪	**১৯২৪-২৫**
মাদ্রাসা	৩৪৬	৩৭৪
ছাত্র	২৬,১৫৬	৩১,৬১৩
সরকারি ব্যয়	৩,৩৯,২৯৬	৬,১৯,৭৭৬

শতকরা ৪২ জন মুসলমান ছাত্র মক্তবে পড়ে।

নব-মাদ্রাসার শিক্ষা যে আদরণীয় হচ্ছে তার কারণ—ইহাতে আরবি ও ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভাল করে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, এই শিক্ষায় মুসলমান সমাজের জীবন শ্রীসম্পন্ন হবে না—তার মন জাগবে না—রুচি ফিরবে না—বুদ্ধি বিকশিত হবে না—জগতের জ্ঞান গ্রহণ করতে তার শক্তিও বাড়বে না। শুধু ভাষা শিখলেই যে জ্ঞান বর্ধিত হয়, বুদ্ধি বিকশিত হয়, মন সম্প্রসারিত হয়, কর্মশক্তি বাড়ে, এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই বোধ হয় প্রবর্তকগণ নব-মাদ্রাসা-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্ববিদগণ একবাক্যে বলবেন, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল। মন বিকশিত ও বুদ্ধি সজাগ করতে যে সমস্ত বিষয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ছাত্রের সামর্থ্যানুসারে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন সেগুলি প্রকৃষ্ট উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে থাকে না সে পদ্ধতি জীবন-সমস্যা সমাধান করতে পারে না। যে-শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নাই—সে শিক্ষা পঙ্গু, যেমন যে-জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নাই সে জীবন অন্ধ। যে-শিক্ষা হৃদয় প্রশস্ত করে না—বুদ্ধিকে জাগ্রত করে না—চিত্তকে মার্জিত করে না—সংস্কার হতে মুক্তি দেয় না, সে-শিক্ষা জাতির প্রাণ বিনাশ করে। সংকীর্ণ মন নিয়ে কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বেশ বলেছেন, 'মনোজগতে যে জাতি একঘরে সে জাতি পতিত।'

মাদ্রাসা শিক্ষার পরিণাম চিন্তা করলে আমার ঐ কথাটাই মনে পড়ে। আজ নবমাদ্রাসায় বর্তমান জগতের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস বা আর্ট কিছুরই স্থান নাই অথচ যে সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে এই সমস্ত বিষয়ের স্থান করা হযেছে সেখানে মুসলমান যাচ্ছে না। আর কিছুকাল পরে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা সাধারণ কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতান্ত কম হয়ে যাবে। তখন এই নব-মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণও তাদের সংকীর্ণ মন, স্বল্প-দৃষ্টি আড়ষ্ট-বুদ্ধি নিয়ে মুসলমান সমাজকে জগতের অন্যান্য শক্তিমান, জ্ঞানদীপ্ত জাতির সম্মুখে নিতান্ত হেয় বলে প্রতিপন্ন করবে। নব-মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষা ও জীবনের সঙ্গে যোগসাধন করতে পারে নাই। এরূপ শিক্ষা খাপ না খায়, মনকে মুক্ত করতে না পারে, সে-শিক্ষা জীবনকে সরস সুন্দর করতে পারে না। **যে-শিক্ষা মন মুক্ত ও শক্তিশালী করতে পারে না সে-শিক্ষা** শিক্ষাই নয়।

এস্থলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন। কোনো দেশে কোনো কালে কোনো এক ব্যক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য একান্ত করে চিরকালের জন্য নির্ধারিত করতে পারে না। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও পরিবর্তিত হয়—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধানের উপায়ও পরিবর্তিত হয়। মানুষের জীবন বিবিধ উপকরণ দ্বারা পুষ্ট হয়। সেই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করবার শক্তি অর্জন এবং মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক তাতে মানুষ আপনার শক্তি প্রখর করে—জগতের রহস্য অবগত হয়—সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বিশ্বস্রষ্টার অপরূপ শক্তিতে আস্থাবান হয়ে তাঁর দিকে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়। ব্যক্তি হিসাবে মানুষকে জানতে হবে—কি তার বর্তমান—কি তার অতীত এবং ভবিষ্যতে কি তাকে হতে হবে—সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয় ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করতে হবে। বুদ্ধি প্রখর হলে তার দৃষ্টি-শক্তি বাড়ে এবং হৃদয় সম্প্রসারিত হলে প্রেম ও অনুভূতি জাগে। **যে-শিক্ষা হৃদয় ও মনের চর্চায় বিঘ্ন ঘটায় সে-শিক্ষা জাতির পক্ষে মারাত্মক**। হৃদয়, মন, ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ-সাধনের সঙ্গে ধর্মস্পৃহাকেও (Divine spirit) জাগ্রত করতে হবে। তবেই মানুষের সমুদয় শক্তি প্রখর হবে। এইরূপে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে যে-শিক্ষা দ্বারা সে-শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক উন্নতি ও ঐশীগুণ-সাধন। এজন্য হজরত বলেছেন,—'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ' (খোদার গুণাবলী লাভ করতে চেষ্টা করে)। মানুষের চরম বিকাশের প্রথম পথ হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধি (emancipation of intellect)—যাতে জগতের প্রয়োজন অনুসারে যুগধর্মের ইঙ্গিত অনুসারে স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করা সহজ হয়। **অতীতের কোনো যুগবিশেষের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যারা বর্তমানকে অস্বীকার করে তাদের বুদ্ধি মুক্ত নয়।** সুতরাং তাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ। বর্তমান জগতে যে সমস্ত জাতি জগতের জ্ঞান ও সুখ বৃদ্ধি করতে প্রাণপণ করছে তারাও একদিন অতীতের কোনো ধর্ম-গুরুর বাণীকে চিরন্তন সত্য মনে করে সম্মোহিত হয়েছিল—জগত আপন মনে নানা

আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল—কিন্তু তাদের কোনো খেয়ালই ছিল না—হঠাৎ একদিন কোনো বিদ্রোহীর চরম আঘাতে জেগে উঠে দেখে—যে-সত্য তারা আঁকড়ে বসে আছে সে-সত্য কোনো সমস্যাই তাদের সমাধান করতে পারছে না। তখন থেকে তারা সে সত্যকে পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যস্ত হয়েছে। তা করতে গিয়ে তারা অনেক প্রাচীন সত্যকে ত্যাগও করেছে। তার কারণ তাদের বুদ্ধি মুক্ত হয়েছে। বুদ্ধি মুক্ত হলে জগত ও জীবনই যে পরম সত্য তা বুঝতে শুরু হয় না—তখন মানুষ আপনার সম্পদ শ্রী সমস্ত একে একে আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়। তখনই সে সমাজের সমস্ত অভাব পুরণ করতে ও তার দাবি রক্ষা করতে পারে। সমাজ স্থির হয়ে থাকে না—জগত যেমন চলে সমাজও তেমনি চলে। আপনা হতেই সমাজ মন পরিবর্তন লাভ করে। মানুষ শিক্ষা দ্বারা বিকশিত-শক্তি সমাজের উন্নতিসাধনে ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন-সাধনে ব্যবহার করে। পরিবর্তনশীল সমাজের অভাব ও দাবি অনুসারে মানুষের শক্তি প্রবল হওয়া আবশ্যক—তজ্জন্য শিক্ষা-পদ্ধতিও ক্রমশ সেই শক্তিকে প্রখর করবার জন্য পরিবর্তিত পরিবর্ধিত হওয়া আবশ্যক। এজন্য শিক্ষা ও জীবন একসূত্রে গাঁথা দরকার। জীবনের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। **যুগ বিশেষের মন্ত্র ও শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করাই শিক্ষার চরম পদ্ধতি বলে গণ্য হলে সে শিক্ষা জীবনকে সংযত সুন্দর করতে পারে না**। সেরূপ শিক্ষার অধীনে যাঁরা থাকেন বাইরে এসে দেখেন জীবনের সঙ্গে তাঁরা একেবারে অপরিচিত। ফলে, দুঃখ-দৈন্যই তাঁদের ভাগ্যে ঘটে। জীবন যা চায় সে শিক্ষা তাকে তা দেয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা অনেকটা এই দোষে দুষ্ট। বিশেষত মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতি আর জীবনধারা একেবারে পৃথক।

যুগধর্মকে অস্বীকার করে যে জাতি শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করে সে জাতি হতভাগ্য। মন ও হৃদয় সম্প্রসারণের জন্য মানুষের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আছে। সেই বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে সমাজের সাধু, বিজ্ঞ, শক্তিমান নরনারীর সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন। সেই আকাঙ্ক্ষা একবার জাগলে অন্ধকারের মধ্যে আলোকস্তম্ভের মতো উহা মানুষকে নব নব শুভ চেষ্টায় আহ্বান করে মনুষ্য-বিকাশ ও মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য। সে-আকাঙ্ক্ষা জাগাতে হলে সর্বপ্রথম চাই উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু নব-মাদ্রাসা-শিক্ষা-পদ্ধতি পাঠ্যতালিকাটি বিশ্লেষণ করলে তা বেশ বুঝা যায়। বিষয়গুলির সমাবেশ কোনো শিক্ষানীতি দ্বারা সমর্থন করা যায় না। সুদূর অতীতের চিন্তাধারাপ্রসূত সূত্র-সমূহ মুখস্ত করাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাতে চিন্তার স্বাধীনতা স্ফূর্তি লাভ করে না, কারণ সে সূত্রকে অকাট্য সত্য বলে শিক্ষার্থীকে মেনে নিতেই হয়। সে তার পারিপার্শ্বিক জীবন হতে লব্ধ-জ্ঞান দ্বারা সে সূত্রকে সমালোচনা করতে পারে না। সে শিক্ষা তাকে দেওয়া হয় না। এই যে শুধু 'মেনেই

নেওয়া' এর চেয়ে শিক্ষার বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে? এতে চিত্তবৃত্তি বিকশিত হয় না, বুদ্ধি স্তম্ভিত বিড়ম্বিত হয়ে ক্রমশ জড়তায় আচ্ছন্ন হতে থাকে। ধারণ-শক্তি এতে রুদ্ধ হয়ে যায়। চিন্তাস্রোতে ভাটা পড়ে। মাদ্রাসা-শিক্ষা মস্তিষ্কের খাদ্য জোগায় না। গণিত,—যাতে বুদ্ধি বিকশিত হয়—তার মাত্র যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া হয়—তার মধ্যে আবার বীজগণিত বা Algebra গরহাজির। বর্তমান Logic, বর্তমান ইতিহাস ভূগোল—যাতে মনের স্ফূর্তি হয়—দৃষ্টি খোলে—হৃদয়-বৃত্তি বিকশিত হয়—তার স্থান মাদ্রাসায় নাই। মাদ্রাসার ইতিহাসের পাঠ্য-সীমা দেখলে মনে হয় ইসলামের ইতিহাস হজরত আলীর সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদুনের পরের ইতিহাস পাঠ্যোপযোগীই নয় এদের নিকট। জগতের সঙ্গে পরিচয় করতে হলে যে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন তার কিছুরই ব্যবস্থা হয় নাই। সাহিত্য ও কাব্য যাতে জীবনের রুচি ও সৌন্দর্যগুণ বর্ধিত হয় তারও স্থান অতি সামান্য। এই শিক্ষায় ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মজীবন দুটি পৃথক করতে শেখায় না। এতে এই ধারণা জন্মায় যে ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলে ধর্মজীবন লাভ বটে। ফলে, অনেক সময় দেখা যায় অনেক মৌলবী সাহেব ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েও নিতান্ত গর্হিত জীবন যাপন করেন। তাঁরা কিছুতেই বুঝেন না ধর্মজীবন যাপন করতে হলে শুধু ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলেই চলে না। সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাপনের সমুদয় কায়দাকানুনও শিখতে হয়, হৃদয় ও মনোবৃত্তিগুলির চর্চা করতে হয়। ধর্মশাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করে শিকেয় তুলে রাখলে চলে না। তাকে অন্যান্য পুস্তকের সংসর্গে এনে আয়ত্ত করতে হয়। বুঝতে হয় জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় এবং তজ্জন্য আবশ্যক হলে কিছু কিছু ত্যাগও করতে হয়—কারণ জীবন আমাদের কাছে শাস্ত্রের চেয়ে সত্য। 'জীবন নানা শাস্ত্রকে সৃষ্টি করে'—আজ আমাদের এই কথা ভাল করে বুঝে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। নতুবা এ জীবন সুন্দর তো হবেই না বরং ধর্মজীবনও আমাদের গর্হিত হতে থাকবে।

কেহ কেহ বলেন, মাদ্রাসায় ছেলেরা অল্প খরচে লেখাপড়া শিখতে পায়। কথাটি ঠিক—কিন্তু একথা হয়তো আপনারা জানেন—'সস্তার তিন অবস্থা'। সস্তা জিনিষ সব সময়ই আক্রা। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর অনেকেই জায়গীরে থেকে পড়েন। এই জায়গীরে যাঁরা থাকেন তাঁদের জীবন অতি কঠোর। কিন্তু জায়গীরে থেকে শিক্ষা লাভ করে তাঁরা যতটুকু লাভ করেন আমার মনে হয় তাঁরা তার দশগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। জায়গীরে থেকে গৃহ প্রভুর হুকুম তামিল ও সুনজর বজায় করতে করতে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা যে দিন দিন কত হীন হয়ে পড়ে তা বর্ণনা করা যায় না—পরিণামে তাঁর চরিত্র যে দুর্বল হয়, তেজ ও সাহস যে ক্ষীণ হয়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় তার জীবন কত ক্ষীণ, আকাঙ্ক্ষা কত দুর্বল—সাহস কত কম—মুখ কত বিশীর্ণ! সমস্ত

চেহারাতে যেন তার দৈন্য ফুটে পড়ছে; জীবনের স্বাদ যেন তাঁর ফুরিয়ে গেছে—কোনো বস্তুতেই যেন তাঁর আর স্পৃহা নাই! এরূপ জীবন্মৃত হয়ে এই ঝঞ্ঝাপীড়িত সংসারে তাঁর পথ কেটে বের করতে হয়। কিন্তু সে-পথ কাটতে যে-শক্তির দরকার সে-শক্তি অর্জন করার শিক্ষা মাদ্রাসা হতে পাওয়া যায় না।

তারপর মাদ্রাসায় যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাও শিক্ষার্থীর মনোবিকাশে অনুকুল নয়। শৈশবেই মাতৃভাষার সহিত পরিচয় ঘটবার আগেই আরবি প্রাথমিক ও তার উর্দু তর্জমা কণ্ঠস্থ করতে করতে শিশুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ৮/১০ বৎসর বয়সেই একটি বালককে তিনটি ভাষা পড়তে হয়, আরবি, উর্দু ও বাংলা। তার দুই বৎসর পরই ইংরাজি তার উপর চাপে। ১২ বৎসর বয়সে তাকে চারটি ভাষার সহিত যুঝতে যুঝতে জুনিয়ার মাদ্রাসা সীমা অতিক্রম হয়। তার পূর্বেই এইরূপ নিষ্ঠুর পাঠ্যপদ্ধতির চাপে অনেককে শিক্ষাক্ষেত্র হতে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হয়। এই ব্যবস্থার বিহিত প্রতিকার সত্বর করা প্রয়োজন। নতুবা আর কিছু কাল পরে দেখব আমরা ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগে চিরদিনের তরে গরহাজির হয়েছি। হিন্দু-সম্প্রদায় উত্তরোত্তর নানা জ্ঞান আহরণ করে শক্তিমান হবে আর আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে লুকিয়ে থাকব। জগতের সঙ্গে আমরা একেবারে যোগ হারিয়ে ফেলব। শুধু ইংরাজি ভাষা আমাদের রক্ষা করবে না। ইংরাজি ভাষার সঙ্গে ইংরাজি দর্শন বিজ্ঞান কাব্য প্রভৃতি গ্রহণ করতে হবে—হজম করতে হবে—তার উপর আমাদের ধর্মশাস্ত্রের যুগধর্মসম্মত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আমাদের শিক্ষা একমুখী করতে হবে—কেমন করে করা দরকার তা ভাবতে হবে।

এখন আমি আমাদের শিক্ষা-সমস্যার মাত্র একটি দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছে। এই সমস্যার অন্যদিক যথা স্ত্রীশিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা এস্থলে করতে গেলে আপনাদের ধৈর্য হারিয়ে ফেলব। এরই মধ্যে আপনাদের ধৈর্যের অনেকখানি পরীক্ষা হয়েছে।

উপসংহারে আমি এই বলতে চাই যে, আজ আমাদের সকল দুর্গতির কারণ হচ্ছে আমাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি—অন্ধ বিশ্বাস, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং বর্তমান জগতের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কহীনতা। তার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকখানি দায়ী। মুসলমান সমাজের ঐক্য-সাধন বা একদিল্ করতে হলে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি একমুখী করতে হবে—জগতের সমস্ত বিদ্যা বর্তমান জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আজ আমাদের সকল শুভ চেষ্টা আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে মুক্ত করতে নিয়োজিত হোক।




শিখা

দ্বিতীয় বর্ষ

১৯২৮

সম্পাদক : কাজী মোতাহার হোসেন

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'




নতুনের গান
কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্!
উর্দ্ধ-গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ-প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্ ॥
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
'তাজা-ব-তাজার' গাহিয়া গান
সজীব করিব গোরস্থান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

কোরাস :
ঊর্দ্ধে আদেশ হানিছে বাজ
শহীদী-ঈদের সেনারা সাজ্
দিকে দিকে চলে কুচ্‌কাওয়াজ
খোল্‌রে নিদ-মহল।

চল্‌রে নৌজোয়ান—
শোন্‌রে পাতিয়া কান
নয়া জমানার মিনারে মিনারে
নব উষার আজান!
ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ আগল!
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌
কবে সে খোয়ালি বাদ্‌শাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি
যাস্‌ মুসাফির গান গাহি
ফেলিস্‌ অশ্রুজল।
যাক্‌রে তখ্‌ত্‌ তাউস
জাগ্‌রে জাগ্‌ বেহুঁশ,
ডুবিলরে দেখ্‌ রোম গ্রীক্‌
কত পারশ্য রুষ।
জাগিল পুন সকল!
আমরা রচিব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌ ॥

সভাপতির অভিভাষণ
আবদুর রহমান খান

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহাস্পদ বন্ধুগণ,

ভূমিকা

আপনারা আমাকে আপনাদের সাহিত্য সমাজের সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আমাকে অপ্রত্যাশিত সম্মান দেখাইয়াছেন। তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাদের নির্বাচন বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। যে দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার আপনারা আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সভাপতির অভিভাষণে নিরাশ হইবেন। কিন্তু তজ্জন্য দায়ী আমি নহি! বারবার অক্ষমতার অজুহাত পেশ করিয়াও আমি নিষ্কৃতি পাই নাই। আপনারা আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া থাকেন; আপনাদের আহ্বান আমার শিরোধার্য। তাই অগত্যা কম্পিত অন্তঃকরণে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। যে স্থলে আন্তরিক স্নেহ বিদ্যমান, তথায় দোষত্রুটি সহজেই মার্জিত হয়। আশা করি, আপনারাও আমার ভুলভ্রান্তি মাফ করিয়া লইবেন।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যেই ইহা আপনাকে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে ইহার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। উহার কার্যবিবরণী ও প্রবন্ধসমূহ সমাজের মুখপত্র 'শিখায়' প্রকাশিত হইয়াছে। 'শিখা' সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়াছে। এই সমস্ত সমালোচনা হইতে আর যাহাই পাওয়া যাউক না কেন, এই কথাটি বেশ স্পষ্টরূপে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে যে, সমাজের কর্মিগণ এক নতুন উৎসাহে উৎসাহিত, এক নতুন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। ইহারা সমাজ-গত-প্রাণ। মুসলিম সমাজের বর্তমান দুঃখ দৈন্য ইঁহাদের মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। ইঁহারা উহাকে সঞ্জীবিত ও সর্বগুণে বিভূষিত করিয়া বিশ্বের দরবারে একটি গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সকল জাতির নিকট শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতে চান। ইহারা সত্যান্বেষী; গতানুগতিক সহজ ব্যাখ্যায় ইহারা সন্তুষ্ট নহেন। সত্যকে ইহারা শুধু মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান না।

ইহারা চান সে সত্যকে বুদ্ধির মাপকাঠি দ্বারা ভাল করিয়া যাচাই করিয়া আপনার করিয়া লইতে। ইঁহারা স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা অকপটে নির্ভীকচিত্তে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। সত্যান্বেষণের ইহাই একমাত্র পথ। সকল সত্যের আধার পরম কারুণিক খোদাতা'লা ইহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করুন এবং ইহাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করুন, ইহাই আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

সাহিত্যের স্বরূপ

আমি সাহিত্যিক নহি। সাহিত্যের স্বরূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। একজন সামান্য শিক্ষিত লোক হিসাবে আমার সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহাই নিতান্ত সাদাসিদা ভাবে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। সাহিত্যকে জীবনের সমালোচনা বলা হয়। পারিপার্শ্বিক জীবনে যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূত হয় তাহাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই ঘটনাগুলি সাধারণের অনুভূতিতে যেরূপ প্রতীয়মান হয় সাহিত্যে তাহার অবিকল ছবি ফুটিয়া উঠে না, সাহিত্যিকের অন্তর দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া উহা নতুন রঙে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়। যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূত হয় তাহা ঘটনা মাত্র। আর সাহিত্যিকের মন উহাকে ছাঁকিয়া সাহিত্যে যাহা প্রকাশ করে তাহাই সত্য। এই সত্যই প্রকৃত সাহিত্যের পরিচায়ক। ইহাতেই সাহিত্যিকের আত্ম-প্রকাশ হয়।

সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য দুইটি জিনিষ আবশ্যক—পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাহিত্যিকের মন। এই দুইটি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যখনই কোনো বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হয়, কোনো স্থিতিশীল অনুষ্ঠানের মধ্যে গতি বা বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই সাহিত্যিকের মন প্রচণ্ড আঘাতে উন্মুক্ত ও প্রসারিত হয় এবং প্রাণস্পর্শী সাহিত্যের সৃষ্টি করে। ইউরোপের সাহিত্যে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইউরোপে লোকের মন এরূপ সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, একমাত্র বাইবেল গ্রন্থ ভিন্ন তাহাদের আলোচনার বিষয় আর কিছুই ছিল না। তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কনসটন্টিনোপলের পতনে বহু সংখ্যক বিদ্যার্থী ইটালীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে ইউরোপ এক নতুন আলোক ও চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং ফলে তাহার সাহিত্যের পুনরুত্থান হয়। ইংরাজি সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ এলিজাবেথীয় যুগ। সে যুগের সাহিত্যের মূলেও একটা প্রচণ্ড নতুন আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ড যখন কলকারখানার আবিষ্কার দ্বারা প্রকৃতির উপর বিপুল প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছিল। নতুন আবিষ্কার ও পর্যটনের ফলে বহু দেশের বহু অভিজ্ঞতা তখন তাহার সাহিত্যিকের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে, যখন কোনো জাতির মধ্যে একটা নতুন আলোক প্রবেশ করে, তখন তাহাদের জ্ঞান ও কল্পনার পরিধি সহসা বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এক কথায়, যখন তাহাদের জীবনে একটা নতুন স্ফুর্তি অনুভূত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

মুসলিম সাহিত্যের মূলেও ঐ একই কথা। হজরত মুহাম্মদের সাধনা আরবি সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ইসলামের প্রভাবে প্রাচীন চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। মোতাজেলা, সুফী চিন্তাধারা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তৎকালীন আরবি ও পারস্য চিন্তাধারা ইসলামের তৌহিদের মন্ত্রে কেমন করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া এক নতুন পথে গতিলাভ করিয়াছিল। প্রাথমিক মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ইমামের চিন্তাধারা লক্ষ্য করিলেও এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে নবভাবের আবির্ভাব হইলে মানুষের মন গা ঝাড়া দিয়া উঠে এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সাহিত্য মানবমনের পুষ্প। বড় বড় শাস্ত্রগ্রন্থ, বড় বড় কাব্য, বৈজ্ঞানিক তথা দার্শনিক সত্য সমস্তই মানুষের উৎকর্ষসমন্বিত চিত্ত ও সম্প্রসারিত মার্জিত মস্তিষ্কের ফল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে সে মন বিকশিত হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় দার্শনিক সত্য মানুষের দুঃস্থ অনুন্নত সমাজের মহাপুরুষদের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়াছে। ইউরোপে যে সমস্ত দার্শনিক সূত্র প্রচলিত হইয়াছে তাহার মূলে অনুভূতির বহ্নিতে প্রজ্জলিত চিত্ত বিদ্যমান। বেনথাম, মিল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বার্গসঁ, কহলার প্রমুখ দার্শনিক সমাজের প্রসব-বেদনার ফল। আবার ভারতীয় আধুনিক জাগরণের মূলে আমাদের বর্তমান সামাজিক দুরবস্থা। সেই দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য যে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে—তাঁহারাই সাহিত্যের আধুনিক স্রষ্টা। বাংলাদেশে রামমোহনের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের এবং রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—প্রত্যেক যুগের এক একটি বিশিষ্ট সমস্যা সাহিত্যের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের অজ্ঞাতে সমস্যা জন্মলাভ করে—আর সাহিত্যে তাহার রূপ গ্রহণ করে এবং সমাধানের ইঙ্গিত করে। যে সমাজে সমস্যা যত কম, সে সমাজে সাহিত্যের বৈচিত্র্য তত কম। বাংলায় আধুনিক মুসলমানের সাহিত্য নাই। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও পুঁথিসাহিত্যের একটি চমৎকার প্রভাব বাংলার মুসলিম সমাজের উপর বিদ্যমান ছিল—কিন্তু আজ তাহাও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে। আজ চতুর্দিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র যেন উষর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের জীবনে যেন কোনো সমস্যাই নাই। তাহার কারণ, আমরা একটি কৃত্রিম ভাবধারার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছি। আমাদের আলেম সম্প্রদায়, উর্দুকে আমাদের ধর্মভাষায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন এবং আমরা উর্দুকে

মাতৃভাষার উপরে স্থান দিয়া মাতৃভাষার উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সেই জন্যই বোধ হয় আমাদের জীবনের আনন্দ ও স্বচ্ছন্দ সৃষ্টি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। নতুবা আমার মনে হয় পুঁথিসাহিত্য ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া অন্য এক নতুন রূপ লইয়া আমাদের সাহিত্যের অভাব পূরণ করিত।

সাহিত্যের ভাষা

সাহিত্যের বাহন ভাষা। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যের ভাষা কি হইবে তাহা লইয়া আজ মাথা ঘামাইয়া সময় নষ্ট করিতে যাওয়া নিরর্থক বিড়ম্বনা বৈ আর কি হইতে পারে? ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই বঙ্গ-ভাষা-ভাষী, সুতরাং তাহাদের সাহিত্যের ভাষা যে বাংলা হইবে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তথাপি যে কোনো কোনো মুসলমান বাংলাকে তাহাদের সাহিত্যের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ, তাহার বোধ হয় একটা কারণ আছে। বাংলা ভাষায় তাহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটে না; তাঁহারা সাহিত্যে যাহা প্রত্যাশা করেন, বাংলায় তাহা পান না; এটা অতি দুঃখের বিষয় এবং এই দুঃখেই তাঁহারা বাংলাকে অস্বীকার করিয়া চলিতে চান। কিন্তু তাহা নিষ্ফল। বাংলাকেই বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাতেই তাহার সাহিত্য প্রকাশ করিতে হইবে। বাংলাকে অস্বীকার করিয়াই আমরা আজ সাহিত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় উর্দুতে বাৎচিৎ করিয়া শরাফত বহাল করিবার জন্য উদ্বিগ্ন, আর আলেম সম্প্রদায় উর্দুর মারফতে প্রচারকার্য চালাইয়া পেটের অন্ন সংস্থানে ব্যস্ত। কাজেই মাতৃভাষার চর্চা হয় নাই বলিয়া আজ আমাদের এই দুর্দশা। কেহ কেহ উর্দুকে বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে চালাইতে চাহেন; কিন্তু তাহা অতি দুরূহ। মুখের কথায় কেহ কোনো দেশবাসীর মাতৃভাষা পরিবর্তন করিতে পারে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা ন্যূনাধিক গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু যে ভাষা তাঁহারা মাতৃ-স্তন্য পানের সহিত শ্রবণ করিয়া আসিয়াছে সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার সহিত অপর কোনো ভাষার প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না। অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সমাজে উর্দুর প্রচলন অতি আয়াসসাধ্য এবং পরদানশীন মাতৃ-জাতির মধ্যে উহার প্রবর্তন একরূপ অসম্ভব। সুতরাং বাংলাকেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যের বাহন করিয়া লইতে হইবে।

প্রচলিত 'বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কোনো কোনো মুসলমানের একটা অভিযোগ আছে। তাহারা বলিয়া থাকেন, উহা বাংলার মুসলমানদের ভাষা নহে, উহা সংস্কৃত শব্দবহুল। এই হেতু কতিপয় মুসলমান বাংলা ভাষার মধ্যে আরবি ও ফারসি শব্দের প্রচলন দ্বারা উহাকে মুসলমানদের হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টায় আছেন। এস্থলে মনে রাখা কর্তব্য যে, ভাষা সাহিত্যের বাহন মাত্র, উহাই সাহিত্য নহে। প্রকৃত

সাহিত্যের পরিচয় উহার ভাবে এবং প্রকাশের ভঙ্গিতে যে স্থলে এই দুইটি জিনিষ বিদ্যমান আছে, তথায় ভাষায় সংস্কৃত বা আরবি ফারসি শব্দের নানাধিক্যে সাহিত্যের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সংস্কৃত শব্দবহুল হইলেও ভাষা উৎকট বিকট না হইতে পারে, আবার খাঁটি বাংলাও শ্রুতিমধুর না হইতে পারে। তদ্রূপ আরবি, ফারসি বেশি থাকিতেও হয়তো তাহা বাংলা ভাষার মধ্যে বে-মালুম খাপ খাইতে পারে; আবার তাহাদের পরিমাণ কম হইলেও হয়তো তাহা একদিকে সাধারণ পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী না হইতে পারে এবং অপরদিকে মুসলমানদের নিকটও তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য না হইতে পারে। মোট কথা, ভাষায় কি পরিমাণ সংস্কৃত বা আরবি ফারসি শব্দ থাকিবে তাহা কেহ নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারে না; তবে একথা ঠিক মুসলমানগণ সাহিত্যক্ষেত্রে মনোনিবেশ করিলে যে, বর্তমান বাংলা ভাষার মধ্যে একটু পরিবর্তন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা মুসলিম সমাজে আদরণীয় হইবে না। আবার আরবি ফারসি বহুল পরিমাণে প্রচলন করিলে তাহাও সাধারণ বঙ্গবাসী গ্রহণ করিবে না। বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান বহুদিন যাবৎ একত্র বসবাস করিয়া আসিতেছে, ইহার ফলে সাধারণ মুসলিম কথাবার্তায় যে সকল বিদেশীয় শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা সাধারণ হিন্দুর উপলব্ধি করিতে আদৌ বেগ পাইতে হয় না। যদি বাংলা সাহিত্যের ভাষায় ঐ সমস্ত শব্দের প্রচলন হয় তবে তাহাই মুসলমানদের নিকট তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া আদৃত হইবে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ভাব

কিন্তু প্রচলিত বাংলা ভাষার মধ্যে কতিপয় মুসলিম শব্দের প্রচলন হইলেই মুসলিম সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে না। মুসলিম সাহিত্যের বিশেষত্ব থাকিবে তাহার ভাবে, তাহার ভাষায় নহে। যতদিন মুসলমান তাহার সাহিত্যে মুসলিম আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে না পারিবে, ততদিন প্রকৃত মুসলিম সাহিত্য সৃষ্ট হইবে না। অধুনা যে সমস্ত মুসলমান সাহিত্যসেবায় যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই হিন্দু আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের লেখায় এমন কোনো বিশেষত্ব পাওয়া যায় না যাহা হইতে উহা মুসলমানের লেখনী-প্রসূত বলিয়া সহসা প্রতীয়মান হয়। মুসলমানের একটা নিজস্ব সম্পদ আছে। উহা প্রকাশ করাই মুসলিম সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহার এক প্রধান ফল এই হইবে যে, অপর সম্প্রদায়ের লোক মুসলমানকে ভালরূপে চিনিতে সুযোগ পাইবে এবং তাহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। মুসলমান যদি অপর সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তা পাইতে আশা করে, তবে তাহাকে তাহার মধ্যে যাহা শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয় আছে তাহা তাহাদের

সমক্ষে সঠিকভাবে উপস্থিত করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যের ভিতর দিয়া মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মিলন আশা করা যায়, অন্য কোনো উপায়ে তাহা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনেক মুসলমানের একটা বিতৃষ্ণা আছে। তাঁহারা বলেন, বাংলার বড় বড় সাহিত্যিকও মুসলমানকে নিকৃষ্টরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, মুসলমান হাতে কলম ধরিতে পারিলেই তাহার পক্ষে ইহার প্রতিশোধ লওয়া অবশ্য কর্তব্য। এই খেয়ালের বশবর্তী হইয়া কোনো কোনো লেখক এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যাহা কিছুতেই সুরুচিসংগত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। তাহাতে মুসলমান সমাজের গৌরব বাড়িতেছে না বরং তাহাতে অন্য সমাজের নিকট আমাদের নিকৃষ্ট চিত্তের পরিচয়ই দেওয়া হইতেছে। ইহা বাস্তবিকই লজ্জার বিষয়। আমাদের এস্থলে পালটা হীন মনোবৃত্তির পরিচয় না দিয়া, উচ্চতর মনোবৃত্তি ও উদার সুরুচির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের জীবনের মার্জিত রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মুসলমানকে যদি অপর সম্প্রদায়ের লোক ভালভাবে চিত্রিত না করিয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য তাঁহারা যেমন দায়ী, মুসলমানও সেইরূপ দায়ী। তাঁহাদের কর্তব্য ছিল মুসলমানকে সূক্ষ্মরূপে জানিবার চেষ্টা করা এবং মুসলমানের উচিত ছিল নিজকে তাঁহাদের নিকট সঠিকভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাওয়া। গলাবাজি করিয়া কিংবা প্রতিহিংসামূলক ভাষা ব্যবহার করিয়া সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করা যায় না। সে গৌরবের সর্বপ্রথম বিষয় হইতেছে আমাদের সুন্দর ও মার্জিত জীবন। সেইরূপ জীবন সম্পদ আমাদের নাই। যে জন্য অন্য সমাজের লোক আমাদিগকে ঘৃণা করেন এবং নিকৃষ্ট জীবরূপে চিত্রিত করেন। সেজন্য আমরা অত্যধিক অপরাধী। আমি নোংরা থাকিলে কে আমাকে সভ্যসুন্দর বলিতে পারে? যাঁহারা আমাদিগকে কুশ্রী করিয়া আঁকিয়াছেন তাঁহাদের সামনে আমাদের জীবনের খুব ভাল ছবি ছিল না। সুতরাং সেজন্য শিল্পীকে দোষ না দিয়া আমাদের সমাজের রূপকে দোষ দেওয়া উচিত। তাই বলি আজ আমাদের জীবনকে শ্রদ্ধেয় করিতে হইবে—সেজন্য আজ চিন্তাশীল সাহিত্যিকের আবির্ভাব হওয়া চাই। 'সাহিত্য-সমাজ' সেই সাহিত্যিকের আগমন সহজ করিতে ব্রতী হউক—এই কামনা করি।

মুসলিম সমাজে সাহিত্যচর্চার অন্তরায়

জাতি হিসাবে বঙ্গীয় মুসলিম জগতের মধ্যে সভ্যতার নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে। কে তাহাকে গালিমন্দ দিয়াছে, কিরূপে তাহার প্রতিশোধ লওয়া যাইবে এই আলোচনায় সময় ও শক্তি ক্ষেপণের অবসর তাহার আর নাই। তাহাকে একাগ্রমনে আত্মোন্নতি

ও আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাতেই তাহার মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং তাহাতেই তাহার কলঙ্ক মোচন হইবে।

সাহিত্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, জোর করিয়া বা ফরমাইশ দিয়া কেহ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে না। সাহিত্য ফুলের ন্যায় আপনি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু গাছের গোড়ায় জল সিঞ্চন করিয়া যেমন উহার পুষ্টির ও পরোক্ষভাবে ফুলোৎপত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, তদ্রূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন দ্বারাও সাহিত্য সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করা যাইতে পারে। এখন দেখা যাক 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এরূপ পরিবর্তন সংঘঠনে সাহায্য করিতে পারেন কি না। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ বর্তমানে যেরূপ সংকীর্ণ জীবন যাপন করিতেছে, তাহাতে তাহাদের মধ্যে সাহিত্যের সৃষ্টি অসম্ভব। সংকীর্ণতা তাহাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়াছে। তাহাদের মানসিক পরিদৃষ্টি (outlook) অতি সংকীর্ণ, তাহাদের মধ্যে উদার শিক্ষা অতি বিরল। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার আভাস পাওয়া যায় না। (যাঁহারা আলেম বলিয়া দাবি করেন, তাঁহারা কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত পৃথিবীর কোনো বিষয়ের সংবাদ রাখেন না।) যাঁহাদের পার্থিব বিষয়সমূহের কিছু জ্ঞান আছে, ধর্মশিক্ষার সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই বলিলেও চলে। যাঁহারা আরবি জানেন, তাঁহারা ইংরেজি জানেন না এবং জানা আবশ্যকও মনে করেন না। যাঁহারা ইংরেজি জানেন, তাঁহারা আরবি জানেন না এবং আরবির মধ্যে জানার উপযোগী কিছু আছে বলিয়াও বিশ্বাস করেন না। জ্ঞানের কী ভীষণ দৈন্য আমাদের বাংলার মুসলিম সমাজে। যখন মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চা ছিল, তখন তাঁহারা নিজেদের মাতৃভাষা তো জানিতেনই, তাহা ছাড়া তখনকার দিনে যে সমস্ত ভাষায় সাহিত্যের প্রাচুর্য ছিল তৎসমুদয়ও নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করিয়া নতুনভাবে তাহা আলোচনা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, যিনি গণিতজ্ঞ বা জ্যোতির্বিদ ছিলেন, তিনিও সাহিত্য-চর্চা করিতেন। মুসলমানগণ তখন দূরদেশে থাকিয়া যতটুকু সংস্কৃত চর্চা করিতেন, আজ তাঁহারা বহু শতাব্দী হিন্দুদের সহিত একত্র বসবাস সত্ত্বেও তাহার শতাংশের একাংশ করিতেছেন না। ওমর খাইয়াম দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ হইয়াও সাহিত্য-সেবায় ... মুসলিম সমাজে এমন একাগ্রচিত্ত সাহিত্যসেবীও পাওয়া দুষ্কর, যিনি একজন সাধারণ সাহিত্যিক বলিয়াও পরিচিত হইতে পারেন।

ধর্মক্ষেত্রেও মুসলমানদের সংকীর্ণতা অতি শোচনীয়। তাঁহারা ধর্মের নামে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন কিন্তু ধর্ম কি, সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনো সঠিক ধারণা নাই। তাঁহারা ধর্মের বহিরাবরণ লইয়া তর্কাতর্কি করেন কিন্তু উহার ভিতরকার আসল জিনিষটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা অনুষ্ঠানকেই একমাত্র ধর্ম বলিয়া মনে করেন কিন্তু অনুষ্ঠান যে কোনো বৃহত্তর ও মহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায়

মাত্র, ইহা তাঁহাদের চিন্তা করিবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি নাই। তাঁহারা চক্ষু বুজিয়া শাস্ত্রের আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলেন বা চলেন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহাদের মূলে যে কোনো যুক্তি থাকিতে পারে তাহা একবার ভাবিয়া দেখেন না এবং ভাবিয়া দেখাও নিষ্প্রয়োজন বা আত্মার অবনতির কারণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস নাই। তাই তাঁহারা আপন ধর্ম অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য অপর ধর্মাবলম্বীর সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করেন। জাতীয় জীবনে এত বড় জড়তার দৃষ্টান্ত বোধ হয় আজ আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি সহসা এমন কোনো নব-আলোক (X-rays) এর আবির্ভাব হয় যাহাতে এই নিবিড় জড়তা আলোকিত ও সমুদ্ভাসিত হইতে পারে, তবেই মুসলিম সমাজে সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইবে। এই আলোকের প্রবেশপথ পরিষ্কার করিতে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নিশ্চয়ই সাহায্য করিতে পারেন। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে উদার শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে পারেন। যাঁহারা ইংরাজি জানেন, তাহারা ইংরেজীর যোগে নানা দেশের culture সভ্যতা ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে অবগত হইতে পারেন এবং তাহা ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ লোকের সম্মুখে ভাষান্তরিত করিয়া উপস্থিত করিতে পারেন। যাঁহারা আরবিতে অভিজ্ঞ তাঁহারা ইসলামে যাহা কিছু সুন্দর ও মনোরম এবং আধুনিক সমস্যা সমাধানের অনুকূল তাহা তরজমা করিয়া যাঁহারা আরবি জানেন না তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত করিতে পারেন। উভয় দল পরস্পরকে জানিবার, বুঝিবার ও শ্রদ্ধা করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে পারেন। এই প্রকার ভাবের আদান-প্রদানে হয়তো মুসলিম সমাজে এক নতুন আলোক প্রকাশিত হইবে এবং তাহার ফলে সাহিত্য সৃষ্টির পথ সুগম হইবে।

সাহিত্য ও শিক্ষা

সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। প্রথমত যাঁহারা সাহিত্যের সেবা করিবেন, তাঁহাদের সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সুশিক্ষিত হইতে হইলেই যে বি-এ, এম-এ পাশ করিতে হইবে, এমন নহে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপাধিধারী না হইয়াও সুশিক্ষিত হওয়া সম্ভবপর। সুশিক্ষার জন্য অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ আবশ্যক এবং অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ হইতেই সাহিত্যের মালমসলা সংগৃহীত হয়। অধ্যয়ন দ্বারা অতীত ও বর্তমান মনীষীগণের চিন্তাধারার সহিত পরিচয় ঘটে, সাহিত্যের দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে, চিন্তাশক্তি প্রখর হয় এবং রুচি মার্জিত হয়। পর্যবেক্ষণ দ্বারা মানস ও বাহ্য প্রকৃতির অনেক গূঢ় তত্ত্ব গোচরীভূত হয়। যাহা জন-সাধারণের নিকট নিতান্ত সামান্য ও অর্থবিহীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাও পর্যবেক্ষণশীল লোকের নিকট অনেক সময়ে অতি সারগর্ভ ও মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হয়।

দ্বিতীয়ত, যাহারা সাহিত্য পাঠ করিবেন তাঁহাদের সাহিত্য বুঝিবার এবং উপভোগ করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। যতদিন মুসলিম সমাজে বিদ্যাশিক্ষার প্রসার না হয়, ততদিন তাহাদের মধ্যে সাহিত্যের আস্বাদ দানের চেষ্টা বৃথা। বাংলার সাধারণ মুসলিম বটতলার প্রকাশিত পুঁথি পড়িয়া পঠনের আমোদ উপভোগ করে। উহাই তাহার সাহিত্য। প্রকৃত সাহিত্য পাঠ করিবার বা উপভোগ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তাহাকে প্রকৃত সাহিত্যের রস আস্বাদ করানো অসম্ভব। সুতরাং মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' অন্যতম কর্তব্য।

কি উপায়ে মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহাদিগকে শিক্ষার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বহু মনীষী ব্যক্তি বহু গবেষণা করিয়াছেন। এইরূপ এক গবেষণার ফলে দেশে জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা বাড়িতেছে। ইংরেজি বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিয়া মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন নাই। এই অভাব পূরণের জন্যই এই মাদ্রাসা প্রণালীর উদ্ভাবন হয়। ইহার ফলে বহু মাদ্রাসার উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মানুষের কোনো অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ নির্দোষ হয় না। মাদ্রাসা প্রণালীরও দোষ আছে। মুসলিম সমাজের একদল ইহাকে দূষণীয় বলিয়া ইহার বর্জনের চেষ্টা করিতেছেন এবং অপর দল ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া আর দোষ স্বীকার করিবার সাহস পাইতেছেন না।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই নতুন প্রণালীর মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল মুসলমান পূর্বে আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তাঁহারাও ইহার প্রতি কথঞ্চিৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত বিদ্যালয়েও যে ইসলামিক শিক্ষার সুচারু ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নহে। তথাপি ইহার প্রতি মুসলিমগণের আস্থা স্থাপিত হওয়ার কারণ এই যে, তাঁহারা যে মোহের বশবর্তী হইয়া আপনাদিগকে সর্বসাধারণ মানব হইতে পৃথক রাখিতে চান ইহাতে তাহার একটা পরিতুষ্টি হয়। তাঁহারা অতি ধর্ম-প্রাণ, তাঁহারা ধর্মহীন শিক্ষার বিরোধী, এই কথাটাই তাঁহারা সব সময়ে সপ্রমাণ করিতে চান। ইংরেজি শিক্ষার ফলে লোক ধর্মহীন হইয়া পড়িবে, এই ভয়েই মুসলমানগণ উহা হইতে দুরে সরিয়াছিলেন এবং এই ভয় এখনো মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার অভাবের জন্য অনেকখানি দায়ী।

এই সংস্কার দূরীকরণের উপায়ান্তর না পাওয়ায় নতুন মাদ্রাসা প্রণালীর যোগে ফাঁকি দিয়া মুসলমানদিগকে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। এই চেষ্টা যে অনেকটা ফলবতী হইয়াছে তাহাও সত্য। অনেক স্থলে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়াতে এমন অনেক বালক তাহাতে যোগদান করিতেছে যাহারা অপর

কোনো বিদ্যালয়ে যাইত না এবং মাদ্রাসা না হইলে সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকিয়া যাইত। যে কারণেই হউক যখন মাদ্রাসা প্রণালী জনসাধারণ মুসলমানের নিকট অপরাপর বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে অধিকতর আদৃত হইয়াছে, তখন ইহাকে উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ইহারই যোগে মুসলমানের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা পাইতে হইবে। কোনো পদ্ধতিকে দূষণীয় বলিয়া বর্জন করা যত সহজ, তাহার স্থানে অপর একটি গড়িয়া তোলা তত সহজ নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে সমস্ত দোষ আছে, তাহার সংশোধন করা আবশ্যক। 'দীন ও দুনিয়ার' শিক্ষা একাধারে ও সমানভাবে দেওয়া হইবে এই উদ্দেশ্যেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই উদ্দেশ্য আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

আমার মনে হয়, এই প্রণালীর প্রধান দোষ এই যে, ইহার পাঠ্য তালিকা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সোপান অনুযায়ী নহে। ইহার ফলে তাহার উপর অত্যধিক চাপ পড়িতেছে, অথচ সে উহা আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। পরীক্ষা পাশের জন্যে সে কোনো প্রকারে কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়া যাইতেছে কিন্তু উহার মর্ম তাহার চিত্ত বিকাশের পক্ষে সহায় হইতেছে না বলিয়া তাহার প্রকৃত শিক্ষালাভ হইতেছে না। জুনিয়ার মাদ্রাসায় সুকুমারমতি বালককে মধ্য-ইংরাজি স্কুলের যাবতীয় পাঠ্য পড়িতে হইতেছে; তাহার উপর আবার আরবি উর্দু ও দীনিয়াতের ভার চাপান হইয়াছে। হাই মাদ্রাসার অবস্থাও তদ্রূপ। তথায় শিক্ষার্থীকে হাই স্কুলের ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদির সহিত হাদিস, তফসিল, কোরান, কালাম, ফেকা, ওসুল, মনতক ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হইতেছে। অথচ ইহাদের কোনো একটি বুঝিবার মতো বুদ্ধির পরিপক্বতা সুলভ শক্তি তাহার হয় নাই। ইহার ফল এই হইতেছে যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ না হওয়ায় সে একটি জীবন্ত যন্ত্রে পরিণত হইতেছে। উপরোক্ত দোষের ফলে ইহার দ্বিতীয় দোষ এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাতে উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হইতেছে না, যতটুকু গণিত, ভূগোল ও ইতিহাসের জ্ঞান উচ্চ শিক্ষার সোপানে সোপানে আবশ্যক হয় এবং যাহা না হইলে লোক অশিক্ষিত থাকিয়া যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহাতে তাহার অভাব রহিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দোষের অনিবার্য ফলস্বরূপ ইহার তৃতীয় দোষ এই হইয়াছে যে, ইহা জীবনসংগ্রামের সমস্যা সমাধান করিবার মতো বুদ্ধি ও শক্তি পরিপুষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নহে। ইহা দ্বারা শিক্ষার্থী সাংসারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত সমকক্ষতা করিয়া জীবিকা-অর্জনে সক্ষম নহে। যে শিক্ষা জীবিকা অর্জনের সম্যক সহায়তা করে না ... আগেই হউক আর পরেই হউক নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু ... অবস্থা এরূপ নহে যে, তাঁহারা শেষ পর্যন্ত ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট শিক্ষাক্ষেত্রে আজ

প্রত্যেকটি মুহূর্ত মূল্যবান। সুতরাং এখন হইতেই উহার প্রতিকারের চেষ্টা করা আবশ্যক। এস্থলে আশার বিষয় এই যে, ইহাতে ইতিপূর্বেই কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং তাহাতে কর্তৃপক্ষের বা জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই।

শিক্ষা ও ধর্ম

শিক্ষার সহিত ধর্মের সংযোগ আবশ্যক। কিন্তু এই সংযোগ প্রকৃত শিক্ষার প্রতিকূল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ধর্মের নামে এই মাদ্রাসাগুলিতে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দুর্বোধ্য আরবি ভাষার শব্দগুলি কণ্ঠস্থ করিতে শক্তি ও সময় অযথা ব্যয়িত হয়। তৎসমুদয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে অধিকতর সুফল ফলিতে পারে। ইহাতে বিষয়গুলি সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, অথচ শিক্ষার্থী পার্থিব বিষয়গুলিতে অধিকতর মনোনিবেশ করিবার সুযোগ পাইতে পারে। কিন্তু আমাদের একটি মোহ আছে, আমরা হাই মাদ্রাসায় বড় বড় আলেমের লিখিত বড় বড় কেতাব পড়াইয়া গৌরব অনুভব করি। সেই মোহকে জয় করিবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে।

একথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি এই বিষয়গুলির বা যে সমস্ত পুস্তক হইতে এই বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়, সেগুলির সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি। প্রত্যেক বিষয় শিক্ষার উপযোগী একএকটি সোপান আছে। যে সোপানে ঐগুলির শিক্ষা দেওয়া হয়, ঐগুলি সেই সোপানের উপযোগ্য নহে। কলেজিয়েট ও ইউনিভার্সিটি সোপানে উহাদের শিক্ষাদান সমধিক সমীচীন হইতে পারে। উহাদের ভাষা ও যুক্তি বুঝিবার জন্য যে আরবির জ্ঞান আবশ্যক, তাহার জন্য জুনিয়র ও হাই মাদ্রাসায় ব্যবস্থা করা উচিত। আমার মতে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে আরবি ভাষার জ্ঞানের ভিত্তি ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্মের সাধারণ বিধানগুলির ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং বিষয়গুলির নির্বাচন এইরূপ হয় যেন তাহা সাধারণ উচ্চ শিক্ষার পরিপন্থী না হয়। হাই মাদ্রাসা সোপানে সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্রগণ উপরের সোপানসমূহে নিজ নিজ যোগ্যতা ও অভিরুচি অনুসারে বিষয় নির্বাচন করিয়া লইতে পারিবে। তাহা হইলে তাহারা পাঠে আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে এবং জীবনসংগ্রামেও কাহারও পশ্চাৎপদ হইবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা

বর্তমান সময়ে দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। মুসলিম সমাজে শিক্ষা-বিস্তারের ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ।

মুসলমানগণ প্রধানত গ্রামে বাস করে। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই গ্রাম্য পাঠশালায় বা মক্তবে বিদ্যারম্ভ করিয়াছেন। দূর ভবিষ্যতেও মুসলমানগণ গ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত থাকিবে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। যাহাতে এই শিক্ষা গ্রামবাসী সকলে সহজে ও বিনা ব্যয়ে পাইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক মুসলমানের ঐকান্তিক চেষ্টা করা আবশ্যক। একথা সত্য যে, অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে এবং উহার ব্যয়ভার বহনের অপর কোনো ব্যবস্থা না হইলে গ্রাম্য মুসলমানদিগকে অতিরিক্ত কর দিতে হইবে। কিন্তু টাকা না হইলে এরূপ বিরাট ব্যাপার কিরূপে সম্ভবপর হইবে? মুসলমানকে এখনো অনেক কর দিতে হয় কিন্তু এই শিক্ষা-করের মধ্যে তাহার প্রকৃত মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। ইহাকে তাহার কিছুতেই ভয় করা উচিত হইবে না। খোদাতা'লার নাম স্মরণ করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া ইহার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি কোনো কারণবশত এই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার আইন আইন-সভায় পাশ না হয়, তাহা হইলেও শিক্ষার বন্দোবস্ত তাহাকে করিতে হইবে এবং তাহাতে তাহাকে অধিকতর ক্লেশ ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যা এবং তাহাদের কৃতিত্ব দেখিলেই কেহই মনে করিতে পারে না যে, এদেশের মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে এত পশ্চাৎপদ। গত প্রাইমারি পরীক্ষার ফল কলিকাতা গেজেটে ছাপা হইয়াছে। তাহাতে মুসলিম বালক-বালিকাগণ বহুল পরিমাণে বৃত্তি লাভ করিয়াছে এবং গুণানুসারেও সর্বসাধারণের মধ্যে গৌরবজনক উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। যদি প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়, তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা মেধাবী বলিয়া পরিগণিত হয় তাহাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হইবে। সুতরাং মুসলিম মাত্রেরই ইহাতে সহায়তা করা কর্তব্য। মুসলিম সাহিত্যিকগণেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট করণীয় আছে। তাঁহারা এ বিষয় সর্বসাধারণকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের লেখনী চালনা করিতে পারেন।

স্ত্রীশিক্ষা

মুসলিম শিক্ষা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার একান্ত অভাব। যতদিন এই অভাব পূর্ণ না হইবে ততদিন তাহারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে অপরাপর সম্প্রদায়ের পিছনে পড়িয়া থাকিবে। মাতৃজাতি জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন। মাতৃক্রোড়ে শিশুর জীবনের লক্ষ্য নিরূপিত হয়, তাহার

উচ্চাকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হয়। মাতার সম্মুখে জাতীয় জীবনের যে আদর্শ স্থাপিত হয় শিশু ঠিক সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। জাতীয় জীবনের আদর্শ যদি মাতৃগণ আপন প্রাণে অনুভব করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা কখনো উহা তাঁহাদের সন্তানগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে পারেন না। এই হেতু যে জাতির মাতৃগণের মধ্যে শিক্ষার যত অভাব সে জাতির উন্নতির পথ তত দুর্গম। মুসলমানগণ যদি সমাজ হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদিগকে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ দিতে হইবে।

এস্থলে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্ত্রী-শিক্ষা ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় বিধান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাহার প্রতি মারাত্মকরূপে উদাসীন; অথচ তাহাদের অনেক প্রতিবেশীর মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে বহুকালের কুসংস্কার প্রচলিত থাকাতেও তাঁহারা ইহার প্রতি বেশি মনোযোগী। মুসলমানদের এ উদাসীনতা আত্মঘাতী। ইহা তাহাদের সর্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। যতদিন তাহারা ইহা ঝাড়িয়া না ফেলিবে ততদিন তাহাদের পদে পদে বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। কিছুদিন হইল বঙ্গের ডিরেক্টর বাহাদুর মাননীয় ওটেন সাহেব ইডেন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় বলিয়াছিলেন, 'মুসলমানগণ এক সময়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া তাহার জন্য আজ অনুশোচনা করিতেছেন। আজ যখন দেশে স্ত্রী-শিক্ষার সাড়া পড়িয়াছে তখন তাহাতে উদাসীনতা দেখাইলে তাঁহারা পুনরায় ঠকিবেন এবং একদিন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে অনুতাপ করিতেই হইবে।' কথাটা ঠিক। এ বিষয় আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। মানুষ একবার ঠকিলে সাবধান হয়, আর আমরা কি চিরকালই ঠকিতে থাকিব?

অনেক মুসলমান মনে করেন, বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষা-দান পদ্ধতি তাঁহাদের বালিকাগণের উপযোগী নহে এবং সেই জন্য তাঁহারা তাহাদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষা অননুমোদিত হইলে গৃহ শিক্ষার ব্যবস্থায় কিছুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না। এমন অনেক কৃতবিদ্য লোক আছেন যাঁহারা আমাদের দেশের বালক-বিদ্যালয়গুলিকেও শিক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং তজ্জন্য আপন পুত্রগণের শিক্ষার জন্য গৃহে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মুসলমানদের এই কল্পিত গৃহশিক্ষাটি যে আদৌ শিক্ষা নহে, একথা তাহাদের অনেকে অন্তরে অনুভব করিলেও মুখে স্বীকার করিতেছেন না।

এদেশের প্রচলিত স্ত্রী-শিক্ষার সংস্কার হওয়া আবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া যতদিন ইহার সংস্কার না হয় ততদিন ইহার বর্জন করা কোনোক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার সংস্রবে আসিলেই কেবলমাত্র ইহার দোষ গুণ ভালরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিলে ইহার গুণেরও

পরিচয় হইবে না এবং ইহার দোষেরও সংশোধনের চেষ্টা হইবে না। সাঁতার দিয়াই লোকে সাঁতার শিখিতে পারে। শিশু হাঁটিয়াই হাঁটিতে শিখে। একথা আর কতকাল আমরা না বুঝিয়া থাকিব?

সাহিত্য সমাজে ধর্ম-চর্চা

আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, সাহিত্য সমাজে ধর্ম-চর্চা হয় কেন? সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্নটি প্রায়ই উত্থিত হয় বলিয়া এস্থলে উহার পুনরুক্তি করা আবশ্যক মনে করি। জীবনের সহিত যাহা ঘনিষ্ঠরূপে সংসৃষ্ট তাহাই সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়। মানুষের ভাব-বৃত্তি-সমূহের প্রকাশ, তাহার কার্যপ্রণালীর সমালোচনা, সমাজের দোষসমূহের উদ্ঘাটন, সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য। জাতীয় জীবনে যখন যে আদর্শ থাকে তাহাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, সাহিত্যিক তাহার অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা বলে যাহা সমাজের পক্ষে শ্রেয় ও অনুকরণীয় মনে করেন তাহারই আদর্শ সর্ব-সমক্ষে উপস্থিত করেন। সাহিত্যের সৃষ্টিতে যে সমস্ত উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তন্মধ্যে সমাজ সংস্কার অন্যতম। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যিক তাঁহার চক্ষে যাহা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য প্রতীয়মান হয় তাহা এরূপভাবে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন যেন তৎপ্রতি সকলেরই স্বতঃপ্রণোদিত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয় এবং যাহা প্রশংসার্হ ও কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা এরূপ ভাবে অবতারণা করেন যেন সর্বসাধারণের মন তাহার প্রতি অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট হয়। মুসলমানের ধর্ম তাহার সমগ্র জীবনব্যাপী একটি সমস্যা। তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সম্বন্ধ এরূপভাবে জড়িত যে তাহাদের বিচ্ছেদ কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং কোনো মুসলমান সাহিত্যিক সমাজ সংস্কার উদ্দেশ্যে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হইলে তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার সহিত কাহারো মতের অনৈক্য হইলে তজ্জন্য অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নহে। শান্তভাবে তাঁহার প্রতিবাদ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতের মধ্যে যাহা অনভিপ্রেয়, যুক্তি সহকারে তাহার খণ্ডন করা যাইতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন সাহিত্যের স্ফূর্তি হইতে পারে, অপর দিকে তেমনি অপরের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বর্ধিত হইতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতার ন্যায় শত্রু আর নাই। যখন যিনি যে বিষয়ে আলোচনা করিবেন সে বিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য আছে তাঁহার তাহা যথাসম্ভব জানিয়া শুনিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তাহা হইলে আলোচনা প্রকৃতপক্ষে সুফলপ্রদ হইবে এবং তাহাতে কোনো পক্ষ হইতে বিশেষ কোনো আপত্তির কারণ থাকিবে না।

উপসংহার

এইক্ষণ আমি উপসংহার করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা শেষ করিব। যাহা আমি বলিয়াছি তাহা খুব গভীর জ্ঞান বা গবেষণার কথা নয়। আজ আমাদের সমাজের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রন্দন করিতেছে তাহারই প্রতি আপনাদের শুভ দৃষ্টি ও বিস্তৃত জ্ঞান আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। সকলেই এ সমস্ত বিষয় অবগত আছেন—কিন্তু আমাদিগকে এমন একটা নিসাড় ভাব ও ভীরুতা ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা একেবারে সাড়া-শব্দ করিতে চাহিতেছি না। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' চেষ্টা এই নিসাড়তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে সক্ষম হউক—এই কামনা করি।

আজ আমার সকল প্রার্থনার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রার্থনা এই—'হে খোদাঅন্দ! মুসলিম সাহিত্যিকের লেখনী শক্তিশালী হউক—তাহার চিত্ত উন্মুক্ত সম্প্রসারিত হউক—তাহার বুদ্ধি বিকশিত হউক—তাহার রুচি মার্জিত হউক—মুসলিম অমুসলিম তাহার অন্তরে সমান শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠুক।'

বাংলার জাগরণ
কাজী আবদুল ওদুদ

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা এই যে বাংলার জাগরণ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু পুরোপরি সত্যও যে নয় সে-দিকটা ভেবে দেখবার আছে। যাঁরা এই জাগরণের নেতা তাঁরা কি উদ্দেশ্য-আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ও এই জাগরণের ফলে দেশের যা লাভ হয়েছে তার স্বরূপ কি, এই সমস্ত চিন্তা করলে হয়তো আমাদের কথা ভিত্তিশূন্য মনে হবে না। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার থেকে আরম্ভ করে বাজনা ও গোহত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা পর্যন্ত আমাদের দেশের চিন্তা ও কর্মধারা, আর ডিইস্ট এনসাইক্লোপিডিস্ট থেকে আরম্ভ করে বোলশেভিজম পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তা ও কর্মধারা, এই দুইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে গেলেও বুঝতে পারা যায়—আমাদের দেশ তার নিজের কর্মফলের বোঝাই বহন করে চলেছে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে তার পার্থক্য যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য।—এই পার্থক্য একই সঙ্গে আমাদের জন্য আনন্দের ও বিষাদের। আনন্দের এই জন্য যে এতে করে আমাদের একটা বিশিষ্ট সত্তার পরিচয় আমরা লাভ করি—অসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির মতো আমরা শুধু ইয়োরোপের প্রতিধ্বনিমাত্র নই; আর বিষাদের এই জন্য যে আমাদের জাতীয় চিন্তা ও কর্মপরম্পরার ভিতর দিয়ে আমাদের যে ব্যক্তিত্ব সুপ্রকট হয়ে ওঠে সেটি অতীতের অশেষ অভিজ্ঞতাপুষ্ট অকুতোভয় আধুনিক মানুষের ব্যক্তিত্ব নয়, সেটি অনেকখানি অল্পপরিসর শাস্ত্রশাসিত মধ্যযুগীয় মানুষের ব্যক্তিত্ব।

এই সঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে রামমোহন থেকে আমাদের দেশে যে নবচিন্তা ও ভাবধারার সূচনা হয়েছে পরে পরের চিন্তা ও কর্মধারা কেবল যে তার পরিপোষক হয়েছে তা নয়, এমনকি প্রবলভাবে তার বিরুদ্ধাচারীই হয়েছে বেশি। আর উদ্দেশ্য আদর্শের এই সমস্ত বিরোধ একটা বীর্যবান সামঞ্জস্যলাভ করে আমাদের জাতীয় জীবন ও কর্মের যে একটা বিশিষ্ট ধারা সূচিত করবে তা থেকেও আমরা এখনো দূরে।

২

বাংলার নবজাগরণের প্রভাত-নক্ষত্র যে রাজা রামমোহন রায় সে সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নাই। কিন্তু তাঁকে জাতীয় জাগরণের প্রভাত-নক্ষত্র না বলে প্রভাত-সূর্য বলাই উচিত; কেননা, জাতীয় জীবনে কেবলমাত্র একটি নব চৈতন্যের সাড়াই তাঁর ভিতরে অনুভূত হয় না, সেই দিনে এমন একটি বিরাট নব আদর্শ তিনি জাতির সামনে উপস্থাপিত করে গেছেন যে এই শত বৎসরেও আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই যাঁর আদর্শ ...। এমনকি, এই শত বৎসরে আমাদের দেশে অন্যান্য যে সমস্ত ... তাদের প্রয়াসকে পাদপীঠরূপে ব্যবহার করে ... উপর রামমোহনের আদর্শের ... প্রতিষ্ঠা করলে দেশের জন্য একটা সত্যিকার কল্যাণের কাজ হবে এই আমাদের বিশ্বাস।

এই রামমোহন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ, ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। তবু একথা সত্য যে এই পাশ্চাত্য কৃষ্টির সংস্রবে তিনি এসেছিলেন পূর্ণ যৌবনে। তার আগে আরবি ফারসি ও সংস্কৃত অভিজ্ঞ রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাদানুবাদ করেছেন, গৃহত্যাগ করে তিব্বত উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছেন, আর সেই অবস্থায় নানক, কবীর প্রভৃতি ভক্তদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—যাঁরা হিন্দু-চিন্তার উত্তরাধিকার স্বীকার করেও পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এইসব ভেবে দেখলে ও তাঁর চিত্তের উপর মোতাজেলা সুফি প্রভৃতির প্রভাবের কথা স্মরণ করলে বলতে ইচ্ছা হয় ভারতে মধ্যযুগে হিন্দু মুসলমানের সভ্যতা ও ধর্মের সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন যে নানক কবীর দাদু আকবর আবুল ফজল দারাশেকো প্রভৃতি ভক্ত ভাবুক ও কর্মীর দল অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের রামমোহন তাঁদেরই অন্যতম। অবশ্য মধ্য যুগের সমস্ত খোলস চুকিয়ে দিয়ে একেবারে আধুনিক কালের এক পরম শক্তিমান মানুষের চিত্ত ক্রমেই আমরা তাঁর ভিতরে বেশি করেই অনুভব করতে পারছি। কিন্তু সেটি হয়তো তাঁর উপর আধুনিক কালের ইয়োরোপের প্রভাবের জন্যই নয়, আধুনিক ইয়োরোপ যেমন করে মধ্যযুগেরই কুক্ষি থেকে উদ্গত হয়েছে রামমোহনের বিকাশও হয়তো সেই ধরণেরই ব্যাপার।

এই একটি লোক রামমোহন হিন্দুর সঙ্গে তর্ক করেছেন বেদ উপনিষৎ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ তন্ত্র সংহিতা ও সেই সমস্তের টীকা নিয়ে—মুসলমানের সঙ্গে তর্ক করেছেন কোরআন, হাদিস, ফেকা, মন্তেক ইত্যাদি নিয়ে—আর খ্রিস্টানের সঙ্গে তর্কে ব্যবহার করেছেন ইংরেজি গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল ও বড় বড় খ্রিস্টান পণ্ডিতের মতামত। এই লোকটিই আবার সতীদাহ নিবারণের জন্য লড়েছেন—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, চীনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য, নারীর দায়াধিকার, বাংলা ব্যাকরণ,

ইংরেজের শাসনের সমালোচনা ও সেই ক্ষেত্রে পথনির্দেশ, এই একটি লোকেরই কর্মের প্রেরণা যুগিয়েছে। এই বিরাট পুরুষের জীবনকথা ও বিভিন্ন রচনা আলোক পথের পথিক দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের নিত্যসঙ্গী হবার যোগ্য। কিন্তু এই আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের দ্রষ্টব্য—দেশের সামনে কি নির্দেশ তিনি রেখে গেলেন। সেই সম্পর্কে মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায়, ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ এক নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা, লোকশ্রেয় ও বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র—সেই জন্য পরে পরের উপশাস্ত্রসমূহ প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাবর্তন মূল শাস্ত্রসমূহে; শিক্ষার ক্ষেত্রে, ইয়োরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশেষ অনুশীলন; সমাজের ক্ষেত্রে, লোকহিতকর অনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্তন—যা অনিষ্টকর তা প্রাচীন হলেও বর্জনীয় ; আর রাজনীতির ক্ষেত্রে, Dominion status-এর মতো একটা কিছুর আশা রাখা। এমনিভাবে নানা আন্দোলনে সমগ্র দেশ আন্দোলিত করে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন, সেই যাত্রা তাঁর মহাযাত্রা।

৩

রামমোহন জাতীয় জীবনে যে সমস্ত কর্মের প্রবর্তনার সংকল্প করেছিলেন তার মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজ অনতিবিলম্বে ফল প্রসব করতে আরম্ভ করে। হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর নাম চিরদিনের জন্য একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। এই ডিরোজিও যে গুরুর শিষ্য ফরাসি বিপ্লবের চিন্তারস্বাধীনতা-বহ্নি তাঁর ভিতরে প্রজ্বলিত ছিল। ডিরোজিওর সেই বহ্নি-দীক্ষা হয়েছিল। অল্প বয়সে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জন করে কবি ও চিন্তাশীল রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হন, আর তিন বৎসর শিক্ষকতা করার পর সেখান থেকে বিতাড়িত হন। এরই ভিতরে তাঁর শিষ্যদের চিত্তে যে-আগুন তিনি জ্বালিয়ে দেন তাঁর কলেজ পরিত্যাগের পরও বহুদিন পর্যন্ত তার তেজ মন্দীভূত হয় নাই। শুধু তাই নয়, নব্য বঙ্গের গুরুদের ভিতরে এই ডিরোজিওর এক বিশিষ্ট স্থান আছে। এঁর শিষ্যেরা অনেকেই চরিত্র, বিদ্যা, সত্যানুরাগ ইত্যাদির জন্য জাতীয় জীবনে গৌরবের আসন লাভ করেছিলেন, এরই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের আচার-বিচার বিধি-নিষেধ ইত্যাদির লঙ্ঘন দ্বারা সুনাম বা কুনাম অর্জন করে সমস্ত সমাজের ভিতরে একটা নবমনোভাবের প্রবর্তনা করেন।

ডিরোজিরও দলকে আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন রামমোহনের বিরুদ্ধ দল বলে, কেননা এই দল ধর্ম বিষয়ে উদাসীন তো ছিলেনই অনেক সময় নাস্তিক ভাবাপন্ন ছিলেন, আর 'If we hate anything from the bottom of our heart it is Hinduism' একথা তাঁদের

কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করতেন। তবু এই ডিরোজিওর দল প্রকৃত প্রস্তাবে হয়তো রামমোহনের বিরুদ্ধ দল নয়। এই ডিরোজিওর দলের অনেকে উত্তর কালে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও কর্মী হয়েছিলেন, আর বিদ্যা চরিত্রবল জনহিতৈষণা ইত্যাদি গুণে এঁরা যে ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন তাতে রামমোহনের বিদেহী আত্মার স্নেহাশিসই হয়তো তাঁরা লাভ করেছিলেন।

রামমোহন ইয়োরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞানের স্বাদ বাঙালি প্রকৃত প্রস্তাবে পায় ডিরোজিওর কাছ থেকে। এই স্বাদের চমৎকারিত্ব কত তা এই থেকে বোঝা যাবে যে বাংলার চির-আদরের মধুসূদন এই ডিরোজিও-প্রভাবের গৌণ ফল। তাছাড়া সাধারণত বিদ্যানুরাগী বাঙালি হিন্দু এই ডিরোজিও প্রদর্শিত-পথে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রশংশনীয়। আজো বাঙালি হিন্দুর বিদ্যানুরাগ কমে নাই, কিন্তু ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যদের সেই আন্তরিকতার লালিমা একটু কেমনতর হয়ে গেছে বৈ কি।

কিন্তু এত গুণ ও কার্যকারিতা সত্ত্বেও, স্বীকার করতে হবে, ডিরোজিওর দল দুই এক পুরুষের বেশি প্রাণ ধারণ করে থাকতে সমর্থ হন নাই, আর আজ তাঁরা বাস্তবিকই নির্মূল হয়ে গেছেন। কেন এমন হয়েছে তা ভাবতে গিয়ে হয়তো বলতে পারা যায়, তাঁরা দেশের ইতিহাসকে একটুও খাতির করতে চান নাই—পবননন্দনের মতো আস্ত ইয়েরোপ-গন্ধমাদন এদেশে বসিয়ে দিতে তাঁরা প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে অন্য একটি কথাও ভাববার আছে। তাঁরা যাই কেন করুন না দীনচিত্ত তাঁরা ছিলেন না—তাঁদের কামনা ভাবনা বাস্তবিকই রূপ নিয়েছিল তাঁদের জীবনে। আর সেই ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যদের চাইতে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু যে সর্বাংশে উন্নততর জীব তাও হয়তো সত্য নয়।—তবু সেই ব্যক্তিত্ব ও সুরুচি-সমন্বিত প্রাণবান সারবান অপেক্ষাকৃত সরলচিত্ত ডিরোজিও-দল আমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন কিনা কে জানে। কে জানে এত জাতি-সম্প্রদায়-বিখণ্ডিত এত শাস্ত্র-উপশাস্ত্র-ভার-ক্লিষ্ট এত পূর্ণাবতার-খণ্ডাবতার-নিপীড়িত বাঙালি-জীবন আবার কোনোদিন বলবে কি না—Derozio, Bengal hath need of thee।

৪

রামমোহনের শ্রেষ্ঠ দান কি তা নিয়ে আগেও বাংলাদেশে তর্কবিতর্ক হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্যও যে সে তর্কবিতর্কের প্রয়োজনীয়তা চুকে গেছে তা নয়। তবে যে সমস্ত বাদ প্রতিবাদ হয়েছে তার মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বাদানুবাদই সুবিখ্যাত। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। হাফেজের

যে সব লাইন তাঁর অতিপ্রিয় ছিল তার একটি এই—হরগিজ মোহ্‌রে তু আজ্‌ লওহে দিল্‌ ও জাঁ ন বরদ্‌ (তোমার ছাপ আমার চিত্তফলক থেকে কিছুতেই মুছবে না), তাঁর জীবনের সমস্ত সম্পদ বিপদের ভিতর দিয়ে তাঁর এই প্রেমের পরিচয় তাঁর দেশবাসীরা পেয়েছেন। প্রথম জীবনেই যে পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল তা কঠোর—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সর্বস্ব দানে তিনি পিতৃঋণ হতে উদ্ধার পাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। সত্যের যাত্রাপথে 'মহান মৃত্যুর' এমনিভাবে সম্মুখীন হওয়া সমস্ত বাঙালি-জীবনে এক মহাঘটনা যাকে বেষ্টন করে বাংলার ভাবস্রোতের নৃত্য চলতে পারে—হয়তো চলেছে। কিন্তু গুহা পথের যাত্রী হয়েও দেবেন্দ্রনাথ গভীরভাবে জ্ঞানানুরাগী ও সৌন্দর্যানুরাগী ছিলেন। তবু, সংসারনিষ্ঠা, জ্ঞানানুশীলন, সৌন্দর্যস্পৃহা সমস্তের ভিতরে ঈশ্বর-প্রেমই ছিল তাঁর অন্তরের অন্তরতম বস্তু। তাই তিনি যে রামমোহনকে মুখ্যত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারকরূপে দেখবেন এ স্বাভাবিক।— কিন্তু অক্ষয়কুমার ছিলেন জ্ঞান-পিপাসু; সে পিপাসা এমন প্রবল যে এত দিনেও বাংলাদেশে সে রকম লোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অক্ষয়কুমার মত ... বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার। জ্ঞানানুশীলন ... এত বড় জিনিষ ছিল যে এ ভিন্ন অন্য রকমের প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতেন না। তাঁর সেই সুবিখ্যাত সমীকরণ বাংলার চিন্তার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। শুধু প্রার্থনার যে কিছুমাত্র কার্যকারিতা নাই তা প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি লিখেছেন—কৃষক পরিশ্রম করে শস্য উৎপাদন করে প্রার্থনা করে নয়। একেই তিনি একটি সমীকরণের রূপ দিয়েছেন এইভাবে :

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য
পরিশ্রম = শস্য
প্রার্থনা = ০

অক্ষয়কুমারের এই মনোভাব কিছুদিন ব্রাহ্ম সমাজে ও সেইদিনের ছাত্র মহলে কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব ব্রাহ্ম সমাজে অক্ষুণ্ন হয় নাই—হয়তো বা দেশের বৃহত্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই।

শেষ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যানই রামমোহনের পরে ব্রাহ্ম সমাজ গ্রহণ করেছিল; আর নানা বিপর্যয়ের পর আজো তাঁর নির্দেশই হয়তো অধিকাংশ ব্রাহ্মের জীবনে কার্যকরী রয়েছে।

কারো কারো বিশ্বাস দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের যে রূপ দিয়েছিলেন তা রামমোহনের উদ্দেশ্য-আদর্শ থেকে পৃথক বস্তু। কিন্তু তা সত্য নয় এই জন্য যে যে -দ্বৈতবাদের উপর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি পত্তন করেছিলেন রামমোহনের জীবনে তারই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সত্য বটে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষা অবলম্বন করেছিলেন; কিন্তু শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তাঁর মতভেদ বিস্তর; এমনকি,

অধিকাংশ হিন্দু সাধক ও দার্শনিকের অবলম্বিত Pantheistic God-এর চাইতে হিব্রু প্রফেটদের ব্যক্তিত্ব সমন্বিত পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের নিয়ামক ঈশ্বরের দিকেই তাঁর চিত্তের প্রবণতা হয়তো বেশি ছিল। তবে রামমোহনের চিত্তের প্রসার ছিল অনেক বেশি, তাই ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের যে রূপ দিয়েছিলেন, কর্মী জ্ঞানী ও অন্তঃপ্রবাহী-ভক্তিরস-সমন্বিত রামমোহনের বিরাট ইচ্ছাধারা তাতে অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হতে পারবে তা আশা করা সঙ্গত নয়। কোনো বড় স্রষ্টাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পুরোপুরি ধরা পড়েন নাই; রামমোহনের সূচিত ব্রাহ্ম-সমাজ যদি তাঁর বিরাট চিত্তের প্রতিচ্ছবি না হয়ে থাকে তবে তাতে দুঃখ করবার বিশেষ কিছু নাই।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের যে রূপ দিয়েছিলেন তাতে যে শুধু তাঁর ভক্তি-উচ্ছ্বসিত চিত্তের তরঙ্গাভিঘাতই বুঝতে পারা গেছে তা সত্য নয়। ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তিভূমি নির্ণয়ে তিনি যে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তাতে দেশের চিত্ত-বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর একটি বড় আসন লাভ হয়েছে। প্রথমে বেদকে ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেছে বেদের সবকিছু আশানুরূপ সুন্দর নয়। তারপর তিনি নির্ভর করেছেন উপনিষদের উপর। সেখানেও মুশকিল যে উপনিষদ বহু, বহু রকমের, তার উপর শুধু দ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনই নয় অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনের সংখ্যাও তাতে কম নয়। এই সঙ্কটে জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমারের পরামর্শমতো 'আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' এর উপর ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা হলো। এইভাবে মানুষের চিত্তকে যে নতুন করে এক গরীয়ান আসন দেওয়া হলো, তার অর্থ কত, ইঙ্গিত কি বিপুল, দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার জাতীয় জীবনের সামনে থেকে আজ সে সব চিন্তা দূরে স্থিত। তাই জাতীয় জীবনে অক্ষয় কুমার-দেবেন্দ্রনাথের এই দানের জন্য তাঁদের প্রতি তাঁদের স্বদেশবাসীদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন আজো তেমন পর্যাপ্ত নয়।

৫

আমরা বলেছি বাংলায় এ পর্যন্ত যে চিন্তা ও কর্মধারার বিকাশ হয়েছে তাতে মধ্যযুগীয় প্রভাব বেশি। দেবেন্দ্রনাথের কার্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি মানুষের চিত্তকে ব্রহ্ম-পাদপীঠ বলে সম্মান দিয়েছেন, শুধু প্রাচীন ঋষিদের যে কেবল সে অধিকার ছিল তা তিনি মানেন নাই।—কিন্তু এই আবিষ্কৃত সত্যের পুরো ব্যবহারে তিনি যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করেছেন। এই 'আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' কথাটি তিনি পেয়েছেন উপনিষদ থেকে—নিজের জীবনের ভিতরে এ কথার সায় তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। কিন্তু অনন্ত প্রয়োজনতাড়িত মানুষকে এই অমৃতের সাধনা জীবনের সমস্ত কর্ম সমস্ত অবসর সমস্ত প্রার্থনা সমস্ত অপ্রার্থনার ভিতর দিয়ে করতে হবে শুধু বিধিবদ্ধ প্রার্থনার ভিতর দিয়েই নয়—এতটা অগ্রসর

হতে তিনি যেন পশ্চাৎপদ হয়েছেন। হয়তো বৃহত্তর মনীষা নিয়ে তিনি যদি অক্ষয়কুমারকে আত্মসাৎ করতে পারতেন তাহলে ব্রাহ্ম সমাজ তাঁর হাতে যে রূপ লাভ করত তা দেশের পক্ষে আরো কল্যাণদায়ক হতো।

দেবেন্দ্রনাথের এই যে অন্তরে অন্তরে সেই ব্রহ্মোল্লাস অনুভব করা; সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞান ও কর্মের ভিতর দিয়ে শ্রেয়ের অন্বেষণ করে যাবে, সে অন্বেষণে মুখের প্রার্থনার প্রয়োজন সে অনুভব করতে পারে, নাও পারে; —অনন্ত কর্ম ও প্রেমপুলকিত মানুষের জীবনে তার আরাধ্য হয়তো তারই জীবনের সুরভি, হয়তো তার জ্ঞাননেত্রে বিশ্বজগতের নিয়ামক, হয়তো বিশ্বজগতের জন্য তার প্রেমের বন্ধন, হয়তো কর্ম ক্ষেত্রে তার চিরজাগ্রত নেতা—অক্ষয়কুমারের ভিতর দিয়ে উৎসারিত এই আধুনিক মনোভাবকে যে তিনি তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেন নাই, এইখানেই তাঁর মধ্যযুগীয়ত্ব; এবং আধুনিক জীবনোপযোগী জ্ঞানানুরাগ সুমার্জিত জীবন-যাপন ইত্যাদি সত্ত্বেও তিনি যে বৃদ্ধবয়সে ভাবের আতিশয্যে নৃত্য করতে পেরেছিলেন হয়তো তাঁর এই প্রগলভা মধ্যযুগীয় ভক্তিই তার কারণ। অবশ্য মধ্যযুগীয় বলে সে জিনিষটি যে তাচ্ছিল্য বা অসম্ভ্রমের চক্ষে আমরা দেখতে প্রয়াস পাচ্ছি সে কথা মনে করলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হবে। এখানে শুধু এই কথাটি আমরা বলতে চাচ্ছি যে এত চেষ্টা সত্ত্বেও আধুনিক অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার সামর্থ্য যে আমাদের হচ্ছে না তার এক বড় কারণ—আমাদের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁরাও খুব কমই আধুনিক জীবনের দিকে তাকিয়েছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হন। তাঁর উপর খ্রিস্টের জীবন ও বাইবেলের প্রভাব বিশেষ রূপে কার্যকরী হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির যে বিশেষ পার্থক্য ছিল অনেকেই সে কথা বলেছেন। কিন্তু এক জায়গায় বড় গভীর মিলও ছিল, সেখানে হয়তো কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথেরই মানসপুত্র—সেটি প্রগলভা ভক্তি। দেবেন্দ্রনাথ রাশভারি লোক ছিলেন, তাই তাঁর অন্তরের এই প্রগলভা ভক্তি তাঁর বাইরের চেহারা ক্বচিৎ আলুথালু করতে পেরেছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র আজন্ম 'অগ্নিমন্ত্রে'র উপাসক; এই প্রগলভা ভক্তি তাঁকে প্রায় সব ধর্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির দিকে নিয়ে গেছে, নিত্য নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে, আর শেষে জগতের সমস্ত ধর্মের সার সংগ্রহ করে এক 'নববিধান' বা নবধর্মের পত্তনে অনুপ্রাণিত করেছে। কেশবচন্দ্র যে শেষ বয়সে পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন সেটি কিছুমাত্র আশ্চর্য বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। বাংলার চির-পরিচিত প্রগলভা ভক্তি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার এই এক অদ্ভুত পুরুষ রামকৃষ্ণের জীবনে আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছিল; যাঁর প্রেরণায় কেশবচন্দ্র আজীবন নানা পথে

ছোটাছুটি করেছেন তা অমন পর্যাপ্ত পরিমাণে কারো ভিতরে সঞ্চিত দেখতে পেলে সেখানে তিনি যে নিজেকে বিকিয়ে দেবেন এ যেমন স্বাভাবিক তেমনি সঙ্গত।

৬

সব ধর্মই কি সত্য? এ প্রশ্নের মীমাংসায় রামমোহন বলেছিলেন—বিভিন্ন ধর্মের ভিতরে পরস্পরবিরোধী অনেক নিত্যবিধি বর্তমান তাই সব ধর্মই সত্য একথা মানা যায় না, তবে সব ধর্মের ভিতরেই সত্য আছে। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এই মীমাংসা মেনে চলেছিলেন বলতে পারা যায় যদিও উপনিষদের দিকে তিনি বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ভক্তিপ্রধান প্রকৃতির কাছে রাজার এ মীমাংসা ব্যর্থ হলো। তিনি বললেন—'Our position is not that there are truths in all religions, but that all established religions of the world are true.' এই কথাই রামকৃষ্ণ আরো সোজা করে বললেন—যত মত তত পথ।—যত মত তত পথ তো নিশ্চয়ই; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—সে সব পথ একই গন্তব্য স্থানে নিয়ে যায় কি না। রামকৃষ্ণ বললেন—হাঁ, তাই যায়, তিনি সাধনা করে দেখেছেন শাক্ত বৈষ্ণব বেদান্ত সুফী খ্রিস্টান ইত্যাদি সব পথই এক 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দের' অনুভূতিতে নিয়ে যায়। এ সব কথার সামনে তর্ক বৃথা। তবে এই একটি কথা বলা যেতে পারে যে মানুষ অনেক সময়ে বেশি করে যা ভাবে চোখেও সে তাই দেখে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেউ বলেছেন অবতার, কেউ বলেছেন উন্মাদ, কিন্তু যিনি যাই বলুন বাংলার হিন্দু-চিত্তের উপর তাঁর কথার প্রভাব যে অত্যন্ত বেশি তাতে সন্দেহ নাই। পৌরাণিক ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থানে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু জনসাধারণের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে—পৌরাণিক ধর্মের কিছুই বাজে নয়, তারই পরতে পরতে রয়েছে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ হয়তো বা তার চাইতেও ভাল কিছু।

৭

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মচর্চার উপরে যে একটা মধ্যযুগীয় ছাপ মারা রয়েছে তা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাংলার নববিকশিত সাহিত্যে যেন মধুসূদন আশ্চর্য উদার চিত্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; জাতি ধর্ম ইত্যাদির সংকীর্ণতা যেন জীবনে ক্ষণকালের জন্যও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই; আর এই উদারচিত্ত কবি ইয়োরোপের ও ভারতের প্রাচীন কাব্যকলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে ভাবে অবলীলাক্রমে আহরণ করে তাঁর স্বদেশবাসীদের উপহার দিয়েছেন সে কথা বাঙালি চিরদিনই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তারপরে সাহিত্যের যে নেতা বাঙালি জীবনের

উপর একটা অক্ষয় ছাপ রেখে গেছেন তিনিও প্রথম জীবনে শিল্পী সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা অস্পৃষ্ট। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে কবিজনসুলভ স্বপ্ন কম। তিনি বরং নিপুণ চিত্রকর ও বাস্তববাদী স্বদেশপ্রেমিক। তাই তাঁর যে অমর কীর্তি, 'আনন্দমঠ', তাতে হয়তো নায়ক নায়িকার গূঢ় আনন্দ বেদনার রেখাপাত নাই, হয়তো এমন কোনো সৌন্দর্য-মূর্তি আঁকা হয় নাই যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের নয়নে প্রতিভাত হবে a thing of beauty আর সেই জন্য a joy for ever; কিন্তু তবু এটি অমর এই জন্য যে এতে যেন লেখক কি একটা আশ্চর্য ক্ষমতায় পাঠকের সামনে প্রসারিত করে ধরেছেন দেশের দুর্দশা মথিত তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়—যে হৃদয় তাঁর সুগভীর বাস্তবতার জন্যই সৌন্দর্যের এক রহস্যময় খনি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত শিল্পের ক্ষেত্রে থাকতে পারেন নাই। শেষ বয়সে ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি অবতরণ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রাখ্যায়করা বলেন, শেষ বয়সে আত্মীয় বিয়োগে অধীর হয়ে তিনি ধর্মে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ চরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রম স্বীকার করেছেন, যে সুবৃহৎ আদর্শ স্বজাতির সামনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন তাকে আর্তের কর্ম না বলাই সঙ্গত।—বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মালোচনায়ও দেখতে পাওয়া যায় তার দেশ হিতৈষণা ; তবু বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত দেশের অগ্রগতিকে খানিকটা সাহায্য করলেও বেশি সাহায্য করতে পারে নাই; কেননা দেশ বলতে কেমন করে তিনি বুঝেছিলেন দেশের হিন্দু—তাও আবার সকল হিন্দু নয়, সমসাময়িক সংস্কারকদের হাতে যে হিন্দু কিছু দিশাহারা হয়ে পড়েছিল সেই হিন্দু। এখানেও তাঁর সেই স্বদেশপ্রেম;– কিন্তু এ প্রেম খুব গভীর হলেও কিছু একরোখা, তাই শেষ পর্যন্ত জাতির ত্রাণকর্তার বড় আসন তাঁর স্বদেশবাসীরা হয়তো তাঁকে দিতে পারবেন না।

জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধনায় রামমোহনের সুর শেষ পর্যন্ত তাঁর পশ্চাদবর্তীরা রাখতে পারেন নাই; সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি মধুসূদন যে গ্রামে সুর ধরেছিলেন তা নেমে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রই যখন নিজেকে দেশের কল্যাণের রাজপথে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলেন না 'অন্যে পরে কা কথা'। তাই তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনার পরিমাণ যতই বেশি হোক, দশের করতালিতে যতই তাঁদের সাহিত্যিক জীবন মুখরিত হয়ে থাকুক, বাংলার চিত্তের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য তাঁরা কিছুই করতে পারেন নাই বললে চলে; বরং ধর্মের ক্ষেত্রে যে মধ্যযুগীয় ভাবোন্মত্ততা সুপ্রকট হয়ে উঠল, নানাভাবে তাকেই তাঁরা প্রদক্ষিণ করেছেন।

৮

কিন্তু বাংলাদেশ এমনিতর একটা প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়েই চলেছে, বৃহত্তর জীবনের দিকে তার গতি রুদ্ধ, এতটা বলতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হবে। রামমোহন যে কর্ম ও চিন্তার সূচনা করে গেলেন ও তাঁর পরে কেশবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে তার যে একটি প্রতিক্রিয়া হলো, এসব বিরোধ কোনো এক বীর্যবান সামঞ্জস্যে উপনীত হয় নাই ও তার জন্য বাঙালির জাতীয় চরিত্র ও কর্মধারা একটা সুদর্শন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নাই, এ সত্য; কিন্তু এ বিরোধ চুকিয়ে দিয়ে একটা উদার বীর্যবন্ত জাতীয়তার দিকে চোখ কারোই যে নাই তা সত্য নয়। জাতির এ নব প্রয়োজন দুইজন চিন্তা ও কর্মবীরের জীবনের ভিতর দিয়ে ফুটেছে—একজন বিবেকানন্দ, অপরজন রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ পরম-হংস রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি ব্যাপারটি আমরা বুঝি আর নাই বুঝি কিন্তু এ সত্য যে তিনি বারবার জোর দিয়েছেন জগৎ-হিতের উপর। এ উপেক্ষা করে বিবেকানন্দ মুক্তির প্রার্থী হয়েছিলেন, তার জন্য তিনি তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের ভিতরে দোষ কম নয়,—প্রথমত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র মতো সব সময়ে তিনি যেন বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে লড়বার জন্য তৈয়ার, দ্বিতীয়ত সন্ন্যাস ও বেদান্তের তিনি গোঁড়া, তৃতীয়ত ব্রাহ্মদের যে তিনি নিন্দা করেছেন তাদের ঐতিহাসিক বোধ নাই বলে সে অভিযোগটি তাঁর সম্বন্ধেও খাটে—ব্রাহ্মদের সংস্কারের প্রয়াসের কোনো অর্থ তিনি যেন পান নাই; অথচ তিনি নিজে একজন ছোট-খাট সংস্কারক ছিলেন না; চতুর্থত ভারত আধ্যাত্মিক, ইয়োরোপ জড়বাদী, ভারতকে ইয়োরোপের আচার্য হতে হবে, এই ধরনের কতকগুলো কথা প্রচার করে স্বজাতির অন্তঃসারশূন্য দম্ভের সহায়তাই তিনি বেশি করেছেন;—তবু মোটের উপর এই বীরহৃদয় সন্ন্যাসী সত্যকার স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন—হয়তো মানবপ্রেমিকও ছিলেন। তাই সেবাশ্রম প্রভৃতির সূচনা করে জাতীয় জীবনে তিনি যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র রচনা করেছেন জাতির চিত্ত-প্রসারের জন্য বাস্তবিকই তা অমূল্য; এবং জাতীয় জীবনের দৈন্যের জন্য নানা ক্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এই সব প্রতিষ্ঠান বাংলার হিন্দু যুবককে দেশের সত্যকার সন্তান হতে যে অনেকখানি সাহায্য করছে তাতে সন্দেহ নাই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার যে রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্কীর্ণতা ভেঙে তাকে বৃহত্তর করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদর্শের অনুপ্রেরণা এ পর্যন্ত বাংলার জাতীয় জীবনে কমই অনুভূত হয়েছে; এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ত্বের আদর্শই দেশের জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে

রয়েছে, বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাও আবার সূক্ষ্ম-শিল্পী গীতিকবি; তাই যে মহা-মানবতার গান তিনি গেয়েছেন আমাদের দেশের স্থূল-প্রকৃতি জনসাধারণের জীবনে কতদিনে তার স্পন্দন জাগবে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

৯

হিন্দুর নিজের ভিতরেই মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংগ্রামের যখন এই চেহারা,—তখন আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে ভাবে উঠেছে তা একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের দুর্দশার প্রমাণ। মুসলমানের দুর্দশা এই জন্য যে এ সংগ্রামে সে যেভাবে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখে তা থেকে বুঝতে পারা যায় তার স্বপ্ন দেখারই অবস্থা। বাস্তবিক মুসলমানের অবস্থা খুবই বিস্ময়কর—এতদিন ধরে পরিবর্তিত অবস্থায় বাস করেও তন্দ্রার ঘোরে দুই একটি প্যান-ইসলামী বোলচাল দেওয়া ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনোরূপ জাগ্রত চিত্ততার পরিচয় সে আজ পর্যন্ত দেয় নাই।—আর হিন্দুর জন্য আফসোসের এই জন্য যে তার এত সংস্কার চেষ্টা এত সাধনা সত্ত্বেও এই সমস্যার একটা মীমাংসা করবার সামর্থ্য তার হলো না। এই হিন্দু মুসলমান সমস্যা যেন হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে বিধাতার জ্বালা এক তীব্র আলো,—এর ঔজ্জ্বল্যে আমরা দেখে নিতে পারছি—বর্তমান জগতের জ্ঞান ও কর্মের উৎসবে আমাদের স্থান কোথায়।

বাংলার যে প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তা অনেক সময়ে এমন সামান্য কারণে হয়েছে যা থেকে বুঝতে পারা যায় প্রাচীন সংস্কার বাঙালির জীবনে কত বদ্ধমূল—চোখ খুলে জগতকে দেখতে সে কত নারাজ। এরই সঙ্গে এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে বাঙালি এ পর্যন্ত তার চোখ খোলার সাধনার বড় সাধক রামমোহনকে মোটের উপর প্রত্যাখ্যান করে এসেছে।—এই প্রত্যাখ্যানের কারণ সম্বন্ধে দুটি কথা বলা যেতে পারে—প্রথমত বাঙালি সাধারণত ভাবপ্রবণ, আর রামমোহন লোকটি যেন আগাগোড়া নিরেট কাণ্ডজ্ঞান, দ্বিতীয়ত বাঙালি হিন্দুর পরম আদরের প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তিনি বেশ উঁচু গলায় কথা বলেছেন।—এই প্রতিবাদকারী অথচ মহাপ্রাণ রামমোহনকে বাঙালি হিন্দু শেষ পর্যন্ত কিভাবে গ্রহণ করবে বলা সহজ নয়। কিন্তু বিশ্বজগতের দিকে বাস্তবিকই যদি তার চোখ পড়ে তাহলে সে হয়তো দেখবে—এই প্রতিবাদকারীর কথার ভিতরেই সত্যের পরিমাণ বেশি, তাই তাঁর পথ-নির্দেশই অনেক পরিমাণে কল্যাণ-পথের নির্দেশ। তাছাড়া রামমোহনকে গ্রহণ করা বাঙালি হিন্দুর জন্য সে শুধু আয়াস-সাধ্যই হবে এটি সঙ্গত নয় এই জন্য যে রামমোহনও বাঙালি সন্তান, শুধু তাই নয়, তাঁর বিশাল দেহের ভিতরে যে চিত্তটি ছিল সমস্ত অভিনবত্ব সত্ত্বেও তা বাঙালিরই কোমল চিত্ত।

মনে হয়, বাঙালির রামমোহনকে গ্রহণ করার সব চাইতে বড় অন্তরায় এইখানে যে সে সাধারণত ঘর-মুখো আর রামমোহন আবাল্য ঘর-মুখো ছিলেন না। এই বাহিরমুখো হওয়ার সাধনাই হয়তো বর্তমান বাঙালি জীবনে বড়ই সাধনা—হয়তো এরই সাহায্যে সবলতর কাণ্ডজ্ঞান শ্রেষ্ঠতর পৌরুষ ইত্যাদি কল্যাণ-পথের সম্বল আহরণ তার পক্ষে সহজ হবে। আর এই বাহিরমুখো হওয়ার উপায়ও তার অতি নিকটে। দৈব ঘটনায় বহু জাত বহু সম্প্রদায় দেশের বুকে এক জায়গায় মিলেছে, সেই মিলনকে অন্তরের দিক দিয়ে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে বাহিরমুখো হওয়ার বড় উপায়—বাঙালির সৌভাগ্য-রূপী তার এ যুগের কবি বারবার একথা বলেছেন।

এরই সঙ্গে মুসলমানের সত্যকার জাগরণ যদি সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ তার নিজের ধর্মাদর্শ ও সভ্যতার ভিতর থেকে এক নব জীবনের প্রেরণা সে যদি লাভ করতে পারে; তাহলে কিছু বেশি সুফল লাভের সম্ভাবনা। যে গুরু তাকে উপদেশ দিয়েছেন—ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নামাজ পড়ো, তাঁর অনুবর্তিতায় বস্তুতন্ত্র হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। আবার সেই জন্যই বস্তুর শিকলে বন্দি হওয়াও তার পক্ষে কম স্বাভাবিক নয়। ফলে মুসলমানের হয়েছেও তাই।—এই মনের বন্ধন সহজভাবে চুকিয়ে দিয়ে মুসলমান নব মানবতার ধ্বজা বহন করবার যোগ্য হবে কিনা, অথবা কতদিনে হবে জানি না। যদি হয়, তবে বাংলার কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে তার দান কম হবে না—তাহলে স্বাপ্নিক হিন্দু ও বস্তুতন্ত্র মুসলমান এ দুয়ের মিলনে বাংলার যে অভিনব জাতীয় জীবন গঠিত হবে—তার কীর্তিকথা বর্ণনা করবার ভার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকের উপর থাকুক।

বাংলার লুপ্ত শিল্প

রকিবউদ্দীন আহমদ

বাংলার শিল্পের ইতিহাস এক বিপুল ব্যর্থতার ইতিহাস। একদিন ছিল যখন বাংলার প্রতি জনপদে ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো না কোনো গৃহ শিল্পের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হইত; কাল পরিবর্তনের অপ্রতিহত প্রভাবে আজ যেন ঐ সকল দূরান্তে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বর্তমানে আর্থিক সমস্যার নিপীড়নে অধিকাংশ বাঙালিই জীবন ধারণে অক্ষম; আর শ্রমিকদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় সেই জীবন বড়ই নীরস; বড়ই উদাস; উহাতে স্বাদ নাই,—আছে শুধু অতীতের অতি ক্ষুদ্র করুণ মধুর ক্ষীণ স্মৃতিটুকু, আর তারই জড়িত সুখ স্বপনের ক্ষীণতর পুলক-শিহরণ!

আজকাল বাঙালির সর্বপ্রধান ব্যবসায় কৃষিকর্ম কিন্তু এই ব্যবসায় কোনো অর্থনৈতিক পরিণতি (Economic Evolution) অথবা বাংলার আর্থিক অবস্থার জন্য বিকাশের ফল নহে। ইহা একদিকে বিদেশী শিল্পের অবৈধ প্রতিযোগিতা ও অপরদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় আপেক্ষিক ব্যয় বাদের (Theory of Comparative Cost) প্রত্যক্ষ পরিণাম। এই নিয়মের বশীভূত হইয়া প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যে দেশ যে দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে (best relative advantage) উৎপাদন করিতে পারে, সেই দেশ কেবল সেই দ্রব্যই উৎপন্ন করয়া তৎপরিবর্তে অন্যান্য দেশ হইতে অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। থিওরির দিক দিয়া ইহা অর্থশাস্ত্রের একটি সুন্দর ব্যবস্থা বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে উহার যে সকল অশুভ ব্যতিক্রম সংঘটিত হয়—বিশেষত যখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা একীভূত হইয়া পড়ে—তখন অর্থনৈয়ায়িকের অগাধ পাণ্ডিত্যেও কোনো সুফল হয় না। অবাধ বাণিজ্য (Free trade) সকলেরই অভিলষিত; তবু সকল দেশেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংরক্ষণনীতির (Protection) প্রয়োজন কেন? কারণ জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হইয়া আজও মানুষ রাজনীতির শাসনে অর্থনীতিকে চাপিয়া রাখিতে চায়।

অর্থশাস্ত্রে একটা কথা আছে 'Exports pay for the imports'—অর্থাৎ আমরা বিদেশ হইতে যত টাকার মাল আমদানি করি ঠিক তত টাকার মাল আমাদিগকেও বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমনের পূর্বে

বাংলাদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হইত তার অধিকাংশই ছিল শিল্পদ্রব্য; এক্ষণে আর্থিক ও অন্যবিধ ঐতিহাসিক কারণে ঐ সকল শিল্প নষ্ট হওয়ায় বাঙালি-শিল্পিগণ কৃষিক্ষেত্রে বিতাড়িত হইয়া বিদেশী শিল্প-যন্ত্রের খাদ্য সরবরাহ করিতেছে। পূর্বে যে সকল পণ্য দ্রব্য বাংলাদেশে উৎপান্ন হইত, তন্মধ্যে মসলিন, সিল্ক, তসর, পট্টবস্ত্র, কাগজ, চিনি, লৌহ, লবণ, নীল, চা, বাঁশের জিনিষ, শাঁখা, মাটির বাসন এবং নানা ... বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বস্ত্রশিল্প

অতি প্রাচীন কালেও ভারতীয় বস্ত্র সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। মি. ইয়েটস তাহার 'Tesitrinum Antipuorum' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে খ্রিস্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্বে ভারতের কার্পাস-বস্ত্র গ্রীস দেশে বিক্রীত হইত। প্রফেসর উইলসন তদীয় 'Introduction to the Rigveda Samhita' নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে দিন সহস্র বৎসর পূর্বেও ভারতের বস্ত্র-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এরিয়েন তাহার 'Periplus of the Erythrean Sea' নামক পত্রিকায় বঙ্গের মসলিনের কথা লিখিয়াছেন।

বয়ন ও বস্ত্র-শিল্পের জন্য ঢাকা জিলা বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় ছিল। প্রাচীন যুগে বেবিলনিয়া ও এশিরিয়ার চরম সভ্যতার দিনেও ঢাকাই মসলিন জগতের আদরণীয় হইয়াছিল—এই কথা ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন। বাংলার শিল্পদ্রব্য নৌকা যোগে প্রাচীন প্যালেস্টাইন বন্দরে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হইত। মসলীন ব্যবসায়ের সাহায্যে আধুনিক সভ্যতার পথপ্রদর্শক রোমক নগরী শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। ডা. ইউরি তদীয় 'Cotton : Manufacture of Great Britain' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'Muslim of Dacca Constituted the Seriac vestes which were so highly prized by the ladies of Imperial Rome in the days of its luxury & refinement.'

যদিও অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঢাকাতে মসলিন প্রস্তুত হইত; তথাপি মুসলমানদের সম্বন্ধেই এই শিল্প উন্নতির চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। মসলিন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অত্যন্ত প্রিয় বস্ত্র ছিল; এই জন্য দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর মসলিন শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাট ঔরঙ্গজেবও মসলিনের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন; এমনকি যাহাতে এই বস্ত্র বিদেশে না যাইতে পারে এই জন্য রাজাদেশ প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আরো দেখিতে পাওয়া যায় যে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে মসলিন বস্ত্রের বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট নাম ছিল না; তাঁহারাই বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্যানুসারে মসলিনকে, ঝুনা রং, সরকারী আলী, খাসা, শবনম, আবরোচান, আলাবাল্ল তাঞ্জেক তরন্দাম

নয়ন-সুক, বদন-খান, সেরবন্দ, সরবতি, কুমিস ডুড়িয়া খার খান (ছয় প্রকার— নন্দন সাহী, থানার দাস, সাকুতা, বাছাদার, কুস্তিকার) জামদানি, মলমলখান ও জঙ্গলখান ইত্যাদি মুসলমানি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ঝুনা শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম। 'ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ ইহাকে অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন দেব বালাগণের কোমল করসম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।' টেইলর সাহেব তাহার 'Topography of Dacca' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'Those gossamer like muslins were made which have been compared (?) to the work of fairies rather than of men.'

ফারসি খাসা শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। এই বস্ত্রকে আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে 'কষাক' নাম প্রদান করিয়াছেন। সর্বোৎকৃষ্ট মলমলের নামই জঙ্গল খান। মলমলে খাসা সাধারণত দিল্লীর সম্রাটগণের ব্যবহারের জন্যই প্রস্তুত হইত। উহা এইরূপ সূক্ষ্ম ছিল যে ২০ হস্ত দৈর্ঘ্য ও একগজ প্রস্থ একখানা বস্ত্রখণ্ড একটি অঙ্গুরীয়কের ছিদ্রের ভিতর দিয়া একদিক হইতে অনায়াসে অপর দিকে টানিয়া লওয়া যাইত। উহার ওজন প্রায় ৮ তোলা এবং মূল্য তৎকালেই প্রায় ১০০ টাকা ছিল।

'শবনম' শব্দের অর্থ 'সান্ধ্য শিশির'। সন্ধ্যাকালে উহাকে শ্যামল ঘাসের উপর আস্তীর্ণ করিয়া রাখিলে প্রাতে শিশির নিষিক্ত দুর্বাদল বলিয়া ভ্রম হইত। বোল্ট সাহেবের 'Consideration in the Affairs of India' গ্রন্থে একটা গল্প আছে যে একদিন পরীক্ষাস্থলে নবাব আলিবর্দি খাঁ এক খণ্ড শবনম মলমল তৃণের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, ঘাসভ্রমে একটি গাভী ঐ বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড উদরসাৎ করিয়াছিল।

'আবরোচান' শব্দের অর্থ 'স্বচ্ছ-সলিলা'। ইহা জলের সহিত এইরূপ ভাবে মিশিয়া যাইত যে জল হইতে উত্তোলন না করিলে কেহ উহাকে চিনিতে পারিত না। জামদানি কাপড়ের বয়ন কার্যে ২০০ হইতে ২৫০ নম্বরের সুতা ব্যবহৃত হইত। ভারতসম্রাট ঔরঙ্গজেব এই বস্ত্রের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। উহার মূল্য অন্যূন ২৫০ টাকা ছিল। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে নায়েব নাজিম মুহম্মদ রিজা খাঁ একখানা জামদানি বস্ত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য ৪৫০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই বস্ত্র বিশেষভাবে মোগল সম্রাটদের জন্যই প্রস্তুত হইত। পরবর্তীকালে মুরশিদাবাদের নবাবগণ ইহার রক্ষাকর্তা হইয়াছিলেন। এইরূপে বিভিন্ন নামের মসলিন বিভিন্ন দিক দিয়া বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল।

ইংল্যাণ্ডের মহাসভার নিম্ন বিভাগের (House of commons) আদেশ অনুসারে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Trigonometrical Survey of India' নামক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে 'ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা এই নদনদীত্রয়ের

সঙ্গমস্থলে প্রায় ১৯৬০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূখণ্ডের সমুদয় স্থানেই মসলিন প্রস্তুত হইত। ঢাকা, সোনারগাঁও, ডেমরা ও তিতবদ্দি নামক স্থানে ভুবনবিখ্যাত মলমল প্রস্তুত হইত; এতদ্ব্যতীত নূরাপারা, বালিয়াপাড়া, আবদুল্লাপুর ও কলাকোপা ইত্যাদি স্থানেও নানা প্রকার বস্ত্রের অনেক অনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ঢাকাই মসলিনের প্রতিপত্তি নষ্ট হয় নাই। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা নগরে ৪,৫০,০০০ টাকার, সোনার গাঁয়ে ৩৫,০০০ টাকার, ডেমরাতে ২,৫০,০০০ টাকার ও তিতবদ্দিতে ১,৫০,০০০ টাকার মসলিন প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরে ১,৫০০, সোনার গাঁয়ে ৭০০, ডেমরাতে ৯০০, তিতবদ্দিতে ৩৫০ এবং মুড়াপাড়া, আবদুল্লাপুর ও অন্যান্য স্থানে ৭০০ সর্বশুদ্ধ ৪১৫০ খানা তাঁত ঢাকা জিলাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।' ১৮৬১ অব্দে বিলাতের শিল্প প্রদর্শনীতে ঢাকাই মসলিনের সঙ্গে ইউরোপীয় মসলিনের তুলনা করা হইলে ঢাকাই মসলিনই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে 'The textile Manufacture and Costumes of the People of India' নামক গ্রন্থে মি. এফ. ওয়াটসন লিখিয়াছেন, 'With all our machinery and wondrous appliances we have hitherto been unable to produce a farbic which for fitness and utility can equal the 'woven air' of Dacca.'

যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য স্থানে মসলিনের যথেষ্ট সমাদর ছিল তথাপি উহার প্রারম্ভকালেই ইউরোপের পথ ইহার জন্য রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঢাকাতে সর্বপ্রথম বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। সেই কুঠির উপরে বর্তমান কলেজিয়েট স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। ফরাসিগণ এই দেশে আসিয়াছিল ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে; কিন্তু ১৭২৬ অব্দের পূর্বে তাহারা ঢাকাতে বাণিজ্য আরম্ভ করিতে পারে নাই। আহসান মঞ্জিলের সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীর পারে তাহাদের কুঠি স্থাপিত ছিল; বর্তমান ফরাসগঞ্জ তাহাদেরই প্রতিষ্ঠিত। টেভারনিয়ারের ভ্রমণকাহিনীতে জানা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওলন্দাজগণ ঢাকাতে ব্যবসা আরম্ভ করে; বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের উত্তর পশ্চিম কোণে তাহাদের কুঠি নির্মিত হইয়াছিল।

'ঢাকার বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি, গৌরব; প্রসার ও প্রতিপত্তি ইউরোপীয় বণিককুলের ঈর্ষানল প্রদীপ্ত করিয়াছিল।' ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত পেইসলি নগরে সর্বপ্রথম ঢাকাই মসলীনের অনুকরণে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হয়; ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তাহাদের সেই চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছিল। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম সূতার কল ব্যবহৃত হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লঙ্কা সারারে মাত্র ৪১টি সূতার কল বিদ্যমান ছিল; ঐ বৎসর ঢাকার শুল্কাগার হইতে ৫০,০০,০০০ টাকার (খরিদ দর)

বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৭৯০ হইতে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঢাকার অধীনস্থ আরং হইতে ১,৩৬,২৬,০১৮ টাকার বস্ত্র ক্রীত হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দ হইতেই যাহাতে ভারতীয় বস্ত্র ইংল্যাণ্ডে পৌছিতে না পারে ইংরেজগণ আইনের সাহায্যে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাই মসলিনের উপর শতকরা ৫ টাকা শুল্ক ধার্য হইল। ইংল্যাণ্ডের কল-কারখানার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু শিল্প (young industries) রক্ষা করিবার জন্য শুল্কের হার আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাব জর্জ বার্ডউড লিখিয়াছেন, '১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে—নটিংহাম নগরে সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইলে ঢাকার মসলিন শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়, ... ইংল্যাণ্ডের শিশু শিল্পের উন্নতিকল্পে এবং শিল্প চাতুর্যে ঢাকার তন্তুবায়গণের সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য মসলিনের উপর শতকরা ৭৫ টাকা কর সংস্থাপিত হইয়াছিল। এত অধিক পরিমাণ শুল্ক দিতে হওয়ায় ঢাকার বস্ত্র ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্রাদির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। সুতরাং ঢাকার বস্ত্র-শিল্প উত্তরোত্তর বিলুপ্ত হইতে লাগিল।' 'Imperial Gazetteer of India : Eastern Bengal and Assam' গ্রন্থে লিখিত আছে, 'Dacca Muslins were intruduced in England about 1670, and the trade flourished till the end of the 18th Century, as much as 30 or 40 lakhs being expended annually in the purchase of cloths for export to Europe. The Industry could not, however, compete with English peice-goods made by machinery; and in 1807 had fallen in value to 8.5 lakhs and by 1813 to 3.5 lakhs while since 1817, when till commercial Residency was closed the export to Europe may be said to have ceased.' ডা. টেলর তদীয় 'Topography of Dacca' নামক পুস্তকে এই একই কথা বিবৃত করিয়াছেন।

এইদিকে তন্তুবায়দিগের অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হইতে চলিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই দেশে আসিয়া দালালের সাহায্যে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। তন্তুবায়গণ এক বৎসরে যেই পরিমাণ টাকার মাল সংগ্রহ করিতে পারিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে উহার চেয়ে অনেক বেশি দাদন দেওয়া হইত; এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া তাহারা প্রতিনিয়ত ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিল। উইলিয়ম বোল্ট শিল্পীদের জীবনকাহিনী লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন— 'They have been treated also with such injuries that instances have been known of cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind silk.'

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে মি. হাসকিসন ভারতীয় বস্ত্র-শুল্ক হ্রাস করিয়া শতকরা ১০ টাকায় পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অসাময়িক অনুগ্রহে ঢাকাই বস্ত্র আর উন্নতি লাভ করিতে পারিল না। কারণ তখন বিলাতি সূক্ষ্ম বস্ত্র এই দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইতেছিল। তখনকার বিলাতি ও দেশী সূতার মূল্য-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কাপড়	ঢাকায় প্রস্তুত	কলে প্রস্তুত
১নং ছোট বুটদার জামদানি	২৫ টাকা	৮ টাকা
২নং ছোট বুটদার জামদানি	১৬ ,,	৫ ,,
জামদানি মেহিপস	২৭-২৮ ,,	৬ ,,
১নং জঙ্গল খাস	৩৮-৪০ ,,	২০-২২ ,,
২নং জঙ্গল খাস	২৪-২৫ ,,	৯-১০ ,,
মলমল	১০-১১ ,,	৭-৮ ,,
সলিম	২৮-৩০ ,,	১০-১৫ ,,

ঢাকার বস্ত্রশিল্পকে যদি বলপ্রয়োগে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা না হইত তা হইলে আজও উহা বিশ্বমানবের প্রিয়তম পরিচ্ছদ বলিয়া পরিগণিত হইত। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিয়াছেন—'ঢাকার বস্ত্রশিল্প স্বীয় মহিমায় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং এই সুযোগে জগতের ধনরাশি শতমুখী জাহ্নবীর ধারার ন্যায় ভারত সাগরে আসিয়া পতিত হইয়াছিল। ঢাকার শিল্পকুলকে রাজশক্তির বলে, অনুগ্রহ সাহায্যে, আপনাদের পণ্যদ্রব্য জগতের গ্রহণীয় করিতে হয় নাই।' বাস্তবিকই ঢাকার মসলিন বঙ্গের স্বাভাবিক শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সুযোগের অভাবে আজ উহা বিনষ্ট হইয়াছে। এইসকল বিষয় অবলোকন করিয়া 'Topography of Dacca' প্রণেতা মহাপ্রাণ টেলর বড় দুঃখেই লিখিয়াছেন—'From this recapitulation of the more prominent facts connected with the sources of industry in this part of the country, it will be seen that the commercial History of Dacca presents but a melancholy retrospect.'

মসলিন যে শুধু ঢাকা জেলাতেই হইত এমন নহে; ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত সরাইল পরগণাতে 'তঞ্জিব' নামে এক প্রকার মসলিন প্রস্তুত হইত। ইহা ঢাকার 'শবনম' মসলিনের ন্যায় সুন্দর ও সূক্ষ্ম ছিল। উক্ত জেলার চারপাতা গ্রামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লাভের একটা প্রকাণ্ড কারখানা ছিল; উহাতে 'বাপ্তা' নামে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। প্রায় ৫০ বৎসর হইল এই দুইটি শিল্পই বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে সুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে জানা যায় ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরে সুন্দর মসলিন প্রস্তুত হইত।

উভয় স্থানেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠিও ছিল, এক্ষণে তাহার কোনো চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না।

মসলিন ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই নানা প্রকার শিল্প ও অন্যবিধ বস্ত্রশিল্পের বিস্তর অনুষ্ঠান ছিল। পূর্বে মুরশিদাবাদের অধিবাসিগণের প্রধান ব্যবসায় ছিল রেশম শিল্প। তাহারা গুটি পোকা (Co-coons) ও তুঁতগাছের (Mullberry) চাষ করিয়া স্বহস্তে সিল্কের সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত করিত। পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সিল্কের ব্যবসায় আরম্ভ করিলে চীন ও ফরাসি দেশ হইতে গুঁটি পোকার বীজ আনিয়া সিল্কের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তন্তুবায়দিগকে দাদন দেওয়া হইত; ইহার ফলে তাহারা স্বাধীন শিল্পের পদ হইতে ক্রমে দিনমজুরের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ফলে রেশম শিল্পও মসলিনের ন্যায় লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি জার্মান যুদ্ধ চলিতেছিল; হয়তো তাহারই অপ্রত্যক্ষ পরিণাম স্বরূপ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ ক্রিস্টফনিস (Cristofonis, an Italian gentleman in charge of the filatures) জাপান হইতে গুটি পোকা আনাইয়া রেশম শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোনো ফল হইল না। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদাবাদ জেলায় ৩৩ খানা রেশমের বানক (silk filatures) বিদ্যমান ছিল। শুধু ইংরেজদের কুঠি হইতে প্রতি বৎসর ২,২৮,০০০ পাউণ্ড অনুমান ১৭,১০,০০০ টাকার রেশমী সূতা ইউরোপে রপ্তানি করা হইত। এতদ্ব্যতীত দেশী শিল্পীগণও প্রচুর পরিমাণে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিত। উক্ত জিলায় ১৩৭টা গ্রামে অন্যূন ১০০০ তন্তুবায় মাসিক ৫ টাকা মাহিনায় মজুরি করিয়া কোম্পানি প্রদত্ত সূতা দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত। কিন্তু তাহাদের জীবন বড় সুখের ছিল না। মুরশিদাবাদের কালেক্টর বাহাদুর লিখিয়াছেন—'The weavers in particular are always in debt and their appearance very squalid and miserable ... their life is one of sedentary labour passed in filthy houses ... Mirzapur was a flourishing town and its silk weavers were the most numerous class, but now an atmosphere of hopeless decay broods over the whole place.' আজ মুরশিদাবাদের রাজ-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্পশক্তিরও অধঃপতন ঘটিয়াছে।

পাবনা জিলার অন্তর্গত মুনসিদপুর গ্রামে রেশমের কুঠি ছিল; তার ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। পাবনাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই অনেকগুলি স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন তন্তুবায় ছিল। দোগাছা গ্রামে প্রস্তুত ১ জোড়া ধুতি ৫ টাকা হইতে ১৫ টাকা পর্যন্ত বিক্রীত হইত। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত জেলার কলেক্টর বাহাদুর লিখিয়াছেন, 'তন্তুবায়গণ তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম অবলম্বন করিয়াছে'। বগুড়া জেলাতেও এক সময় রেশম-শিল্প উন্নতি লাভ

করিয়াছিল। এই স্থানে অনেকগুলি মুসলমান তন্তুবায় বাস করিত। বগুড়া শহরের পার্শ্ববর্তী স্থানে এখনও তাহাদের অতীত জীবনের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। রংপুর জেলায় রয়না গাছের (castor oil plant) উপর এক প্রকার গুটি পোকা জন্মিত তদ্দারা ঐ স্থানের মুসলমানগণ এণ্ডি সূতা তৈরি করিয়া নিজেদের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিত। রাজশাহীর কার্পাস-শিল্প মুসলমান রাজত্বকালে সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় ২০০০ লোক গৃহশিল্পে লিপ্ত ছিল। বহু শতাব্দীব্যাপী রাজশাহী জেলার সর্বপ্রধান শিল্প ছিল রেশম। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি সিল্কের কুঠি নির্মাণ করিয়াছিল (১৮০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি সিল্কের কুঠি নির্মাণ করিয়াছিল (১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া রামপুর বোয়ালিয়াতে আরো দুইটি কুঠি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু ক্রমে এই শিল্প লুপ্ত হইতে থাকে। পূর্বে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকার অন্যূন ৪০,০০০ পাউণ্ড কাঁচা রেশম (raw silk and not manufactured goods) প্রস্তুত হইত।'১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ৯৬,৬৮৪ পাউণ্ড ৬.৫ লক্ষ টাকার এবং ১৯০৩-৪ অব্দে ৬,৭৪৯ পাউণ্ড আসিয়া পরিণত হয়।

মালদহের শিল্পের ইতিহাস আরো বিচিত্র! গৌড়ের শেষ হিন্দু রাজবংশের রাজত্বকালে মালদহের অধিবাসিগণ গুটি পোকার চাষ করিয়া স্বহস্তে রেশমী সূতা কাটিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিত। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে ... নামক জনৈক ব্যক্তিবিশেষের সহিত মালদহী বস্ত্রের ব্যবসা করিত। কথিত আছে একবার তাহার দুইখানি নৌকা পণ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ হইয়া রুশদেশে যাইবার পথে পারস্য উপসাগরে জলমগ্ন হইয়া যায়।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে একজন ফরাসি ভদ্রলোক বাংলার রেশম-শিল্পের উন্নতি মানসে এই দেশে আগমন করেন এবং তাহার কিয়ৎকাল পরেই মালদহ শহরে একটা ফরাসি কুঠি স্থাপিত হয়। স্থানীয় ইতিহাসে অবগত হওয়া যায়, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিরিশ বৎসর ব্যাপী মালদহী রেশমী শিল্পের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, কখনও আর সেইরূপ হয় নাই। সেই সময়ে মহানন্দা নদীর উভয় তীরস্থ অধিবাসীদের প্রায় সকলেই এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। কিন্তু এই উন্নতি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ডা. বুকানন হেমিল্টন (Dr. Buchanan Hamilton) যখন মালদহ পরিদর্শন করিতে আসেন, তখন তথাকার রেশমী শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে যখন চীন ও ভারতীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া বন্দোবস্ত monopoly প্রত্যাহার করা হয়, তখন কোম্পানেও কুঠি উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি স্থাপনের দুইশত বৎসর পরে মালদহ জেলায়, হয়তো ইউরোপীয় শিল্প-বস্ত্রের খাদ্য যোগাইবার অভিপ্রায়েই শুধু কাজ করিবার জন্য ৭টি ইউরোপীয় অনুষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাও অধিক দিন টিকিতে পারে নাই।

মালদহ জিলার কলেক্টর সাহেব রেশমী শিল্পের অবনতির যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন ডবলিউ. ডবলিউ. হানটার প্রণীত 'Statistical Account of Bengal' গ্রন্থেও উহা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, 'মুসলিম বিজয়ের পর হইতেই মালদহী বস্ত্রের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল কারণ রেশমী বস্ত্র পরিধান করা মুসলমান ধর্ম মতে বিধেয় নহে।' কিন্তু কলেক্টর বাহাদুরের এই উক্তি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ভারতের বস্ত্রশিল্পের জন্য মুসলমান সম্রাট ও নবাবগণ যত অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপীয়ানদের কথা তো দূরে ভারতের প্রাচীন সভ্যতাভিমানী হিন্দুগণও সেইরূপ চেষ্টা করেন নাই। মুসলমানদের মূল ধর্মগ্রন্থে সিল্কের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই। কোনো কোনো ধর্মপ্রাণ মহিষী মিতব্যয়িতার খাতিরেও যাহাতে বাহ্যিক সৌন্দর্যের অতিরিক্ত চাকচিক্যে আন্তরিক সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার ব্যাঘাত না ঘটে সেই অভিপ্রায়ে কেবল প্রার্থনা কালে রেশমী বস্ত্র পরিধান করা অশুভ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। এই ইঙ্গিতের বলে একটা মহাশিল্পের ধ্বংস হইতে পারে না। বিশেষত সেখ ভিখের নাম উল্লেখ করিয়া তিনি নিজের মতকে আরো দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন। মুরশিদাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে বয়ন-শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান করিয়া কেবল মালদহের বিরুদ্ধে তাহাদের ধর্ম-জনিত ক্রোধবহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। আর সকল স্থানের সকল শিল্প নষ্ট হইল বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে, কেবল মালদহের বস্ত্র ধ্বংস হইল মুসলমানদের প্রকোপে! মুসলিমের ভাগ্য বিপর্যয়ের এই 'দুঃখ লগনে' জগতের শিল্পসম্ভারের নেতা (industrial leader) আর্থিক গরিমায় গৌরবান্বিত, মহা-শক্তিশালী ইংরেজ রাজ-প্রসূত শান্তি সুখ স্নিগ্ধতার মাঝেও ভারতীয় শিল্পের বিলোপ হইল কেন, তাহার কারণ বাংলার অনুসন্ধিৎসু অর্থনৈয়ায়িক কি কেবল সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা ও ভারতের প্রাচীনতা-প্রযুক্ত আর্থিক অবহেলার (economic negligence of the past) উপরেই নিক্ষেপ করিবে?

কাগজ

আজকাল সীরামপুর কাগজের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্বে বাংলাদেশের নানা স্থানে কাগজ কুটির শিল্পের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ঢাকা জিলার অন্তর্গত আরিয়ল গ্রামে অতি প্রাচীন কাল হইতে হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার পুরু কাগজ প্রস্তুত হইত। এই স্থানের ৫০০ ঘর কাগজী কেবল কাগজ প্রস্তুত করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। বর্তমানে তাহার কোনো চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। রংপুর জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প ছিল কাগজ। এই জেলায় কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ভাগরী, পানিয়ালা ঘাট, দুর্গপুর, বালাকান্দী ও কোর্সী নামক স্থানসমূহে ১৩০টি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে পাট দ্বারা কাগজ তৈরি হইত। প্রতি চারি রিম কাগজ প্রস্তুত

করিতে ৭ আনা খরচ লাগিত। শিল্পীগণও প্রতি মাসে ৫ টাকা হইতে ৮ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিতে পারিত। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ কতকগুলি গ্রামে স্বদেশী প্রণালীতে পাট হইতে এক প্রকার কাগজ তৈরি হইত। মি. হান্টার লিখিয়াছেন ইংরেজি কাগজের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জের মহকুমার অধীনস্থ কতকগুলি গ্রামে স্বদেশী প্রণালীতে পাট হইতে এক প্রকার কাগজ তৈরি হইত। মি. হান্টার লিখিয়াছেন ইংরেজি কাগজের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জের কাগজশিল্প টিকিতে পারে নাই। আজকাল বঙ্গদেশের অনেক ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিহার উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে গয়া ও সাহাবাদ জেলায় কাগজের বিরাট ব্যবসায় ছিল। গয়ার অন্তর্গত আরওয়ালের মুসলমানগণ অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিয়া ভারতের নানা স্থানে প্রেরণ করিত। হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন—'It used to have a wide market before Serampare was ever heard of.' বাংলার বাহিরে যাইয়াও আরিয়লের শিল্প বাঁচিতে পারে নাই।

রঞ্জন শিল্প

পূর্বে কুসুমফুল ও নীলের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে রঞ্জনশিল্প বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ঢাকার তন্তুবায়গণ লাল, নীল, বাসন্তী, হরিদ্রা, সবুজ ও কালো রঙ দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিত। অনুন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত কুসুম ফুলের রঙ বিদেশের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রস্তুত রঙের সম্মুখে টিকিতে পারে নাই।

নীলের ইতিহাস অতীব হৃদয় বিদারক। এই শিল্প অধিকাংশ স্থলেই ইউরোপীয়ানদের একচেটিয়া (monopoly) ছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলায় মি. জে. পি. ওয়াইজ কর্তৃক ৪টা নীলকুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এই জেলায় ইউরোপীয় পর্যবেক্ষণের অধীনে শ্রীমদ্দি, দুলালপুর, ব্রাহ্মণচর, মাছেমপুর, ভাঙ্গারচর ও আকানগর প্রভৃতি স্থানে ছয়টি নীলকুঠি নির্মিত হয়। নীলকুঠির কর্মচারিগণ সামান্য কিছু দাদন প্রদান করিয়া ... কৃষক ও মজুরদের নিকট হইতে অত্যধিক পরিমাণে কাজ আদায় করিয়া লইত। কোনো বিশেষ কারণে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে না পারিলে অথবা দাদনের টাকা ফেরত দিতে চাহিলে, নিঃসহায় গ্রামবাসীদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার উৎপীড়ন করা হইত। অবশেষে চাষীদের 'সঞ্চিত ব্যথা' বিদ্রোহের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়া পড়িল। কথিত আছে—কোনো স্থানীয় জমিদার প্রজাদের দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া মর্মাহত হইয়াছিলেন; এবং তাহারই উপদেশমতো এক রাত্রে একই সময়ে সবগুলি কুঠি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলায় ২০টা নীলকুঠি ছিল। সেই বৎসর মালদহে প্রায় ৪০০০ হাজার মণ নীল উৎপন্ন হয়। বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই জেলায় অধিকাংশ নীলের অনুষ্ঠান বিদেশী মূলধনে পরিপুষ্ট হইলেও, এইখানে কতকগুলি দেশী কারখানা ছিল যাহাতে দেশের টাকাতেই কারবার চলিত। ১৮৬০

খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলার সর্বত্রই নীলকুঠি বিদ্যমান ছিল; ঐ সকলও ইউরোপীয় মূলধনে পরিচালিত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাবনার নীল শিল্প ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মুরশিদাবাদের রেভিনিউ সার্ভেয়ারের রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায় যে এই জেলায় ১২টা বিভিন্ন অনুষ্ঠান হইতে প্রায় ৭ লক্ষ টাকার নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লব আরম্ভ হইলে মুরশিদাবাদের নীল শিল্প বিনষ্ট হইয়া যায়। এই বিপ্লবের সময় অধিবাসীদের দুঃখের সীমা ছিল না। Revenue Surveyor লিখিয়াছেন—'Murshidabad witnessed the serious case of loss of life which took place during the troubled times, in an attack upon a factory.'

পরাধীন জাতি বলিয়া বাঙালি রঞ্জন শিল্পের মূল্য অনেকটা বুঝিতে পারে না। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি রঙ বন্ধ করিয়া দিলে মিত্র শক্তিকে যে কী ভীষণ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অবাধ বাণিজ্য (free trade) পন্থী গ্রেট ব্রিটেনও রঞ্জন শিল্পের উন্নতি কল্পে বিদেশী রঙের উপর সংরক্ষণী শুল্ক (protective duty) সংস্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গদেশে যাহা ছিল তাহা নাই; অন্যদেশে যাহা ছিল না তাহা হইতেছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাংলার বিবিধ শিল্পের সামান্য আভাস দেওয়াও অসম্ভব। পূর্বে বাঙালি কোনো প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল না। লৌহ, লবণ, চিনি, বাসনপত্র ইত্যাদি সকল বস্তুই নিজের দেশে পাইত। ঢাকাতে যখন মুসলমান রাজধানী ছিল তখন ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত লোহাইল, মির্জাপুর, কীর্তনীয়া প্রভৃতি স্থানে লৌহের কারখানা ছিল। ঐ লৌহ দ্বারা যুদ্ধের যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। ঐ সমস্ত স্থান খনন করিলে এখনও নানা প্রকার যন্ত্রাদির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ঐ স্থানে লৌহের খনি ছিল বলিয়া আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

সূচী কর্মের জন্য বোগদাদ নগরী চির প্রসিদ্ধ। বোগদাদ হইতে মুসলমানগণ সর্বপ্রথম সীবন শিল্প ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ হইতে ইংল্যাণ্ডে ... প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। মুরশিদাবাদের অন্তর্গত পাগলা নদীতীর ও বলিয়া নারায়ণপুরে লৌহের বাজার ছিল। ঐ স্থানে লৌহ প্রস্তুত করিবার জন্য ৬২ খানা উনুন (furnace) দিবারাত্রি প্রজ্বলিত থাকিত।

দেশীয় প্রণালীতে লবণ প্রস্তুত করিয়া বঙ্গের অধিবাসীগণ নিজেদের অভাব পূরণ করিত। নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় পূর্বে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত। অনেক দিন হইল লিভারপুলের লবণ আসিয়া এই সকল বিনষ্ট করিয়াছে। চট্টগ্রামে—১৮৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে লিভারপুল হইতে ১২৪৬ টন; ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে লিভারপুল হইতে ৩২৫৫ টন; ১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে লিভারপুল হইতে ৭৭৫২ টন লবণ আমদানি হইয়াছিল। এই উভয় স্থানের লবণ প্রস্তুতকারীগণ এক্ষণে কৃষিকর্ম

অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্বে বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও বাংলার অন্যান্য স্থানে ইক্ষু ও খেজুরের চাষ করিত এবং তদ্দারা গুড়, চিনি ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ এই তিনটি জেলা মাটির বাসনের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত কাংস্য দ্রব্য ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। বর্তমানে তাহার অনেকগুলি বিনষ্ট হইয়াছে এবং দুই একটি শিল্প মাত্র স্থান পরিবর্তন করিয়া অর্ধমৃত অবস্থায় প্রাচীনতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বাংলার শিল্প-ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করিলে স্বভাবতই প্রশ্ন হয়, আর্থিক নিপীড়নে বঙ্গদেশ উৎপাদন ক্ষেত্রে (field of production) যেই স্থান অধিকার করিয়াছে, এই কি তার চরম অবস্থা না কুটির ও অন্যান্য শিল্পের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা আছে? ভারতের প্রাচীন সভ্যতা শুধু ভারতবাসীর নৈতিক উন্নতি ও শাস্ত্র-জ্ঞানের মধ্যেই পর্যবসিত হয় নাই; আর্থিক জীবনও তাহাদের সুন্দর মধুর ছিল। মাঝখানে একটা অনৈসর্গিক বিপর্যয় সংঘটিত হইয়াছে মাত্র। আজকালও বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল (raw materials) ও খনিজ পদার্থ (minerals) বিদ্যমান রহিয়াছে; মজুরেরও (labour) অভাবই নাই; মূলধনও (capital) ভূগর্ভে লুক্কায়িত নহে; সমবায় ঋণ-দান সমিতি গৃহশিল্পের সহায়তা করিতে সতত তৎপর; বিদেশী মূলধনও এই দেশে নিয়োজিত হইতে প্রতিনিয়ত উৎকণ্ঠিত; অভাব আছে কেবল একটা শক্তির, যাহার নাম সমবেত চেষ্টা বা organisation। এই সকল শক্তির একত্র সমাবেশে বাংলার 'লুপ্তশিল্প' উদ্ধার করা যাইতে পারে।

যেই দেশ শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে সেই দেশ কখনও আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। আর যেই দেশে আর্থিক সমস্যার সুমীমাংসা হয় না সেই দেশের জাতীয় জীবনে কোনো অধিকার নাই, কারণ সেই দেশ অভিশপ্ত, লাঞ্ছিত, পদদলিত জগতের নিকট ঘৃণ্য ও হেয়। দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া দেশমাতৃকার লজ্জা নিবারণ করিতে হইলে, আত্ম-স্বার্থ ও জাতীয় ভাবে প্রমুগ্ধ ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্য দ্রব্য পরিতৃপ্ত না হইয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথা তুলে নিতে হইলে, আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিলে, বর্তমান যুগের হীন সাম্প্রদায়িকতার বাহিরে আসিয়া জাতিভেদ নির্বিশেষে সকল বাঙালিকে সমভাবে দেশে কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করিতে হইবে।

বাংলার শিল্পাকাশ এইক্ষণে কালমেঘে আবৃত; সেই মেঘের আড়ালে দুই একটি অনুষ্ঠান মাত্র দূরান্তরে নীহারিকার মতো নিষ্প্রভ হইয়া দেখা দিতেছে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের, একতান বিশিষ্ট সমাবেশে দেশের ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক আলোকে সকল অন্ধকার বিদূরিত করিয়া তবে সকলে মিলিয়া বঙ্গমাতার মঙ্গলাভিষেকের পূর্ণায়োজন করিতে হইবে।

মানব-মনের ক্রমবিকাশ

কাজী মোতাহার হোসেন

কবি যখন ভাবের প্রাচুর্যে নির্ঝরের বন্দনা করে, বসুন্ধরাকে সম্বোধন করে এবং দুরন্ত সাগরকে তাহার গান শুনায়; যখন সে পর্বতের সঙ্গে কথা বলে, কোকিলের সঙ্গে আত্মীয়তা করে এবং সমীরণের নিকট মনোবেদনা জানায়; তখন আমরা বিদ্রূপের হাসি হাসি না—সম্ভাব্যতার তর্কও করি না, আমরা প্রাণ দিয়া অনুভব করি। আমাদের হৃদয়ের কোনো নিভৃত গোপন কন্দরে, কি যেন এক অনির্দেশ্য অথচ পরিচিত সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। কোনো অতীত যুগের হারানো কাহিনী যেন অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। সে যুগ মানব-ইতিহাসের শৈশবকাল; আর সে কাহিনী বোধ হয় শিশু-চিত্তের কল্পনারঞ্জিত স্মৃতি। সে যুগে এই সব চিন্তা মানুষের মনকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া থাকিত। বর্তমানে যাহা কবিতার অলঙ্কার মাত্র, সে যুগে তাহা জীবনের সত্য ঘটনা ছিল। তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় আত্মীয়তাব সম্বন্ধ ছিল; বৃক্ষ-লতা প্রভৃতিও তাহাদের নিকট প্রাণ-যুক্ত ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল।

সেই আদিম যুগে মানুষের নিকট সূর্য এক মহাশক্তিশালী দেবতা ছিল, যাহার হাস্যে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত এবং ক্রোধে উত্তপ্ত প্রান্তর ধূ-ধূ করিত। পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড ঘুমন্ত দৈত্য ছিল, যাহা সময় সময় একটু নড়িয়াচড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইত। মানুষ জীবিতকালে ঐ দৈত্যের পিঠের উপর দিয়া চলাচল করিত, মৃত্যুর পর তাহার পেটের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিত। আগুন এক বন্য দুরন্ত প্রাণী ছিল, যাহা স্পর্শ করিলে দংশন করিত। পশুপক্ষীরা বিদেশী ছিল যাহাদের স্বতন্ত্র ভাষা এবং আচার পদ্ধতি ছিল। বৃক্ষলতা বাকহীন প্রাণী ছিল, তাহাদের কতকগুলি মানুষের হিতকরী বন্ধু এবং কতকগুলি অনিষ্টকামী শত্রু ছিল।

এইসব বস্তু ও প্রাণীকে তাহারা ঠিক মানুষ ভাবিয়াই তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিত। তাহারা কখনও একটা সুন্দর কাঁঠাল গাছ বা নারিকেল গাছকে ফুল সাজে সাজাইত; কখনও বা ফল-দায়ক বৃক্ষকে পূজা উপচারে সম্মানিত করিয়া ফল প্রার্থনা করিত। তাহারা কতকগুলি প্রাণীকে বুদ্ধির জন্য সম্মান করিত, কতকগুলিকে হিংস্র বলিয়া ভয় করিত এবং কতকগুলিকে উপকারী বলিয়া কদর করিত। এইজন্য সব

জন্তুকে বধ করা, এমনকি তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করাও ভয়ানক অন্যায় মনে করিত। পাছে হিংস্র জন্তুর সমাজ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এই ভয়ে তাহারা সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না; বরং নানা উপচারে উহাদিগকে পূজা করিত। এইরূপ নিসর্গের অন্যান্য শক্তির কৃপা দৃষ্টি লাভের জন্য, তাহাদের উদ্দেশ্যে পূজা ও বলিদান করিত। কিন্তু সময় সময় দুই চারিজন অসাধারণ সাহসী পুরুষ ব্যাঘ্র ভল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নির্গত হইত। এমনকি সময় সময় মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ুকে তরবারি দ্বারা খণ্ড খন্ড করিয়া ফেলিত, স্ফীতবক্ষ নদীর স্রোতকে বল্লমের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিত, দুর্দান্ত সমুদ্রকে বেত্রাঘাতে শাসন করিত, নির্দয় পৃথিবীকে শাণিত ছুরিকা দ্বারা বধ করিত। আকাশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উন্নত সৌধ নির্মাণ করিত এবং স্বর্গ জয় করিবার জন্য মেঘের গায়ে তীর ছুড়িত।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি উৎকর্ষ লাভ করিল। তখন তাহারা আবিষ্কার করিল যে, দেহ হইতে পৃথক একটি জিনিষ মানুষের ভিতর আছে। সেই জিনিষটি জড় দেহকে চালনা করে। সেই মন বা আত্মা কিংবা তদ্রূপ কোনো ভৌতিক অদৃশ্য পদার্থই চিন্তা করে, সেই-ই আকাঙ্ক্ষা করে, সে-ই সিদ্ধান্ত করে। শরীর যখন নিদ্রায় অচেতন, তখনও ইহা জাগ্রত থাকিয়া ঘুমন্ত মানুষের অন্তঃকরণে চিন্তা ও কল্পনার জাল বিস্তার করে। যখন তাহারা দন্তহীন পক্বকেশ বৃদ্ধের নিকট হইতে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করে, তাহারা বুঝিতে পারে যে শরীরের সঙ্গে আত্মা জরাগ্রস্ত হয় না—সুতরাং ইহার মৃত্যু নাই। দেহটি আত্মার বাহন মাত্র। এখন প্রশ্ন হইতেছে, দেহ ধ্বংস হইয়া গেলে তদাশ্রয়ী আত্মার কি অবস্থা হয়?

প্রিয়জনের বিচ্ছেদে তাহার চিন্তা ও স্মৃতি সর্বদা মনে হইতে থাকে। তন্দ্রাবস্থায় তাহার প্রতিমূর্তি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, তাহার সুমিষ্ট কোমল ধ্বনি শ্রুতি গোচর হয়, তাহার মধুর স্পর্শ অনুভব হয়। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তর্হিত হইলেও অনেকের মনে বিশ্বাস থাকিয়া যায়, যে সত্যই প্রিয়াস্পদের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রধানত ভাব হইতেই এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে। হয়তো তাহাদের সর্দারের মৃত্যু হইয়াছে। অর্ধ জাগ্রত অবস্থায় তাহার প্রতিকৃতি আসিয়া যেন তাহাদিগকে শাস্তির ভয় দেখাইতেছে। সুতরাং তাহার সহজেই বিশ্বাস হয় যে সর্দার জীবিত আছে। এইরূপে মৃত্যুর পরপারে জীবন আছে, এই ধারণার উৎপত্তি হয়। আত্মার মোকাম বা বাসস্থান স্বরূপ এই দেহের যখন ধ্বংস হয়, তখন আত্মা অবাধে বাতাসের মধ্যে চলাচল করে। ইহা বাতাসের মতোই অদৃশ্য বাতাসের মতোই ভয়াবহ নিষ্ঠুরও হইতে পারে। ইহা হইতে অসভ্য মানুষের মনে এই ধারণা হয় যে আধিব্যাধির যন্ত্রণা তাহার সর্দারের প্রদত্ত শাস্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। তাহার ইহাও বিশ্বাস হয় যে, যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাহাদের

সর্দারের আত্মা অদৃশ্য অস্ত্র লইয়া তাহাদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করে। এই Father spirit এর সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য তাহার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়, তাহার সমাধির পাশে খাদ্য সম্ভার যোগান হয়। প্রকৃতপক্ষে তখনই তাহাকেই সর্দার বলিয়াই মনে করা হয়—এবং এইসব কল্পিত সর্দারকে দেবতা আখ্যায় ভূষিত করা হয়। প্রত্যেক সর্দারই দেহ ত্যাগের পর দেবতার আসন ও সম্মান পাইতে থাকে। জীবিত সর্দার যেন এইসব দেবতাদের পুরোহিত। ইনি দেবতাদের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন বলিয়া সময় সময় শাস্ত্র বা আদেশের প্রবর্তন করেন। সর্দারদের গৌরবজনক বীরত্বকাহিনী অবলম্বন করিয়া গীত রচিত হয়, তাহাদের জীবনবৃত্তান্ত বংশ পরম্পরায় ঘোষিত হইতে থাকে এবং ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত হয়।

মানুষ স্বভাবতই নিজের মনের রঙে জগৎকে রঙিন করিয়া দেখে। 'He reasons from himself outwards'. সে মনে করে, নিজের ভিতরে যেমন জড় ও চিন্ময় পদার্থ আছে, সেইরূপ সামান্য তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রাদি পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থেরই এক বড় ভাগ আর একটি সূক্ষ্ম ভাগ আছে। দেবতার মন্দিরে বা সমাধিস্থানে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহার সূক্ষ্ম অংশ দেবতারা ভোগ করেন, বড় অংশ যেমনকার তেমনই থাকিয়া যায়। নদী কেবল জল মাত্র নহে যে শুকাইয়া গেলেই নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার মধ্যে এক আত্মা বাস করে—তাহার মৃত্যু নাই। কিন্তু মানুষ যতই সমষ্টিকে ধারণ করিতে সক্ষম হয়, ততই তাহাদের দেবতার সংখ্যা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা প্রত্যেক বৃক্ষের এক একটি দেবতা কল্পনা করিয়া সমগ্র বনের একটি দেবতা স্বীকার করে; প্রত্যেক নদীর স্বতন্ত্র দেবতা-স্থলে একটিমাত্র জল-দেবতা বিশ্বাস করে; প্রত্যেক নক্ষত্রের পৃথক পৃথক দেবতা-স্থলে, সমগ্র আকাশের একটিমাত্র দেবতার ধারণা করে। এইরূপে প্রকৃতি একদল দেবতার শাসিত বলিয়া অনুমিত হয়। স্থলবিশেষে কৌলিক দেবতাদিগকে ইহাদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়, আবার কোথাওবা স্বতন্ত্রভাবেই ইহাদের পূজা হয়।

এই সমস্ত দেবতা আদিম মানুষের নিকট প্রভু বা সম্রাটের ন্যায়। তাহাদের চরিত্রও মানবীয় চরিত্র; কারণ প্রত্যেক জাতিই নিজেদের চরিত্রের উচ্চতম আদর্শের দ্বারা দেবতার চরিত্র কল্পনা করে। কোনো কোনো দেশে শুভ এবং অশুভ দুই প্রকার দেবতা আছে। উপ-দেবতাগুলিকে স্তুতিবাক্য এবং উপহার দ্বারা সন্তুষ্ট করা যায়, শুভ দেবতাগুলিকে অবহেলা করিয়া ভীষণ ও ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা যায়। যাহা হউক, যেমন অত্যাচারী রাজাদের ভাগ্যেই স্তুতি উপহার অধিক ঘটে, সেইরূপ অপদেবতাগণই অধিক পরিমাণে পূজা উৎসর্গ প্রভৃতি পাইয়া থাকেন।

মৃত্যুর পরে আত্মার স্থিতি সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রথমে তাহাদের কোনো নির্দিষ্ট বাস স্থান ছিল না। সমাধির আশেপাশেই তাহাদের গতিবিধি ছিল। পরে ভূগর্ভে তাহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হয়। পৃথিবীতে তাহারা যেভাবে জীবন যাপন করিত, ভৌতিক জগতেও তাহারা ঠিক সেই ভাবেই বাস করে। বস্তুত মৃত্যুর পর আত্মার জীবন পৃথিবীস্থ জীবনেরই পরবর্তী অধ্যায় মাত্র। পরবর্তী জীবন, পৃথিবীস্থ জীবনের উপনিবেশ বিশেষ, কাজেই সেখানেও ঠিক এই সমস্ত আত্মীয় - স্বজন পরিবৃত হইয়াই আত্মা বাস করিবে। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, এই কারনে তাহার সমাধিপার্শ্বে বা তাহার অভ্যন্তরে, তাহার ব্যবহৃত প্রিয় খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি রক্ষিত হয়, এমনকি তাহার পত্নী ও দাস--দাসীদিগকেও সময় সময় তাহার অনুগমন করিতে হয়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিবর্গ পরিচ্ছদ, খাদ্য এবং অস্ত্রশস্ত্রের আত্মা প্রেতলোকে তাহার অনুগমন করে।

নরলোক এবং পরলোকে একই দেবদেবী রাজত্ব করে। নরলোকের স্থায়িত্বকাল অল্প প্রেতলোকের স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ। কিন্তু উভয় লোকই অনাদি কাল হইতে অবস্থান করিতেছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকিবে। মানুষ কোনোকালে পৃথিবীকে আরম্ভ হইতে দেখে নাই বলিয়াই তাহা অনাদি; এবং সে ইহাকে বৃদ্ধ হইতে দেখে না বলিয়াই ইহা অনন্ত।

নরলোক ও পরলোক পাশাপাশি অবস্থিত। এমনকি সীমারেখাও খুব সুনির্দিষ্ট নহে। দেবতারা বা প্রেতাত্মারা অনেক সময় রক্তমাংসের শরীর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করে। স্ত্রীলোককে ভুলানো, শত্রুকে উৎপীড়ন করা এবং প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বাক্যালাপ করা এই সমস্ত তাহাদের কাজ। অপর পক্ষে মানুষের মধ্যেও এমন সব মহাশয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা জড় শরীরকে বিছানায় শায়িত রাখিয়া আত্মিক জগতে ভ্রমণ করিতে পারেন। মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মারা অনেক সময়, পৌত্র বা প্র-পৌত্রের রূপ ধরিয়া বংশে পুনঃপ্রবেশ করিয়া থাকেন। বিখ্যাত বিখ্যাত বীরপুরুষ এবং ধর্মপ্রবর্তকগণকে অনেক সময় অবতার বলা হয়, অর্থাৎ তাঁহারা দেবতার ঔরসে স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছেন। কখনও কখনও বিশ্বাস করা হয় যে, কোনো দেবতা দয়াপরবশ হইয়া পৃথিবীর দুর্দশা বা বিপ্লব দূর করিবার জন্য দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়া আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিয়া থাকেন। কখনও কখনও অসভ্য জাতিরা বিশ্বাস করে যে তাহাদের রাজা প্রকৃতপক্ষে নরদেহধারী দেবতা। কোনো কোনো দেশে রাজদেহকে অবিনাশী বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদেব বিশ্বাস, রাজা আহার করেন না, নিদ্রা যান না এবং তাঁহার মৃত্যুও নাই। ঐ সমস্ত রাজ্যে পুরোহিতেরাই সর্বেসর্বা। সাধারণ লোকে কোনো দরবার লইয়া উপস্থিত হইলে রাজা পর্দার আড়াল হইতে একখানি

পা বাহির করিয়া দিয়া সম্মতি জ্ঞান করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, পুরোহিতেরা গোপনে তাহাকে সমাধিস্থ করিয়া তৎস্থলে অন্য রাজা প্রতিষ্ঠিত করে।

Savage এক অদ্ভুত জগতে বাস করে। তাহারা প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এজন্য তাহাদের প্রত্যেক যন্ত্রণা, প্রত্যেক স্বপ্ন, প্রত্যেক সম্পদ, প্রত্যেক বিপদ—এক কথায় যাহার কারণ নির্ধারণ কবা একটু কঠিন, সে সমস্তই দেবতার রোষ বা অনুগ্রহের ফলে সংঘটিত হয়। প্রতিদিন, প্রতি নিয়তই দেবতা তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। এমনকি, মৃত্যুকে পর্যন্ত তাহারা স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করে না। তাহাদের বিশ্বাস, কোনো না কোনো দিন মানুষ দুর্ব্যবহার দ্বারা দেবতাদিগের রোষ উৎপাদন করে, তাহার ফলে দেবতাগণ কর্তৃক নিধনপ্রাপ্ত হয়।

তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অসাধারণ। যদি তাহাদিগকে বলা যায়, 'তোমরা যাহাদিগকে দেবতা বলো, তাহারা বাস্তবিক পক্ষে নাই', তবে তাহারা কেবল অবাক হইয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসে। তাহাদের পিতা পিতামহের বর্ণিত দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস, তাহাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক। বিশ্বাস করিবার জন্য তাহাকে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় না; সে প্রাণের সহিত অনুভব করে, তাহাকে যাহা শিখানো গিয়াছে তাহাই সত্য। তাহার বিশ্বাস, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির সহচর ও সহ-প্রকৃতিক। যতক্ষণ না তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিবর্তন হয়, ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। যদি কোনো দেবতা স্বপ্নে, বা তাহার পুরোহিতের মারফতে কোনো প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া থাকেন, তবে সে কিছুমাত্র আশ্চর্য জ্ঞান করে না—তাহার দেবতার প্রতি বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও কমে না। সে সহজভাবে মনে করে, দেবতা ছলনা করিয়াছেন। দেবতা তাহার নিকট এক বিরাট পুরুষ মাত্র, সুতরাং তাহার পক্ষে ছলনা করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা দোষের বিষয় নহে। তাহার দেবতা স্বেচ্ছাচারী নৃপতিবিশেষ—ক্ষেতের প্রথম ফসল, গাছের প্রথম ফল, পালের প্রথম বাছুর তাহার প্রাপ্য। আবার কখনও কখনও তাহার ভোগের জন্য কুমারী নারী এবং ভোজের জন্য নরদেহ দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। আর মানুষ প্রকৃতপক্ষে দেব রাজার ক্রীতদাস। সে প্রার্থনা করে—অর্থাৎ ভিক্ষা চায়; স্তোত্র পাঠ করে, অর্থাৎ স্তুতি গায়; বলি উৎসর্গ করে—অর্থাৎ কর প্রদান করে। সাধারণত ভয় হইতেই এইসব করে—তবে অনেকসময় প্রতিদানে কিছু বেশি পাইবার আশাতেও করিয়া থাকে। তাহার আকাঙ্ক্ষা বস্তু প্রধানত দীর্ঘ জীবন, ঐশ্বর্য এবং পুণ্যবতী স্ত্রী। সচরাচর দেবতা সম্বন্ধে তাহাদের মনে যে সব বিদ্রোহের কথা উদিত হয়, তাহা প্রকাশ করিতে ভয় পায়, কিন্তু সময় সময় অসহ্য হইলে তাহার অন্তর্নিহিত যাতনা কথায় প্রকাশ পায়। রোগশয্যায় ছটফট করিতে করিতে সে দেবতাকে অভিশাপ করে আর বলে, 'আমার ভিতরটা খোলা করিয়া খাইয়া ফেলিতেছে।' আবার মানুষ যখন নিজের বুদ্ধির চেয়ে উচ্চতর

কোনো ধর্মে দীক্ষিত হয়, তখনও সে দেবতাকে ঠিক চিনিতে পারে না। কারণ দীক্ষা দ্বারা ধর্ম পাওয়া যায় না। একবার সোমালিল্যাণ্ডের এক বৃদ্ধা বলিয়াছিল, 'ও আল্লা, তোমার দাঁতে যেন আমার দাঁতের মত কনকনানি হয়; ও আল্লা, তোমার মাড়িতে যেন আমার মাড়ির মতো ঘা হয়।' খ্রিস্টান সম্রাট 'পেপেল' এক সময় নিজের অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'গডকে দেখিতে পাইলে এই মুহূর্তে তাহার প্রাণ বধ করিতাম, মানুষকে কেন সে মরণাধীন করিয়াছে?'

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতার সংখ্যা কেমন করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়, পূর্বেই তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই সংখ্যা যত কম হয়, দেবতার ক্ষমতাও তত প্রসারিত বিস্তৃত ও পরিবর্ধিত হয়। অবশেষে মানুষ যখন বিচিত্র বিশ্বে এক পরিপূর্ণ একত্বের সন্ধান পায়, তখন ক্রমে ক্রমে তাহার মনে একটিমাত্র দেবতার কল্পনা আসে। তখন লোকে বিশ্বাস করে যে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম' পুরুষটিই সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছেন। প্রথমত এই দেবতা যেন জগতের বহির্দেশে বা ঊর্দ্ধদেশে নির্বিকার ভাবে বসিয়া রাজত্ব করেন; এবং আগেকার দেবতাগুলি এই দেবাদিদেবের প্রতিনিধি বা ডিপুটি রূপে পৃথিবীতে কার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তাহারা ফেরেস্তা কিংবা পয়গম্বর শ্রেণীতে অবনীত (degraded) হন; তখন লোকের বিশ্বাস হয় যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বিশ্বের সর্বত্র অর্থাৎ 'অনলে, অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধরে সলিলে গহনে' বিরাজিত আছেন; এবং ভাল মন্দ সমস্তই তাঁহার নিকট হইতে প্রবাহিত হয়। তবে কোনো কোনো পদ্ধতিতে তাঁহাকে কেবল শুভদায়ক বলিয়া কল্পনা করা হয়; অশুভের কর্তা কোনো বিদ্রোহী ফেরেস্তা—যাহাকে খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী মহাশত্রু বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এপর্যন্ত আমরা নীতির দিক দিয়া একটি কথাও বলি নাই। পৃথিবীর সৃজন কাহিনী, দেবতা দ্বারা মানুষের শাসন, মৃত্যুর পরে তাহার অবস্থা, এ সমস্তই বৈজ্ঞানিক হিসাবে ধরিলে অনুমান বা theory মাত্র। এগুলি প্রাথমিক মানুষের জিজ্ঞাসু চিত্তের কৌতূহলনিবারক যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত। এইগুলি নানাভাবে ও কল্পনার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া আমাদের নিকট revealed religion বা প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-বিশ্বাস রূপে আসিয়া পৌছিয়াছে। এগুলি যুক্তিমূলক বলিয়া আমাদের বুদ্ধির সহিত অনেকটা মিশ খায়। এ কারণ বর্তমান যুগের সভ্য মানবও উহা অনেকটা বিশ্বাস করে। কিন্তু নৈতিক হিসাবে ইহার কোনো মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পৃথিবী নির্মাণ করিতে ৬ দিনই লাগুক আর ১০ হাজার বৎসরই লাগুক, পৃথিবীর সৃজনকারী এক খোদাই হউন বা তেত্রিশ কোটি দেবতাই হউন, তাহাতে মানুষের জীবনযাত্রার কি আসিয়া যায়? কোনো অসভ্য জাতি এক লক্ষ দেবতার শাসনাধীনে

আছে বলিয়াই, তাহারা নিশ্চয়ই খুব সাধুসজ্জন হইবে, তাহার কোনো স্থিরতা বা guarantee নাই।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় নৈতিক বৃত্তিও একটা স্বভাবজাত ধর্ম। ক্রমে ক্রমে ইহার বিকাশ হয়। মানুষের দেবতা যখন তাহারই চরিত্রের প্রতিমূর্তি তখন মানুষের নৈতিক আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে তাহার দেবতার নৈতিক আদর্শও উন্নত হইতে থাকিবে তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। অসভ্য জাতির সর্দার কেবল তাহার নিজের এবং নিজের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে অন্যায়ের শাস্তি বিধান করে, কিন্তু উহারা আর একটু সভ্য হইলে, সর্দার সর্বসাধারণের ধর্মাবতারে পরিণত হয়। সেইরূপ অসভ্য জাতির দেবতা, তাহাদের নিকট হইতে মাত্র কারও বশ্যতার দাবি করে। তাহারা heresy-র (ধর্মদ্রোহিতার) শাস্তি দেয়, কারণ তাহা বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ; blasphemy-র শাস্তি দেয়, কারণ তাহা contempt of court; কর বা স্তুতি বন্ধ করিলে শাস্তি দেয়, কারণ তাহা রাজবিদ্রোহ। আবার এই সব অপরাধীকেই সভ্য জাতির দেবতাও সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি প্রদান করে। কিন্তু সভ্য জাতির দেবতা আরও আদেশ করেন যে, মানুষ পরস্পরের প্রতিও ন্যায় ব্যবহার করিবে। এই দেবতা এখনও despot. কারণ তিনি মানুষকে তাঁহার স্তুতি গান ও প্রশংসা করিতে আদেশ করেন এবং করও গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল আত্মানুসন্ধী despot মাত্র নহেন। তিনি সুকৃতিশীলকে পুরস্কার দান করেন এবং দুষ্কৃতিশীলকে দণ্ডিত করেন।

সময় সময় পৃথিবীতে দেখা যায়, সাধুতার পুরস্কার নাই, অথচ অসাধুতার জয় জয়কার হইতেছে। অসভ্যের মনে ইহাতে কোনো খটকা বাধে না, কারণ তাহারা মনে করে, কোনো পূর্বপুরুষ কিংবা আত্মীয়ের দোষে সাধুপুরুষও নির্যাতন ভোগ করে; আর পূর্বপুরুষের সুকৃতির ফলে পাপীরও পাপ খণ্ডন হইয়া যায়। অসভ্য জাতির জীবন-ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ে সমাজ ব্যক্তি-দ্বারা গঠিত হয় না, পরিবারের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়। পরিবারের কোনো ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিলে, সেই পরিবারের যে-কোনো ব্যক্তির রক্ত দ্বারা সেই হত্যার পরিশোধ লওয়া হয়। যদি এক পুরুষের মধ্যে সেই রক্তপাতের প্রতিশোধ না লওয়া যায়, তবে সে বিবাদ চলিতেই থাকে: কারণ ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হইলেও, সমগ্র সম্প্রদায়ের ত আর মৃত্যু হয় না। সুতরাং অপরাধীর পুত্র-পৌত্রেরাই পূর্বপুরুষের কৃতকার্য্যের শাস্তি গ্রহণ করিবে, একথা তাহাদের নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।

সমাজের উচ্চতর অবস্থায় এই পারিবারিক ভাবের পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তখন মনের বিকাশ খুব দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে। এই সংসারে সকলের প্রতি ঠিক ন্যায় ব্যবহার হইতেছে না, একথা তখন ধরা

পড়ে। এজন্য বিশ্বাস করা হয় যে পরজন্মে ইহকালের বিচারের দোষক্রটি সংশোধন করা হইবে। অন্য কথায় 'পরলোকে পুরস্কার ও শাস্তি হইবে', এই বিশ্বাস প্রচলিত হয়। তখন প্রেত জগত বা আত্মিক জগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক অংশে পাপাত্মা ও অন্য অংশে পুণ্যাত্মার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। অবাধ্য পাপাত্মারা অন্ধকার দুর্গন্ধময় স্থানে অনন্তকাল ধরিয়া অসীম যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকিবে। আর ভক্ত পুণ্যাত্মারা সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, সোনার মুকুট পরিয়া, অনন্তকাল ধরিয়া মহাপ্রতাপান্বিত দেবতা বা ঈশ্বরের সৌন্দর্যসুধা পান করিতে থাকিবে।

বলা বাহুল্য, কর্মপ্রবণ ইউরোপীয় চিত্তের নিকট পরিণামের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা বিশেষ লোভনীয় বলিয়া মনে হয় না। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে স্বর্গের সৃষ্টি হইয়াছে এশিয়াতে। রাজদরবারে সম্মানিত আমির-ওমরাহের পদ অধিকার করা প্রাচ্য মনের চরম আকাঙ্ক্ষা এবং পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরা ক্রমবিকাশের যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখনকার দিনে দেবতার প্রতি মানুষের মনোভাব, ঠিক রাজার প্রতি প্রজার মনোভাবের অনুরূপ। প্রাচ্য রাজার প্রজারা তাহার সন্তান বা সেবক। এখানে লোকে প্রাণ বধের আজ্ঞা পাইলে, সেই নিদারুণ ফরমান চুম্বন করিয়া ভক্তির সহিত নির্বিবাদে শূলে চড়িতে পারে। রাজা তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইলেও, হাত জোড় করিয়া ভক্তিভাবে বলিতে পারে, রাজাই দেনে-ওয়ালা, রাজাই লেনেওয়ালা। 'রাজার নাম ধন্য হউক।' বিদেশী প্রজা, যে কোনো দিন রাজাকে দেখে নাই, কেবলই ট্যাকস দিয়াছে, সেও যদি শুনিতে পায় সে রাজা বিপদে পড়িয়াছেন, তখন অমনি সে তরবারি বাহির করিয়া আপন আত্মপরিজন এবং গৃহকে যেভাবে রক্ষা করিত, ঠিক সেই ভাবে রাজাকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া যায়।

এই প্রকার ভক্তি রাজার প্রতি প্রদর্শিত হইলে রাজভক্তি, দেবতা বা খোদার প্রতি প্রদর্শিত হইলে ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে মনোবৃত্তি একই প্রকার। ধর্মরাজাও এক প্রকার গভর্ণমেন্ট বিশেষ। মানুষ ঐহিক নরপতিকে যে সম্মান করিত, অবশ্য দেবতাকেও সেই সম্মানে ভূষিত করিয়াছে। অসভ্য সমাজে কেবল ভীতিই এই সম্মান প্রদর্শনের মূল কারণ কিন্তু উন্নত সমাজে ভয়ের সহিত ভালবাসাও মিশ্রিত আছে। ইহাতে মনে এক অনির্বচনীয় সুখকর মিশ্র ভাবের উদয় হয়। পার্থিব রাজার প্রতি পূর্বেকার এই শ্রদ্ধা ও সম্মান অনেক হ্রাস পাইয়াছে, এমনকি কোনো কোনো দেশে এখন তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। তথাপি অদৃশ্য দেব-রাজার প্রতি তাহাদের মনোভাবের অতটা পরিবর্তন হয় নাই। কে জানে ভবিষ্যতে দেবতার রাজসম্মান বজায় থাকিবে কিনা?

ধর্মভাব ও দেব-পরিকল্পনা সম্বন্ধে ক্রমবিকাশের যে সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল, ইহা হইতেই সহজে ও পরিষ্কার রূপে বিভিন্ন দেশের রাশীকৃত স্মৃতি, পুরাণ ও কাহিনীর বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণী ভাগ করা যাইতে পারে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে মানুষের ধারণা ক্রমশ পরিবর্তিত হইতেছে; এক সমাজে একই সময়ে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোনো কারণ নাই। আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই এরোপ্লেনের দিনেও গো-গাড়ি ও এক্কাগাড়ির অপ্রতুল নাই; ইলেকট্রিক লাইটের দিনেও শত শত ঘরে মাটির টেমি জ্বলিতেছে; সেইরূপ এক ঈশ্বরের ধারণা প্রবর্তিত হইবার বহু পরেও আমরা প্রকৃতিপূজার শত শত নিদর্শন দেখিতে পাই। হানিবল আর ফিলিপের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাহাতে উভয় পক্ষে বলিতেছেন, 'Jupitor, Juno এবং Apollo র সাক্ষাতে; কার্থেজবাসীর দেবতা এবং Hercules ও Iolons এর সাক্ষাতে; Mars, Triton এবং Neptune এর সাক্ষাতে; আমাদের শিবিরে যে সমস্ত দেবতা আছেন তাহাদের সাক্ষাতে; সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবীর সাক্ষাতে; নদী হ্রদ এবং সমুদ্রের সাক্ষাতে শপথ করিতেছি।' সক্রেটিসের সময় এথেন্সের লোক সূর্য্যকে একজন মহাপুরুষ মনে করিত। আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দর বাদশাহ যে কেবল সমুদ্রের দেবতাদিগের উদ্দেশ্যেই বলিদান করিয়াছিলেন, তাহা নহে, (Arrian বলেন) তিনি স্বয়ং সমুদ্রকেও নানা উপহারে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এমনকি Prophet Job এর গ্রন্থেও তারকাগণকে জীবনধারী প্রাণী মনে করিয়া বলা হইয়াছে যে তাহারা স্বর্গের সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে সংগীত করিয়া ফিরিতেছে।

আবার যে-সব দেশে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে, অর্থাৎ এক শ্রেণীর প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষিত এবং অন্য শ্রেণী অনুন্নত ও অশিক্ষিত, সেখানে বাহ্যত এক ধর্ম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে দুইটি ধর্মই বিরাজ করে। প্রাচীন Sabeansদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক নক্ষত্র-বাসী দেবগণকে ভক্তি করিত, অন্য শ্রেণী নক্ষত্র গুলিকেই পূজা করিত। অগ্নিপূজকদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক অগ্নিকে উপলক্ষ মাত্র জানিত, অন্য শ্রেণী অগ্নিকেই উপাস্য মনে করিত। পুতুল বা প্রতিমার প্রচলন যে-দেশে আছে সেখানে সর্বত্রই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরোহিতেরা প্রতিমাকে ধ্যানধারণার সহায়ক বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যাহারা পড়িতে জানে না, তাহাদিগকে পুস্তক কিনিয়া দিলেও ফল হয় না। অসভ্য জাতি, মনে করে, তাহার দেবতা ঐ প্রতিমার ভিতর আছে, কিংবা ঐ প্রতিমাকেই দেবতা মনে করে। শিশু তাহার পুতুলটিকে যে চক্ষে দেখে, ইহারা দেবপ্রতিমাকেও ঠিক সেই ভাবেই দেখে। শিশু জানে যে তাহার পুতুল রং-করা কাঠ দিয়া প্রস্তুত এবং তাহার ভিতরে হয়তো মটরের দানা কিংবা করাতের গুঁড়া আছে তবু সে তাহাকে জীবিতের মত ভালবাসে, শাড়ী পরায়, বিছানায় শোয়াইয়া ঘুম পাড়ায়। Savage এর ভ্রান্তিও ঠিক এইরূপ;

কারণ সে কল্পনাশক্তিতে শিশুর সমতুল্য। সেও প্রতিমার সঙ্গে আদর করিয়া কথা বলে, জল দিয়া তাহার পা ধোওয়াইয়া দেয়। তাহার মাথায় ও মুখে তেল দিয়া দেয়, প্রার্থিত জিনিষ না পাইলে অনুযোগ করে।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। দেবতার নৈতিক আচরণও দেশের লোকের নৈতিক আদর্শের অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বেদুইন বা যাযাবর জাতি সচরাচর তাহাদের দল ছাড়া অন্যদলের দ্রব্যসামগ্রী অপহরণ বা লুণ্ঠন করা, অন্য কথায় কাফেরের মাল লুট করা, অন্যায় মনে করে না। তাহাদের দেবতাও তাহাদের মতো লুণ্ঠনকারী সর্দার। যখন তাহারা বেদুইন স্বভাব ত্যাগ করিয়া শস্য-শ্যামল প্রান্তরে বাস করিয়া কৃষ্টি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, এবং বাড়িঘর ও শহর নির্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করে তখন তাহাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দেবতাও চুরি, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি নিষেধ করিয়া নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেন। কিন্তু সময় সময় তাহাদের পূর্বদেবতার বচন বা ক্রিয়াকলাপ লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় এবং ওগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত যুগের লোকেও অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করে। তখন একটা কৌতুকজনক অথচ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে, ধর্মবিশ্বাস তখনকার লোককে উন্নতির দিকে না উঠাইয়া অবনতির দিকেই টানিয়া নামায়। কাজে কাজেই ধর্মবিশ্বাসও অনেকটা শিথিল হইয়া যায়। কারণ, একই কাজ দেবতায় করিয়া গিয়াছেন বলিয়া লীলারূপে পরিগণিত হইবে, আর মানুষে করিলে তাহার জন্য ফাঁসিকাষ্ঠের ব্যবস্থা হইবে, এই অন্যায় অবিচার শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকে দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারে না।

সাধারণ লোকের মন অত্যন্ত অগঠিত ও অপরিপূর্ণ। এজন্য তাহাদের কোনো নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাঁধাবাঁধি বিশ্বাস থাকা চাই। সেই অজানিত ও অজ্ঞেয় পুরুষ বা শক্তি সম্বন্ধে একটা থিওরি থাকা উচিত, যাহাতে বিশ্বাস করিয়া তাহার জিজ্ঞাসু মনের কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু এই Theory যে রূপই হউক না কেন, তাহাকে লোকের বুদ্ধির সহিত সমান তালে চলিতে হইবে। সেই Theory এমন হওয়া চাই, যে অনুসন্ধানের ফলে তাহা বিনষ্ট না হইয়া যেন আরও তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

কিন্তু উন্নত জ্ঞানপিপাসী মন কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া সর্বদা সন্দেহে আন্দোলিত থাকিবে। তাহারা যে কেবল অতিরঞ্জিত পৌরাণিক কাহিনীগুলিকেই অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহা নহে; জগতের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য, জ্ঞানমূলক ও নীতিমূলক যে সমস্ত সুকৌশল যুক্ত থিওরি উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতেও সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না। তাহারা দিনের পর দিন কেবলই চিন্তা করিতে থাকিবে। ক্রমেই জ্ঞানের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিবে; কিন্তু দেখিতে পাইবে যে চিন্তার ক্ষেত্র অনন্ত প্রসারিত। তখন সে

বুঝিতে পারিবে যে মানববুদ্ধি সেই সূক্ষ্মচিন্তার ক্ষেত্রে কত দুর্বল, কত শক্তিহীন। তথাপি মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই—সে অনবরত সৃষ্টিরও গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইটিই মানুষের গৌরব। ইতিমধ্যেই সে দুইটি বিরাট সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমটি এই—জগতের সৃষ্টি ও পরিকল্পনায় আপাতদৃষ্টিতে নানা বৈষম্য দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে সকলের মধ্যে এক চমৎকার ঐক্যবন্ধন আছে। বিশ্ব যেন এক অখণ্ড বিরাট দেহ, যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি একে অন্যের পরিপূরক। দ্বিতীয়টি এই যে, জগতের সমুদয় নৈসর্গিক ও নৈতিক ব্যাপারই অপরিবর্তনীয় কঠোর নিয়মের অধীন। প্রকৃতপক্ষে, বৃষ্টি অথবা সুবাতাসের জন্য প্রার্থনা করা আর সূর্যকে মধ্যাকাশে অস্ত যাইতে বলা সমান হাস্যকর। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা যতটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, জীবিকার জন্য বা রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করাও ঠিক ততখানি নির্বুদ্ধিতার চিহ্ন; আবার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করা যতটা অজ্ঞতার লক্ষণ, মানসিক শান্তি বা পবিত্রহৃদয় লাভের জন্য প্রার্থনা করাও তথৈবচ। পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাই নিয়ম অনুসারে ঘটে। এমনকি যে সমস্ত কাজ মানুষের খামখেয়াল বা খোশমেজাজের উপর নির্ভর করে, তাহাও সমষ্টির হিসাব ধরিলে (statisticaly) মানুষের ইচ্ছার অধীন নহে। একটি মানুষের জীবন একটি পরমাণুর মতই হেঁয়ালি যুক্ত, কিন্তু সমগ্র মানব সমাজ যেন গণিতের (Problem) হিসাবের ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত। ব্যষ্টি হিসাবে সে ইচ্ছাশক্তিময় মানুষ, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে সে কলের তৈয়ারি জীব, যাহার এরূপ ছাড়া অন্যরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল।

বিশ্বের একত্ব একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহার সৃষ্টিকর্তাকে একটিমাত্র মহামন বলিয়া ধরিয়া লওয়া সদৃশ-যুক্তিমূলক অনুমান। এই অনুমান হয়তো মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু সত্যই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা যুক্তিসহ অনুমান। তথাপি ইহা অনুমান মাত্র। আর বাস্তবিক পক্ষে, ইহাতে আমাদের সমস্যার অপনোদন হয় না, সত্যাবিষ্কার বেশিদূর অগ্রসর হয় না। পৃথিবী যেন কচ্ছপের উপর অবস্থিত হইল, কিন্তু 'কচ্ছপ কিসের উপর আছে?' এই নতুন প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সেই মহামন অর্থাৎ 'আল্লা' যেন জগত সৃষ্টি করিয়া জাগতিক নিয়ম ঠিক করিয়া দিলেন, কিন্তু 'আল্লা' কোথা হইতে আসিলেন? ধর্মকারেরা বলিলেন, খোদা 'স্বয়ম্ভূত' অর্থাৎ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছেন; জড়বাদীরা বলিবেন, পদার্থ আপনা হইতে উদ্ভূত। তবে এ সমস্তই অসার কথা, বিস্ময় বিমুগ্ধ নির্বাক বৈজ্ঞানিকের নিকট এসব কথার কোনোই মূল্য নাই। এই সমস্ত ব্যাপার অসীমের ধারণার ন্যায় বর্তমান মনুষ্য-চিন্তার বহির্ভূত। আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা সে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন জ্ঞানান্বেষী হিসাবে আমাদের তাহা অনুসন্ধান করা উচিত; এবং যে সমস্ত নৈতিক নিয়মের অধীন, নাগরিক হিসাবে তাহা পালন করা কর্তব্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র আল্লাকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করাই

বৈজ্ঞানিক হিসাবে সর্বাপেক্ষা কম আপত্তিজনক। কিন্তু একথা প্রথম ঘোষিত হইয়াছিল, সুসভ্য গ্রীকদের দ্বারা নহে, অর্ধসভ্য বেদুইন আরবদের দ্বারা। প্রথমে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয় যে গ্রীকেরা সর্ব বিষয়ে প্রাচীন আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকিলেও ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে—যাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও বুদ্ধির সাপেক্ষ, কেন আরবদের নিকট ঋণী হইল? কিন্তু উভয় দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই একথার উত্তর পাওয়া যায়। গ্রীস দেশে নদী উপত্যকা, ফল, মূল, লতা, পুষ্প বিচিত্র; আর আরবের রিক্ত প্রকৃতি মরুভূমি মাত্রেই পর্যবসিত। সুতরাং গ্রীকের মনে একক দেবতার কল্পনা করা কষ্টকর ও অস্বাভাবিক, আরবদের পক্ষে তেমনি বহুতার ধারণা করাই আশ্চর্যের বিষয়। আরবের মরুভূমির মধ্যে হয়তো কতকগুলি পাথর এবং আকাশের চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আমরা জানি আরববাসী প্রথমত এইগুলিকেই দেবতা বলিয়া মানিত। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় তাহাদের প্রাচীন রাজাদের এক উপাধি ছিল 'সূর্য-দাস'। বর্তমান যুগেও প্রাভাতিক নক্ষত্রকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু এই দেশের বুদ্ধিমান লোকে চিরকাল, (অন্তত ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই), এক খোদায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। একেশ্বরবাদকে আরব্য ধর্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরবদের এই একেশ্বর ধর্মই, হজরত এব্রাহিম, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, জহুরা, সামুয়েল, সল, দাউদ, সুলেমান প্রভৃতির জীবন ঘটনার সংস্পর্শে কিরূপ পরিবর্তিত ও বিকশিত হইয়াছিল, পরে তাহা হইতে কেমন করিয়া খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম উদ্ভূত হইয়া সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সে সমস্ত ইতিহাস চমৎকার হইলেও এখন বলিতে গেলে আপনাদের নিশ্চয়ই ধৈর্যচ্যুতি হইবে। এজন্য আজ আর ক্রমবিকাশের শেষাংশের ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে কোনো দিন সে বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াই আজ বিদায় লইতেছি।

নারী-জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ

মিস ফজিলতননেসা

সুন্দর করে একটি প্রবন্ধ সৃষ্টি করবার জন্য যা কিছুর প্রয়োজন সে চিন্তাশীলতা বা জ্ঞানের গভীরতা আমার নেই। তাই আপনাদের নিকটে আমার অনুরোধ এই যে, একে প্রবন্ধ হিসাবে বিচার না করে শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত সামান্য দুইএকটি কথা বলেই গ্রহণ করবেন।

নারী-জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদের রূপটি ফুটিয়ে তোলার ভার আপনারা একটি নারীকেই দিয়েছেন, কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত কি বাস্তবিকই কিছু আছে যা বিশ্বজনীন অনুভূতিরই ফল? একই জিনিষকে মানুষ তার প্রবৃত্তি ও প্রবণতা অনুসারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখে থাকে এবং তার থেকে যেটুকু রস গ্রহণ করে থাকে তারও স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমিও তাই একান্তভাবে আমারই অনুভূতিলব্ধ কয়েকটি কথা বলব।

আধুনিক শিক্ষা হতে যা কিছু আমি আমার জীবনে পেয়েছি তাতে হয়তো ভুল পাওয়ার পরিমাণই বেশি। বুদ্ধির ত্রুটিতে অনেক জায়গায়ই আমি বঞ্চিত, এই কথাটা মনে রেখে আজ আপনারা আমার সব কথা গ্রহণ করবেন।

নারী-জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ সম্বন্ধে বলতে হলে আমি বুঝি যে, আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে নারী-জীবন কিছু নতুন উপলব্ধি, নতুন চেতনা লাভ করেছে কিনা এবং যদি লাভ করে থাকে তবে সেই নারীত্বটুকু তার জীবনে কোন রস জাগিয়ে তুলেছে—তারই আলোচনা। আরো ব্যাপকভাবে নিলে এ কথাও বলা যায় যে এই শিক্ষার সাহায্যে আপনাকে জানবার ও বুঝবার জন্য মানব-হৃদয়ে যে অনন্ত কামনা তাকে নারী এতটুকুও চরিতার্থ করতে পেরেছে কিনা তাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

প্রথমেই আমরা দেখতে পাই যে, আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে ভুলত্রুটি যতই থাক না কেন, তবু নারী-জীবনে তা মধুরতার স্বাদই এনে দিয়েছে। তার পরিচয় আমরা নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নবোদ্বুদ্ধ চেতনাতেই পেয়ে থাকি। যদি আমরা অতীত নারী-জীবনের সঙ্গে বর্তমান নারী-জীবনের তুলনা করে দেখি, তবেই এই মধুরতা এই নতুন আত্মোপলব্ধির চেষ্টার রূপটি পূর্ণ হয়ে আপনি এসে

আমাদের চোখে ধরা দেবে। এই আলোচনায় আমরা শুধু এইটুকুই দেখব যে, আধুনিক শিক্ষার প্রচলনের পূর্বে নারী এই সুখ দুঃখ প্রভৃতি নানারসে ভরা জীবনকে কিভাবে পেয়েছিল এবং এই শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত নবীন চেতনার সাহায্যেই বা তাঁরা তাঁদের জীবনকে কি ভাবে পাচ্ছেন। এখানেই মতান্তরের সৃষ্টি। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদকে দুরে রেখে কিছুক্ষণের জন্য আমরা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখব।

স্রষ্টা আদমকে সৃষ্টি করলেন, কিন্তু বেহেস্তে আদম মনের সুখে থাকলেও কিসের এক অজানিত অভাবে তিনি ম্রিয়মান হয়ে থাকতেন। তখন ... অভাব পূরণ করা হল যাকে দিয়ে তিনি হলেন আনন্দরূপিনী নারী। এ ক্ষেত্রে নর-নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসাবে যদি আমি বলি যে 'নারী ও পুরুষ পরস্পরের complement, একে অন্যের substitute নয়', তাহলে বোধ হয় আপনারা অস্বীকার করবেন না।

তারপরই আমাদের যে-সবচেয়ে পুরান ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখি যে নর-নারী জীবনযাত্রার পথে সৃষ্টির এই মূল উদ্দেশ্যটি ভুলে যাননি। গৃহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই নর-নারী পরস্পরের সঙ্গী। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান, চিন্তা ও সৃষ্টির স্রোত পাশাপাশি বয়ে চলেছে। কর্মের ক্ষেত্রেও তাই। প্রয়োজন অনুসারে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে করো দায়িত্ব বেশি রয়েছে, কিন্তু কোথাও একের জীবন অন্যের জীবনের বিকাশে পরিপন্থী হয়ে উঠছে না। কি এক অপূর্ব চেতনা তাদের জীবনকে রসে, গন্ধে, গানে ভরে দিয়ে পূর্ণ করে, সুন্দর করে তুলেছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট চেতনার জ্যোতি চিরদিন এমনি উজ্জ্বল রইল না। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যে শিক্ষাপদ্ধতি তাদের উপলব্ধি এনে দিয়েছিল, সে পদ্ধতি ধীরে ধীরে আবিল হয়ে এল, তাতে আর প্রাণ রইল না—রইল শুধু আচার-বিচারের বাহ্যিক আবরণ। তাই ধীরে ধীরে সে চেতনাও ম্লান হতে হতে একেবারেই নিভে গেল। যে শিক্ষার প্রভাবে একটি অপরূপ চেতনা নর-নারীর জীবনকে সুখময় করে তুলেছিল, সে-শিক্ষা ও সে-চেতনা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেল।

কিন্তু এই হারিয়ে ফেলার মাঝেও পুরুষ আপনাকে কিছু বাঁচিয়ে রাখল। একান্ত ভাবেই আপনাকে হারাল নারী। সে যে মানুষ—জীবনের বৈচিত্র্য থেকে রস গ্রহণ করবার অধিকার যে তারও আছে, এই জ্ঞান তার নিঃশেষেই লোপ পেল; এবং সেই সঙ্গেই তার বেঁচে মরে থাকা শুরু হল। তার জ্ঞান লাভের পথ, প্রতিভার স্ফূর্তির পথ সব নষ্ট হয়ে গেল। কর্তব্যজ্ঞান, আত্মসম্মান-জ্ঞান বিলুপ্ত হল। পুরুষের ইচ্ছার কাছে নিজেকে নত করে, আচারের দাসত্বে আপনাকে একান্তভাবে বিকিয়ে দিল। নারীর জীবনে বাকি রইল শুধু ব্যর্থতা আর বেদনার হাহাকার।

আজ সে যুগের অবসান হয়েছে, আজ নবীন ভাবের নব নব বন্যা জগতের প্রবাহিত। এই স্রোতের বেগ কোনো দেশই একেবারে রুদ্ধ করতে

পারেনি। তাই এর আলোড়ন আমাদের এই নিশ্চেষ্ট অসাড় নারীজীবনেও অনুভূত হচ্ছে। এই ভাবের প্রধান বাহন হয়েছে আধুনিক শিক্ষা। এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, এই আলোড়নের ফলে নারী কি পেয়েছে?

সে-কথাটাই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সকল মতবাদ আলোচনা করে বলতে চাই। আমি চলতে চাই যে এই শিক্ষা নারীকে পূর্ণতা দিতে না পারলেও মুক্তি দিতে না পারলেও পুনর্জন্ম দিয়েছে। সে আপনার প্রাণের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল, তাকে সেই বেঁচে থাকবার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। এই তার সার্থকতা। নারীজীবনের আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ তাই মধুর হয়েছে। অবশ্য একথা বলবার মতো স্পর্ধা আমার নেই যে, আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ-লাভে নারী-জীবন বর্তমানে সব রকমেই মধুর ও সুষমামণ্ডিত হয়েছে। আমি জানি যে এ শিক্ষার মধ্যে ত্রুটি অনেক আছে এবং এ শিক্ষার সংস্পর্শে এসে অনেক জীবনই বিপরীত পথে চালিত হয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে এ শিক্ষা সার্বজনীন ভাবে নারীকে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছে। তাকে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের রস গ্রহণ করতে শিখিয়েছে; তাই এর আস্বাদ আমাদের কাছে বড় মধুর।

তবে এই শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ বা জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে নারীর ধারণা যে অভ্রান্ত একথা বলতে চাই না এবং একথাও বলব না যে তারা আজ যে পথে চলছে তাই ঠিক। আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ নারীজীবনে যে, জাগরণের সাড়া এনে দিয়েছে সেজন্যই আমি তাকে বরণীয় বলে, কাম্য বলে আহ্বান করি। দুইএকটা দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো আমার বক্তব্য একটু পরিষ্কার হবে।

আত্ম-নির্ভরশীলতা শিখিয়ে এ শিক্ষা বিধবার ব্যর্থ জীবনে সার্থকতা এনে দিয়েছে। গঞ্জনা সহ্য করে, পরের দেওয়া ঘৃণার উচ্ছিষ্টের মায়া ত্যাগ করে আজ সে নিজের উপার্জনে জীবন যাপনের পথ পেয়েছে। তার কাছে জীবন আজ শুধু শুষ্ক মরুভূমি হয়ে থাকেনি।

জীবনের আদর্শকে বুঝবার একটি চেষ্টা আজ নারীর মধ্যে জেগে উঠেছে। সে প্রয়াস যতই ভুল পথে চালিত হোক না কেন, একথা বোধ হয় সবাই স্বীকার করবেন যে বুদ্ধিকে বাঁধা পথে চালিয়ে জড় করে রেখে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবার চেয়ে তাকে মুক্তির ভিতর দিয়ে বিধ্বস্ত হতে দেওয়া শ্রেয়স্কর। জড়তার চেয়ে প্রাণের স্পন্দন সব সময়েই বেশি কাম্য। নারীর জড়তা ঘুচিয়ে আধুনিক শিক্ষা তার মাঝে এ প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে তাই আজ তার আস্বাদ পাবার জন্য আমাদের এত আগ্রহ। এ যে আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে—সংস্কারের বাঁধন ছিন্ন করে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে শিখিয়েছে। এর সংস্পর্শে এসে, আমরাও যে বেঁচে থাকতে অধিকারী, এ পরম সত্যটির সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাই এর প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এ শিক্ষা নারীকে অন্তর্মুখী হতে না শিখিয়ে বহির্মুখী করে তুলেছে—নারীর একমাত্র কর্মক্ষেত্র গৃহাভ্যন্তর হতে তাকে বাইরে নিয়ে এসেছে। এতে নারীজীবনের আসল উদ্দেশ্য সফল হতে পারছে না। কিন্তু আমার মনে হয় এ তর্ক এখানে না তুললেও চলে। মানুষকে মনুষ্য-পদবাচ্য করতে সাহায্য করাই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে সর্বাঙ্গসুন্দর কোনোরকম সম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি আজ পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি। এবং হয়তো ভবিষ্যতেও পাওয়া সহজ হবে না। কাজেই যে-শিক্ষা আংশিক-রূপেও সে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়েছে সেটা কি নারী কি পুরুষ, সবার জীবনেই সার্থক। তাই যে-শিক্ষা নারীকে এত বড় অনুভূতি এনে দিয়েছে তাকে নারীজীবনে নিরর্থক বলে অবহেলা করব কোন সাহসে? হয়তো সে-শিক্ষা ঠিক পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করে নাই কিন্তু তবুও তো সে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। প্রাণে যখন সাড়া এসেছে, তখন আজ হোক, দুদিন পরে হোক, ঠিক পথ তারা খুঁজে নেবেই। এত বড় দানকে কি অগ্রাহ্য করা যায়?

যত বড় ভুল পথেই অগ্রসর হোক না কেন, নারী তো আজ এই শিক্ষার বলেই জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে। 'আমরা জীবনকে জানব' এই দাবি তো তাঁরা বিশ্ব সম্মুখে আনতে পেরেছে। কিভাবে জানবে, কোন পথে জীবন সম্বন্ধে তাদের সত্য উপলব্ধিটি সহজ হবে তাই নিয়ে মতভেদ করে লাভ কি? কি যে হওয়া উচিত সে বিষয়ে যথার্থ কজন ভাবতে পারে? এক্ষেত্রে নর বা নারীর প্রকৃতি তাকে যে-পথে যাত্রা করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে সেই পথেই তাকে যেতে দেওয়া বোধ হয় শ্রেয়। আগেই বলেছি যে, নর নারী সকল ক্ষেত্রেই পরস্পরের complement কাজেই তাদের কর্মক্ষেত্র বিশিষ্টরূপে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া যায় না। নারী যদি তার জীবনের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বহির্মুখিতাকেও প্রয়োজনীয় মনে করে তাহলে তো তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা চলে না। আর যে-শিক্ষা তাকে এই প্রয়োজনটুকুর কথা ভাবতে শিখিয়েছে তাকেও নিরর্থক বলা চলে না। বরং একথা স্বীকার করতেই হয় যে ভাবতে শিখিয়ে মনুষ্য-পদবাচ্য করে তুলেছে বলেই এ শিক্ষার আস্বাদ বর্তমান নারীজীবনে কাম্য হয়েছে।

আজ নারীর মুখে লুপ্ত হাসি ফুটে উঠেছে। বহু বৎসর পর্যন্ত অজ্ঞানতার অতলস্পর্শ গর্ভে থেকে আজ তার উত্থান হয়েছে। বহু বৎসর অন্যায় অত্যাচার সয়ে নারীর ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে। আজ তাদের লুপ্ত অধিকার ফিরিয়ে নেবার দিন এসেছে।

যে-সমাজ নারীকে এতখানি হীন করে রেখেছিল, আজ নব্য শিক্ষার গুণে নারীই আবার জয়-গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে বিজয়ী বীরের মতন সেই সমাজের নিকট হতে জয়মাল্য আদায় করে নিচ্ছে। শিক্ষার স্বাদ পেয়ে আজ নারী পুরুষের কাছে নিজের অধিকার দাবি করবার সাহস ও শক্তি পেয়েছে।

পূর্বে স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিনী মাত্র ছিল, এখন সহ-কর্মিণী। শিক্ষিতা নারী স্বামীর উপর ধর্ম ও কর্মের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে জীবন-ভার বাড়িয়ে তোলে না, স্ত্রীই তাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করে তার পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করে দেয়।

কয়েক শতাব্দী পূর্বে পুরুষ যে-নারীকে পদদলিত করে চলে গেলে যন্ত্রণায় তার বুক বিদীর্ণ হলেও তার মুখে ভাষা ফুটত না, আজ সেই মূক নারীর মুখে ভাষা ফুটেছে। নব্যশিক্ষা নারীকে তার নারীত্বের গৌরব, নারীত্বের মর্যাদা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে।

যেখানে স্নেহ নেই, মমতা নেই, সম্মান নেই, আছে কেবল পরাধীনতা, অন্যায় অবিচার, আধুনিক শিক্ষা সেখানে স্বাধীনতা ও পূর্ণ অধিকার জোর করে আদায় করবার সাহস দিয়েছে। নারীকে আজ প্রাণ খুলে বলতে শিখিয়েছে, 'স্বাধীনতা চাই, আত্মার মুক্তি চাই'। নারীকে আজ বলতে শিখিয়েছে, 'আমরা অজ্ঞতার কালো আবরণে আর ঢাকা থাকব না, আমরা অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করব। আমরা জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত হয়ে সেই আলোকে বিশ্ব-জগৎ উদ্ভাসিত করব, প্রতি গৃহে মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে জগতের মহৎ কল্যাণ সাধন করব। আমরা স্নেহে মমতায়, দয়ায় সেবায় ঘরে ঘরে শান্তিবারি সিঞ্চন করব। আমরা কুসংস্কার পদদলিত করে জগতের মঙ্গলার্থে অগ্রসর হব।'

নব্যশিক্ষা ভারতের ঘরে ঘরে প্রত্যেক নারীকে জাগবীর ও সমস্বরে স্বাধীনতা চাইবার দীক্ষায় দীক্ষিত করুক, এই আমার আন্তরিক কামনা।

আমার বক্তব্য আর বিশেষ কিছু নেই, তবু যেটুকু বলতে চাই, তাকেই পরিষ্কার করে বলতে যেয়ে একই কথা অনেকবার বলে আপনাদের ধৈর্য ও সময় নষ্ট করেছি। আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখের বিচিত্রতায় জীবন যে পূর্ণ এই চেতনা নারীহৃদয়ে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে যে-শিক্ষা নারীকে জীবনের পূর্ণ পাত্রের রস আস্বাদনে সাহায্য করেছে, সে-শিক্ষাকে আমার জীবনে আমি বড় করেই পেয়েছি—একথা বলেই আজ আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।




শিখা

তৃতীয় বর্ষ

১৯২৯

সম্পাদক : কাজী মোতাহার হোসেন

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'




অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

সমবেত সাহিত্য-সেবী ভ্রাতৃবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলী,

উপযুক্ত রূপে আপনাদের অভ্যর্থনা করি---এমন কিছু সম্বল আমাদের নেই। তাই শুধু 'সূনৃতা বাক' দিয়ে আপনাদের অভিনন্দন করছি। স্বাগত মাতৃভাষার সাধকগণ! স্বাগত মাতৃভাষার সেবক ও ভক্তগণ! 'আহলান ওয়া সহলান।' 'খোশ আমদেদ।'

আজ দেশের মধ্যে মুক্তির ডাক এসেছে। কিন্তু সে ডাক অতি ক্ষীণ। দূরের বাঁশির সুরের মতো কখন সে কানে এসে লাগে, কি না লাগে। অলস ভীরু কাপুরুষ আমরা, তার উপর তন্দ্রাঘোরে ভোর। চাই আমাদের জন্য তূরী ভেরীর তীকখিন বিকট নিখাদ নাদ। তা নাহলে জীবনের রাঙা পতাকার নিচে দলে দলে মুক্তিফৌজ এসে জমবে না; তা নাহলে মুক্তির লড়াই আমাদের চলবে না; তা নাহলে মুক্তি আমাদের মিলবে না।

তাই চাই আমাদের বীর্যবন্ত সাহিত্য। মাত্র একখানি পুস্তক আরবের বহু যুগের কাল-ঘুম ভেঙে দিয়ে সমস্ত দুনিয়া তোলপাড় করে এক নতুন প্রাণ গড়ে তুলেছে। মাত্র একটি গীত প্রাচীন ফরাসির শিরায় শিরায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে যত পুরানোকে ছাই করে এক নতুন ভাব-জগতে জাগিয়ে দিয়েছে। কালাম ও কলমের, বাণী ও লেখনীর এমনই অপূর্ব ক্ষমতা! তাই কুরআন তার দৈব ভাষায় ঘোষণা করছে---'নূন্ ওয়া-ল্ কলম্, ওয়া মা য়স্তুরূন' '(লক্ষ কর) 'দোয়াত, কলম এবং যা তারা লেখে' (সূরহ্ কলম)।

সাহিত্য যদি সাহিত্য হয় সে মুক্তি দিবেই---দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি, আত্মার মুক্তি। এই তিনটি নিয়েই মানুষ। একটি ছেড়ে অন্যের মুক্তিতে মুক্তি নেই। সাহিত্যের সকল উদ্দেশ্যই ঘুরে-ফিরে এসে দাঁড়ায় এখানে। এই মুক্তিকেই মাঝের বিন্দু করে সাহিত্য চারিদিকে ঘুরবে। আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট কাব্যের ফল সম্বন্ধে বলছেন---

> কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
> সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে ॥

'কাব্য যশের জন্য, টাকাকড়ির জন্য, আচার ব্যবহার জানবার জন্য, অমঙ্গল দূর করবার জন্য, সদ্য সদ্য পরম শান্তি লাভের জন্য, প্রেয়সীর ন্যায় উপদেশ দিবার জন্য।' সে সাহিত্য বিফল, ষোল আনাই বিফল, যা মুক্তির সন্ধান দেয় না।

আজ সাহিত্যের মার্কা নিয়ে একটা জিনিষ বাজারে চলছে। শুনি তার খাঁকতিও কম নয়, বিশেষ করে যুবক মহলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণ তরুণীদের একটা অপূর্ণ দুর্দান্ত ইচ্ছাকে রক্তমাংসময় কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করা। রহমানে ও শয়তানে যে তফাৎ, আঙুরে ও শরাবে যে তফাৎ, মুক্তি ও বন্ধনে যে তফাৎ আসল সাহিত্যে ও এই নকল সাহিত্যে সেই তফাৎ। হায়! অবোধ পাঠক জানে না সাইরেনের বাঁশরীর এই সুরের ন্যায় অসাহিত্য তাকে ধ্বংসের দিকে পলে পলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির সমস্ত যৌব-শক্তি এই সাহিত্য জোঁকের মতো নিঃসাড়ে চুষে নিচ্ছে।

সাহিত্যের হাটে যে কেবল এই কামাগ্নিসন্দীপনী বটিকাই বিক্রি হচ্ছে তা নয়। এর চেয়েও ভয়ানক ভয়ানক জিনিষ—একেবারে সাক্ষাৎ বিষ—নানা মনোহর নামে ও রূপে কাটতি হচ্ছে। পরখ করলেই অনায়াসে দেখা যাবে সেগুলির ভিতর আছে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, জাতীয় বিদ্বেষ প্রভৃতি। এ সমস্ত জাতির আত্মা ও মনকে বিষাক্ত করে দেশে কি অশান্তিই না ঘটাচ্ছে!

আমি রসিক নই; আর্ট বুঝি। কিন্তু আর্টের নামে কি গণিকার উলঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গীকেও প্রশ্রয় দিতে হবে? তারিফ করতে হবে? আমি সাহিত্যের স্বাধীনতা বুঝি। কিন্তু তাই বলে কি সাহিত্যের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে অমৃতের নামে বিষ কিংবা রসের নামে প্রস্রাব বিক্রিরও লাইসেন্স দিতে হবে? আমাদের এক জিহাদ ঘোষণা করতে হবে এই অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে। তবেই জানি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' একটা ফাঁকা আওয়াজ নয়—সে এক 'হায়দরি হাঁক' অসত্য অশিব অসুন্দরের বিরুদ্ধে অভিযানের। আজ সমস্ত মুসলিম বঙ্গ অনিমিষে চেয়ে আছে তার খিযরের জন্য যে তাকে পরান ভরে এই সত্যিকার সাহিত্যের 'আবে-হায়াতের' পরিচয় করে দেবে। বোধ হয় শূন্যে খিযরের আবির্ভাব হয়েছে, নইলে এত সাকী জুটল কোথা থেকে?

> 'উমরি তাঁ বাদা দরায আয় সাকীয়ানি বযমে জম।
> গরচি জানি-মা ন শুদ পুর ময় ব-দওরানি শুমা ॥'
> জম বাদশার সাকী ভাই সব! আয়ু তোদের বৃদ্ধি হোক,
> যতই কেন পেয়লা মোদের তোদের দানে শূন্য রো'ক। (হাফিয)

বাহন উপযুক্ত না হলে কেউ তার অভীষ্ট স্থানে পৌছুতে পারে না। লক্ষ লাভ করতে গেলে সাহিত্যেরও বাহন উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই বাহন মাতৃভাষা। মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে পরাণ আকুল করে? ডন কুইকসোট একটা রোগা ঘোড়ায় চড়ে বাহাদুরি জাহির করতে বেরিয়েছিলেন। তার চেয়ে বাহাদুরি বলতে হবে তাঁদের যাঁরা বিদেশী ভাষার

সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গড়তে চান। মিলটনের ল্যাটিন কবিতা এখন ঘুণের খোরাক হয়েছে। মধুসূদনের 'Captive Lady' এখন ভোলা-দরিয়ার অথই জলে ডুবে গেছে। বঙ্কিমের 'Rajmohon's Wife' এর সন্ধান দু'একটি বইয়ের পোকা ছাড়া আর কে রাখে?

এই প্রসঙ্গে উর্দুর কথা উঠতে পারে। মানি উর্দু শেখা দরকার। কিন্তু তার চেয়ে বেশি দরকার আরবি শেখা। যদি উর্দুর সাহায্যে আব্রহ্ম ভারতে আমরা পরস্পরকে জানতে পারি, আরবির সাহায্যে ফিলিপাইন থেকে মরক্কো, সাইবিরিয়া থেকে জাভা পর্যন্ত সমস্তকে চিনতে পারি। কিন্তু আরবি বা উর্দু শেখা এক কথা, আর তাকে সাহিত্যের বাহন করা আর এক কথা। বলা হয় বাংলায় মুসলিম সাহিত্য নেই। কিন্তু গোড়ায় উর্দুতেই কি ছিল? ফারসির কথা ধরা যাক। তাতে এক বিরাট মুসলিম সাহিত্য আছে। অল্পবিস্তর তুর্কীতে আছে; সিন্ধীতে আছে, মালয় ভাষায় আছে। শুরুতে এদের কোনোটাই তো মুসলিম সাহিত্যের ভাষা ছিল না। তবে বাংলার বেলা কেনই বা দোষ হবে? একটা মস্ত কথা আমরা ভুলে যাই যে আজ নতুন করে নয় বরং প্রায় চারশো বছর ধরে মুসলমান এই বাংলা সাহিত্যের সেবা করছে। শুধু তাই নয় আমরা আরও জানি যে মুসলমান আমীর ওমরার নেক নজরেই বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। সেই য়ুসুফ শাহ, হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ, পরাগল খান, ছুটি খানের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে। কাজি দৌলত আরাকানরাজ থিরি থুধম্মা রাজার সময়ে (১৬২২-১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে) 'সতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রাণী' রচনা করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ করবার পূর্বেই মারা যান। তা পুরা করেন সৈয়দ আলাওল। সৈয়দ আলাওল মধ্য যুগের বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের মাথার তাজ। তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা 'পদ্মাবতী' আরাকানরাজ থদো মিন্তার রাজার রাজত্ব সময়ে (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে)। খুব সেকেলে বলেই এঁদের নাম করলাম। এঁদের ছাড়াও অসংখ্য কবি, গায়ক ও লেখক বরাবরই বাংলা ভাষায়ই তাঁদের রচনা প্রকাশ করে ধন্য হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ও বন্ধুবর মৌলভী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদের প্রসাদে তাঁদের অনেকের খবর আমরা পেয়েছি। আজ আমরা কেমন করে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করতে পারি? তিন শতাব্দীর পূর্বের কবি কাযী দৌলতের বাংলার নমুনা দেখুন!

বিসমিল্লা প্রধানেক নাম নিরঞ্জন।
যে নাম স্মরণে কার্য সিদ্ধি সর্ব্বক্ষণ ॥
কি করিব যমদূতে বিপক্ষ বিবাদ।
সর্ব্বসিদ্ধি জয় জয় সে নাম প্রসাদ ॥
রহমান নাম অর্থ করুণা সদায়।

যে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র খণ্ডায় ॥
সুজন দুর্জ্জন আদি যত জীব জান।
ভক্ষকেরে কুশলে করান্ত ভক্ষ দান ॥
রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।
দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার ॥
দয়ার সাগর প্রভু পতিত পাবন।
দুঃখী পাপী নৃপতির সহায় কারণ ॥
লীলায় পাপের মূল করয় বিনাশ।
তুলা রাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ ॥

[বটতলা সংস্করণের বানান ভুল মাত্র শুধরে দেওয়া হয়েছে।—লেখক]

এক শ্রেণীর কাছে বাংলা ভাষা বলতে বোঝায় অনুস্বার বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত। বাংলার সৌভাগ্য সে শ্রেণী এখন এক রকম লোপ পেয়েছে। তেমনি অন্য দিকে আর এক শ্রেণী আছে তাদের কাছে বাংলা মানে আরবি-ফারসি-উর্দু-বাংলার এক অপূর্ব খিচুড়ি। দুই রকমের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

১ নম্বর

চমকি বিশ্ব নব-বীর্য্য সূর্য্য-নৃপ রজনি-রাজ্য অবসন্নে,
উদিত উদয় গিরি-কনক-মরু'পরি গঞ্জি মঞ্জুমণিবর্ণে।

দীপ্ত রশ্মিচয় সৈন্যনিচয়সম, (বিষম যুগাগ্নি বিনিন্দে)
ভস্মিল হতকর-পতিত-রজনিকর-যোদ্ধৃ নিকর উডুবৃন্দে।

২ নম্বর

হলকুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে!

আসমান ভরে গেল গোধুলিতে দুপরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফারের উপরে!

[দুঃখের সহিত আমরা লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, ২ নম্বরের মধ্যে যে মাধুর্য লালিত্য ও কাব্যঝঙ্কারের সমন্বয় হয়েছে তা ডক্টর সাহেব আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। আমাদেব মতে এই দৃষ্টান্তটি একেবারেই অপ্রযোজ্য। ইহার একটি শব্দও বেমানান বা দুর্বোধ্য হয় নাই। বরং আরবি ফারসি শব্দের সহিত বাংলা শব্দের মিলনে যে মাধুর্যের সৃষ্টি হয় এই ২ নম্বর তাহারই একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।—সম্পাদক, শিখা]

এই দু'দলের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে। তবেই বাংলার প্রাণ বাঁচবে। তা না হলে বাংলা মরে ভূত হয়ে যাবে—একটি নয় দুটো। একটি ব্রহ্মদৈত্যি, আর একটা মামদো। আমরা জীবন্ত বাংলাকেই চাই, তার ভূতকে নয়।

টেকচাঁদ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষার অনেকটা সংস্কার হয়েছে। এখন কিছু বাকি ভাষার দিক দিয়ে। কিন্তু বাংলার বানান বিভীষিকা এখনও ঘোচেনি। সেখানে মস্ত বড় একটা সংস্কারের দরকার। সংস্কৃতের দুটো ব বাংলায় একাকার হয়ে বানান সংস্কারের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। তিনটে শ, ষ, স, দুটো ণ, ন, দুটো জ, য এদেরও একাকারের দরকার আছে। বানান সংস্কারের নজির পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে পাওয়া যাবে। কিন্তু কারো তো সাহসে কুলায় না। ব্রহ্মশাপের ভয়ে নাকি!

খালি বানানে নয়, অক্ষরেও তার সংস্কারের দরকার আছে। যুক্তাক্ষরগুলি অনেক স্থলেই রাসায়নিক মিশ্রণের মতো হয়ে আছে। এতে যে খুঁট আখুরে ছেলে মেয়ের প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলা যখন ইংরেজি ফরাসি আদি ভাষার মতন পৃথিবীর একটা গণ্যমান্য ভাষা হয়ে উঠবে, তখন হয়তো লাতিন হরফ চালাতে হবে। আপাতত যুক্তাক্ষরের একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতটা সকলে মেনে নিলেই গোলমাল চুকে যায়। কিন্তু আমরা এমনই প্রাচীন পন্থার দাস, যে এই সংস্কারটুকুও বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নই।

আমরা অনেকবার বলেছি মুসলিম সাহিত্য। কেউ হয়তো বলতে পারেন 'কি গোঁড়ামি! সাহিত্যেও আবার জাত বিচার।' তাই একটু খোলাসা করে বলা দরকার—মুসলিম সাহিত্য বলতে কি বুঝি। আমাদের ঘর ও পর, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদিস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বাংলার হিন্দু মুসলমানের চেনা পরিচয় হবে। চেনা হলেই ভাব হবে। To Know is to love. এই সেদিন দীনেশবাবু বলেছেন, 'যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের উন্নত চরিত্রগুলি সুন্দর মহিমান্বিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করেন, তবে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবেন।' আমরা একেই বাংলার মুসলিম সাহিত্য বলি। হিন্দু সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মসজিদের মতো এক সম্প্রদায়ের একচেটে জিনিষ নয়। সুহৃদ্বর সত্যেন্দ্র দত্ত, ভক্তি ভাজন গিরিশচন্দ্র সেন, মাননীয় কৃষ্ণকুমার

মিত্র, শ্রদ্ধেয় জলধর সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হিন্দু লেখকও অনেক মুসলমান সাহিত্য রচনা করেছেন। বাস্তবিক বাংলা সাহিত্য বাংলার হিন্দু মুসলমানের অক্ষয় মিলন-মন্দির হবে। হিন্দু সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য হবে তার দুই কুঠরী। সর্বত্রই সকলের অবাধ প্রবেশ অধিকার। যে পর্যন্ত মুসলিম সাহিত্য না গড়ে উঠছে সে পর্যন্ত মিলন মন্দির পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না।

তবে, এস হিন্দু ও মুসলমান! এস সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ভক্ত! এস কবি ও গায়ক! এস ঐতিহাসিক ও দার্শনিক! আমরা এই মিলন মন্দির গড়ে তুলি। এস কিশোর-কিশোরী, এস তরুণ-তরুণী, এস জরৎ-জরতী, এই মিলন-মন্দিরে এক মন প্রাণ হয়ে মুক্তি সাধনা করি।

এখন ঋষি-কবির ভাষায় প্রার্থনা করে আমার অভিভাষণ শেষ করি :

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
আমাদেরে* সেই স্বর্গে কর, জাগরিত।

[* মূলে আছে 'ভারতেরে'।—লেখক]

সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ

আবুল মুজফফর আহমদ

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

আপনারা এই সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত করিয়া আমাকে যে অশেষ সম্মান দিয়াছেন তজ্জন্য সর্বপ্রথম আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু আজ নিজে সভাপতি না হইয়া আপনাদের সহিত মিলিয়া আমার চেয়ে অধিকতর বিজ্ঞ ও শক্তিশালী কোনো মহাত্মাকে আপনাদের ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ করিবার জন্য এই সভার সভাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পাইলে আমার পক্ষে ইহাপেক্ষা ঢের বেশি সুখের বিষয় হইত।

বন্ধুবর মি. হুসেন যখন আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করেন তখন আমার মনে শঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল কারণ বহুদিন হইল আমি সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করিয়া আইনচর্চায় মন দিয়াছি। কাজেই, আধুনিক বিবিধ সাহিত্যিক ভাবধারার সহিত আমার কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। অতএব আপনারা একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ সাহিত্যিকের নিকট হইতে যাহা আশা করিতে পারিতেন তাহা আমার নিকট হইতে কখনোই আশা করিতে পারেন না। তিনি বিষয়টি আরও মধুর করিয়া বলিতে পারিতেন এবং সত্যকার সাহিত্যিক রুচি-সৃষ্টির জন্য তিনি আপনাদের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা আরও বেশি উদ্দীপিত করিতে পারিতেন। আমার অবস্থা বরং একজন সাধারণ গুরুমহাশয়ের মতো—যিনি তাঁহার ছাত্রের প্রয়োজনের বেশি কিছু দিতে এবং তরুণ প্রাণে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ। তবুও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং ভরসা করি, আমার সাধ্যমতো চেষ্টা সত্ত্বেও আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে আপনারা উদার গুণে তাহা মার্জনা করিয়া লইবেন। আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি এই অধিবেশন সাফল্য-মণ্ডিত করেন।

সর্বপ্রথম আমি এই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' সভ্য ও সারথিগণকে বিশেষত সম্পাদক ও সভাপতি সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গত তিন বৎসর তাঁহারা এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের তরুণ সমাজে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে, জ্ঞানের পিপাসা সৃষ্টি করিতে

এবং জ্ঞানের অমৃতধারার সন্ধান দিতে যাইয়া তাঁহারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনন্যমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই সমাজের শৈশব অবস্থায় তাঁহাদের যে কি প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইতেছে তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আল্লাহতায়ালার নিকট এই প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁহাদের মনে অধিকতর উৎসাহ, তেজ ও শক্তি দান করেন যাহাতে এই সমাজ অচিরে সমগ্র বাংলা তথা ভারতের যাবতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-মার্জিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয়।

আসল কথা তুলিবার আগেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই আমাদের বর্তমান অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রতি। আপনারা জানেন, আধুনিক জগতের মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞান-দীপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে বাংলার মুসলমানের স্থান সর্বনিম্নে। স্বভাবতই আমরা অনুকরণ-প্রবণ। অন্যের হাবভাব আচার ব্যবহার গতিবিধি সমস্তই হুবহু অনুকরণ করিবার একটি প্রবল ইচ্ছা আমাদের মধ্যে জাগ্রত। কিন্তু আমি সতর্ক করিতেছি কোনো কিছুই বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য নয়। কোনো ভাবধারা ভাল বলা হইলেই বা প্রচারিত হইলেই যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে, বিচার করিয়া তাহার গূঢ় সত্য সম্বন্ধে বিশেষরূপে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহা গ্রহণ করা উচিত। কারণ কোনো একটি ভাবধারা একটি বিশেষ আবহাওয়ায় বা দেশে কার্যকরী হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য আবহাওয়ায় বা দেশে তাহা তদনুরূপ কার্যকরী নাও হইতে পারে। প্রত্যেক আন্দোলনের প্রাণ বুঝিবার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। প্রত্যেক অনুষ্ঠান প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় হইলেও তাহা যুক্তি-বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই না করিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য নয়। মৌলিক চিন্তাই সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রাণ এবং যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ এই মৌলিক চিন্তার জনক ও পরিপোষক। ইহাতে ভাব-বিপর্যয় ঘটে না বরং সাধারণ জ্ঞান প্রখর হয়। মোট কথা, মৌলিকতাই সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি করে কিন্তু অনুকরণ তাহার প্রাণ সংহার করে। বাংলা সাহিত্য ইসলামের অগ্নি-রসে মার্জিত হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক এবং আধুনিক জগতের প্রয়োজন অনুসারে মুসলিম সমাজের সামাজিক, আর্থিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক।

সাহিত্য কি?

এস্থলে জাতিবিশেষের সাহিত্যের জন্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিত করা কর্তব্য। সাহিত্যের সংজ্ঞা একান্ত করিয়া কেহই আজ পর্যন্ত দিতে সমর্থ হন নাই। আমি এ সম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত করিব মাত্র। আমার মনে হয়, কি ব্যক্তি কি জাতি যখন আপনার সত্তায় উদ্বুদ্ধ ও তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া উঠে তখনই সাহিত্য-

ধারা প্রবাহিত হইতে শুরু করে। এই ব্যক্তিত্ব বা আত্মানুভূতি আর সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার উপলব্ধি একই পর্যায়ভুক্ত।...

...বস্তুত সাহিত্যস্রষ্টা বলিয়া যাঁহারা জগতে অমর হইয়াছেন—তাঁহারা যে শুধু তাঁহাদের অন্তরাত্মার উপলব্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নহে তাঁহারা বিশ্বের অপরূপ রহস্যজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বিশ্ব-বিশ্রুত সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি কত মার্জিত ও প্রসারিত, অনুভূতি কত তীব্র ও গভীর! তাঁহাদের জীবন অসীম আনন্দে নৃত্য করিয়া চলে আর এই সুন্দর ভুবনকে নিরানন্দ বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। তাঁহাদের অন্তশ্চক্ষুতে এমন এক অভিনব আলোকরেখার সম্পাত হয় যাহার তুলনা কি স্বর্গে কি মর্তে অতীব বিরল। তাই আমরা সত্যই কবি Wordsworth এর সঙ্গে গাহিতে পারি—

...Add the gleam
The light that never was on Sea or land,
The consecration and the poet's dream.

এই সমস্ত সাহিত্যিক পুরোহিত আমাদের দৃষ্টিপথে খুলে ধরেন সেই—

Magic casements opening on the foam
Of perilous seas in fairy lands forlorn.

ইহাতে একদিকে যেমন বিশ্বের সৌন্দর্য ও মহিমা প্রকাশ পাইতেছে অন্যদিকে তেমনি সমস্ত সৃষ্টবস্তুর অন্তর্নিহিত এবং মানব-অন্তরের চিরন্তন পরমানন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন বিশ্বজননী আনন্দের গান গাহিয়াছেন তখন এই আনন্দই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ....

ব্যক্তির পক্ষে যাহা জাতির পক্ষেও তাহাই প্রযোজ্য। কোনো জাতিই সর্বাগ্রে আপনার সত্তায় উদ্বুদ্ধ না হইয়া সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে না। যে মুহূর্তে এই অনুভূতি ও আত্মবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠে সেই মুহূর্ত হইতে জাতির সাহিত্যপুষ্প মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইতে শুরু করে। তাহার সৌরভ-মাহাত্ম্য তখন জাতির অস্তিত্বকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তোলে। কোনো কিছুই আর তখন তাহার গতি রুদ্ধ করিতে পারে না। সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি মানবজাতির সংহতি-সাধন করিবার জন্য একটি কার্যকরী উপকরণ। সত্যকার সাহিত্য-প্রীতি বিশ্বশক্তির সহিত মোকাবিলা করাইয়া বিভিন্ন প্রাণসংহারক শক্তি ও পৃথক পৃথক বিরুদ্ধস্বার্থ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র সমাজকে একই পথে চালিত করিতে সক্ষম হয়। মূলত সাহিত্য প্রাণ এবং জীবনচর্চার একটি চমৎকার উপায়। কবি, ঔপন্যাসিক, ধর্মযাজক সকলই মানুষ ও তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার জন্য সাহিত্য সম্পদশালী করিয়াছেন।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

সাহিত্যের কাজ মানব-মনকে উন্মুক্ত করিয়া তাহার গতিপথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সংস্কৃত ও মার্জিত করিয়া বিশ্বরহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য শক্তিশালী করিয়া তোলা। সাহিত্যচর্চায় মন ক্রমশ বিকশিত হইয়া তাহার বিচিত্র প্রবৃত্তির উপর সংযম লাভ করিয়া অভিনিবেশ, উদারতা, কার্যতৎপরতা, বিচারবুদ্ধি ও ভাব-প্রকাশের ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ইহাতে চরিত্রের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং অভিজ্ঞতার সীমা প্রশস্ত হইতে থাকে।

সাহিত্যের ভাষা

ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার প্রয়োজন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, যে ভাবসম্পদে অন্তরাত্মার চেতনা প্রকাশ পায় এবং যে ভাবের ভিতর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে তাহা আমাদের প্রকৃতি-সুলভ ভাষায় ব্যক্ত করা প্রয়োজন। সেই সুপ্রকাশিত ভাবই প্রকৃত সাহিত্যের মূল উপাদান। যে ভাষা আমরা মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে শুনি ও আবৃত্তি করি সে ভাষার চেয়ে এমন কোন ভাষা আছে যাহাকে আমরা আমাদের প্রকৃতিগত বলিয়া মনে করিতে পারি? আমরা বাঙালি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সুতরাং আমাদের শিক্ষার বাহন এবং আমাদের সাহিত্যের ভাষা যে বাংলা ভাষা হইবে সে সম্বন্ধে আর কোনো তর্কই চলিতে পারে না। আমি জানি কেহ কেহ বাঙালি-মুসলমানের শিক্ষার বাহন উর্দু হওয়া উচিত মনে করিয়া খুব আন্দোলন করিয়া থাকেন কিন্তু সে আন্দোলন ব্যর্থ হইবেই হইবে কেননা উহা আমাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মুসলিম সাহিত্যের জন্য আমরা বাংলা ভাষাই অবলম্বন করিব। উর্দু ও বাংলার মধ্যে আর কোনো মধ্যপন্থা নাই। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইসলামের ভাব-সমৃদ্ধিতে বাংলা ভাষা ক্রমশ অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং তজ্জন্য অনেক উর্দু, আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যবহার করিয়া বাংলা ভাষার অঙ্গ পুষ্ট করিতে হইবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী হইতেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যসেবী কবি ও লেখকের মধ্যে যাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অমর কবি সত্যেন্দ্রনাথ বহু আরবি ছন্দে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কবিতা লিখিয়া বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাবু শচীন্দ্রলাল দাস-বর্মনের লেখা হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কেমন সুন্দরভাবে আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা শব্দের সহিত মিল খায়। লাইন কয়টি এই :

কানে কানে গেয়ে গান ইরানের বুলবুল
সারাটি পরান মোর করে গেছে মশগুল
কি চাহনি বাণ হানে আঁখি পরি সুর্মা
যুগ ভাবি নাহি যদি দেখি এক লহমা।

এই আরবি-ফারসি শব্দগুলির ঝঙ্কার কেমন মধুর! আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

আঁখিতে সুর্মারেখা অধরে তাম্বুল,
হেলায় রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জরিতে জড়িত বেণী রুমালে তাম্বুল
বাদশার ছিলে তুমি খেলার পুতুল।

এই বাংলা ও ফারসি শব্দের চমৎকার সংমিশ্রণে সেই অতীত মোগল-বাদশাহর হেরেমের বিলাসিতা, সৌন্দর্য-চর্চা ও জাঁকজমকের চিত্র কেমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তিশালী মুসলিম সাহিত্যিকের আবির্ভাবে অচিরেই বাংলা ভাষা ইসলামের ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমাদের তরুণ কবি নজরুল ইসলাম সে কাজ বেশ কৃতিত্বের সহিত করিতেছেন। তাঁহারই আদর্শে আমাদের তরুণ সাহিত্যিকগণ আমার এই আশা ফলবতী করিয়া তুলিবেন সন্দেহ নাই। মুসলিম সাহিত্যিকের রচনা-সম্পদে বাংলা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইলে হিন্দু ও মুসলিম কালচারের একটি মনোরম সমন্বয় ঘটিবে এবং সেই সমন্বয়েই হিন্দু মুসলিম মিলন-সমস্যার সমাধান হইবে।

সাহিত্য-ক্ষেত্র ও শিক্ষা

এতক্ষণ সাহিত্যের সার্থকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বলা হইতেছিল। কিন্তু আফসোস! আমাদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র কোথায়? আমাদের সমাজের অতি অল্প লোকই সাহিত্য বুঝিবার উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কি দারুণ লজ্জার কথা! আমাদের সম্মুখে বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া আছে কিন্তু তাহা এখনও আগাছায় পরিপূর্ণ। সকলে মিলিত হইয়া আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ঐ ক্ষেত্র চাষ করিতে হইবে তবেই তাহাতে ফলপ্রসূ বৃক্ষ রোপণ করা সম্ভবপর হইবে। এজন্য চাই সর্বাগ্রে আমাদের বালক-বালিকাগণকে সমভাবে সর্বতোমুখী শিক্ষার সুযোগ সরবরাহ করিয়া দিয়া শিক্ষিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য শিক্ষাই সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। শিক্ষাই ইহলোক পরলোকের মঙ্গল ও কল্যাণপথ উন্মুক্ত করে। আমাদের ধর্মগুরু হজরত মুহম্মদ শিক্ষাকেই মানবজীবনের একমাত্র ভূষণ বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি নরনারী উভয়ের জন্যই শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। ...

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি শিক্ষিত নয় তাহার জন্মলাভ হইয়াছে বলা যায় না। দেখিবার, শুনিবার এবং অনুভব করিবার শক্তি তাহার একরকম নাই বলিলেও চলে। সে কেবল পশুর মতো খাইতে এবং নিদ্রা যাইতে পারে।

এ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য স্পষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য সরকার বাহাদুর একটি বিল প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের সমাজবিশেষ উপকৃত হইবে। সুতরাং এই বিলের ব্যবস্থা অনুসারে যদি কোনো শিক্ষা-কর আমাদের উপর ধার্য হয় তাহাতে আমাদের এতটুকু আপত্তি করা উচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে আমি নারী-শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে চাই। নারী শিক্ষিত না হইলে নর পঙ্গু থাকিয়া যায়। আমাদেরও হইয়াছে তাহাই। আমরা পঙ্গু। আমাদের ধর্মগুরু যদিও নরনারীকে সমভাবে শিক্ষিত করিবার আদেশ জারি করিয়া গিয়াছেন তবু আমাদের সংকীর্ণচিত্ত মৌলবী মৌলানা সাহেবগণ নারী-শিক্ষাকে একেবারে বর্জন করিয়াছেন। ফলে, আজ আমাদের নারীমাত্রই অশিক্ষিতা থাকায় আমাদের জাতীয় জীবন অবনতির অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুগে যুগে দেশে দেশে যে সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের জীবনে তাঁহাদের জননীদের প্রভাব কত সুফল প্রসব করিয়াছে তাহা আপনারা অবগত আছেন। আধুনিক জগতের বীর্যবান উন্নতশির জাতিসমূহ এমনকি তুরস্ক, মিশর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ আজ নারীশিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া স্কুল-কলেজের দ্বার নারীর জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। গভীর পরিতাপের বিষয়, মুসলিম ভারতই এ বিষয়ে সাংঘাতিকরূপে পশ্চাৎপদ। আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণও নারীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাহার প্রসারের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন।

বন্ধুগণ, আপনাদের অনুমতি হইলে, আমার প্রাচ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে তুরস্ক, মিশর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে নারীশিক্ষার যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত করিতে ইচ্ছা করি। মিশরের কথাই বলি। সেখানে সম্প্রতি বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে ১৩৭০টি বাধ্যতামূলক ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী এজন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। এই চেষ্টার তুলনায় আমাদের চেষ্টা কিছুই নয়। কতদিন ধরিয়া শিক্ষা বিলটি কাউন্সিলে পেশ আছে কিন্তু তাহার কোনো মীমাংসাই এখনও হয় নাই,—কাজ আরম্ভ করা তো দূরের কথা। দেশের লোকও শিক্ষা সংস্কারের প্রতি একেবারে উদাসীন।

মিশরের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। অচিরেই শিক্ষাক্ষেত্রে বালিকাগণ বালকগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেও নারীর অবাধ প্রবেশ। তাহারা সেখানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার নারী সম্প্রদায় পর্দা ত্যাগ

করিতেছে। অতি সম্ভ্রান্ত বনিয়াদি পরিবারেও পর্দা শিথিল হইয়াছে। পর্দার সঙ্গে ফেজের বিরুদ্ধেও একটি আন্দোলন শুরু হইয়াছে। উদার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মিশরে অন্নসমস্যা ও বেকার সমস্যা দূর করিবার জন্য নানাপ্রকার শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার বহু অনুষ্ঠান প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এমনকি মক্তব্যের ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব কল্যাণ অর্জনের শক্তি সৃষ্টি করিবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় আমি একটু পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। আধুনিক মিশরীয় ছাত্র ছাত্রী ধর্মানুষ্ঠান পালনে উদাসীন হইয়া পড়িতেছে। তাহারা ইউরোপীয় আদবকায়দা, জীবনায়োজন, পোষাকপরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়া নামাজ সম্বন্ধে কোরানের বিধিনিষেধ পালনে অবহেলা করিতেছে। বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও অঙ্গভঙ্গী তাহাদের নিকট রুচি-বিরুদ্ধ এবং অসুবিধাজনক বোধ হইতেছে। তাহারা এই বাহ্যিক প্রক্রিয়ার উপর আদৌ জোর দিতে চাহিতেছে না। আমি একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, 'শিক্ষা হইতে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়, কারণ ধর্মের উপরই চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।' তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিবার যথেষ্ট সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে তাহারা অকপটে তাহাদের মনের কথা যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে আমার মনে হইয়াছিল বস্তুত তাহারা ধর্মপ্রবণ কিন্তু বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক আচারের চাপে তাহাদের ধর্মভাব বিনষ্ট হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহারা বলে, অবিলম্বে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলির সরলতা সম্পাদন করাই এমনকি সম্ভব হইলে সেগুলি ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়; কেননা বিচার-বিমুখ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অনাবশ্যক কড়াকড়িতে তাহারা মনে করে তাহাদের আত্মা মৃতপ্রায় হইয়াছে। এটা ভাবিবার কথা বটে।

এই একটি দৃষ্টান্ত হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন আধুনিক জগৎ এবং আমাদের অন্যান্য দেশের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ কত দ্রুত শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এখন আমাদের উপায় কি?

আপনারা নারায়ণগঞ্জের ইসলামিয়া Education Trust-এর কথা শুনিয়া থাকিবেন। বালকবালিকাকে সমভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলাই এই Trust এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অনুসারে Trust পরিচালিত স্কুলগুলিতে ধর্ম-নীতি-শিক্ষা ও শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই Trust-এর আর এক উদ্দেশ্য শিল্পবাণিজ্য-শিক্ষা বিস্তার এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের সমাজের আর্থিক সমস্যার সমাধান করা। এই Trust-এর কার্যে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। সরকারের মুখপানে দেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের এক মূহূর্ত সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। আমাদের সমবেত চেষ্টায় দেশের শিরায় শিরায় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উঠিয়া

পড়িয়া লাগিতে হইবে। এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র হইতে যে সমস্ত শিক্ষিত ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবে তাহারাই সাহিত্যকে জীবন্ত করিয়া তুলিবে। এই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত Trust আন্দোলনকে উপযুক্ত যুক্তি পরামর্শ ও আলোচনার সাহায্যে অন্যান্য বিরুদ্ধপন্থী প্রতিষ্ঠানের সংঘর্ষ হইতে রক্ষা করা এবং চিন্তাশীল সাহিত্য-স্রষ্টাগণকে উৎসাহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

সামাজিক কুসংস্কার শিক্ষার বিঘ্ন

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার পথে সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার পর্বতপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি করিতেছে। ভারতে আমরা আচার ও প্রথার বন্ধনে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা আছি—যদিও সে সমস্ত প্রথা বহুপূর্বেই অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। আজ সেই প্রথার খোসা আছে শাঁস নাই কিন্তু আমরা খোসাই পূজা করিতেছি। ইহার সঙ্গে আবার মোল্লাশ্রেণীর দৌরাত্ম্য আরও আমাদের কার্যের বিঘ্ন ঘটাইতেছে। মোল্লাগণ দুর্ভাগ্যক্রমে ইসলামের ঔদার্য্যগুণ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে। এই সংকীর্ণচিত্ত মোল্লাপীড়িত অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত গোঁড়া সম্প্রদায় এমন নিদারুণভাবে রক্ষণশীল যে, তাঁহারা বালিকাদের কথা তো দূরে থাকুক, বালকগণকেও আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে বাধা দেন। তাঁহারা মনে করেন এই সমস্ত কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিলে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি ধর্মহীন হইয়া খোদাতালার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা হাদিস ফিকাহ আরবি শিখাইয়া আখেরের নেকী হাসিল করিবার লোভে মক্তব মাদ্রাসার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা একথা কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না যে, এই সমস্ত মক্তব মাদ্রাসার সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া আধুনিক জগতের জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার পথ তাঁহারা সাংঘাতিকভাবে রুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। বর্তমান জগতের শিক্ষা বিস্তারের জন্য কত মনীষী নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া অতি নির্বোধকেও অতিপ্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। আর আমরা আজ আমাদের চক্ষু মুদিত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছি। ইহা অপেক্ষা আত্মঘাতী আর কি হইতে পারে? যে সমস্ত প্রাচীন প্রাণহীন আচার ও অন্ধ-সংস্কার আমাদের শিক্ষা তথা সাহিত্য-প্রসারের পথ রুদ্ধ করিতেছে তন্মধ্যে আমাদের পর্দাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। বলা বাহুল্য, আমাদের ধর্মগুরুর জীবদ্দশায় পর্দাপ্রথার এত কড়াকড়ি আদৌ ছিল না। উম্মীয় ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে মহিলাগণ নিঃসঙ্কোচে বাহিরে চলাফেরা করিতেন—এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়াও জনসাধারণের মজলিসে মুক্তকণ্ঠে বক্তৃতা দিতেন। মুসলিম বিজেতাগণ যখন পারশ্য ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে আসিলেন তখনই তাঁহারা নারীর মর্যাদা ও মূল্য ক্ষুণ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেইদিন হইতে মুসলিম পতনের যুগ

শুরু হইয়াছে। সুখের বিষয়, আধুনিক মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ দ্রুত পর্দা প্রথা ত্যাগ করিতেছেন। তুরস্ক তো একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে। তাহার ফলে তুর্কী নারী আজ সর্বত্র স্বচ্ছন্দগতিতে আপনার ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি করিতেছেন।

বন্ধুগণ, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি পর্দাপ্রথা বর্জন করিয়া তুরস্ক অশেষ কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়াছে। আজ তুর্কীনারী তাই তুরস্কের যাবতীয় জাতীয় আন্দোলনে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। ব্যবসায় বাণিজ্য, আফিস আদালত, স্কুলকলেজ ইউনিভার্সিটি সর্বত্রই তুর্কীনারীর অবাধ গতি। অহো! খোদাতালার যদি এমনি মর্জি হইত যে, আমরা এক কলমের খোঁচায় পর্দাপ্রথা উঠাইয়া দিতে পারিতাম তাহা হইলে কি কল্যাণই না হইত! তাই বলি, আপনারা যদি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন যে, পর্দাপ্রথা আমাদের প্রাণশক্তি খর্ব করিতেছে, তবে আপনারা সত্যকার দেশপ্রেমিক ও সমাজহিতৈষীর মত এই সর্বনাশী পর্দাপ্রথা একেবারে তুলিয়া দেওয়ার জন্য প্রাণপণ করুন।

আমাদের অবনতির অন্যতম বিশিষ্ট কারণ সংগীতচর্চায় গোনাহর ভয়। সংগীত নিষেধ করা হইয়াছে হজরতের দোহাই দিয়া। কিন্তু হজরতের জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি কখনও সংগীত নিষেধ করেন নাই বরং নিজে সংগীত শুনিতেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী হজরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকাকে শুনাইতেন। মানবজীবনের উপর সংগীতের প্রভাব কত বড় সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা বাহুল্য। এই বলিলে বোধহয় যথেষ্ট হইবে যে, আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বলেন শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য আলোক ও বায়ুর যেমন প্রয়োজন আত্মার মুক্তি ও স্ফূর্তির জন্য সংগীতের তেমনি প্রয়োজন। যে শিক্ষাব্যবস্থায় বালক বালিকাগণের হৃদয়-পুষ্প সৌরভময় করিয়া তুলিবার জন্য সংগীত শিক্ষার স্থান নাই সে ব্যবস্থা আমার মতে অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল। সংগীতের সঙ্গে ললিতকলা শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে সুকুমারমতি শিশুদের চিত্ত-কোরক আদৌ বিকশিত হইতে পারে না। এস্থলেও মোল্লাসাহেবদের অন্ধ-বিশ্বাস ও সংকীর্ণ-চিত্ততা আমাদের চিত্ত-বিকাশের পথে কন্টকস্বরূপ হইয়া আছে। তাঁহারা হজরত মুহম্মদের দোহাই দিয়া চিত্র-চর্চায় বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। তাঁহাদের এই নিষেধ হাস্যকর বৈ আর কিছু নয়। আপনারা আপনাদের রুচি-জ্ঞানকে সাক্ষ্য করিয়া বলুন, রাফেল, ডা ভিনসি, মাইকেল এঞ্জেলো প্রমুখ বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্র দর্শন করিয়া আপনাদের চিত্ত কি অপরূপ ভাবে ভরপুর হইয়া উঠে না? ইউরোপের যে কোনো অঞ্চলের অতি নগণ্য যাদুঘরেও প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তত্তৎ অঞ্চলের কবি, গায়ক ও চিত্রকরের অপরূপ সৃষ্টি প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোকের চিত্ত আনন্দসমৃদ্ধ করিতেছে।

কিন্তু গভীর লজ্জার কথা যে, সংকীর্ণচিত্ত মুসলিম ধর্মপুরোহিতদের বাড়াবাড়ির ফলে বিগত কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে শাস্ত্র-পীড়িত মুসলিম জগতে বিশ্বের দরবারে আসন লাভ করিতে পারেন এমন নামজাদা গায়ক, চিত্রকর বা শিল্পী অতি অল্পসংখ্যকই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, মধ্যযুগের অবসান হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত মুসলিম-জগৎ বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তেমন কোনো মৌলিক সৃষ্টি দান করিতে পারে নাই। মৌলিক সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাহাদের যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ মুসলিম ভারত, তুরস্ক মিশরের ন্যায় অকুতোভয়ে সংগীত, ললিতকলা ও কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করিলেই তাহার মুক্তি তথা পূর্ণকল্যাণ ও মঙ্গলের ধারা দ্রুত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। তখনই ভারতীয় মুসলমান শক্তিমান হইয়া জীবনের পূর্ণ আস্বাদ লাভ করিয়া দীপ্ততেজে অগ্রগামী জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও অনুবাদ

আমি গোড়াতেই বলিয়াছি মৌলিকতাই সাহিত্যের প্রাণ ও সঞ্জীবনীশক্তি জোগায়। কিন্তু সকলেই মৌলিক সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। কারণ সকলের মানসিক শক্তি একরূপ নহে। এজন্য আমি বলি, সাহিত্যসমাজের যে সমস্ত সভ্য মৌলিক সৃষ্টি করিতে অসমর্থ তাঁহাদের পক্ষে ভাল ভাল জ্ঞান-সমৃদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদে হাত দেওয়া কর্তব্য। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। শুধু মুসলিম কালচারের পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার জন্য আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির অনুবাদকার্যে আপাতত হাত দেওয়া যাইতে পারে। এই অনুবাদ সহজ সরল বাংলা ভাষায় মুদ্রিত করিয়া দরিদ্রতম ব্যক্তির কুটিরেও পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই। তবেই বাংলাব্যাপী প্রচলিত অন্ধ-সংস্কার দূরীভূত হইবে। কোরানের বাংলা অনুবাদ আরো সুন্দর করিয়া করা উচিত। কোরান ও অন্যান্য আরবি ফারসি গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনূদিত হইলে আমার বিশ্বাস অচিরেই মুসলিম বাংলায় এমন এক নব-যুগের সূচনা হইবে যেমন পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাইবেল ইংরাজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর এক নব মুক্তির যুগ আরব্ধ হইয়াছিল। এই সমস্ত অনূদিত গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বাংলায় তথা মুসলিম ভারতে এমন এক নব সংস্কারের যুগ আসিবে যাহাতে অন্ধ সংস্কারের বন্ধন এবং নীতি ও ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডি ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং ধর্মের এক নবজোশ ঔদার্য ও প্রেমের পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া মানব সমাজের সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধতা দূরীভূত করিয়া বিশ্বকল্যাণ ও সত্যকার মঙ্গলকে সার্থক করিবে। আরবি ফারসি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের জ্ঞান বিজ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থ বাংলায় তর্জমা করিয়া ফেলা দরকার। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতি এই অনুবাদ কার্যের জন্য আমার বিশেষ অনুরোধ।

অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। লাইব্রেরী জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করিবার পক্ষে বিশেষ হিতকর। মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থায় এরূপ লাইব্রেরীর বিশেষ প্রয়োজন; কারণ মুসলিম বাংলায় পুস্তক ক্রয় করিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার মতো ক্ষমতা কয়জনের আছে? লাইব্রেরী সেই ক্ষমতার অভাব দূরীভূত করে। লাইব্রেরীর উপকারিতা সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু বলিতে চাই না। সে সম্বন্ধে আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তবে এইটুকু বলিতে চাই যে, লাইব্রেরী শুধু নাটক উপন্যাস ও হালকা কবিতার পুস্তক লইয়াই হয় না। সেখানে সর্বপ্রকার চিন্তাশীল লেখকদের পুস্তক থাকা চাই। আর বড় বড় লেখকদের পুস্তক ধারাবাহিকভাবে পাঠ করা উচিত। পাঠে সর্বদাই একটি বিশিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক; কারণ পাঠে শৃঙ্খলা না থাকিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

শিল্প বাণিজ্য ও অর্থকরী শিক্ষা

আপনারা জানেন বাঙালি-মুসলমানের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। এই অবস্থা হইতে তাহাদের মুক্তি সাধনের জন্য কিছু করা দরকার। অধিকাংশই কৃষিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর লোক। তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিক রুচি সৃষ্টি করা বিশেষ কষ্টকর। মানুষ মাত্রই রুটির জন্য ব্যগ্র। রুটি-সমস্যার সমাধান না হইলে সাহিত্য-সমস্যার সমাধান অসম্ভব। সুতরাং সর্বপ্রথম অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। অধিকাংশই রুটির জন্য বাঁচিতে চায়। আমরা আমাদের মুনাজাতে আগে দুনিয়ার খায়ের চাহিয়া পরে আখেরাতের খায়ের চাহি। এজন্য অর্থকরী শিক্ষার বিস্তার যত দ্রুত হয় ততই দেশের ও আমাদের দুঃস্থ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। যে শিক্ষা আমাদের রুটি অর্জনে বিশেষ হিতকর আজ আমাদের সেই শিক্ষা চাই। কিরূপে শ্রমিক কার্যদক্ষ হয়—কিরূপে অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন করিতে পারা যায়—কিসে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে বিস্তর পুস্তক সংকলন করিয়া জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া কর্তব্য। এ কার্যেও সাহিত্য সমাজের হাত দেওয়া উচিত। দেশের ও সমাজের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবাণিজ্য সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যার প্রতি এই সাহিত্যসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ইহার কার্য সর্বতোমুখী না হইলে ইহার উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হইবে না। আশা করি সাহিত্যসমাজ দেশের বিভিন্ন রুচির অনুকূল বিবিধ সমস্যার সমাধান কল্পে ইহার শক্তি নিয়োজিত করিয়া সমাজের উন্নতি পূর্ণাঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবেন।

উপসংহার

এইক্ষণ আমার এই মামুলি কথাগুলি শুনিয়া আপনারা যে ধৈর্য ও ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে গভীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি জানি আমার এই বক্তৃতায় কোনো মৌলিকতা নাই। কেবল আমি আমাদের দেশের বিশেষত মুসলিম সমাজের অত্যাবশ্যকীয় সমস্যাগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। চতুর্দিক নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে—সমাজের অধিকাংশই উদাসীন। তবু তাহারই মাঝে সাহিত্যসমাজের সারথিগণের দুঃসাহস দেখিলে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। তাঁহারা অদম্য উৎসাহে বাংলার পতিত মুসলিম সমাজকে মুক্তির পথে আনিবার জন্য বড় কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। খোদাতায়ালা তাঁহাদের এই মহৎ কার্যে অধিকতর উৎসাহ ও সাহস প্রদান করুন মনে প্রাণে এই প্রার্থনা করি। যদি এই তরুণ স্বার্থত্যাগী সারথিগণ তাঁহাদের এই কঠিন ব্রতে আরও কিছুদিন ধরিয়া টিকিয়া থাকিতে পারেন তবে আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের জন্য এক অতি সুন্দর, সুখদায়ক ও উজ্জ্বল প্রভাতের আগমন অনিবার্য করিয়া তুলিবেন। ...

আব্বাসীয় যুগ

কাজী আকরম হোসেন

আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর তাঁহার নির্মিত রাজধানীর নাম দিয়াছিলেন দার-উস-সালাম, অর্থাৎ শান্তিধাম; তুর্কী ও ফারসি লেখকগণ উহাকে 'বিহিশত আবাদ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাগদাদ তাহার এই দুই নামই বহুল পরিমাণে সার্থক করিয়াছিল। আরব ইরান ও সিরিয়া তিনেরই সমান নিকটবর্তী হওয়াতে বাগদাদ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক কেন্দ্র হইয়াছিল, এই জন্য প্রাচীন দামাস্কাস অপেক্ষা নবীন বাগদাদ রাজধানী হিসাবে নিশ্চয়ই বেশি উপযুক্ত ছিল। রাজধানীর নির্মাণের প্রথম হইতেই উহাকে জগতের প্রভুত্ব, সম্পদ, জ্ঞান ও কলার কেন্দ্র হইবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের তীরভূমি আদিকাল হইতেই পৃথিবীর একটি প্রধান জীবন-কেন্দ্র ছিল; বাগদাদ প্রাচীন বেবিলন, সেলুসিয়া এবং টেসিফনেরই নবীন মূর্তি। উহার নির্মাণের সময় টেসিফনের ধ্বংসাবশেষ হইতে অনেক মালমশলা লওয়া হইয়াছিল এবং সিরিয়া ও পারস্য হইতে শিল্পী আনা হইয়াছিল। অতীতের ভস্মস্তূপের উপর নবীনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা; পূর্বের সহিত পশ্চিমের মিলন; ভারতের বাণী, ইরানের রুচি, সিরিয়ার শিল্প, মিশরের স্থাপত্য, গ্রীসের জ্ঞান, রোমের ব্যবস্থা-সৌকর্য প্রভৃতির সহিত আরবের নবীন প্রাণের সংমিশ্রণ, ইহা অপেক্ষা বড় আর কোন জিনিষ আমরা আব্বাসীয়গণের নিকট হইতে আশা করিতে পারি?

শুধু স্থলপথে জগতের সহিত বাগদাদের সম্বন্ধ ছিল মনে করিলে ভুল হইবে, বাগদাদ একটি প্রকাণ্ড পোতাশ্রয়ও ছিল; টেমস তীরবর্তী লণ্ডনের সহিত তাইগ্রিস-সলিল বিধৌত বাগদাদের তুলনা হইতে পারে। লণ্ডনের তবু অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, কিন্তু সে যুগে বাগদাদের মতো সামুদ্রিক ও অসামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র জগতে আর দ্বিতীয় ছিল না। বাগদাদ এখনও একটি বড় বাণিজ্যকেন্দ্র, কিন্তু হারুন ও মামুনের সে বাগদাদ, সমৃদ্ধি-শোভার আধার সৌধ-মিনার-কিরীটিনী স্বপ্নপুরী বাগদাদ আর নাই। আরব্যোপন্যাসের চিত্রে হয়তো রঙ অনেক বেশি পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সে যুগের বাগদাদের আভাস আমরা একমাত্র উহা হইতেই প্রাপ্ত হইতে পারি। আরবের বাণিজ্য জাহাজ যে যুগে চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে

সম্পদ আহরণ করিয়া আনিত, যে যুগে আফ্রিকার নিগ্রো ও উত্তর ইউরোপের শ্বেতকায় দাসদাসী বাগদাদের রাজপথে বিচরণ করিত, সে যুগের ছবি যে একটু অতিরঞ্জিত বোধ হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? বাগদাদ নগরী সত্যই যে তখন দুনিয়ার রাণী ছিল।

বর্তমানকালে সুলতান ইবনে সউদ এক দুঃসাধ্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি চির-যাযাবর বেদুইনদিগকে স্থায়ী বসবাস শিক্ষা দিতেছেন। সতত সঞ্চরমান শিবির জীবন কখনও উচ্চাঙ্গের জ্ঞান, কলা ও সভ্যতার পরিপোষক হইতে পারে না, চঞ্চলগতি মরুবাসীর নিকট প্রাণ-বিমোহন স্থপতি-শিল্পের অথবা আকাশ-পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত উন্নত মান-মন্দিরের আশা করা যায় না। ইসলামের গৌরবযুগে বহুসংখ্যক আরববাসী তাঁহাদের চিরন্তন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া গৃহবাসী হইয়াছিলেন; মরক্কো, মিশর, সিরিয়া সর্বোপরি মেসোপটেমিয়ায় প্রথমত আরব সৈনিকাবাস ও কালক্রমে সাধারণ আরব উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। বসরা ও কুফানগর এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছিল। বাগদাদনগরী এই অভিনব উদ্যমের চরম ফল। উম্মিয় খলিফাগণ সময় সময় দামাস্কাস ত্যাগ করিয়া আসিয়া মরুভূমির মধ্যে বাস করিতেন; কিন্তু আব্বাসীয়গণ ছিলেন ষোল আনা গৃহবাসী, কাজেই তাঁহাদের সকল আয়োজন ও কর্মের মধ্যে স্থায়িত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য আব্বাসীয় যুগে আমরা সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের বিপুল চেষ্টা দেখিতে পাই। আব্বাসীয় যুগের পূর্বে এক কোরআন শরীফ ভিন্ন আর কোনো লিখিত ধর্মগ্রন্থ ছিল না বলিলেই হয়, হাদিসের শিক্ষা চিরদিনই মুখে মুখে দেওয়া হইত এবং মুখে মুখেই ধর্মোপদেশ প্রচারিত হইত। কিন্তু এই যুগে ধর্মগ্রন্থ সংকলনের জন্য বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি আলেমগণ কি অসাধারণ পরিশ্রমই না করিয়াছিলেন। আব্বাসীয় যুগের প্রাসাদ ও লাইব্রেরী, শাস্ত্রগ্রন্থ ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক, অনুবাদ ও মৌলিক রচনা প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহাদের সঞ্চয় বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কৃপণের যে সঞ্চয় তাহা কোনো ফলপ্রসব করে না, কিন্তু নবসৃষ্টির প্রাক্কালে যে শক্তি সংগ্রহ তাহা কৃপণের সঞ্চয় হইতে ভিন্ন। এই যুগের আরব যেমন সঞ্চয় করিয়াছেন, তেমনই সৃষ্টিও করিয়াছেন। এ বিষয়ে উম্মিয়গণ তাঁহাদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহারা দেশ জয় করিয়াছিলেন, নানা দেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, বীজসংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আব্বাসীয়রা তাহা লইয়া সোনার ফুল ফুটাইলেন।

আর এক কথা, এ যুগে আরব বলিতে শুধু আরবের অধিবাসী বা তদীয় বংশধরকেই বুঝাইত না; পশ্চিমে মরক্কো হইতে পূর্বে খোরাসান পর্যন্ত সকলেই আরবির চর্চা করিতেন, বাগদাদের সমৃদ্ধি ও আনন্দলীলায় সমানভাবে যোগ দিতেন এবং আরবের জ্ঞানোৎসবে সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের মশাল সমানভাবে

জ্বালাইতেন। আব্বাসীয় যুগের পূর্বে অন্য জাতীয় মুসলমান অপেক্ষা আরবদিগের প্রাধান্য সর্ব বিষয়ে অত্যধিক ছিল, কিন্তু আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সকল মুসলমানই সমশ্রেণীস্থ বলিয়া পরিগণিত হইল এবং আরব ও পারসীক বা আরব ও সিরিয়ার মধ্যে ভেদরেখা বিলুপ্ত হইল। উম্মিয় সাম্রাজ্য আরব সাম্রাজ্য; কিন্তু আব্বাসীয় সাম্রাজ্য মুসলমানের সাম্রাজ্য। এ যুগের যত কীর্তি তাহা শুধু আরবের কীর্তি নয়, সর্বদেশের মুসলমানের তাহাতে সমান অংশ ছিল। প্রাচীন অবসাদগ্রস্ত জাতির দেহে আরব ধমনীর নবীন রক্তের সংমিশ্রণে যে নবজীবনের সৃষ্টি হইয়াছিল পশ্চিমে স্পেন হইতে পূর্বে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত রূপে ও রঙে তাহা সমানভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

সুবিস্তীর্ণ মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ও মস্তিষ্ক ছিল বাগদাদ। স্পেন আব্বাসীয় সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সৃষ্টি ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টি সব সময়েই আরবের দিকে থাকিত। কর্ডোভার কীর্তি বাগদাদের কীর্তি হইতে ভিন্ন হইলেও ভিন্ন জাতীয় নহে। মুসলমানের এই গৌরব-যুগের অসাধারণ কর্ম-অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করা আমাদের সাধ্যাতীত, উহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রদান করিতে পারিলেই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

বাগদাদের বাণিজ্য সম্পদের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বাষ্প ও তড়িত যুগের বহু শত বৎসর পূর্বে বাগদাদ নগরে সুদূর চীন দেশে প্রস্তুত জিনিসপত্রের জন্য যে একটি পৃথক বাজার ছিল ইহা স্মরণ করিলে তৎকালীন মুসলমানদিগের অধ্যবসায় ও কার্যকুশলতায় চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না। ইউরোপ হইতে কাঁচা মাল আনিয়া তৎপরিবর্তে তাঁতের বস্ত্র, অলঙ্কার, ধাতুর দর্পণ প্রভৃতি তৈরি জিনিস পাঠান হইত; ইহাতে প্রমাণ হয় যে, মুসলমান জগৎ অন্যান্য বিষয়ের মতো শিল্পক্ষেত্রেও ইউরোপ অপেক্ষা উন্নত ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ইসলাম যে কিরূপ সুফল প্রসব করিয়াছিল তাহা চাকরি-সর্বস্ব বাঙালি-মুসলমান কল্পনাও করিতে পারেন না। কথিত আছে যে ইমাম আবু হানিফাকে চাকরি দিতে চেষ্টা করিয়া স্বয়ং খলিফা মনসুরও কৃতকার্য হন নাই, তিনি রাজপদ অপেক্ষা সামান্য ব্যবসায়কেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। শিল্পক্ষেত্রে আব্বাসীয় যুগের মুসলমানের সৎসাহস এমনকি দুঃসাহস তাঁহাদের জাগ্রত মনের পরিচয় প্রদান করে। চীনদেশে কাগজ প্রস্তুত হয় শুনিয়া তাঁহারা দেশে নতুন ধরনে কাগজ তৈরির চেষ্টা আরম্ভ করেন এবং অবশেষে বিবিধ রূপের বিবিধ রঙের ও বিবিধ মূল্যের সুন্দর সুন্দর কাগজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। এইরূপ তাঁহারা যেখানে যে ভাল জিনিসটি পাইতেন তাহাই স্বদেশে উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন এবং অসাধারণ কৃতকার্যতাও লাভ করিয়াছিলেন। রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে তাঁহারা সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত বিষয়ে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন এবং কৃষি ও শিল্পকর্মের সুবিধার জন্য বহু

নতুন নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ব্যবহার করিতে । শস্য ও ফলের চাষ রীতিমতো বৈজ্ঞানিক ধরনেই হইত।

ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প সকল জাতিরই জীবনের ভিত্তি। এ ভিত্তি যে জাতির দৃঢ় নয় তাহার নিকট হইতে জ্ঞানবিজ্ঞান ও ললিতকলায় সুমহান সৌধ আশা করা যায় না। আব্বাসীয় যুগের মুসলমানের জাতীয় জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল ইহা আমরা দেখিয়াছি, ঐ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানসৌধটিও তেমনই বিরাট ও শোভন হইয়াছিল।

আজকাল আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। মুসলিম সাম্রাজ্যে আইন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন ছিল না। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল বালক বালিকাই ছয় বৎসর বয়স হইতে শিক্ষালাভ করিত। প্রথম প্রথম জ্ঞানবিস্তারের জন্য কোনো রূপ প্রতিষ্ঠান ছিল না, মসজিদই মুসলমানের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মসজিদে যে কেবল ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা নহে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত ইত্যাদিও শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। যে কোনো মুসলমান বিনা বেতনে সেখানে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। শিক্ষকেরা কাহারও নিকট হইতে নির্দিষ্ট বেতন পাইতেন না, সাধারণত তাঁহাদের ব্যবসায়, শিল্প বা অন্য কোনো অবলম্বন থাকিত। শিক্ষক উপযুক্ত না হইলে শিক্ষার্থী জুটিত না, ডিগ্রীর জোরে শিক্ষক হওয়া তখনকার দিনে সম্ভবপর ছিল না। শিক্ষার জন্য ভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও বেতনভোগী শিক্ষকের ব্যবস্থা পরবর্তী যুগের কথা।

জ্ঞানচর্চা শুধু পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মেয়েরাও সমানভাবে সাহিত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসা বিদ্যা এবং ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, কেহ কেহ সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। মেয়েরা কবিত্ব ও সংগীতের সাধনাও করিতেন এবং টেনিস প্রভৃতি ক্রীড়ায় যোগ দিতেন। আব্বাসীয় যুগের প্রথম অংশে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরা নৃত্য কলারও চর্চা করিতেন।

আদি মুসলিম যুগের আরবগণ যে অবস্থায় বাস করিতেন, এখন তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। মরুভূমির পরিবর্তে তাহারা একটি সুন্দর শোভাময় জগতের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সীরিয় ও পারসীক রীতিনীতির প্রভাব হইতে উম্মিয় ও আব্বাসীয় যুগের মুসলমানগণ মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। থাকিলে তাহা অস্বাভাবিক হইত এবং ইসলামের গণ্ডি তাহা হইলে আরবদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া যাইত। পারিপার্শ্বিকতার সহিত খাপ খাইতে গিয়া সুফল ও কুফল দুই হইয়াছিল। মুসলমানরা যদি আরবের বাহিরের প্রভাব বর্জন করিয়া চলিতেন তাহা হইলে তাঁহারা অত্যন্ত সরল ও নিরাড়ম্বর অথচ অত্যন্ত উদ্ধত ও উগ্র থাকিয়া

যাইতেন। বাহিরের সংস্পর্শে আসাতে তাঁহারা উদার ও শান্ত অথচ বিলাস ও আরামপ্রিয় হইয়া গেলেন। বিলাসিতার দুই রূপ; পুষ্পরাশি যেমন সুন্দরী যুবতীর অঙ্গভূষণ আবার মৃতদেহেরও আচ্ছাদন, সেইরূপ বিলাসিতা কখনও বা জীবনের স্ফূর্তি ও আনন্দের বিকাশ, কখনও বা দুর্বলতা ও নিঃস্বতা ঢাকিবার ও ভুলিবার কুৎসিত প্রয়াস। আব্বাসীয় যুগের প্রথম ও শেষ ভাগের বিলাসিতার এই পার্থক্য।

আব্বাসীয় যুগের মুসলমান যে শুধু কবিতা ও সংগীতের চর্চাতেই মশগুল হইয়াছিলেন তাহা নহে, চিত্রবিদ্যাও তাঁহারা বাদ দেন নাই। লিপিবিদ্যায় তাঁহারা কিরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যে কালে মুদ্রাযন্ত্রের নামগন্ধ ছিল না সেকালে যে কিরূপে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইত তাহা আমাদের ধারণার অগোচর। এইখানে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক বালক বালিকাকে যেমন কোরআন শিক্ষা দেওয়া হইত তেমনই উচ্চাঙ্গের লিপিবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। গ্রন্থমধ্যে যে কেবল লতাপাতাই আঁকা হইত তাহা নহে, জীবজন্তুর ছবিও থাকিত অর্থাৎ অঙ্কনবিদ্যায় কোনো অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিত না। সিরিয়ায় আবিষ্কৃত একটি প্রাসাদ হইতে জানা যায় যে, উম্মিয় যুগের মুসলমানরাও গৃহপ্রাচীরে মানুষের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিতেন। ইসলাম চারুশিল্পের জীবন-নাড়ি কাটিয়া দিয়াছে, সাধারণের এই বিশ্বাস ভিত্তিহীন। মতওয়াক্কিলের মতো গোঁড়া খলিফার মুদ্রাতেও তাঁহার প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। প্রতিমূর্তির বিরুদ্ধে যাহা কিছু সংস্কার ছিল, পারসীক প্রভাবে তাহাও বিদূরিত হইয়াছিল।

বাণিজ্য, শিল্প এবং ললিতকলায় আমরা গৌরবযুগের মুসলমানের যে সাহসের পরিচয় পাইয়াছি জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহা আরো সুপরিস্ফুট। বর্তমান যুগের জার্মান ফরাসি ও ইংরেজের মতো তাঁহারা কোনো বিদ্যা ও কোনো শাস্ত্রকে দুরধিগম্য বলিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। বিরাট বা ভূমার ভয় কোনো দিন তাঁহাদের কার্যক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিতে বা তাঁহাদের শক্তিকে পঙ্গু করিতে পারে নাই। 'আরবজাতির দার্শনিক' আলকিন্দী একাই দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, সংগীত ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে প্রায় দুইশত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং গ্রীক, পারসীক ও হিন্দুদিগের বিজ্ঞান ও দর্শন আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ আলফারাবী ভাষাতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত একখানি বিশ্বকোষ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তিনি সংগীত-তত্ত্ব ও বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ প্রণালী সম্বন্ধেও পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইবনে সীনা ছোটবড় প্রায় একশত পুস্তক লিখিয়াছেন। কথিত আছে যে, ঐতিহাসিক তাবারী চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ভ্রমণকারী আলবেরুণী তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত গ্রন্থ ছাড়া জ্যোতিষ, গণিত, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ক

পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং অনেক সংস্কৃত পুস্তক আরবিতে ও গ্রীক পুস্তক সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। আব্বাসীয় যুগের মুসলমানগণ দিকে দিকে ভ্রমণ করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে জগতের সকল জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন এবং তাহা দিয়া নিজেদের বিশেষত্বমণ্ডিত নতুন জ্ঞানসৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই বিশ্বগ্রাসী জ্ঞান-ক্ষুধার ফলে আবব তীক্ষ্ণতা ও সজীবতার সহিত আর্য সূক্ষ্মতা গভীরতার আশ্চর্য সংযোগ সাধিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সমগ্র মুসলিম জগৎ নব নব ভাব ও চিন্তার আলোড়ন অনুভব করিতেছিল।

ফন ক্রেমার (Von Kremer) এর মতে উম্মিয়দিগের সময়ে দামাস্কাস নগরে খ্রিস্টানদিগের সহিত সংশ্রবের ফলে ইসলামের ভিতর মুর্জি মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। মুর্জিগণ অমুসলমানদিগের প্রতি বেশ উদার ছিলেন এবং মুসলমানের জীবন এবং ভবিষ্যৎকেও কিছু উজ্জ্বলভাবে ও আশার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। আল্লাহ ও রসুলে যাহার বিশ্বাস আছে সেই মুসলমান; সেই কোনো না কোনো সময়ে বেহেশতের অধিকারী হইবে যদিও গোঁড়াদিগের সহিত তাহার মতানৈক্য থাকিতে পারে—মুর্জিরা এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। এই আন্দোলনের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নাই তবে একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইমাম আবু হানিফা এই মুর্জি দলভুক্ত ছিলেন।

বসরা নগরে মুতাজেলা মতের উদ্ভব হইয়াছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই মতের গুরুত্ব অত্যধিক। মুসলিম জগতের উপর মুতাজেলা দলের প্রতিপত্তি কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত অপ্রতিহত ছিল এবং বড় বড় পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকগণ এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুতাজেলাগণ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং অন্ধ বিশ্বাস ও গতানুগতিকতার বিপক্ষে বুদ্ধি, বিচার ও তর্কের শাণিত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অদৃষ্টবাদ মানিতেন না, আল্লাহকে নিরাকার বলিয়া জানিতেন ও কোরআন শরীফ অনাদি নহে এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। মুতাজেলা মত দ্রুতগতিতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খলিফা মনসুর ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তীগণ এই মতের পোষকতা করিতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে উহা গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে মামুন, মু'তাসীম ও ওয়াসেক প্রকাশ্যে মুতাজেলাবাদ গ্রহণ করেন এবং রাজ্য মধ্যে উহা প্রচার করেন।

স্টাইনার (Steiner)-এর মতে মুতাজেলাবাদ স্বাধীনভাবে ইসলামের মধ্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং পরে গ্রীক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। Goldziher এর মতে মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্র (ফিকাহর) উপর রোমান আইন ও চিন্তাধারার ছাপ খুব বেশি পরিমাণে পড়িয়াছে। মুসলমানদিগের কর্মক্ষেত্র যখন খুব বাড়িয়া গেল তখন সকল ব্যাপারে ও প্রতি ঘটনায় কোরআন ও হাদিসের আইন প্রয়োগ করা সম্ভবপর থাকিল না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কেয়াস ও রায়ের উপর নির্ভর করিতে হইল। কোরআন, হাদীস, কেয়াস ও রায় সম্পর্কিত

আলোচনার ফলে যে চারিটি বিভিন্ন মজহবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইমাম আজম আবু হানিফা সাহেব অধিকাংশ হাদিস জাল বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কোরআনের উপরই বেশির ভাগ নির্ভর করিতেন, অধিকন্তু তিনি রায় বা ব্যক্তিগত মতের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। মুতাজেলাদের তুলনায় তিনি যথেষ্ট গোঁড়া, কিন্তু অন্যান্য মজহবের তুলনায় তাঁহার মজহব অত্যন্ত উদার। অন্যান্য ফকীহগণ অমুসলমানের জীবনকে মুসলমানের জীবন অপেক্ষা সর্বাংশে হেয় বলিয়া মনে করিতেন; আবু হানিফা প্রথমে মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করেন এবং অমুসলমানের জীবন মুসলমানের জীবনের মতোই সমান মূল্যবান বলিয়া ঘোষণা করেন। চৌর্য অপরাধের শাস্তি তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমাইয়া দেন। আবু হানিফার বিপরীত ছিলেন ইবনে হাম্বল। হাম্বলের মতে নামাজ না পড়ার দণ্ড মৃত্যু, কিন্তু আবু হানিফা উহার জন্য লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে বোঝা যায় যে, তিনি যেমন কোরআনের ভক্ত ছিলেন তেমনই উদারতা, সহিষ্ণুতা ও করুণার পক্ষপাতী ছিলেন।

মামুনের সময়ে মুতাজেলা মত যখন খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল তখন ইবনে হাম্বল উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, মানুষ আল্লাহকে চক্ষে দেখিতে পারিবে, তিনি যে কুর্সীর উপর দেহ ধরিয়া বসিয়া থাকিবেন ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, মানুষের নিজ কর্ম স্বাধীনতা কিছুই নাই, সে অদৃষ্টের ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। মজহব হিসাবে হাম্বালের দল বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সমগ্র হানাফী জগতের উপরে উহার গভীর ছাপ রহিয়া গিয়াছে। বর্তমান হানাফী মত ঠিক আবু হানিফার উদার মত নহে, উহা হানাফী ও হাম্বলী মতের সংমিশ্রণ। (সৈয়দ আমীর আলী, 'Spirit of Islam')

মুতাজেলাদিগের সহিত ইমাম হাম্বলের বিরোধ বহুদিন চলিয়াছিল। মামুন জোর করিয়া মুতাজেলাবাদ চালাইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে ইমাম হাম্বল শৃঙ্খলিত অবস্থায় বিচারার্থ নীত হইয়াছিলেন, এবং মুতাসীম তাঁহার জন্য দোররা মারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কারাগারেই তাঁহার এন্তেকাল হয়। খলিফাদিগের জবরদস্তির ফল কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়; জনসাধারণ ইমাম হাম্বলের পক্ষে ও মুতাজেলা মতের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর প্রায় দেড় লক্ষ লোক তাঁহার লাশের অনুগমন করিয়াছিল। জোর করিয়া মুতাজেলাবাদ প্রচার করিতে গিয়া মামুন প্রভৃতি খলিফাগণ হাম্বলী মতেরই সহায়তা করিয়াছেন। তাহার ফলে শধু যে মুতাজেলা মত ধ্বংসের সহায়তা হইয়াছে তাহা নহে, মধ্যপন্থী হানাফী মতও অযথা রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

খলিফা হিসাবে মতওয়াক্কিল মুতাজেলাবাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। তর্কের ক্ষেত্রে আশয়ারী ও গাজ্জালী উহাকে পরাস্ত করেন। তদবধি গোঁড়া মতই ইসলামে

জয়ী হইয়া আছে এবং গোঁড়াগণ চিন্তার স্বাধীনতামূলক প্রত্যেক আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপে ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মুস্তানজিদের আদেশে ইবনে সীনা ও ইখওয়ান উস সাফার সমস্ত গ্রন্থাবলী ভস্মীভূত করার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আব্বাসীয় খলিফাগণের রাজত্বকালে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে ও নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুফীদলের উদ্ভব হইয়াছিল। সুফীমতের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে নানা জন নানা ধারণা পোষণ করেন। কেহ বা বেদান্তের সহিত কেহ বা Neo-platonism এর সহিত উহার সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়াছেন। সুফীগণ বলেন যে, স্বয়ং হজরত মোহাম্মদের নিকট হইতে তাঁহারা তাঁহাদের গুপ্ততত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন। আদি যাহাই হউক না কেন উপরি লিখিত সময় হইতে যে তাঁহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইহা সত্য এবং সহজবোধ্য। এই যুগের নানারূপ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা, মুতাজেলা ও আশয়ারীদিগের মধ্যে নিরন্তর তর্কযুদ্ধ, গোঁড়াদিগের ভাববর্জিত ধর্মচর্চা প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কতকগুলি লোক স্বভাবতই শান্তি ও বিস্মৃতির আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই জন্যই ইমাম গাজ্জালী সকল দর্শন আলোচনা করিয়া কোনো কূল না পাইয়া শেষে সুফীমতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুফীমত মুতাজেলাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; কিন্তু গোঁড়াদিগের হস্তে উভয়কেই নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। তবে প্রাচ্য জগতের স্বভাব অনুসারে চিন্তা-ধর্মী মুতাজেলাদিগের অপেক্ষা ভাবধর্মী সুফীরা মুসলমানের নিকট বেশি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

মুতাজেলাদিগকে দমন করিতে গিয়া হানাফীগণ যে নিজেদের পায়েও কুঠারাঘাত করিয়াছেন ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, স্বাধীন চিন্তা বন্ধ করিতে গিয়া চিন্তাস্রোতই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দর্শনের ভয়ে বিজ্ঞান আলোচনাও স্থগিত হইয়াছে। সত্য বটে, সাধু চিন্তা এবং স্বাধীন চিন্তার মধ্যে পার্থক্য করা শক্ত এবং বিজ্ঞান হইতে দর্শন খুব বেশি ভিন্ন নয়; মানুষের জীবনই এইরূপ সমস্যাময়, তাহার গতিপথ সত্যই বড় পিচ্ছিল, এবং কাম ধর্ম এবং সংস্কার, স্বার্থ এবং পরার্থের মধ্যে নির্ভুলভাবে ভেদরেখা টানিবার শক্তি মানুষের অতি অল্পই আছে; কিন্তু পিচ্ছিল পথে পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে নর্দমায় আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষা উঠিয়া পড়িয়া চলার সাহসের মধ্যে যে একটা নির্মল আনন্দ আছে তাহা অস্বীকার করিলে মানব-প্রকৃতিরই অবমাননা করা হয়।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ

মোহিতলাল মজুমদার

আজিকার এই বিদ্বজ্জন-সমাজে কোনো নতুন কথা শুনাইবার মতো পাণ্ডিত্য আমার নাই—এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রাণে যে আনন্দ সঞ্চার হয়. সেই আনন্দের আবেগে কিছু প্রাণের কথাই নিবেদন করিব। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এই নামটির মধ্যেই এমন কিছু আছে যাহা চিরদিন আমার অন্তরের গোপন আশাকে সঞ্জীবিত করিয়া, একটি স্বপ্নকে সত্য করিয়া তোলে। ২০/২৫ বৎসর পূর্বে বাঙালি-মুসলমান সমাজে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিতাম, তাহাতে দুঃখ পাইতাম; কেন, তাহাই বলিব। মানুষ মাত্রেরই বৃহত্তর সমাজকে নিজ সমাজ করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। আমি যে একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এ কথা মনে করায় একটা আনন্দ আছে; হৃদয়ের গণ্ডি যত বাড়িয়া যায় ততই যেন মানুষের মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়; মানুষের অহংবোধ যত ব্যাপক হয়, ততই মানুষ সুস্থ বোধ করে। আমার মাতৃভূমির এই যে অর্ধেকেরও অধিক সন্তান আমার ভাই হইয়াও সর্ব বিষয়ে পৃথক হইয়া রহিল এ চিন্তা বড় দুঃখকর। সত্যকার দেশ-হিতৈষী জাতি-প্রেমিক এমন কে আছেন, যাঁর মন ইহাতে পীড়িত হইয়া না উঠে? নানা সংস্কার ও নানা ভুল বিশ্বাসে আমরা এই আত্মীয়তা-বোধ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আজিও অনেকের মধ্যে 'বাঙালি' ও 'মুসলমান' এই নাম দুইটি জাতি-সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হয়, যেন ধর্ম পৃথক হইলে জাতিও পৃথক হইয়া যায়! জাত পৃথক হয় বটে, এবং জাতের মূল্য যার মতে যেমনই হউক, আজ এই ইতিহাস-বিজ্ঞানের যুগেও কি জাতি অপেক্ষাও জাতের মূল্য অধিক হইবে? দিনের আলোর চেয়ে গৃহকোণের হাতে জ্বালা বাতির শিখাই অধিকতর উজ্জ্বল বলিয়া মনে করিতে হইবে? বাতির আলোর নিজস্ব প্রয়োজন থাকে থাক, তাহাতেও আপত্তি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সূর্যের আলোকে অস্বীকার করিবে কে? হিন্দু যেমন বাঙালি, মুসলমানও কি ঠিক তেমনই বাঙালি নয়? ধর্মের অনুষ্ঠানে ও শাস্ত্রের শাসনে উভয় সম্প্রদায়ের বেশভূষা আচার ব্যবহারে যে বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ সত্যকার ঐক্য সেই বাহ্য আবরণের অন্তরালে, জড়প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মের মতোই, এ উভয়কে একই আত্মীয়তার বন্ধনে কি বাঁধিয়া রাখে নাই? যদি মানিয়াই লই যে, উভয়ের রক্ত এক নয়, মূলে ইহারা বিভিন্ন জাতি হইতে উৎপন্ন, তথাপি, এই যে এক জল-মাটিতে এতদিন ধরিয়া ইহারা পুষ্ট হইয়াছে, তার জন্য উভয়ের ধাতু-প্রকৃতি এক হওয়া কি বিজ্ঞান-

সম্মত নয়? কিন্তু কে বলিবে যে বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জনেরও অধিক মুসলমানের দেহে বাঙালির রক্তই প্রবাহিত হইতেছে না? যে বলে সে মিথ্যাবাদী, সে অন্ধ। বাঙালি হিন্দু যেমন নিজের বাঙালিত্ব অস্বীকার করিয়া একদিন নিজেদের আর্যত্ব প্রমাণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল এবং আজিও শিক্ষাদীক্ষাহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সংকীর্ণমন অনেকের মধ্যে এইরূপ sentinentএর আত্মঘাতী আক্রোশ একেবারে লুপ্ত হয় নাই, দেখা যায়—বাঙালি-মুসলমানের মধ্যেও হয়তো ঠিক সেইরূপ একটা মিথ্যা আভিজাত্যের গৌরব লালসা প্রবল হইয়া রহিয়াছে। এও একটা Inferiority complex—নিজের জাতি পরিচয় দিতে যাহারা লজ্জা পায় যে, নিজের প্রত্যক্ষ পিতৃ-মাতৃ-পরিচয় হেয় মনে করিয়া—একটা কাল্পনিক ইতিহাসের সাহায্যে মানরক্ষা করে—তাহাদের মনুষ্যত্ব যে পঙ্গু হইয়া থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য কি? তাই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের বাঙালি আজিও মানুষ হইতে পারিল না। তথাপি হিন্দুর পক্ষ হইতে একটা কথা আপনাদেরও স্বীকার করিতে হইবে যে, মুসলমান ভাইদের সঙ্গে সত্যকার আত্মীয়তা স্থাপনের পথে আর যত বাধাই থাক-শিক্ষিত হিন্দুর মনে এই Race consciousness জাগিয়াছে—এবং ইহা একটা সহজ সংস্কারে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব নাই। এই Race consciousness মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাগ্রে সর্বপ্রধান করিয়া জাগাইতে হইবে। জাতির মুক্তিজয়যাত্রার পথে ইহাই প্রথম প্রয়োজন।

এই সম-জাতীয়তার আর সকল প্রমাণই সাধারণের পক্ষে লুপ্ত হইয়া আছে—কেবল একটি প্রমাণ এখনও প্রাণকে পুলকিত করিয়া তোলে। ধর্মান্ধতা ইহাকে লোপ করিতে পারে নাই, পরস্পরকে ছুরি হানিবার সময়েও যে ভাষায় পরস্পরকে সম্বোধন করি, তাহাতে প্রমাণ হয়, একই মায়ের মুখে আমরা প্রাণের-বুলি শিক্ষা করিয়াছি। এ বেদবেদান্তের দোহাই দেয়, ও কোরানের সুরা আবৃত্তি করে, কিন্তু উভয়েই যখন গভীর আনন্দ বা অপরিসীম ব্যথা পায়, তখন যে ভাষায় তাহা সহজে ও সত্যরূপে উৎসারিত হয়, তাহা যে একই! জগতে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার যত বন্ধন আছে ভাষার মতো আর কিছুই নয়। এই ভাষায় যখন মুসলমান ভাইদের সঙ্গে আলাপ করি তখন শত মোল্লা শত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের রোষ-কষায়িত-নেত্র স্মরণ করিয়াও একথা ভুলিতে পারি না যে, আমরা পরমাত্মীয়।

তাই মাতৃভাষার প্রতি বাঙালি-মুসলমানের ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা যখন লক্ষ্য করিতাম; যখন দেখিতাম, যে-ভাষায় সে চিরজীবন প্রাণের পিপাসা মিটাইতেছে, সেই ভাষাকেই একটা নিদারুণ মিথ্যাচার মোহে সে মানিতে চাহে না; যে মায়ের স্তন্যপান করিতেছে তাঁহাকে মা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত—তখন বড় বেদনা বোধ করিতাম। একি মোহ, একি মিথ্যাচার! একি হিন্দুর প্রতি আক্রোশ করিয়া সে নিজের নাক কাটিতেছে? একি চোরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ভুঁয়ে ভাত খাওয়া? আমার কষ্ট হইত এই জন্য যে, এতগুলি ভাইয়ের সঙ্গে আমার সত্যকার সম্বন্ধ স্বীকৃত হইল না—এতগুলি বাঙালির সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দরিদ্র হইয়া রহিল।

কিন্তু আজ সে দুঃখ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। যত দিন যাইতেছে—ততই আশ্বস্ত ও আশান্বিত হইতেছি—মুসলমান ভাইদের মাতৃ-স্তন্য পিপাসা আবার জাগিয়াছে—সেই স্তন্যপান পুষ্ট হইয়া যখন মনের স্বাভাবিক লাবণ্য আবার ফিরিয়া আসিবে, তখন যে আত্মপরিচয় ঘটিবে তাহার ফলে হিন্দু হিন্দু, এবং মুসলমান মুসলমানই থাকিয়া একটা বৃহত্তর ও উদারতার জাতীয় চেতনায় আত্ম-সমৃদ্ধ হইয়া এক অখণ্ড বাঙালি জাতির সৃষ্টি করিবে। এই প্রসঙ্গে প্রায় ৮/৯ বৎসর পূর্বে একবার যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা এখানে উদ্ধৃত করিব:

> আমার অনেক দিন হইতে একটা ক্ষোভ ছিল যে, বাঙালি হইয়াও মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন থাকায়, মুসলমানগণ আমাদের এই সর্বাপেক্ষা গৌরবের ধন সাহিত্য ও ভাষাকে তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না, এবং নিজেরাও তাঁহাদের হৃদয় নিহিত মনুষ্যত্বের, স্বধর্ম ও স্বকীয় সাধনার অবধি স্ফূর্তির অভাবে, প্রাণে-মনে পঙ্গু হইয়া রহিলেন। কেননা, পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, যে শব্দ, যে বাণী মানবাত্মার হৃদয়-রহস্যের একমাত্র প্রকাশপন্থা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিরঞ্জন গুহাশায়ী অন্তরদেবতা জীবনলীলায় মূর্তি ধারণ করেন, সেই বাক, সেই ব্যক্তিত্বাবগুণ্ঠিত ব্রহ্মের আত্মসৃষ্টি মাতৃভাষাতেই সম্ভব। সেই বাণীকে অবহেলা করিলে আপনাকেই হারাইতে হয়। আত্মবিস্মৃত মুসলমান সমাজ যেন যুগধর্ম-বশেই, অবশে, অজ্ঞাতে, সেই সাধন-মন্ত্র প্রাণ-কর্ণে শুনিয়াছেন; তাই আজ বোধ হইতেছে, তাঁহারা আপনাকে ও জাতিকে এতদিনে চিনিয়াছেন। নহিলে, এই সাহিত্য-সাধনার মধ্যেই তাঁহারা যে খাঁটি বাঙালি, এই প্রচ্ছন্ন সত্য আজ কেমন করিয়া এমন প্রকট হইয়া উঠিল?

—এ আট-নয় বৎসর পূর্বের কথা। আজ সে সত্য আরও স্পষ্ট, আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে—মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজের এই অধিবেশন দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু মুসলিম সাহিত্য সমাজ এই নামটার সার্থকতা কোথায়? কি অর্থে এইরূপ একটা সাম্প্রদায়িক ভেদনির্দেশের প্রয়োজন আছে? সে সম্বন্ধে আমি দুই চারি কথা বলিব। আমার প্রথম কথা এই যে, বাঙালি হিসাবে বাংলা ভাষার চর্চায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অধিকার-গত গৌরবের দাবি যে কাহারও অধিক অথবা মুসলমান বা হিন্দু বলিয়াই কাহারও কৃতিত্বের স্বতন্ত্র মূল্য আমি মানি না। কারণ, উভয়েই যখন বাঙালি, এবং বাংলা যখন উভয়েরই মাতৃভাষা, তখন তাহা চর্চা না করায় বরং অগৌরব আছে, চর্চা করার জন্য কাহারও কোনোও বিশেষ গৌরব নাই। সাহিত্যে এই জাতি-ভেদ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। হিন্দু কবিগণের মধ্যে কয়জন বড় কবি ব্রাহ্মণ এবং কয়জন কায়স্থ—ইহা লইয়া যেমন নিজ নিজ জাতের গৌরব করা হাস্যকর; তেমনি কাব্য-বিচারে, একই ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে পরস্পরের মধ্যে জাতিভেদসূত্রে ঈর্ষা বা আত্মপ্রসাদ বাড়িতে না দেওয়াই উচিত। কারণ, বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায়, দুই সম্প্রদায়ের মিলনের পথে যে বহু অন্তরায় রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেবল একটিমাত্র মিলন-ভূমি

আছে, তাহা সাহিত্য; সেখানেও যদি এই ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠে, তবে আমরা দাঁড়াইব কোথায়?

তথাপি, বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে মুসলমানের দান কতটুকু, এবং তাহার মূল্য কি, এ বিষয়ে বাঙালি-মুসলমানের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। জাতীয় প্রচেষ্টার সর্ব বিভাগে বাঙালি-মুসলমান যদি আপনাদের অধিকার বুঝিয়া লইয়া আত্মসম্মান বোধ করেন এবং বেশ ভালো করিয়া উপলব্ধি করেন যে, এ ভাষা ও এ সাহিত্য কেবল হিন্দুরই নয়, মুসলমানেরও—তবে তাহা অপেক্ষা জাতির পক্ষে কল্যাণকর আর কি হইতে পারে? তাঁহারা সেই অধিকার সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে আরো দৃঢ় ও প্রসারিত করুন, এই আমার আন্তরিক কামনা। তাঁহারা যে বাঙালি, এ ভাষা ও সাহিত্য যে তাঁহাদেরও সম্পত্তি এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যে তাঁহাদের সহায়তা ছিল, ও থাকার প্রয়োজন আছে—ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ নয়? আত্মবিস্মৃত মুসলমান সমাজের পক্ষে অতীতের ইতিহাসে সেই প্রমাণ পাইয়া আশ্বস্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

বাংলা ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব কতখানি, এবং তাহার দ্বারা বাংলা ভাষার কতখানি ইষ্ট সাধন হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে, ইহা বিচারের বিষয় নয়, প্রত্যক্ষ ফলাফলের উপর নির্ভর করে। বাঙালি-মুসলমানের পক্ষে বাংলা ভাষায় কি পরিমাণ আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার তাহার প্রাণ ও মনের অবাধ স্ফূর্তির জন্য আবশ্যক, তাহা প্রকৃত সাহিত্য রসিক, ভাবুক ও প্রতিভাবান লেখকের শক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইবে; যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন তাহার স্বপক্ষে বা বিরুদ্ধে কোনো কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কেবল ভাষা লইয়াই এইরূপ ভাবনা—জোর করিয়া ভাষার উপর একটা বাহ্যিক ছাপ দিবার চেষ্টা করিলে, ভাষা জীবন্ত হইয়া উঠিবে না এবং তাহাতে সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাঘাত হইবে। বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাসে কি হিন্দু কি মুসলমান সকল লেখকের ভাষাতেই বাংলার যে রূপটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সাহিত্যপদবাচ্য রচনায় যাহা এ পর্যন্ত কাব্যের ভাষা দাঁড়াইয়া গিয়াছে—তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, আড়াই হাজার বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় স্থায়ী সম্পদ হইয়া গেলেও, যে ভাষায় এ পর্যন্ত সাহিত্য রচনা হইয়াছে তাহার উপর আরবি বা ফারসির প্রভাব খুবই কম—নাই বলিলেও হয়। ইহার কারণ যাহাই হোক, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না—যদি হিন্দুর অন্ধ অনুকরণই ইহার কারণ হয়, তবে সচেতন ও আত্মপ্রতিষ্ঠ মুসলমান সমাজ ভবিষ্যতে এ দিক দিয়া ভাষার নতুনত্ব বা পরিপুষ্টি সাধন করিতে পারিলে, তাহা সুখের বিষয় হইবে; ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা যত বাড়ে, যত শব্দসম্পদ বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু এই ব্যাপারে সাহিত্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য প্রবল হইলে, মুসলমান ভ্রাতাগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণার হানি হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

এজন্য, উপস্থিত ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া একটা আরো বড় কথার উত্থাপন করিব—আমার বিশ্বাস 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মুসলিম নামকরণের সার্থকতা এইখানেই। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা দুই-এর ভাষা ইংরাজি, তথাপি সকলেই জানেন—ইংরাজি সাহিত্য ও মার্কিন সাহিত্যে একটা ভাব ও ভঙ্গিগত প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ধর্ম ও ভাষা এক—তথাপি দেশভেদে প্রকৃতিভেদ ঘটিয়াছে—এবং উভয়ের জীবনযাত্রার আর্শ নানা কারণে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এই জন্য সাহিত্যে, এমনকি ভাষায় পর্যন্ত একটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙালি-মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু উভয়ের ভাষা এক, দেশও এক তথাপি শিক্ষা দীক্ষা এবং আধ্যাত্মিক আদর্শে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে—এজন্য একের আদর্শ, ভাব ও চিন্তাপ্রণালী ঠিক অন্যের মতো হইতে পারে না। অতএব সাহিত্যে উভয়েরই একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি থাকিবে। কিন্তু, এই ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য সমাজে ও ধর্মজীবনে যেমনই প্রকটিত হউক, আজ পর্যন্ত সাহিত্যে তাহা কোনো বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহার একমাত্র কারণ, বাঙালি-মুসলমান আজ পর্যন্ত সাহিত্যে স্পষ্ট করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন নাই—এবং করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের প্রাণের আদর্শটি তেমন জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। এই আদর্শটিকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মুখ্যত ভাষার উপর লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না; সত্যকার প্রতিভাবলেই সাহিত্যে সৃষ্টি সফল হয়—তখন ভাষা যে-রূপ লইবে তাহা ভাবিবার প্রয়োজনই হয় না, সে ভাষা আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করে,—যদি তাহা খাঁটি বাংলাই হয় তাহাও যথার্থ হইবে; যদি না হয়, phrase বা বাক্যভঙ্গি স্বতন্ত্র হয়, তাহাও যথার্থ হইবে, সাহিত্যই যদি সৃষ্টি হয় তবে তাহার ভাষা লইয়া আপত্তি করিবে কে? সেই সাহিত্যই সৃষ্টি করিতে হইবে—তার জন্য চাই আত্ম-সাক্ষাৎকার—আপনাকে উত্তমরূপে চিনিয়া লওয়া সত্য-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। সংস্কৃতবহুল ভাষাই হউক, আর অধিক পরিমাণে আরবি-ফারসিমিশ্রিত জবানই হউক, কেবল ভাষার দ্বারাই কিছু হইবে না। আমি বাংলা সাহিত্যের পক্ষ হইতে মুসলমান ভাইদের নিকটে এইরূপ জীবন্ত ও প্রাণবান একটি স্বতন্ত্র সুর বঙ্গভারতীর বীণায় ঝঙ্কৃত করার প্রত্যাশা করি—এইরূপ নতুন ও সত্যকার ভাব-সম্পদে বঙ্গ সাহিত্যকে ধনী করিতে না পারিলে, বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানের দান সার্থক হইবে না—এ সাহিত্যের উপর তাঁহাদের সত্যকার দাবি প্রমাণিত হইবে না। সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি, ও তথা ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে মুসলিম সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপরিচয় সাধনের প্রয়োজন। অপর কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিরোধবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া তুলিলেই এই আত্মপরিচয় ঘটিবে না—বরং বাহির হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত করিয়া ধ্যানে বসিতে হইবে, আত্মযোগ সাধন করিতে হইবে; সেই সাত্ত্বিক তপস্যার ফলে যে আত্মপ্রসার ঘটিবে, তাহারই অনির্বচনীয় আনন্দে বাংলার সাহিত্য-লক্ষ্মীর নয়নে, ললাটে ও অধরে এক নতুন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিবে—বাঙালি-মুসলমানের বাঙালিত্বই ধন্য হইবে।

এইরূপ অনুপ্রেরণার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য একটি ঐতিহাসিক সত্যের ইঙ্গিত করিব। সম্প্রতি, বাংলা ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব সম্বন্ধে যিনি প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলমানের উপর বাংলা ভাষা ও হিন্দু সাধনার প্রভাবই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা না করিয়া তিনি আর একটা কাজ করিলে আজিকার এই আত্মবিস্মৃত মুসলমান সমাজের উপকার হইত। তিনি একটু পরিশ্রম করিলে, বাঙালি জাতির ইতিহাসের একটি পরমাশ্চর্য অধ্যায় উদ্ধার করিয়া দিতে পারিতেন। ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে যে একটি নবজীবন সঞ্চারের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার মূলে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতার প্রভাব কতখানি কাজ করিয়াছে—বাঙালির ভাব-প্রকৃতিতে কি অভিনব বেগ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার ধর্মজীবন, সামাজিক আদর্শ ও সাহিত্য সাধনার মূলে কি প্রবল প্রেরণা দান করিয়াছে তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। মুসলমান-পূর্ব যুগের বাঙালি ও পরবর্তী যুগের বাঙালির জীবন যাত্রায় প্রাণের সর্ববিধ প্রবৃত্তিতে যে-বিশিষ্ট ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়, তাহার মূলে, মুখ্য ও গৌণ ভাবে এই নবাগত ধর্ম ও সভ্যতা কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, বাঙালি কালচারের ক্রমবিকাশের এই অঙ্কটি এ পর্যন্ত কেহ কষিয়া দেখেন নাই। শুধু রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, একটা গভীর ভাব-বিপ্লব যে ঘটিয়াছিল, সে বিপ্লবে বাঙালি জাতির মনের রঙ অজ্ঞাতেও কতখানি পরিবর্তিত হইয়াছিল সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে এবং তাহা হইতেই আধুনিক বাঙালি মুসলিম সমাজ পথনির্দেশ ও পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাহিত্য-ব্রত কি কারণে ও কি হিসাবে একটা বিশিষ্ট সাধনা হইতে বাধ্য, তাহা আমার জ্ঞানবিশ্বাসমতো আমি বলিলাম। কিন্তু অন্য দিক দিয়া ইহা যে সমগ্র বাঙালি জাতির মিলিত-সাধনার ক্ষেত্র, ইহা কখনো বিস্মৃত হইলে চলিবে না, বরং এই সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়াই সমগ্র জাতির হৃদয় একই স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠিবে—দুই সম্প্রদায়ের দুই বিশিষ্ট ভাবধারা একত্র প্রবাহিত হইয়া একটি পুণ্য সঙ্গমের সৃষ্টি করিবে। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই শ্রেষ্ঠ ভাবরাশির আদানপ্রদান সূত্রে যে একটি আদর্শ ফুটিয়া উঠিবে তাহা দ্বারা এই জাতির পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় হইবে—তখন উভয়ে উভয়কে খাঁটি বাঙালি বলিয়া চিনিবে, এবং পরস্পরের গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে। এই উদার আদর্শের সন্ধান যাঁহারা ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন, যাঁহাদের ভাবনা ও সাধনা এই উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, সেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মিগণকে সমগ্র জাতির কল্যাণকামী, সত্যবান সাহিত্য সেবকরূপে আমি কি বলিয়া অন্তরের ধন্যবাদ জানাইব তাহা জানিনা; কিন্তু ইহা জানি যে, আজ যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে একদিন তাহাই বিশাল পাদপরূপে ছায়া বিস্তার করিয়া আমাদের প্রাণের শ্রান্তি দূর করিবে—অদূর ভবিষ্যতের সেই পরমা সিদ্ধি স্মরণ করিয়া আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে নমস্কার করি।

দারার ধর্ম-মত

কালিকারঞ্জন কানুনগো

দারার ধর্মমত কি ছিল জানিতে হইলে আকবরের ধর্মের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন। কেননা জাহিরী ইসলাম দুজনকেই কাফের মনে করে। অনেকের ধারণা শাহজাদা তাহার প্রপিতামহের বহুরূপীর পোষাকটা পাইয়াছিলেন; তাঁহার স্বরূপ ও প্রকৃত ধর্মমত ঐ বহুরূপীর পোষাকে প্রচ্ছন্ন ছিল; তাই তিনিও কাফের স্থির হইয়াছেন।

আকবরের ধর্ম কি ছিল লোকে বুঝিতে পারিত না; কিংবা যে ধর্ম তিনি মানিতেন মানুষের অভিধানে তাহার কোনো পরিভাষা নাই; অন্তত স্মিথ সাহেব খুঁজিয়া হতাশ হইয়াছেন। জাহিরী ইসলাম ও সুন্নী মৌলানাদের সহিত বাদশার বিবাদের সংবাদ পাইয়া পর্তুগালের পাদ্রি, পারশ্যের অগ্নিউপাসক, তিব্বতের লামা, লিরনার পাহাড়ের জৈন-যতী ও কাশীর পণ্ডিত দরবারে হাজির হইলেন। ফতেপুর সিক্রীর ইবাদতখানার বৈঠকে প্রথমে পাদ্রির ডাক পড়িল; বাবাজীর বক্তৃতার জোরে সকলের মুখের জল শুকাইয়া গেল—বাদশা বাহবা দিলেন। পাদ্রি সাহেব বুঝাইয়া দিলেন খ্রিস্ট-ধর্ম যেমন একটা আনারস ফল; এ রকম মেওয়া হিন্দুস্থানে নতুন আমদানি, এটা খাইলে সব পাপ হজম হইয়া যাইবে; আঁধারে আলো দেখিতে পাইবেন; বিশেষত শরাবটা হালালের এক ডিগ্রি উপরে; ওটা ছাড়া কাজই চলে না। বাদশা দেখিলেন হাজারচোখো আনারসের চেহারা জমকালো বটে; রসও বোধ হয় তেমনই মধুর। ফলস্তুতি শুনিয়া শাহানশার জিভে জল আসিল। মোল্লা রাগে গা ঝাড়া দিলেন; দিল্লীর শাহী-তক্ত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তবুও গোপনে পাদ্রীকে ডাকিয়া, বাদশা পাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আনারস কেমন করিয়া খাইতে হয়? আনন্দে অধীর হইয়া পাদ্রি বলিল 'উপায় অতি সোজা; আমি জর্ডনের জল ছিটাইয়া দিতেছি—আপনি চোখ বুজিয়া ঝুঁট খোসা ডাঁটি শুদ্ধ গিলিয়া ফেলুন, রস পেটে গেলেই মালুম হইবে।' চতুর আকবর শুধু রসটুকু চাখিতে চাহিয়াছিলেন; আস্ত আনারস গিলিতে তিনি রাজি হইলেন না। পাদ্রি বলিল 'জাঁহাপনা! চোখ ঝুঁট ছাড়া কি আনারস হয়?' আকবর মনে করিলেন পাদ্রি মহামূর্খ। পাদ্রি নিজের ; লিখিয়া রাখিলেন আকবর বাদশাহ মহাধূর্ত, কপট, নাস্তিক ও অবিশ্বাসী;

স্মিথ সাহেব ঐ ডায়েরির সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ইবাদতখানার বাজারে এ প্রকারে বাদশাকে কেহ নারিকেল, কেহ আম, কেহ কলা ভেট দিল; বাদশা কোনোটা নাড়াচাড়া দিলেন ও কোনোটা শুঁকিয়া দেখিলেন এবং সবটার প্রশংসাই পাঁচ মুখে করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছোবড়া, আঁটি, খোসা গিলিবার ভয়ে তিনি কোনোটা গ্রহণ করিলেন না। বাদশা শেষে স্থির করিলেন আনুষ্ঠানিক মতে আঁটি শুদ্ধ গিলিতে হইলে আরবের খেজুরই বরং গিলা সুবিধা; গুণও উহার অনেক, তুর্কী ইসলামী খেজুর খাইয়াই ভিয়েনার দরওয়াজা পর্যন্ত ঘোড়া দৌড়াইয়াছিল। আকবর জগতের উপকারের জন্য সর্ব-ধর্মের সারতত্ত্ব এবং একত্র সংযোগ করিয়া এক mixture আবিষ্কার করিয়াছিলেন; দরবারে দীন-ই-এলাহী নামে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Essence বেশি দিন থাকে না; কালের বাতাসে উহা উড়িয়া গিয়াছে। ধর্মে নতুন patent চালাইবার মতো ইচ্ছা এবং ক্ষমতা দারার ছিলনা। ধর্ম-সম্বন্ধে দারা ও আকবরের সাদৃশ্য ছিল উদারতা, মত-সহিষ্ণুতা এবং জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে মানবজাতির প্রতি প্রেম ইত্যাদি ভাবে; বাহ্যিক অনুষ্ঠানে নয়। প্রপিতামহের মতো তিনি তিলক কাটিতেন না কিংবা অগ্নি ও সূর্যকে পরমাত্মার জ্যোতি বলিয়া ভক্তি করিতেন না। অতি উচ্চ-দর্শনের মধ্যেও আকবরের materialism যে একেবারে ছিল না বলা যায় না; তিনি রোগমুক্তি, আয়ুবৃদ্ধি কিংবা ঐশ্বর্য লাভের আশায় এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া কিছুদিন সূর্য স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

দারার কাম্য ছিল সূফী সাধনা দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার নিত্য রতি ও লয় (*fana fillah*)। সত্যের অনুসন্ধানে তিনি ইঞ্জিল, তৌরিত, বেদ, উপনিষৎ পড়িয়াছিলেন। তিনি ৫০ খানা উপনিষদের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন; এবং তাঁহার চেষ্টায় ভাগবদগীতা, যোগ-বাশিষ্ঠ এবং প্রবোধ-চন্দ্রোদয় ফারসি ভাষায় তর্জমা করান। তিনিও পণ্ডিত, পাদ্রি, গুরু সকলের সঙ্গেই মিশিতেন এবং সকলের মতে সায় দিতেন।

কিন্তু তাঁহার গোপন সাধনা ছিল সূফী সাধনা; তিনি বাতেনী ইসলামেই সর্বধর্মের একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। দারা নিজকে কাদেরী ও হানিফী বলিয়া গিয়াছেন। ইমানের profession, verification and obedience এই তিনটির মধ্যে প্রথম দুটাই স্বীকার করিতেন। হজরত মুহম্মদের পয়গম্বরী এবং খোদাতালা এক ইহা তিনি মানিতেন; এবং সুফীরা মনে করেন দারা সাধনার দুই স্তর অর্থাৎ Fana fi-shaikh ও fana-i-Rasul পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। তিনি রোজা, নামাজ সব সময়ে প্রকাশ্যে করিতেন না। এজন্য লোকে তাঁহাকে নিন্দা করিত; এই নিন্দাও Malamati এর ন্যায় তিনি সাধনার অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। ঔরঙ্গজেব দারাকে মুলহেদ বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। দারা ঔরঙ্গজেবের নাম দিয়াছিলেন

নমাজী। জাহেরী ও বাতেনী ইসলামের এই মতভেদ বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। একজন সুফীপীর জাহেরীকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন:

মতবাদী জানে নহি তত্ত্ববাদীকা বাত।
সুরজ ভাগে উলুয়ালিলেন আধারী রাত ॥

সূফীদের মধ্যে অল্পসংখ্যক সাধক মনে করেন হাকিকত জ্ঞান হইলে শরিয়তের অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। কিন্তু অধিকাংশের মত শরিয়তের কর্ম অনুষ্ঠান না করিলে মনের উপর অজ্ঞানের পর্দা পড়িয়া যায়। দারা জ্ঞানী ও সাধক ছিলেন; কিন্তু শরিয়তের কার্যে অবহেলা দরুন তিনি যুধিষ্ঠিরের মতো নরকের রাস্তা হইয়া স্বর্গে যাইবেন; ঔরঙ্গজেবের মতো সরাসরি বেহেশতে উঠিতে পারিবেন না ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

দারা একাধিক পীর হইতে দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; মোল্লা শাহ বদক্সী, সরমদ, শাহ দিল-রুবা এবং শেখ মহিব্বুল্লা এলাহাবাদী তাঁহার গুরু। ইঁহাদের কাছে দারা যে সমস্ত পত্র লিখিতেন তাহাতেই তাঁহার Pantheism বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়াছে। তিনি খোদাতালা ও জাঁহানের স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। Fana-fi-Shaikh অবস্থায় তিনি শাহ দিলরুবার নিকট যে সমস্ত চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে ঈশ্বরের যে সর্বব্যাপক বিশ্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অনেক সময় গীতার প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। তিনি এক চিঠিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিতেছেন, 'হে আল্লা, তোমার সমস্তই মুখ, সমস্তই চক্ষু, সমস্তই তোমার শ্রবণ'—গীতায়ও আছে :

সর্ব্বতঃ পাণি পাদস্তৎ, সর্বতোহক্ষি শিরো মুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

আর এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন

ban-nam-i-anke u nam-i-darad
ba-har nam-i-ke khawani sar bar-arad.

তুমি একটি নাম; তোমার একই নাম ছাড়া দ্বিতীয় নাম নাই; কিন্তু তোমাকে লোকে যে নামে ডাকুক তুমি সাড়া দাও।

সূফী সাধকদের মতো দারাও ভগবৎপ্রেমে পাগল ছিলেন; রাজপুত্র হইয়া তিনি ফকিরের সাধনায় রত ছিলেন। সূফীরা সাধনার এমন এক স্তরে উঠেন যাহা তাঁহারা আনুষ্ঠানিক ইসলামের, পৃথিবীর সর্ব ধর্মের উপর বলিয়া মনে করেন। সূফীরা এমন অনেক কথা বলেন যাহা আপাতদৃষ্টিতে কাফেরী বলিয়া মনে হয়। সমশী তাব্রিজী মুসলমান জগতকে বলিয়া গিয়াছেন : 'হে মুসলমানগণ! উপায় কি? আমি তো নিজকে চিনিতে পারিলাম না। আমি ইহুদি নই; অগ্নি-উপাসক নই, মুসলমানও নই;

আমি না পূর্ব দেশের না পশ্চিম দেশের; আমি ইরাকেরও নই, খোরাসানেরও নই। আমি আদম-হাওয়ার সন্তান নই; আমি স্বর্গ হইতে আসি নাই।'

হিন্দুস্থান ব্রাহ্মণের দেশ; তাই কবি ও সাধক আমীর খসরু হিন্দুস্থানের মুসলমানকে শুনাইয়া গিয়াছেন, 'প্রেম আমাকে কাফের করিয়াছে, মুসলমানীতে আমার দরকার নাই; আমার প্রত্যেক শিরাই ব্রাহ্মণের পৈতার এক একটি তার হইয়া গিয়াছে, আমার সূতার যজ্ঞোপবীতের দরকার নাই। লোকে বলে খসরু মূর্তি-পূজা করে; হাঁ, আমি সত্যই তাহা করি; দুনিয়ার সঙ্গে আমারতো কোনো কাজ নাই।'

দারাও এমনই ভাবের আবেশে লিখিয়াছেন : 'আমার মনের উপর হইতে জাহিরী ইসলামের খোলস পড়িয়া গিয়াছে; আমি একজন মূর্তি-পূজক ব্রাহ্মণ, কিংবা ততোধিক খোদ-পরস্ত হইয়াছি; প্রকৃত কুফরী কি ভাব তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। কাফের যে জাহিরী ইসলামের উপর নারাজ তাহাতে আশ্চর্য কি? প্রকৃত পৌত্তলিকতা কয়জন জানিতে পারিয়াছে? প্রত্যেক মূর্তিতে প্রাণ, এবং বেইমানীর আড়ালে ইমান প্রচ্ছন্ন আছে।'

Agar kafir az Islam-i-majazi gasht be-zar
Kera kufor-i-haqiqi shud padidar,
Darun har but-i-jan-ist pintran,
Ba-zer-i-kufr iman-ist pinhar.

ইউরোপীয় সভ্যতায় মুসলিম স্মৃতি

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

ভূমিকা

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিবার জন্য জগতে রকম রকম বিলাসের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক দিন পর্যন্ত বিলাসের অনুশীলন করিতে করিতে নাকি মানুষ ক্রমশ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। বিলাস সৃষ্টি ও উদ্ভাবন দ্বারা পরোক্ষভাবে কতগুলি বিশেষ শিল্পের উন্নতি হইলেও অন্যভাবে তাহা মারাত্মক। চিত্ত বা মন দ্বারা উপভোগ করিবার জন্য দিন দিন অসংখ্য রকমের সাহিত্যরসের সৃষ্টি হইতেছে। সাহিত্যবিলাসও সময় সময় মানুষকে আত্ম-বিস্মৃতি আনিয়া দেয়। আর এক প্রকার বিলাস হইতেছে পূর্বপুরুষের খ্যাতিচর্চা উপভোগ করা। অন্য দশ প্রকার বিলাসের ন্যায় ইহাও মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে অসাড় করিয়া তুলে। তখন এই শ্রেণীর বিলাসী ভাবিয়াও উঠিতে পারে না যে পূর্বকালে দূরে থাকুক, বর্তমান কালেও তাহার যে আপনার জন কঠোর কর্মসাধনা দ্বারা জগতের মধ্যে নিজের জন্য একটা শ্রেষ্ঠ স্থান জয় করিয়া লইয়াছে, সে এখন আর তাহার কেহ নয়। সে বৃথাই সেই কর্মকুশল মনীষী পুরুষকে আপনার বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে চায়। আপনার জন হইলেও সে যে এখন তাহার চক্ষে পঙ্গু ও অকর্মণ্য একথাই সে বুঝিতে পারে না। তাহার সফলকাম আত্মীয়ের নিকট সে এখন Lotus-land এর অধিবাসী। এক হিসাবে আমার এই প্রবন্ধ সেইরূপ lotus-eater এর স্বপ্ন।

তবুও এই কথার আর এক দিক আছে। আত্ম-প্রত্যয় অনেক সময় দুর্বল মানুষের দ্বারাও সবল মানুষের কাজ আদায় করিয়া দিতে পারে। আমি যদি এই প্রমাণ পাই যে যাহার সঙ্গে আমার অনেক দিক দিয়া মিল আছে বলিয়া আমি অন্তত মনে করি সেও একদিন আপনার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি চাষ করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল, হয়তো তাহাতে আমার একটা নতুন অনুপ্রেরণা জাগিয়া বাসিতে পারে। এই কথা চিন্তা করিয়া এই সন্দর্ভের অবতারণ করিলাম।

এশিয়ার কোনো অংশে, কিংবা ভারতের কোনো স্থানে বাবরের বংশের কেহ আর রাজত্ব করিতেছে না। বাবরের বংশের নির্মিত সৌধাবলীও হয়তো কালক্রমে ধূলায় মিশিয়া যাইবে। কিন্তু বাবরের বংশের এবং তাঁহার পূর্ব ও পরবর্তী বিভিন্ন

মুসলমান রাজবংশের দীর্ঘ সাত শত বৎসর ভারতে রাজত্ব করার ফলে ভারতবাসীর প্রাত্যহিক জীবনে, আচার-ব্যবহারে, ধর্মে ও ভাষায়, খাদ্য ও পোষাকে এবং দৃষ্টিতে (outlook-এ) যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, সম্ভবত জগতের কোনো Vandalism নাই যাহা, তাহা চিরকালের জন্য মুছিয়া ফেলিতে পারে।

ইউরোপ হইতে মুসলিম সভ্যতা এবং মুসলিম সভ্যতার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রতিপক্ষের শতাব্দীর পর শতাব্দী সুব্যবস্থাপিত চেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা যে সফল হয় নাই ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। (The age of transition has left no memorials from which an intelligent idea of its progress can be obtained. S.P. Scott's History of the Moorish Empire in Europe Vol. III, p. 560)

আপন কল্যাণের জন্য যাহা আবশ্যক হয়, তাহা মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকে এবং আপনার মধ্যে তাহার প্রচলন স্থায়ী করিয়া রাখিয়া থাকে। কল্যাণের অনুসন্ধান মানুষের সনাতন প্রকৃতি। মানুষ চিরকালই কল্যাণ খুঁজিতে যাইয়া কৃত্রিম স্রোতে প্রতিহত ও ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে; কিন্তু সেইজন্য মানুষের কৃত্রিমের বিরুদ্ধে অভিযান থামিয়া যায় নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আসিয়া বলিলেন, তিনি জগতে নতুন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। মানুষের যাহা সনাতন কল্যাণ তাহাই মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে; তিনি মানুষকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি জগতকে যাহা দিয়া গেলেন তাহা লইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বাগবিতণ্ডা চরিয়াছে। ইসলামের যে ব্যাখ্যার মধ্যে মানুষ সত্য ও কল্যাণরূপ স্বর্ণরেণু পাইয়াছে তাহাই মানুষ আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। (এই কথার সহিত তুলনা করুন : মান্‌জে কুরআঁ মগ্‌জেরা বরদাস্‌তাম। ওস্তোখাঁ রা বর সাগা আন্দাখতাম্ ॥—মসনভী এ রুমী)

মোটের উপর মুসলমানদের নির্মিত সকল দালানকোঠা, সকল শিল্পজাত দ্রব্য ও তাঁহাদের রচিত বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস জাতীয় সমুদয় গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ ইচ্ছাপূর্বক ধ্বংস করিয়াও ইউরোপ মুসলিম সভ্যতার ছাপ আপনার অঙ্গ হইতে উঠাইয়া ফেলিতে সক্ষম হয় নাই। জন উইলিয়ম ড্রেপার লিখিয়াছেন : 'I have to deplore the systematic manner in which the literature of Europe has contrived to put out of sight our scientific obligations to the Mohammedans. Surely they cannot be much longer hidden. ... The Arab has left his intellectual impress on Europe, as, before long, Christendom will have to confess; he has indelibly written it on the heavens as any one may see who reads

the names of the stars on a common celestial globe.' ('The Intellectual Development of Europe' by John William Draper, p. 41-41, Vol II)

ইউরোপের তথা বর্তমান জগতের বিজ্ঞানে, দর্শনে, আচার-ব্যবহারে, ভাষায় কিরূপে মুসলিম স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

অঙ্কশাস্ত্র

ভারতীয় মনীষীগণের নিকট হইতে আরবগণ নয়টি সংখ্যা এবং একটি শূন্যের সাহায্যে অঙ্ক লিখিবার প্রথা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরবগণ ভারতের নিকট এই বিষয়ে তাহাদের ঋণের স্মৃতি জাগরুক রাখিবার নিমিত্ত এই সংখ্যাগুলিকে 'ভারতীয় সংখ্যা' বলিয়া চিরকাল উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর তাঁহারা এই নয়টি সংখ্যা ও একটি শূন্যদ্বারা বিশাল অঙ্কশাস্ত্র সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের গণিত সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইউরোপে প্রচলিত রোমান সংখ্যা লিখন পদ্ধতি উঠিয়া যাইতে থাকে এবং গণিত বিজ্ঞানে যুগান্তর আরম্ভ হয়। ইদানীং গণিত বিজ্ঞানে আরো বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আরবগণের হস্তের ছাপ গণিত বিজ্ঞানে এমনভাবে লাগিয়া গিয়াছে যে তাহা আর চেষ্টা করিয়াও উঠাইবার উপায় নাই।

সাইফার (cipher) শব্দটি ও তাহার বিভিন্ন রূপান্তর আরবি শব্দ ছিফর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মোহাম্মদ বিন-মুসা আরবিয়গণের মধ্যে প্রথম বীজগণিতের লেখক। তিনি ত্রিকোণমিতির মধ্যে 'সাইন' ও 'কোসাইনের' (sine and cosine) প্রচলন করেন এবং তৎপর ইটালি হইয়া এই পদ্ধতি ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। স্পেনদেশীয় মুসলমানেরাই প্রথম বীজগণিতের সূত্র জ্যামিতিতে প্রয়োগ করেন বলিয়া অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস (The Application of Algebra to Geometry an invention ascribed with a considerable degree of certainty to the Spanish Muslims. S. P. Scott)। স্পেনীয় খলিফাগণের গৌরবের যুগে সেভিল (Seville), কর্ডোভা, টলেডো ইত্যাদি নগরের বিদ্যালয় সমূহে স্থাপত্যে জ্যামিতি প্রয়োগ প্রণালী ও তদসংক্রান্ত ড্রইং শিক্ষা দেওয়া হইত। আজ পর্যন্তও আরবদের ব্যবহৃত আলগরিথম (Algorithm), আল-জিবরা (Algebra) ইত্যাদি শব্দ অঙ্কশাস্ত্রে প্রচলিত রহিয়াছে। পূর্বোক্ত মুসা 'বর্গীয়-সমীকরণ' quadratic equation সমাধান করিবার যে প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা আজিও প্রচলিত আছে। (Draper's 'Intellectual Development of Europe' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ড দেখুন এবং S. P. Scott's 'History of the Moorish Empire in Europe', Voll III, chap. XXIX এবং XXX দেখুন।)

জ্যোতিঃশাস্ত্র (Astronomy)

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত একটি করিয়া তথ্যও উল্লেখ করিবার স্থান নাই। আরবেরাই সর্বপ্রথমে তারকামণ্ডলীর গতিবিধির তালিকা ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খলিফা আলমামুন নিজে সূর্যের বাৎসরিক আবর্তনকক্ষের তির্যকতা (obliquity of the ecliptic) ২৩.৩৫´ ৫২´´ সেকেণ্ড নির্ণয় করিয়াছিলেন। এইরূপ বোগদাদের আবুল-ওয়ফা (৯৮৭ খ্রি.) ২৩.৩৫´ মিনিট বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। জ্যোতির্বিদ আবু-রয়হান ২৫ ফিট ব্যাসার্ধযুক্ত কোয়াডর‍্যান্ট (quadrant) বা বৃত্ত-চতুর্থাংশ দ্বারা ঐ বক্রতা ২৩.৩৫´ মিনিট নির্ণয় করিয়াছিলেন। স্পেন দেশের টলেডো নগরবাসী আল-জারকাল (১০৮০ খ্রি.) সর্বপ্রথমে সূর্যাদির আবর্তনকক্ষ অণ্ডাকার (বা eliptical) বলিয়া নির্ণয় করেন এবং প্রচলিত টলেমিক প্রণালীর ভ্রান্তি বাহির করিয়া জগতে কোপারনিকাস (Nicolas Copernicus, 1473-1543) এবং কেপলার (Johann Kepler, 1571-1630) এর সিদ্ধান্তের পূর্বাভাস দান করেন। তিনি সূর্যকক্ষের সর্বদূরবর্তী স্থানের (apogee) সঞ্চালন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য অন্যূন ৪০২ বার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ (observation) করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের ফল আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও শুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। ইবনে-সিনার তালিকায় ১০২২টি তারকার নাম উল্লেখ আছে। দার্শনিক ইবনে রোশদ (Averroes) বুধ গ্রহের গতিবিধি নির্ণয়কালে সূর্যের মধ্যে দাগ আবিষ্কার করেন। বর্তমান যুগের কাব্য রসপ্রিয় বাঙালির আদরের ধন ওমর খৈয়াম সেলজুক-সুলতান মালিকশাহ্ কর্তৃক তৎকালের প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার সাধনে নিযুক্ত হন। তিনি আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে লইয়া ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হন। তৎকর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্জিকা সম্বন্ধে গিবন (Gibbon) বলিতেছেন, 'সময় গণনা করিবার এই প্রণালী জুলিয়ান প্রবর্তিত প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট এবং সঠিকতায় গ্রেগরী প্রবর্তিত প্রণালীর প্রায় সমকক্ষ।' যে সময় সূর্য রাশিচক্রের মেষে প্রবেশ করে, সেই সময় হইতে ওমর খৈয়াম বৎসরের প্রথম দিন নির্ণয় করেন। ইতিপূর্বে সূর্যের মীনে প্রবেশ করা হইতে বৎসরের প্রথম দিন গণনা করা হইত। (এ সম্বন্ধে 'ওমের খৈয়াম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখিয়াছি। ১৩২৭ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' দেখুন।)

আধুনিক 'আলমানাক' (Almanac) বা পঞ্জিকার ইংরেজি প্রতিশব্দ মূলে আরবি। ঐতিহাসিকগণ আধুনিক পঞ্জিকার আবিষ্কারক আরবগণকে নির্দেশ করিয়াছেন।

কাইরো নগরের রাজকীয় লাইব্রেরীতে গণিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ৬০০০ পুস্তক ছিল; তথা হইতে অনেক পুস্তক স্পেন দেশেও নীত হইয়াছিল। আজকাল তাহার

একখানিও বাঁচিয়া নাই। খ্রিস্টান শক্তি তাহাদের জয়ের দিনে সকলই ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। (S. P. Scott's 'History of the Moorish Empire in Europe' vol. III, p. 478 এবং John William Draper's 'Intellectual Development of Europe' vol. II দেখুন।)

জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি

আরবগণই প্রথম স্পেনদেশের স্কুলে গ্লোব দ্বারা ভূগোল ও জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সকল গ্লোব কাষ্ঠ ও ব্রোঞ্জ নামক ধাতুর নির্মিত ছিল। সূর্য ও তারকারাজির উচ্চতা নির্ণয় করিবার জন্য আরবগণ astrolabe নামক যন্ত্রের অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। (আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল আকবরের গুণপনার মধ্যে একটি এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি astroilabe নামক যন্ত্রের ব্যবহার জানিতেন।) এই যন্ত্রের দ্বারা তাঁহারা দিবারাত্রির সময় নির্ণয় করিতে পারিতেন। S.P. Scott লিখিয়াছেন : 'Some were provided at the bottom with eleven different projections for as many horizons. On them were represented the movement of the celestial sphere, the sign of zodiac and the position of the principal stars & Constellations. ... Some of their armillary spheres were 25 feet in diameter... etc. etc. (তাঁহার 'History of the Moorish Empire, Vol. III, p. 479 দেখুন।) অর্থাৎ এই সকল যন্ত্রের মধ্যে কতগুলির তলদেশে একাদশ প্রকারের দিগন্ত বৃত্তের জন্য প্রায় ততোধিক 'প্রজেকসন' অঙ্কিত থাকিত। উহাদের মধ্যে নভোমণ্ডলের চলাচল, রাশি চক্র বিভিন্ন তারকার নির্দিষ্ট স্থান এবং প্রধান প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলী অঙ্কিত থাকিত। ... তাহাদের, নভোমণ্ডলে গ্রহাদির কক্ষগতি প্রদর্শনার্থ নির্মিত যন্ত্রের ব্যাস ২৫ ফিট পর্যন্ত ছিল।

আল-মোয়াহেদীন সম্প্রদায়ের নেতা মরক্কোর সম্রাট ইয়াকুব, 'সেভিল' (Seville) নগরে যে বিরাট মানমন্দির (observatory) নির্মাণ করিয়াছিলেন, পরবর্তী খ্রিস্টানগণ তাহার মর্যাদা বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে ঘণ্টা বুরুজে (belfry) পরিণত করিয়াছিলেন। (Draper's 'Intellectual History of Europe', Vol. II এবং Ameer Ali's 'History of the Saracens', p. 338 দেখুন। লেনপুল তাঁহার 'Moors in Spain' গ্রন্থে এই ঘণ্টা বুরুজের একটি চিত্র দিয়াছেন।) খলিফা মামুনের রাজত্বকালে আবুল হাসান 'টেলিসকোপ' বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন (Ameer Ali's 'History of the Saracens'; p. 279 এবং উপরোক্ত Draper সাহেবের 'Intellectual History of Europe', Vol. II দেখুন।)

ভূগোল

এ যুগের কৃত্রিম ও অকৃত্রিম সৈয়দগণ প্রত্যেকেই আপন আপন কুল-তালিকা বা কুল-ক্রমের বিশুদ্ধতার বড়াই করিতেই ব্যস্ত। কিন্তু সে যুগের হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সত্যকার বংশধর 'ইদ্রিসি' যে অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত ভৌগলিক অনুসন্ধান ও ভৌগলিক ভ্রমণ করিয়া ভূগোল রচনা করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তিনি সে যুগে নাইল নদীর উৎপত্তি স্থলের হ্রদসমূহের (Victoria Nyanza, Albert Nyanza) যে অবস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহা বর্তমান যুগের বিখ্যাত পর্যটক (explorer) Stanley (স্যার হেনরী মরটন স্টেনলী, ১৮৪১-১৯০৪) ইঁহার পূর্বনাম ছিল John Rowland ইনি অতি দরিদ্র ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। Henry Morton Stanley নামক একজন আমেরিকার বণিক ইহাকে প্রতিপালন করেন; পরে ইনি নিজে প্রতিপালকের নাম গ্রহণ করেন। ডাক্তার লিভিংস্টোন আফ্রিকার জঙ্গলে নিরুদ্দেশ হইলে ইনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া এবং আফ্রিকার অনেক অজানিত দেশ সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন।) এবং Baker-এর (Sir Samuel white Baker, ১৮২১-১৮৯৩, ইনিও আফ্রিকার বহু অজানা অঞ্চল সম্বন্ধে নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন এবং Allbert Nyanzaহ্রদ আবিষ্কার করেন।) আবিষ্কার প্রায় সমর্থন করিতেছে। তিনি নিজে রাজবংশীয় হইয়াও সিসিলির নরমানবংশীয় রাজা রোজারের রাজধানী পেলেরমো (Palermo) নগরে ভূগোল রচনায় দীর্ঘ ১৫ বৎসর অতিবাহিত করেন। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যাকার, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু, পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান ও নগর-নগরী সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণী দিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ পর্যন্তও নির্ভুল বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। S. P. Scott বলিতেছেন : 'The Compliation of Edrisi marks an era in the history of science. Not only its historical information most interesting & valuable but its descriptions of many parts of the earth are still authoritative.' অর্থাৎ 'ইদ্রিসির সংগ্রহ, বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক নতুন যুগ চিহ্নিত করিতেছে। ইহাতে লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ শুধু যে চিত্তাকর্ষক এবং মূল্যবান তাহা নয়, ইহাতে উল্লিখিত জগতের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা আজ পর্যন্তও প্রামাণিক ও গ্রহণীয়।'

ঐতিহাসিক আবুল ফিদা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অন্যূন ষাটজন আরবিয় ভৌগলিক জীবিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক ডিগ্রি পরিমাণ স্থানের তাঁহাদের নির্ধারিত দূরত্ব, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে নির্ধারিত দূরত্বের প্রায় সমান।

দৃষ্টি ও আলোকবিজ্ঞান (Optics)

বর্তমান আলোকবিজ্ঞান ও দৃষ্টি-বিজ্ঞানের ভিত্তি আরবিয় বৈজ্ঞানিক হাসান-বিন-হাইসেম (যিনি ইউরোপে আল-হাজান নামে খ্যাত) দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। তিনিই প্রথম (একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে) বিজ্ঞান জগতের কতকগুলি চিরপ্রচলিত ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন। আলোকরশ্মি চক্ষু হইতে দৃষ্ট বস্তুতে গমন করে, তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল ছিল। তিনি তাহা সংশোধন করেন। তিনিই সর্ব প্রথমে আলোকরশ্মির দিক-পরিবর্তন নীতি (Principle of refraction) ব্যাখ্যা করেন এবং কেন শূন্যমার্গে ভাসমান বিভিন্ন গ্রহ দিগন্তবৃত্তের নিম্নে থাকিলেও পরিদৃষ্ট হয় তাহার কারণ বর্ণনা করেন। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে যে Ether আছে তাহা তিনিই সর্বপ্রথমে বর্ণনা করেন। তিনিই সকলের পূর্বে, যে আলোক-ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া চশমা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করেন। (He, Roger Bacon, was the inventor of spectacles whose idea he obtained from Kahazen.—S. P. Scott, Vol. III p. 496) তাহার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পুস্তক আন্দুলেশিয়ার বিভিন্ন কলেজে পড়ানো হইত। তদানীন্তন ইংরেজ Adelard of Bath, Robert of Reading, Daniel Morley, William Shelly আল-হাজান লিখিত বিজ্ঞান শিখিবার জন্য স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

রসায়ন (Chemistry)

লৌহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতু হইতে স্বর্ণ বাহির করিবার পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেই Chemistry বা রসায়নশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি সমূহের মধ্যে এই বিদ্যার আলোচনা অল্পবিস্তর চলিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন আরবেরা (They practically invented modern Chemistry.—S. P. Scott, Vol. III p. 490)। অন্তত যত দিন (Chemistry) শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত থাকিবে, যতদিন alcohol, alkali, juleps, elixirs, syrups প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থাকিবে ততদিন ইউরোপীয় সভ্যতা হইতে মুসলিম-স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাহাদিগকে nitric acid, sulphuric acids, alcohol, muriate of ammomia, pottassa, bichloride of mercury, nitrate of silver & phosphorus আবিষ্কর্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। উত্তাপ দ্বারা ধাতুকে চূর্ণ করিলে তাহার ওজন বৃদ্ধি পায়, এ রাসায়নিক সত্যও তাহাদের নিকট বিদিত ছিল। মুস্‌লিম রসায়নবিদ আলজাব্বারুল-কুফি বা Gaber এর প্রণীত রাসায়নিক পুস্তকেই সর্বপ্রথমে ধাতুকে Oxidise করিবার পদ্ধতি, Gas উৎপন্ন করিবার পদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছিল।

ঔষধ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র (Medicine)

হজরত মোহাম্মদ (দ.) নিজেও একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করিতে মুসলমানগণ হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান সকল জাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেন। খলিফা আলমামুনের সময় যাবতীয় গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনো কোনো গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। ইমাম রাজি প্রণীত শিশু চিকিৎসা পুস্তক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই শাখার প্রথম পুস্তক। মূর সার্জনগণ Cataract বা চক্ষুর ছানি রোগের একাদশ প্রকার অস্ত্রোপচার বর্ণনা করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে হাসপাতাল বিদ্যমান ছিল। বর্তমান ইউরোপীয় হাসপাতাল সংরক্ষণ প্রণালী বোগদাদ, কাইরো, মূরদের অধিকৃত স্পেন ও আরব অধিকৃত সিসিলিদ্বীপ হইতে উদ্ভূত হয়। (Their, of those hospitals, hygienic arrangement were in many respects superior even to those dictated by the spirit of modern scientific progress. They were larger more commodious. Purity of air was assured by a system of thorogh ventilation.—S. P. Scott, Vol. III p. 508)

আধুনিক অস্ত্রোপচার বিদ্যার ভিত্তিমূল স্থাপয়িতা আবুল কায়েস। ইবনে সৈয়দুল খতিব চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এক সহস্র পুস্তক রচনা করেন। টোলেডো নিবাসী ইবনে ওয়াফেদ ২০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন 'সেভিল' নগরবাসী ইবনে জোহরই প্রথম আবিষ্কার করেন যে ক্ষতের মামড়ি বা কচ্ছু (Scab) এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষত-কীট হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি গন্ধক নামক পদার্থকে ইহার ঔষধ নির্ণয় করিয়া যান। মোহাম্মদ ইবনে-কাশেম ৬০০ পৃষ্ঠা যুক্ত একখানি চক্ষুরোগ চিকিৎসার পুস্তক রচনা করেন। মোহাম্মদ-আল-তেমিনি 'হারনিয়া' (hernia) এবং 'টিউমার' (tumor) রোগ সম্বন্ধে চারিশত পৃষ্ঠাযুক্ত একখানি পুস্তক রচনা করেন। এইরূপ প্রত্যেক প্রকারের রোগ সম্বন্ধীয় অসংখ্য পুস্তক রচিত হইয়াছিল। তাহাদের 'সার্জারি' সম্বন্ধীয় পুস্তকে তাহারা বিভিন্ন অস্ত্রের ছবিও দিয়াছিলেন।

মূত্রাশয়ের প্রস্তর বহিষ্করণার্থ অস্ত্রোপচার প্রথম আরবেরাই করিয়াছিলেন। 'টাইফয়েড' জাতীয় জ্বরে ঈষদুষ্ণ জলের স্বেদ দেওয়ার ব্যবস্থা আধুনিক চিকিৎসকগণও করিয়া থাকেন। আববগণ এই প্রকার জ্বরে এই ব্যবস্থাই করিতেন। আজি হইতে নয়শত বৎসর পূর্বে ইমাম রাজি এই ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছিলেন।

দর্শন (Philosophy)

এই সাতশত বৎসর একত্র বসবাস করার পরও আমরা মুসলমান শতকরা ৮০ জন সুশিক্ষিত হিন্দুর নজরে 'বারবেরিয়ান'; এই জন্য অবশ্য কতকাংশে দায়ী আমরা

নিজেরাই। পথে-ঘাটে, আন্দোলন আলোচনায় সর্বদাই শুনিয়া আসিতেছি, 'মুসলমান জাতির সৃষ্ট কোনো দর্শন নাই, কেননা তাহারা গভীর চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত।' অথচ ইতিহাসে দেখি, জগতের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্ব তাহাদের মস্তক হইতে বাহির হইয়াছে। তাহারা গ্রীক-দর্শনের অনুবাদ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার উপর তাহাদের নিজদের হস্তের ছাপও যথেষ্ট দিয়াছিলেন। সুফী দর্শন ব্রহ্ম ছাড়া অন্য বস্তুর অস্তিত্ব অসার ও নশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিয়া ধর্মগত ও জাতিগত ও পারিপার্শ্বিক সংস্কার হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক তাহার কত সুন্দর আপ্তোক্তিই না ইমাম গাজ্জালি দিয়া গিয়াছেন। (Draper's 'Intellectual History of Europe' Vol. II দেখুন। অল্পদিন গত হইল বিলাতের মহিলা ঔপন্যাসিক Marie Coreli তাঁহার 'Ardath' নামক উপন্যাসে ইমাম গাজ্জালির দর্শনের একটি সুন্দর আভাস দিয়াছেন।) দার্শনিক ইবনে-রোশদের মতে 'মানুষ একটি প্রধান পাত্র যাহার মধ্যে 'চৈতন্য' আত্মপ্রকাশ করেন। সকল মানুষই 'চৈতন্যে'র আলোক গ্রহণ করিবার সমান ক্ষমতা রাখেন না; ফলে মহাচৈতন্যের আলোকপ্রাপ্তিরও একটা ক্রমবিকাশ আছে। মানুষের পরম আনন্দ হইতেছে সেই পরম চৈতন্যের সহিত মিলন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এবনে-রোশদের দর্শন ইউরোপে বিশেষ করিয়া ইটালি দেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। তথাকার মনীষীগণ এবনে রোশদের দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া 'প্যাডুয়া' (Padua) প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' হইতেন।

সাহিত্য

বিজ্ঞান ও দর্শনের ন্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যেও মুসলিম সাহিত্যের ছাপ পড়িয়াছে। পেট্রার্কের (Petrarch ১৩০৪-১৩৭৪) সনেটগুলি কসিদা ও গজলের ছাঁচে রচিত হইয়াছিল। মুর-অধিকৃত স্পেনদেশে এবং আরব অধিকৃত 'সিসিলি' দ্বীপে আমাদের দেশের কবিওয়ালাদের মতো একশ্রেণীর কবি ছিলেন। তাহারা রাজারাজড়ার দরবারে এবং সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের মজলিসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেন। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গল্পকথকের দলও থাকিতেন। প্রথমোক্ত কবিগণের অনুকরণে দক্ষিণ ইউরোপে 'ট্রুবেডুর' (Troubadour) নামক একশ্রেণীর কবির আবির্ভাব হয়; তথা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। Sir Walter Scot এর Ministrel ও

> Poured to the lord & lady gay,
> The unpremeditated lay.

(Sir, Walter Scot এর 'Lay of the last Ministrel' নামক কাব্যের Introduction দেখুন।)

আবার উপরোল্লিখিত গল্পকথকদের অনুকরণে মধ্যযুগে 'বাংলার' (Jong leurs) নামক বিদূষকের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল গল্পপ্রিয়তার ফলেই মুসলিম জগতে আরব্যোপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছিল। আরব্য-উপন্যাসের ভাবে ইউরোপের বহু গল্প অনুপ্রাণিত। Alexander Duma-র বিখ্যাত উপন্যাস 'কাউন্ট-অব-মন্টিক্রিস্টোর' (Count of Monte Christo) মধ্যে শুধু যে আরব্য-উপন্যাসের প্রভাব আছে তাহা নহে, আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র প্লটগুলি আরব্য উপন্যাস হইতে গৃহীত। ডান্টে (Dante) নাকি তাঁহার ধ্যানে হজরত মোহাম্মদ (দ.) কে Inferno-তে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও আরবি কবিতার ছন্দ ও তাল অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। 'বোকেশিও'র (Boccaccio) গল্পগুলি আরবি ছাঁচে রচিত। ইংল্যাণ্ডের চসার (Chaucer) প্রণীত 'Canterbury Tales'-ও আরবি প্রভাব এড়াইতে পারে নাই।

স্থাপত্য শিল্প

জগতে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের সর্বপ্রসারী প্রভাবের পুনরুক্তি করাই বাহুল্য। হয়তো সর্বত্র তাহাদের স্থাপত্যের মধ্যে মৌলিকতা পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহা কিছু তাহাদের নিজস্ব এবং যাহা তাহারা অন্যান্য জাতি হইতে গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার প্রভাবও ইউরোপে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। দালানের প্রাচীরকে আরবগণ বিভিন্ন মালমশলা যোগে যেরূপ ফুল লতাপাতায় ভূষিত করিতেন (Mural decorations, মিউর‍্যাল ডেকরেশন) তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাহাদের উদ্ভাবিত 'আরাবোক' (arabesque) আজিও কর্ডোভার মসজিদের দেওয়ালে বাঁচিয়া রহিয়াছে। ইউরোপে এবং জগতের সর্বত্র তাহাদের উদ্ভাবিত এই শিল্পকৌশল চিরদিনই বাঁচিয়া থাকিবে। স্টুক্কো (Stucco) নামীয় চুণা বালি মিশ্রিত মশলার উপর ইনামেল করা মোজায়িক (enamelled mosaic) কার্য স্থাপত্যে তাহাদেরই উদ্ভাবিত কলা ('In the perfection of enamelled mosaics, however, Arab's originkaity was undisputed'—S. P. Scott) বিখ্যাত আলহাম্বা প্রাসাদে যে প্রকার চুণা, বালি ও অপরাপর মালমশলা সহযোগে তাহারা লেসের ন্যায় কারুকার্য করিয়াছিলেন আজ পর্যন্তও তাহা স্বাভাবিক প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে। মালমশলার সহিত তাহারা কি এক প্রকার ঔষধ মিশাইয়া দিতেন, যাহার কারণ আজ পর্যন্তও সে সকল দেওয়ালে কখনো মাছি ও মাকড়সা বসে না। কি কি দ্রব্যের সমাবেশে তাহারা তাহাদের দেওয়ালের সেই আশ্চর্য কারুকার্য সমাধান করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্তও জগতের বিখ্যাত স্থপতিগণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো বিজ্ঞ স্থপতি কেবল অনুমান করিয়াছেন যে চূর্ণীকৃত মার্বেল, চূণ ও 'জিপসাম' নামক ধাতু

কোনো এক বিশেষ অনুপাতে ডিম্বের শ্বেত অংশের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা তরল থাকিতে বিভিন্ন আকারে নির্মিত ছাঁচে প্রবেশ করাইয়া দিয়া এই অসাধারণ ইনামেল করা মোজাইক তৈয়ার করা হইয়াছিল। প্রকৃতির ক্ষয়কারী হস্তকে দূরে রাখিয়া আজো যে তাহা অবিকৃত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার কারণ নাকি এই যে ঐ সকল পদার্থের সহিত রসুন মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মোটের উপর ইউরোপের বুরুজে বুরুজে, দরজায় দরজায়, গম্বুজে, দেওয়ালের কারুকার্যে সেই মুসলিম স্থপতিগণের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।

অন্যদিকে প্যালিসির (Palissy) তিনশত বৎসর পূর্বে তাহারা 'পরসিলেন' (porcelain) বা চীনাবাসন প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ('They anticipated by three hundred years the method rediscovered by Palissy.'—S. P. Scott.)

টেরা-কোটা (terra-cotta) নামীয় কর্দম নির্মিত দোদুল্যমান লতাপাতা দ্বারা তাহারাই সর্বপ্রথমে পূর্বকথিত 'জিরালডা'র (Geralda of Seville) অগ্রভাগে পরিশোভিত করিয়াছিলেন।

উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষি

সেভিল নগরবাসী ইবনেল-আওয়াম কৃষি সম্বন্ধে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে কৃষিবিদ্যার এমন কোনো শাখা নাই যাহার সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত না লিখিয়াছেন। কেমন করিয়া শস্য রোপণ করিতে হয়, কেমন করিয়া ফসল সংগ্রহ করিতে হয়, কেমন করিয়া ফলের বাগান সংলক্ষণ করিতে হয়, কেমন করিয়া পশু পালন করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে সে পুস্তকে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে।

মুরজাতিই ইউরোপে সর্বপ্রথমে Straw-berry, লেবু, খেজুর, mulberry বা তুঁত গাছ, বেদানা, পেস্তা, ইক্ষু, গোলমরিচ, কফি, কার্পাস ইত্যাদির চাষ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রমেই আপেলের বেষ্টন ত্রিশ ইঞ্চিতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাদের সময়ে প্রত্যেক নদীর তীরে তীরে ভূমধ্যসাগরের পাড়ে পাড়ে দ্রাক্ষালতা ও ন্যাসপাতির বাগিচা পরিদৃষ্ট হইত।

পশুপালনে তাঁহারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের প্রবর্তিত মেরিনো-ভেড়া (Merino Ship) সংরক্ষণ ও তাহার পশম সংগ্রহ প্রণালী হইতে বুঝা যাইতে পারে। বৎসরে দুইবার করিয়া অসংখ্য মেরিনো-ভেড়া পিরেনিজ পর্বতের ঢালু ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইত। তথায় মুক্তপ্রকৃতির আবহাওয়ায় পশুগুলি চরিয়া চরিয়া বাড়িয়া উঠিত এবং যত্নের ফলে তাহারা রেশমের ন্যায় কোমল চকচকে পশম দান করিত।

কাগজশিল্প

অতি প্রাচীনকাল হইতে চীন দেশে কাগজ প্রস্তুত হইত। কিন্তু ইউরোপে কাগজের প্রচলন করেন মূরগণ। স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ নির্মিত এসকরিয়েল (Escorial) রাজপ্রাসাদের (এই রাজপ্রাসাদ Madrid হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত।) লাইব্রেরীতে একখানি মূরদের প্রস্তুত কার্পাস-নির্মিত কাগজ পাওয়া গিয়াছে। এই কাগজখানি লিখিত। ইহাতে তাহাদের প্রস্তুত কাগজ কতদূর উন্নত ছিল তাহাই বুঝা যাইতেছে। স্পেন দেশের 'জেটিভা' (Xativa) নগরে মূরদের কাগজের কারখানা ছিল। ইহাই ইউরোপের প্রথম কাগজের কারখানা।

বয়ন ও সূচীশিল্প

লাস-নাভাস-ডি-টলসা (Las-Navas-de-Tolossa) নামক স্থানের যুদ্ধে মূরদের একটি প্রকাণ্ড পতাকা খ্রিস্টানদের হস্তগত হইয়াছিল। ইহা স্পেনদেশের বারগস (Burgos) নগরের নিকট লাস-হিউএলগাস (Las Huelgas) নামক আশ্রমে রক্ষিত আছে। ইহার জমিন লাল রেশমের তৈয়ারি। ইহার উপর সবুজ ও হলদে রঙের লেখা ও ফুললতাপাতা অঙ্কিত। ইহার অনুপম সৌন্দর্য গবেষণাকারিগণকে বিস্মিত করিয়া দিতেছে। 'মাদ্রিদের' যাদুঘরে আজ পর্যন্তও খলিফা দ্বিতীয় হিসামের চোগা রক্ষিত হইতেছে। ইহার উপর অসাধারণ কৌশলে সূচিকার্যের দ্বারা ফুল, লতা, পাতা এবং খলিফার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে এবং কোরানের আয়াতও লিখিত হইয়াছে। এই চোগার রঙ আজ পর্যন্তও অবিকল রহিয়াছে।

চর্মের উপর কারুকার্য

লাইব্রেরী সংরক্ষণের জন্য বুক-বাইণ্ডিং এবং চর্মের উপর নানা কারুকার্যের চর্চা মুসলমানদের মধ্যে খুব জোরে চলিয়াছিল। 'Morocco binding' এই নামটিতে তাহাদের সেই শিল্পের স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে। স্পেনদেশে আজ পর্যন্তও তাহাদের ব্যবহৃত চর্ম পাকা করিবার পাত্রগুলি দুই একস্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

কয়েকটি বিশেষ জিনিষ ও তাহার আবিষ্কার

চুম্বক শলাকার ধর্ম অতি পূর্বকাল হইতেই চীনদেশে বিদিত ছিল। আরবেরা তাহাদের নিকট ইহার কার্যকারিতা অবগত হইয়া সমুদ্রে দিকনির্ণয়ের জন্য ইহাকে প্রথম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ইহা আরবদের হস্তে আসিবার পূর্বে শোলার উপর বসাইয়া, শোলাখণ্ডটি জলের উপর ভাসাইয়া দেওয়া হইত, তখন অবশ্য শলাকাটি আপন ধর্মানুযায়ী শোলাখণ্ড সহ উত্তরমুখী হইত। আরবেরাই প্রথম এই

চুম্বক শলাকাকে একটি সূক্ষ্মাগ্র কীলক বা পিভটে'র (Pivot) উপর বসাইয়া ইহার কার্যকে সঠিক ও কার্যকরী করিয়া তুলেন। (S. P. Scott.)

তুলাদণ্ড

দ্রব্য ওজন করিবার জন্য তুলাদণ্ডের ব্যবহার আরবেরাই প্রথম ইউরোপে আনয়ন করেন। একটি মটরের ওজন হইতে তাহারা 'ক্যারেটে'র (Carat) ওজন লইয়াছিলেন। ইংরেজি Carat শব্দটি আরবি 'কিরাত' শব্দ হইতে আসিয়াছে।

Reinand, Fave, LeeBon এবং Viardot প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে আরবগণই বারুদ ও কামান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মূরগণের ইহা ইউরোপে ব্যবহার করিবার পূর্বে, লোকের ধারণা ছিল যে বারুদ চীন দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মূরগণই জল সরবরাহ করিবার জন্য ইউরোপে প্রথম hydraulic engine ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ফরাসি জাতির আট শত বৎসর পূর্বে আরব জাতি Siphon যন্ত্রের নীতির সহিত পরিচিত ছিলেন।

আমোদপ্রমোদ

আরবি বণিকেরা দাবা খেলা ভারত হইতে আমদানি করিয়া ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। স্পেনের মূর-রাজগণ ইহার বড়ই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আরবেরা তাস খেলা হিজিরারও বহু পূর্ব হইতে জানিতেন। স্পেনদেশে কার্ডকে আজ পর্যন্তও naipe বলে; এই naipe শব্দ আরবি 'নায়েব' শব্দ হইতে আসিয়াছে। আরবেরাই প্রথম ইহা ইটালিদেশে প্রচার করেন। Back gammon এবং আরো অনেক প্রকারে গুটিখেলা নাকি তাহাদেরই উদ্ভাবিত ক্রীড়া।

মূরদের বিশেষ নৃত্য Morris dance ইউরোপে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন ইংরেজি কাব্যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। (Cf. Sir Walter Scot's By every rill, in every glen,
Merry elves their morris pacing
To aerial ministrelsy
—Lay of the last ministul)

আজ পর্যন্তও পর্টুগালের একটি প্রদেশের নাম 'আলগার্ভ' (Algary) রহিয়া গিয়াছে। (See Ameer Ali's Saracens p. III, এই শব্দটি আদতে 'আল-ঘারিব' বা 'পশ্চিমের প্রদেশ')। জিব্রাল্টার নামটি আজিও তারিকের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। দক্ষিণ ইউরোপের অনেক নগরের মধ্যে মুসলিম নাম রহিয়া গিয়াছে। Nice নগরের একটি মহল্লার নামের সহিত আরব স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।

এইরূপে ইউরোপের বৃক্ষে বৃক্ষে, পত্রে পত্রে, ফুলে ফলে, শিল্প-বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে দর্শনে, স্থাপত্যে, সাহিত্যে, আইনে, বিধানে, আচারে, ব্যবহারে, ধর্মমতে, চিন্তাধারায় মুসলিম স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। একটা প্রবন্ধে তাহার সামান্য আভাস দেওয়াও সম্ভব নহে।

এই সকল মুসলিম সন্তানের কীর্তিচর্চায় হয়তো আমাদের মনে একটা মহা গৌরবের অনুভূতি আনয়ন করিয়া থাকে', কেননা আমরাও মুসলমান। কিন্তু এই গৌরব হইতে এই কথা পৃথক করা যায় না যে আমরা বর্তমানের একটা চরম হীনতাকে পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেছে। তবুও ইহা হইতে অনেক পাঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে। আরবজাতি হজরত মোহাম্মদের (দ.) জাতি। যে জাতির একজনের উপর কোরান অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহারা গ্রীক, হিন্দু, ইহুদি প্রভৃতি যে কোনো জাতির মধ্যে কোনো একটা সত্য পাইলে, কখনো এই কথা বলিয়া তাহা উড়াইয়া দেন নাই যে উহা কোরানে উল্লিখিত নাই। আলোকবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য কোরানে উল্লিখিত নাই বলিয়া তাহারা সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ক্ষান্ত হন নাই। মৃত্যুর পর আত্মার পরিণামের কথা কোরানে উল্লিখিত থাকা সত্ত্বেও তাহারা দার্শনিক অভিনিবেশ দ্বারা ঐ সকল সত্যের আরো নিকটবর্তী হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অজানিত সত্যের রাজ্যের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য তাহারা যে বিরাট অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাহার ফলেই আজ ইউরোপীয় সভ্যতা দণ্ডায়মান হইয়াছে। S. P. Scott সত্যই বলিয়াছেন : 'Modern seience unquestionbly owes every thing to Arab genius.' ('History of the Moorish Empire in Europe', Vol. III, p. 132)।

কিন্তু আমরা এখন কোথায়?

মানবপ্রগতি ও মুক্তবুদ্ধি

নাজিরুল ইসলাম

সামাজিক জীবনের প্রারম্ভে মানুষের অবস্থা যে কত করুণ, কত মর্মন্তুদ তা আজ এই মানবপ্রগতির যৌবনে দাঁড়িয়ে ঠিক বুঝবার আর সম্ভাবনা নাই। তবে ইতিহাসের পাতায় সেই সুদূর অতীতে মানবজীবনের যে ছবি আমরা দেখতে পাই তাই থেকে কতকটি বুঝতে পারি সে দিন মানুষ কত অসহায় দুর্বল ছিল। প্রকৃতির কাছে চিরাবনত মস্তক নিয়ে কি করে সে ক্ষুদ্র জীবনের হিসেব করা দিন কয়টি কাটিয়ে দিত, কি করে অতীন্দ্রিয় দেবতাদের করুণা ভিক্ষা করে ফিরত, কি করে তার জীবন বিরুদ্ধ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে অকালে শুকিয়ে যেত, সে সব কথা ভাবতে গেলে অনন্ত সম্পদের অধিকারী বর্তমান মানুষের মন করুণায় ভরে ওঠে!—চিন্তাশীল মানুষ আজ বুঝেছে প্রকৃতির রাজ্যে ভিখারীর স্থান নাই। অতীন্দ্রিয় দেবতার কাছে আবেদন নিবেদন করে এজন্য বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এখানে বাঁচবার অধিকার শুধু তারই যে আপন শক্তিতে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। অনন্ত কোটি জীব এই ধরার বুকে বাসা বেঁধেছে আবার অনন্ত কোটি জীব এর পৃষ্ঠ থেকে মুছে গেছে। এই সীমাবদ্ধ জগতে একের স্থান করতে অন্যকে বিদায় নিতে হয়েছে। সবল দুর্বলকে পিষে মেরে আপনি বেঁচে আছে। যে বেঁচেছে, পারিপার্শ্বিক শক্তি তাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। সে আঘাতের বদলে আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে তাদের হীনবীর্য করেছে। মানুষও এই জীবনযুদ্ধের বাইরে নয়। তাকেও অনেক আঘাত সইতে হয়েছে, অনেক আঘাত দিতে হয়েছে। রোগের জীবাণু, দেশের আবহাওয়া, তার নিজের ভেতরের অকল্যাণকর প্রবৃত্তি, এরা সবাই মিলে চেয়েছে তাকে ধ্বংস করতে, তাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে; আর সে যুগে যুগে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে প্রয়াস পেয়েছে এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে ব্যাহত করতে। কিন্তু সজীব বিরুদ্ধ শক্তিও বাঁচবার প্রেরণায় নিজদের নতুন করে গড়ে নতুন অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে, নতুন পন্থার মানুষকে আক্রমণ করেছে। তখন মানুষের আবার প্রয়োজন হয়েছে বর্তনের, নিজের জীবনকে নতুন প্রণালীতে রক্ষিত করবার!

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধকালে মানুষের এই যে নতুন সৃষ্টি এর মূলে আছে তার বুদ্ধি। পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্বের সঙ্গে জীবন নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর শুভ পরিবর্তন সাধ্যায়ত্ত হয় তখনি যখন মানুষের মুক্ত বুদ্ধি তাকে সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করে। জড়বুদ্ধি মানুষকে নিশ্চল করে দেয় তবে সামনে চলার প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে ফেলে। যে নিত্য নতুন করে না গড়ে জীবনযুদ্ধে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই পাশ্চাত্যে আজ নতুনের এত জয় ঘোষণা—আর মুক্ত বুদ্ধি এই নতুনকে এনে দেয় ও যে যৌবন এই নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের আবাহন গতিতে গগন পবন এত মুখরিত।

ডারুইন ও স্পেনসারের অভিব্যক্তিবাদের ফল এই নতুনের সাধনাই বর্তমান জগতের সাধনা। কিন্তু এই নতুনের সাধনাক প্রতিষ্ঠিত করতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে, মানবের দুঃখের দরদী এক একটি চিরনবীন মহাপুরুষ যে কত লাঞ্ছনা সয়েছেন, মানুষেরই রক্ষণশীল প্রবৃত্তি ও মজ্জাগত অভ্যাসের কাছে যে কত কঠিন আঘাত পেয়েছেন, তার কাহিনী বড় শোচনীয়। অসাধারণ সৃষ্টিকৌশলী কোনো মানুষ, জ্ঞানে বা কর্মে যখনি একটা নতুন জগতের সন্ধান দিতে চেয়েছেন যেখানে পৌঁছালে মানুষ বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ থেকে অনেকটা নিরাপদ হতে পারত, তখনি রক্ষণশীল গড্ডলিকা প্রবাহ মহাবিপ্লব বাধিয়ে বড় করে তুলেছে তার অতীতকে—অতীতের অন্ধ অভ্যাসকে। আর এই অতীত-মোহগ্রস্ত গড্ডলিকার তমসাচ্ছন্ন বিশ্বাসের চাপে পিষে গেছে সত্যকার স্রষ্টা। কিন্তু অতীত টেকেনি। অতীত তার সকল কুয়াশা সকল বিশ্বাস ও রক্ষণশীলতা নিয়ে কোন সুদূর হিম গিরির তুহিন শীতল অন্ধকার গহ্বরে আপনাকে ঢাকা দিয়েছে, তার স্থানে আজ আসন পেতেছে বর্তমান শহীদ মহাপুরুষের স্বপ্ন।

আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগে গ্রীক সভ্যতার আদিম পুরুষ সক্রেটিস তাঁর যে বাণী নিয়ে গ্রীক সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সে বাণী পরবর্তী দুহাজার বছর ধরে সমগ্র জগতের কাছে শ্রদ্ধার অঞ্জলি পেলেও তৎকালীন রক্ষণশীল গ্রীক সমাজ তাকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করলে। জীবন বিনিময়ে সক্রেটিসকে তাঁর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

সক্রেটিসের অপরাধ তিনি মানুষের ভেতরে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাকে শেখাতে চেয়েছিলেন সে কারো থেকে ছোট নয়—তবে অন্তরের বাণী কোনো শাস্ত্রবাক্য বা আইনের চেয়ে হীন নয়। নিজের জীবন দিয়ে এই কথাই তিনি আরো ভাল করে প্রমাণ করে গেলেন। শাস্ত্রদ্রোহী বলে ঘোষিত হবার পর তাঁর মাথার পরে যখন কালবৈশাখীর তুমুল বিভীষিকা জীবন-মৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে পুরুষ সিংহের মতো দাঁড়িয়ে তিনি বজ্রকঠিন স্বরে তাঁর দেশবাসীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : 'If you propose to acquit me on condition

that I abandon my search for truth, I will say, I thank you, O Athenians, but I will obey God, who as I believe, set me this task, rather than you and so long as I have breath and strength I will never cease from my occupation with Philosophy.'

জ্ঞানের দুলাল সক্রেটিস—চেয়েছিলেন সত্যকে। সত্যের যে রূপ তাঁর অন্তর দেখতে পেয়েছিল—সেই রূপের মোহে উন্মাদ হয়ে ছুটেছিলেন বাইরের আইন কানুন শাস্ত্র সব কিছুকে লঙ্ঘন করে। যে জাগ্রত মুক্তবুদ্ধির প্রভাবে তিনি এই রূপের সন্ধানী হয়েছিলেন সেই মুক্তবুদ্ধি সবার হোক এই ছিল তাঁর প্রাণের বাসনা। কিন্তু এই মহাপুরুষকে সমাজদ্রোহী বলে পীড়ন করলে শেষে তারাই, যাদের দরদে তিনি ছুটেছিলেন সত্যের পথে নিজের সকল ভোগবিলাসকে অবহেলা করে। Mill তাই দুঃখ করে বলেছেন : 'Man did not merely mistake their benefactor; they mistook him for the exact contrary of what he was.'

মানুষের রক্ষণশীল প্রবৃত্তি তার অতি দরদী বন্ধু এই একটিকে বধ করেই ক্ষান্ত হয়নি। যুগে যুগে দেশে দেশে বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করে দিয়ে এর রাজত্ব চলেছে আর শত শত মানুষ যাঁরা জগতকে নতুন করে গড়ে তার দুঃখের লাঘব করতে চেয়েছিলেন তাঁরা এর কবলে লাঞ্ছিত হয়েছেন। মুসলিম জগতে মধ্য যুগে শিয়া ও খারিজিরা মতের বিবাদ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল মুরজিয়া মতবাদ। মুরজিয়া মতই একটু পুষ্ট হয়ে কাদেরিয়া মতে পরিণত হয়। সক্রেটিসের আগে তাঁর দেশবাসীরা যেমন বিশ্বাস করতো মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই সে অতীন্দ্রিয় দেবতাদের হাতে কলের পুতুল মাত্র, কাদেরিয়া মতের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতার আগে মুসলমানরাও তেমনি ভাবত মানুষের সব কাজই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিয়ন্ত্রিত করছেন, মানুষের নিজের কোনোই ক্ষমতা নেই। ইবনে আতা সমাজকে এই আশাহীন অদৃষ্টবাদের নিষ্কর্মা জীবন থেকে মুক্ত করতে চাইলেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে স্বীকার করে। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে নিজের চিন্তার বিকাশ দিয়ে মানুষ যে তার অবস্থার উন্নতি করতে পারে এই কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টবাদ থেকে তিনি একবারে মুক্ত হতে পারেননি। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে স্বীকার করলেও তার কর্মফল তিনি অদৃষ্টের হাতে রেখে দিলেন। আন্‌নাজ্জান এসে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চাইলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—এ জগতে কিংবা পরজগতে আল্লাহ্ মানুষের কি কোনো প্রাণীর কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারেন না। তিনি যে দয়া করে কারো ক্ষতি করেন না তা নয়, ক্ষতি করবার কোনো ক্ষমতাই তাঁর নেই। নজ্জাম মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

তাঁর মতবাদে ক্রটি যাই থাক তিনি যে অদৃষ্টের ক্ষমতাকে ছোট করে মানুষকে আপন শক্তিতে বিশ্বাসবান করতে চেয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। মানুষ নিজ শক্তিতে আপনার মঙ্গলপথ গড়ে নিতে পারে এই ছিল তাঁর মূল কথা। মানবপ্রগতির গোড়ার কথাও এই আত্মবিশ্বাস। কিন্তু শাস্ত্রান্ধ মুসলিম সমাজ নজ্জামের এই শুভ ইচ্ছার দিকে একবার ফিরে চাইলে না—তিনি সমাজকে কি দিতে চেয়েছিলেন সে দিকে একবারও লক্ষ্য করলে না। সে দেখলে শুধু তাঁর শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। তাই তাঁকে কাদেরিয়াদের সেরা শয়তান বলে অভিহিত করলে। আর প্রথম কাদেরিয়া যিনি সমাজকে অদৃষ্টবাদের হাত থেকে মুক্ত করে উন্নতির পথে তুলে দিতে চেয়েছিলেন সমাজ তাঁর প্রাণবধ করে তাঁর উপকারের শোধ দিলে।

এথেনিয়াঙ্গরী সক্রেটিসকে বধ করলেও গ্রীসের সমাজ শাসন রাজ শাসন স্বাধীন চিন্তাকে ততটা বাধা দেয়নি যতটা দিয়েছে মধ্য যুগের ইউরোপ। রাজা কনষ্ট্যানটাইনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবার পর থেকে গির্জার পাদরিদের ক্ষমতা অত্যন্ত বেড়ে যায়। এই শাস্ত্র-শকুন পাদরির দল ভাবতো জগতের যা কিছু সত্য সে ক্ষুদ্র একখানা বাইবেলের ভিতরে নিহিত আছে। বাইবেলের বিরুদ্ধে যে কথা সে নিশ্চয়ই অসত্য এবং মানুষকে বিপথে চালিত করবার সহায়ক। এই বিশ্বাস নিয়ে ধর্মধ্বজীরা অবাধে সমস্ত ধর্মদ্রোহীদের লাঞ্ছিত করতে লেগে গেল। পোপ নবম গ্রেগরীর সময় ধর্মদ্রোহীদের খুঁজে বের করবার জন্য একটা সংঘই গঠিত হয়ে গেল। এই সংঘ রাজ্যের যত ধর্মদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করে বধ করতে লাগল। ফলে মানুষের সব মন পঙ্গু হয়ে গেল। জগতের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি সম্বন্ধে শাস্ত্র যা ব্যাখ্যা দিয়েছিল তার বাইরে কিছু ভাববার কারো আর স্বাধীনতা রইল না। সুতরাং সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি একেবার বন্ধ হয়ে গেল। তাই মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস এক বিরাট ব্যর্থতার ইতিহাস। একজন ঐতিহাসিক ধর্মধ্বজীদের এই অত্যাচার সম্বন্ধে বলেছেন : 'No more ingenious device has been invented to subjugate a whole population to paralyse its intellect and reduce it to blind obedience.'

ইউরোপকে অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোকের পথে তুলে দেন Ibn Rushd বা এভেরোস, একজন স্পেনীয় মুসলমান দার্শনিক। ১২০০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র ইউরোপ যখন পরকালের মুক্তির মোহে শাস্ত্রদ্রোহীদের রক্তে ইউরোপের মাটি রক্তাক্ত করে তুলেছিল—সেই সময় ইবনে রুশদ তাঁর দর্শন দিয়ে পরকালকে একেবারে অস্বীকার করলেন। তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন আত্মা নশ্বর সুতরাং এ জগতকে অবহেলা করে শাস্ত্রানুসরণ করলেও পরকালে সুখ পাবার সম্ভাবনা নেই। জড়কে তিনি অবিনশ্বর বলে ঘোষণা করলেন। খোদা সম্বন্ধে

বললেন—তিনি সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জড় ও প্রাণীর সমষ্টিই খোদা। ইবনে রুশদের দর্শন ধর্মধ্বজীদের বেশ একটু চিন্তিত করে তুলল। যে পরকালে সুখ পাবার আশায় ইহকালের সকল উন্নতিকে অবহেলা করে তাঁরা কায়মনোবাক্যে শাস্ত্রানুশীলন করে-চলেছিলেন সেই পরকাল যদি না থাকে, আর জড় যদি অবিনশ্বর হয়, তবে জড়ের চিন্তাকে একেবারে ত্যাগ করে পরকালের ভাবনায় বিভোর হয়ে তাঁরা তো ভাল কাজ করেননি। এভেরোসের দার্শনিক মতবাদ কয়েকজন বুদ্ধিমান লোকের ভেতরে প্রশ্ন জাগিয়ে দিলে। ইটালি ও ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে তাঁর চিন্তা নতুন রূপ নিয়ে সমগ্র ইউরোপে ছড়িযে পড়ল। ইউরোপ অন্ধানুবর্তিতা ছেড়ে জিজ্ঞাসা করতে শিখলে। জ্ঞানানুশীলন তার কাছে বড় হয়ে উঠল। ফলে শাস্ত্রদ্রোহী যেকোনো মতকে আর সে চেপে মারতে অগ্রসর হলো না।

কিন্তু ইবনে রুশদের নিজ সমাজে তাঁর লাঞ্ছনার আর সীমাপরিসীমা রইল না। তাঁর নিন্দা ও কুৎসায় স্পেনের আকাশ বাতাস ভরে গেল। ইবনে রুশদ তখন নিজকে বাঁচাবার জন্যে এক অদ্ভুত মত প্রচার করলেন। তিনি পরস্পরবিরোধী শাস্ত্র ও দর্শন উভয়কেই সত্য বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই ঘোষণাতেও কোনো ফল হলো না। স্পেনীয় খলিফা তাঁকে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এমনিভাবে সক্রেটিস থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত মানুষের কল্যাণকামী কত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ যে লাঞ্ছিত হয়েছেন তার হিসেব করা বড় কঠিন। কিন্তু রক্ষণশীলতা মানবপ্রগতিকে যুগে যুগে এমনিভাবে শত বাধায় প্রতিহত করতে চাইলেও তার জয় হয়নি। জয় হয়েছে প্রগতির জয় হয়েছে জীবনের। জড় ও জীবনের এই অনন্ত যুদ্ধে জীবন আদিকাল থেকেই জড়ের ওপর আধিপত্য করে আসছে। মানুষের বুদ্ধি সকল বন্ধনকে অতিক্রম করে কোন ফাঁকে অসীমের পথে যাত্রা করেছে জড়ের কোনো সতর্ক দৃষ্টি তার সন্ধান পায়নি।

রক্ষণশীল প্রবৃত্তির মূলে আছে শাস্ত্রে বিশ্বাস। শাস্ত্র মানুষের কর্মজীবনকে অনন্তকাল একইভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত জীবনকে একই নিয়মের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধতে চায়। কিন্তু মানুষের অন্তর চায় বৈচিত্র্য, কর্মে ও জ্ঞানে বৈচিত্র্য, জীবনোপভোগে বৈচিত্র্য। সমগ্র প্রকৃতি এই বৈচিত্র্যের নিয়মকেই মেনে চলেছে। এই প্রকৃতির নিয়মকে অবহেলা করে শাস্ত্র যখন মানুষের অন্তরকে চিরাচরিত নিয়মে বেঁধে ফেলতে চায় এবং এই নিয়ম পালনের অভ্যাস যখন স্থিতিশীল হয়ে ঘাড়ে চাপে, জীবন তখন হয়ে ওঠে এক এক ঘেয়ে কর্মকোলাহল—এক আনন্দহীন চলচ্চিত্র। মানুষের মুক্তবুদ্ধি তাকে এই যন্ত্র জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে একদিকে যেমন এনে দেয় বৈচিত্র্য অন্যদিকে আবার তেমনি গোড়ায় পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্বের সঙ্গে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার সামর্থ্য। এই মুক্ত বুদ্ধিকে পীড়ন করে ধ্বংস করতে চায় যে অন্ধ বিশ্বাস সে যে কত বড় অকল্যাণকর তা ভাল করে ভেবে দেখবার বিষয়।

মুসলমান শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে। যে সময় এই শাস্ত্র প্রথম প্রচলিত হয় তখনকার দিনে জীবনের যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশিত ছিল সেগুলোকে অভ্যাস করে মানুষ যে নিজদের জীবনকে অধিকতর উন্নত ও সম্পদশালী করতে পেরেছিল তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু তখনকার মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর আজকের মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতরে পার্থক্য এত বেশি যে এখনো সেই প্রাচীন অভ্যাসকে স্থায়ী করে রাখলে মানুষের অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণের কোনো সম্ভাবনা নেই।

মুসলমান সমাজব্যবস্থার মূল কথা সাম্য। শাস্ত্র এই সমাজের সভ্যদের কার্য বিধিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছিল যা পালন করলে মানুষে মানুষে ভেদ বৈষম্য ঘটতে পারত না। ভেদের একটি প্রধান কারণ আর্থিক বৈষম্য। বুদ্ধির তারতম্যের জন্যও বৈষম্য ঘটে কিন্তু এই বুদ্ধির পার্থক্যের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে আর্থিক সমস্যা। প্রচুর খাদ্য ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য না পেলে মানুষের বুদ্ধি বিকশিত হয় না। খাদ্য ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের মূল অর্থ। এই আর্থিক বৈষম্য থেকেই অন্য সবরকম বৈষম্য আসতে পারে। তাই শাস্ত্র এই আর্থিক বৈষম্য দূর করতে এমন কতকগুলো নিয়ম বিধিবদ্ধ করে গেল যা পালন করলে সাম্য আপনা থেকেই এসে পড়ে।

ইসলামিক উত্তরাধকার আইনানুসারে পিতার সম্পত্তি পুত্রেরা সমান ভাগ ও কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পায়। এই আইনের লক্ষ্য ছিল, উদ্ধৃত্ত ধনের উত্তরাধিকারী যেন সমাজের অন্য সবার চাইতে বেশি আর্থিক সুবিধে না পায়। পিতার উদ্বৃত্ত ধন এই আইনানুসারে যখন পাঁচছয়টি পুত্র-কন্যার ভেতরে বিভক্ত হয়ে যায় তখন এক এক অংশীদারের ভাগ্যে এত অধিক ধন জোটে না যা দিয়ে সে সমাজের অন্যান্য সভ্যদের চাইতে কিছু সুবিধে করে নিতে পারে। একটি গরিব শ্রমিক আজীবন পরিশ্রম করেও হয়তো ভাল করে দু মুঠো খেতে পায় না। আর একজন শুধু ধনীর গৃহে জন্ম বলেই অতুল সুখসুবিধের অধিকারী হয়। এই অন্যায়কে বাধা দেবার জন্যই ইসলাম সৃষ্টি করেছিল উত্তরাধিকারীদের ভেতরে সমানভাবে ধন বণ্টন ব্যবস্থা। কন্যার ভাগে পুত্রের অর্দ্ধেক অংশের ব্যবস্থা হয়েছিল কারণ কন্যা স্বামীর সম্পত্তিও ভোগ করবে। কন্যা ও তার স্বামী উভয়ের ধন মিলিত হয়ে পাছে সর্বসাধারণের সঙ্গে তাদের আর্থিক অবস্থার খুব বেশি ব্যবধান ঘটায় তাই কন্যার অংশ পুত্রের অর্ধেক করা হলো।

আর্থিক বৈষম্য ঘটাবার আর একটা প্রধান উপায় সুদ গ্রহণ। পৈতৃক উদ্বৃত্ত ধনের অধিকারী সুদ ব্যবসায়ের ভেতর দিয়ে অনায়াসেই আপনার ধন চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়ে চলতে পারে। কিন্তু যার স্বোপার্জিত বা উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া কোনো ধনই নেই শত চেষ্টা করেও তার ও সুদী ব্যবসায়ীর ভেতর আর্থিক বৈষম্য

দূর করতে পারে না। তাই এই অন্যায়কে দূর করতে ইসলাম সুদকে হারাম বলে অভিহিত করলে।

এই সমস্ত সতর্কতার পরও যদি কোনো মানুষের ধন এত বেড়ে যায় তাতে তার সঙ্গে সর্বসাধারণের একটা বড় রকমের ব্যবধানের সৃষ্টি হতে পারে তবে তার জন্য ইসলাম জাকাতের ব্যবস্থা করল। তার আয়ের শতকরা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা গরিবদের বিলিয়ে দিতে হবে এই হলো ব্যবস্থা। জাকাত দানের ফলে ধনীর আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ কমে যাবে এবং সেই ধন দরিদ্রের ভিতরে বিতরিত হওয়ায় তাদের অবস্থাকে কতকটা ভাল করে তুলবে, কালে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান অনেকটা কমে যাবে এই ছিল শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য।

৭০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে যখন এই নিয়মগুলো প্রবর্তিত হয় তখনকার মানুষের অবস্থানুসারে এগুলো যে বিজ্ঞানসম্মত ছিল সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তারপর আজ প্রায় দেড় হাজার বছর কেটে গেছে। এর ভেতরে মানুষের অবস্থা যে কত দিকে কত পরিবর্তন হয়েছে সেইটে একবার হিসাব করে দেখা যাক।

অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজগতে যুগান্তর উপস্থিত হল। সেখানে বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে অনেকগুলো যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন। যেমন ওয়াটের স্টিম এঞ্জিন তার ভেতরে অন্যতম। ওয়াটের এই আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন রেলগাড়ি ও স্টিমার সুলভ হয়ে উঠল অন্যদিকে আবার তেমনি একঘেয়ে শ্রমিকের কাজ যন্ত্রে সম্পাদন করবার সুবিধে হলো। বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্পেও নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হলো অনেক। যন্ত্রের তৈরি জিনিষ হাতের তৈরি জিনিষের চেয়ে অনেক সস্তা দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয়, কারণ যন্ত্রে কোনো কিছু তৈরি করতে সময়, পরিশ্রম ও খরচ অনেক কম প্রয়োজন হয়। সুতরাং যন্ত্রশিল্প এক এক করে কুটিরশিল্পকে উচ্ছেদ করতে লাগল কিন্তু একটি যন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বা কারখানা খোলায় অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অভাবকে দূর করবার জন্যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হলো। ব্যাঙ্কে সমাজের অধিকাংশ সভ্যের উদ্বৃত্ত অর্থ এসে জমা হতে লাগলো এবং এই অর্থ কারখানায় খাটিয়ে অথবা কর্জ দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে বেশি হতে থাকল। কালে অতি অল্প দিনের ভেতরেই অনেকগুলো লক্ষপতির সৃষ্টি হলো। খ্রিস্টান ধর্মে পৈতৃক সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন অন্য কারো পাবার অধিকার না থাকায় লক্ষপতির পুত্র লক্ষপতি হয়ে জন্মগ্রহণ করলে, তারপর সে আপন শক্তিতে সেই ধন বাড়িয়ে কোটিপতি হয়ে দাঁড়াল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া অন্য সবাই পিতৃধনে অধিকার না-থাকায় অথচ পিতৃগৃহে যে-সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি পেয়েছে সেই খ্যাতি বজায় রাখবার প্রেরণায় অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে ধনোপার্জনে প্রবৃত্ত হলো। অর্থ যতই বেড়ে চলল ততই নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, নতুন

আবিষ্কার ও মানুষের সুখসুবিধে বাড়তে লাগল। এক কথায় গোটা সমাজের আর্থিক উন্নতি দ্রুত অগ্রসর হলো। শিল্পের এই উন্নত প্রণালী ইউরোপের খ্রিস্টান জগতে অতি অল্পকালের মধ্যেই গ্রহণ করলে এবং তাদেরও আর্থিক অবস্থা আগের চাইতে ঢের উন্নত হয়ে গেল।

কিন্তু মুসলিম জগৎ মানুষের এই নতুন সৃষ্টিকে গ্রহণ করতে পারলে না। সে খুলে বসলে জীর্ণ শাস্ত্রের পাতা সেখানে দেখলে লেখা রয়েছে সুদ হারাম আর পৈতৃক সম্পত্তি সমানভাবে উত্তরাধিকারদের ভাগ করে দিতে হবে। সে একবারও দুনিয়ার নতুন আবহাওয়ার দিকে তাকালে না, অর্থ না হলে যে, বেঁচে থাকাও সম্ভব নয় সে কথা ভাবলে না। ফলে দাঁড়াল এই যে, যে সাম্য স্থাপনের জন্য শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল সেই সাম্য মুসলমানদের ভেতরে বজায় রইল কিন্তু মুসলমান আর পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানের ভেতরে ব্যবধান হলো আকাশ পাতাল। মুসলমান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করলে না, কারণ সুদ হারাম। তার উদ্বৃত্ত ধন বাড়ল না। সুতরাং কলকারখানা সৃষ্টি হলো না। অন্যদিকে লক্ষপতি পিতার ধন চারিপুত্রের বিভক্ত হয়ে এক এক জনকে পঁচিশ হাজারীতে পরিণত করল। পুত্র সবাই পিতার সমান অংশ পাবে মনে করে পরিশ্রম করা কেউ বড় প্রয়োজন মনে করল না। রেল, স্টিমার প্রভৃতিতে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে এক দেশ থেকে অন্য দেশে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি হতে লাগলো। যন্ত্রের তৈরি সস্তা জিনিষ সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়লো। যন্ত্রের তৈরি সস্তা জিনিষ সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়লো। কুটির শিল্পী মুসলমানের জিনিষ বেশি দামে আর কেউ কিনলে না। ব্যবসার ক্ষেত্র তাকে ছাড়তে হলো। কৃষিক্ষেত্রেও মুসলমান বিশেষ সুবিধে করতে পারলে না। কারণ বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীর কৃষি এক সঙ্গে অবিভক্ত অনেক জমি না হলেও প্রচুর অর্থ না থাকলে সম্ভবপর হয় না। ব্যাঙ্কের অভাবে মুসলমানের অর্থ সঞ্চিত হোল না আর উত্তরাধিকার আইনের ফলে তার জমি অংশীদারদের ভেতরে বিভক্ত হয়ে খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে গেল। সুতরাং কৃষিতেও তাকে হঠতে হলো। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় ও অর্থাভাবে সে কালোপযোগী যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে পারলে না। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী তার রাজ্য অধিকার করে বসলে। বিধর্মীরা তাদের নিজের আইন দিয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলে। মুসলমানের জাকাত দান বা সুদ গ্রহণে তারা বাধা দিলে না। অনেক মুসলমান সুদ গ্রহণ করতে লাগলে, অনেক জাকাত দান বন্ধ করে দিল। মুসলমান সমাজে যে সাম্য ছিল তাও এবার নষ্ট হলো। এমনি করে ধীরে ধীরে রক্ষণশীল প্রবৃত্তি ও শাস্ত্রসম্মত প্রাচীন অভ্যাসের অভিশাপে মুসলমান এক এক করে রাজ্য হারালে, ধন হারালে, মান হারালে এবং সবশেষে তার যে অতি প্রিয় সাম্যের আদর্শ তাও হারালে,—পরে রইল শুধু ধর্মের পুঁথি আর অশিক্ষিত অনাহারক্লিষ্ট ভিক্ষুকবেশী মুসলমান।

কিন্তু এতেও তার পতনের শেষ হলোনা। সেই দেড় হাজার বছর আগের জীর্ণ শাস্ত্র পৃষ্ঠে বহন করে আবার সে চলতে চেষ্টা করলে। সে ভাবলে 'ইহকাল ত হারিয়েছি—ক্ষতি নেই—কিন্তু পরকাল আমার নেবে কে?'

মুসলমানের এই পরকাল পথযাত্রায় হঠাৎ বাধা দিলে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মহাযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ তার যন্ত্রের আঘাত দিয়ে জাগিয়ে দিলে মুসলিম জগতের যুবক মন। তুরস্কে আনবর ও কামাল বুঝলে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বদলে গেছে এখন আর ৭০০ খ্রিস্টাব্দের বিজ্ঞান দিয়ে বাঁচা চলবে না। আজ চাই নতুন বিজ্ঞান নতুন সৃষ্টি নতুন অস্ত্র। যৌবনজলতরঙ্গ উছলে উঠল। উচ্ছ্বসিত বারির আঘাতে যত জীর্ণ সংস্কারের স্তূপ এক এক করে ভেসে গেল, থেকে গেল শুধু তাজাপ্রাণ নব্যতুর্কী। নতুনের সাধনা হলো এই যুবক তুর্কীর সাধনা। তাই ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সে সহজ করে দিলে মুক্তবুদ্ধির জয়যাত্রা।

ভারত তখনো অবাক হয়ে এই যৌবন সাধনা দেখছিল আর শাস্ত্রের পাতা উল্টিয়ে খুঁজছিল এই তরুণের অভিযান শাস্ত্রের কত পরিচ্ছেদের কত বিধি অনুসারে হলো। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেল জীবন আর একবার স্থিতিশীলের উপর জয় লাভ করলে।

মানুষের সুখের পথে প্রকৃতি কত যে বিঘ্ন ছড়িয়ে রেখেছে তার সীমা-পরিসীমা নেই। সে চায় এক আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করতে যেখানে মানুষে মানুষে কলহ নেই—সাম্রাজ্যবাদীর নিষ্পেষণে অধীন দুর্বল জাতির ক্রন্দন নেই—ধনিকের স্বর্ণরথের চক্র নিষ্পেষণে শ্রমিক আত্মার আর্ত হাহাকার নেই—মৃত্যুর শীতল স্পর্শে জীবনের শুষ্কতা নেই? তাই সে তার মুক্ত বুদ্ধি প্রভাবে নতুন করে রাষ্ট্র গড়ে, সমাজ পত্তন করে, রাসায়নিক বিজ্ঞানাগারে দিনের পর দিন অবিরাম গবেষণা করে চলে—বিরাট যন্ত্রদানব কোলাহল-মুখরিত যক্ষপুরী রচনা করে। কিন্তু তবু কোথা হতে তার সকল প্রয়াস সকল সাধনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আসে অমঙ্গল, আসে মৃত্যুর কুহেলি-ঢাকা নিদ্রালসস্পর্শ।—জীবন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যায় তার যত আয়োজন যত স্বপ্ন সব লুকিয়ে যায় এক ব্যর্থতার কালো পর্দার অন্তরালে। এইখানে এসে মানুষ তার নিজের বুদ্ধিতে নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হারায়। সম্মুখে চেয়ে দেখে এক বিপুল দুর্ধর্ষ শক্তি অনতিক্রমণীয় যার ক্ষমতা আর দুর্বোধ্য যার কৌশল! মানুষের উচ্চশির নুইয়ে পড়ে। বিরোধের পথ ছেড়ে এইবার সে কেঁদে উঠে বলে, 'ওগো প্রভু! ওগো অজানিত অনতিক্রমণীয় দুর্ধর্ষ শক্তি! রক্ষা করো, রক্ষা করো তোমার ঐ কঠিন আঘাত থেকে!' এই দুর্বলতা থেকেই পরকালের চিন্তা ইহকালের চাইতে তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। আবার সৃষ্টি হয় শাস্ত্র। আবার আসে রক্ষণশীলতা, আবার আসে জীবন ও জড়ের যুদ্ধ, গতি ও স্থিতির শক্তিপরীক্ষা! তাই—মানুষের আর জয় লাভ করা হয় না, সে কোনো এক অজানিত মায়াচক্রে শুধু ঘুরেই মরে ঘুরেই মরে। মানুষের মুক্ত বুদ্ধির প্রয়োজন সবচাইতে যেখানে বেশি সেইখানে এসে সে নুইয়ে

পড়ে তার সকল গর্ব সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়ে ভিখারীর মতো প্রার্থনা করে, 'ওগো আমায় বাঁচাও!'—তার প্রার্থনা কেউ শোনেনা—কিন্তু তার মুক্ত বুদ্ধির আলোকে তার অতি প্রিয় ধরণীকে সে যা নতুন সংগ্রহ দিয়ে যেতে পারত, যা পেয়ে তার বংশধরগণ তার চাইতে অন্তত অধিক সুখী হতে পারত, তার সেই অমূল্য দানও অতিমানবীয় শক্তির কাছে প্রার্থনার ভেতরে ডুবে যায়। Russell তাই বলেছেন : মানুষের এই অবস্থায় তার উচ্চশির ও স্বাধীন চিন্তাকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন 'a Spirit of fiery revolt of fierce hatred of gods.'—কিন্তু দুর্বল মন যে সহায় খুঁজে মরে—সে কি নিয়ে জীবনের পথে যাত্রা করবে?

ঘন কুয়াশা-ঘেরা অথৈ সাগরে ভাসমান মানব-জীবনের ক্ষুদ্র আশ্রয়-ভেলা—চারদিকে তার বিরাট অন্ধকার! মাঝে মাঝে কোনো তুষার গহ্বর থেকে ভেসে আসে মৃত্যুর শীতলস্পর্শ, ছুঁয়ে যায় জীবনের দীপ, কত জীবন নিভে যায়—আর জীবিতদের বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে! চারদিকে সিন্ধুর অশ্রান্ত গর্জন—তার ক্রোধদীপ্ত কলকলকল উচ্ছল গতি অথচ কেউ নেই—মানুষের এ অনন্ত বিপদে কেহ নেই যে তাকে আলো ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়! একটি ক্ষুদ্র দীপ মাঝেমাঝে মিট মিট করে জ্বলে—মানুষেরই হাতে—তার জ্ঞানের দীপশলাকার। পথ দেখা যায় যায় না—দীপ আবার নিভে যায়। আবার সেই ঘন অন্ধকার—আবার সেই বিভীষিকা—আবার সেই সিন্ধুর ভয়ানক গর্জন!

মাভৈ—দীপ নেই—না-ই থাক, আলো না জ্বলে নাই জ্বলুক, তবু আছে মন, আছে তার সৃষ্টিক্ষমতা, আছে তার স্বচ্ছন্দ গতি। তার যতটুকু আয়ু তারি ভেতরে সে গড়বে। অন্ধকারের ভেতরেই আলোর সৃষ্টি করবে, এই অনন্ত দুঃখের ভেতরেই আনন্দের মেলা বসিয়ে দেবে, জীবনের প্রতি পরাজয় থেকে সৌন্দর্য আহরণ করে এক বিপুল আনন্দের মন্দির রচনা করবে, আর সেই মন্দিরচূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতির আঘাতকে নিষ্ঠুর উপহাস করবে। এইখানেই মানুষের প্রকৃত জয়।

আনন্দের এই মন্দির রচনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ আর্ট এবং জীবনের Tragedy থেকেই এর সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতেই মানুষের মুক্তি এতেই তার জীবনের সার্থকতা।

'Of all the arts tragedy is the proudest, the most triumphant; for it builds its shining citadel in the very centre of the enemy's country; within its walls the free life continues, while the legions of death & pain & despair & all the servile captains of tyrant fate, afford the burghers of that dauntless city new spectaelcs of beauty.'

বাংলা সাহিত্যের চর্চা

কাজী আবদুল ওদুদ

সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা কিছু বলতে যাবেন তাঁরা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবেন সাহিত্য-তত্ত্ব, অর্থাৎ রস কি কাব্য কি কবি কে এইসব, আমাদের দেশের পাঠক-সাধারণ এ আশায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু লেখক-সাধারণ দুঃখের সহিতই জানেন, সংস্কৃত অথবা ইংরেজি বচনোদ্ধার তাঁরা যতই করুন কাজটি আসলে বড় শক্ত—হয়তো বা অসম্ভব।—তা হোক না খুব শক্ত, এমনকি অসম্ভব-ঘেঁষা, তবু সাহিত্যিকদের এই সাহিত্যতত্ত্বরূপী স্বর্ণ-মৃগের পশ্চাদ্ধাবন অসঙ্গত বা অশোভন নয়, কোনো স্বর্ণমৃগ আয়ত্তের বহির্ভূত হতে পারে কিন্তু তাকে উপলক্ষ করে যে প্রয়াস যে দুর্ভোগ যে অন্তর্দাহ তার ভিতরে পুটপাক হয়ে কোনো অমৃত তাঁদের জন্য উচ্ছলিত হবে কিনা কে জানে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য বিষয়টি আরো কিছু জটিল। সত্য বটে এমন কিছু চিন্তা-ভাবনা কিছু রূপাঙ্কন বাংলা সাহিত্যে আমরা পেয়েছি যা অমৃতমাখা মানুষের চিত্তের জন্য এক উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু তার পরিমাণ ও রকমারিত্ব এখনো বড় কম—এত কম যে তাই থেকে সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে নব নব প্রেরণালাভ অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য নিঃসন্দেহ। ইংরেজি প্রভৃতি সাহিত্যে যাঁরা কাব্যজিজ্ঞাসু তাঁরা তাঁদের অনুসন্ধিৎসা শুধু ইংরেজি সাহিত্য-ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখেন না, কিন্তু সেই সাহিত্যই যে তাঁদের মুখ্য প্রেরণাস্থল সে সম্বন্ধে বাক্যব্যয় বোধ হয় অনাবশ্যক! তাছাড়া ইংরেজি ভিন্ন অন্যান্য যে-সব সাহিত্য থেকে তাঁরা উপকরণ সংগ্রহ করেন, যেমন গ্রীক ও রোমক সাহিত্য, সে-সবের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধ এত নিকটবর্তী যে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তেমন নিকট সম্বন্ধ কোনো সাহিত্যের অথবা কোনো কোনো সাহিত্যের সেইটিই একটি বড় অনুসন্ধানের বিষয়।

কথাটা কারো কাছে অদ্ভুত শোনাতে পারে, কেননা বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণই যে বেশি শুধু তাই নয়। তবু এ কথাটা বাস্তবিকই অদ্ভুত নয়। মধুসূদনের আগেকার যে বাংলা কাব্য, যেমন ভারতচন্দ্রের অথবা বিদ্যাপতির কাব্য ও কতকাংশে চণ্ডীদাসের কাব্য, বলা যেতে পারে, মুখ্যভাবেই হোক আর

গৌণভাবেই হোক, সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব তার উপর বেশি। কিন্তু মধুসুদন থেকে বাংলার যে নব সাহিত্যের সূত্রপাত তার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় কি? নবসাহিত্যের, সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ তেমনই প্রচুর, হয়তো বা প্রচুরতর, সংস্কৃত শব্দালঙ্কার সংস্কৃত দার্শনিক পরিভাষা এসবও বাংলায় নব সাহিত্যের রথীদের প্রীতির সামগ্রী, কিন্তু এসব, যাকে বলা হয়, বাইরের সাজসজ্জা, ভেতরকার আসল কবি-মানুষটি যে বদলে গেছে।

কথাটা আরো কিছু পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে। কালিদাস-ভারবি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিদের আর্থিক অভাব-অভিযোগের তাড়না ভোগ করতে হতো কি না সে তত্ত্ব আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু তাঁদের কাব্যের ভিতরে যে চিত্ত প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায় সেটি বড় শান্তিপূর্ণ-উদ্বেগরহিত! অর্থাৎ, ধর্ম সমাজ ইহকাল পরকাল ইত্যাদি নিয়ে মানুষের চিত্ত যে সময় আন্দোলিত হয়—এ কালের মানুষ এ আন্দোলনের হাত থেকে যেন আর নিষ্কৃতিই পাচ্ছে না—এইসব সংস্কৃত কবি সে বিক্ষোভ দ্বারা যেন অস্পৃষ্ট। কিন্তু মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—আমাদের একালের সাহিত্যের দিকপাল—এঁদের মনোজীবনের সে আরাম কোথায়। সত্য বটে মধুসূদনের জীবন বহু বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হলেও তাঁর কাব্যের মর্মকোষে যে চিত্তটি বিরাজ করছে সেটি প্রসন্ন—ঠিক আনন্দ না হলেও শান্তি-পূর্ণ। কিন্তু তাঁর যে নব-আবিষ্কৃত ছন্দলোক—কত অভিনব সামগ্রী সেই বিরাট হার্মনি! কত বিক্ষোভ কত দুঃখ কত প্রেম কত মাধুর্য তাকে এই অপরূপতা দান করেছে! মধুসূদন নিজে বলেছিলেন গ্রীক দেবদেবীদের তিনি পরিয়ে দেবেন হিন্দু দেবদেবীর পোষাক,—কত নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে তাঁর এই উক্তির সার্থকতা লাভের ভিতরে তাই-ই ভাববার বিষয়।

আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটিতে বাল্মীকির কবিপ্রেরণা লাভ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়? ...

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে এই কথাই বারবার আমাদের মনে হয়। একাধারে এঁরা কবি, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, ভাষা-সংস্কারক, ধর্ম-সংস্থাপক।—আর তাও অজ্ঞাতসারে নয়, সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—হৃদয়রক্ত নিঃশেষিত করে।

কাব্য সম্বন্ধে সেকালের সংস্কৃত উক্তি—কাব্যং বশনে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতরে, —আর একালের বাংলা উক্তি :

কত প্রাণপণ,— দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,—
জানো কি বন্ধু উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি?

এই দুই কাব্য-জগতের যে ব্যবধান তা শুধু বিপুল নয়, কোনো কোনো দিক দিয়ে হয়তো বা দুর্লঙ্ঘ্য।

এই জন্য শান্তি নয় সংগ্রাম-ধর্মী যে ইউরোপীয় সাহিত্য তার সঙ্গে মিলিয়ে বাংলার নব সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করতে আমাদের কোনো কোনো সমালোচক যত্নপরায়ণ দেখতে পাওয়া যায়। এখানেও মুশকিল কম নয়। ইউরোপীয় সাহিত্য ইউরোপবাসীর কাছে এক জীবন্ত ব্যাপার। সেই জীবনের প্রয়োজনে সেই সাহিত্যের, অর্থাৎ কাব্য ও কাব্যজিজ্ঞাসা দুয়েরই, আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন সেখানে হচ্ছে। এত দূর থেকে সেই জীবন ও পরিবর্তন প্রবাহের সমঝদারি আমাদের জন্য খুবই দুরূহ সন্দেহ নাই! তাই ইউরোপীয় সমালোচনাশাস্ত্র নিয়ে আমাদের ভিতরে যাঁরা কিছু ব্যস্ত সমস্ত ইউরোপের সেই অনুদিন-বর্ধমান কাব্যজিজ্ঞাসার পরিবর্তে অনেক সময়েই যে তাঁদের লাভ হবে বিভিন্ন ধরনের কিছু কিছু 'কোটেশন', তা অস্বাভাবিক বা অসাধারণ কিছু নয়।—কিন্তু এর অসাধারণত্বও আছে—এই 'কোটেশন' সমালোচনাও মাঝে মাঝে বাংলা সাহিত্যে ভীতির সঞ্চার করে এসেছে।

কিন্তু বলা যেতে পারে, ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে একালের বাংলা সাহিত্যের মিল যখন বেশি তখন যতটা সম্ভব ইউরোপীয় কাব্যজিজ্ঞাসার মূল সূত্রগুলি আয়ত্ত করা ভিন্ন আমাদের নব সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করবার আর কি মানদণ্ড আছে? বলা বাহুল্য, আমাদের অনেক সমালোচকেরই মোট বক্তব্য এই—যদিও সত্যকার সাহিত্যরসিকদের বুঝতে একটু দেরি হয় না এই মনোভাব কত হেয়। এ হচ্ছে অনুকরণের মনোভাব,—আর অনুকরণ করে যেমন কবি হওয়া যায় না, অনুকরণ করে তেমনি কাব্যজিজ্ঞাসুও হওয়া যায় না। সত্য বটে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট আমাদের নব সাহিত্য। কিন্তু সেই প্রভাবের কথাই তো এর সবখানি কথা নয়। বরং প্রকৃত কথা এই—এক ভিন্ন পরিবেষ্টনে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট এই সাহিত্য। এই অভিনবত্বটুকু না বুঝলে একালের বাংলা সাহিত্যের কিছুই বোঝা হয় না।

যাঁরা একালের বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা তাঁরা যে এই অভিনবত্বের জন্য বিশেষ ভাবে বেষ্টিত ছিলেন তা নয়। মধুসূদন তো ইউরোপীয় কাব্যকলা বরণ করেছিলেন প্রাণের দোসর রূপে। কথিত আছে, তাঁর স্ত্রীর কণ্ঠে ফরাসি গান শুনে তিনি অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। তবু তাঁর রাবণ মেঘনাদ অথবা রাম লক্ষ্মণ সীতা বিভীষণ

হোমরের প্রায়াম হেক্টর অথবা আগামেমনন নেসটর হেলেন ইউলিসিসের অনুকৃতি হয়ে ওঠে নাই। এমনকি এরা ইউরোপীয়ও নয়,—সমস্ত নতুনত্ব সত্ত্বেও এরা সেই এক ধরণের বাঙালি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অবশ্য জাগ্রতভাবে বাংলার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে। কিন্তু জ্ঞাতসারে বাংলার বৈশিষ্ট্যসাধন তাঁরা যতটুকু করতে চেয়েছেন তাঁদের অজ্ঞাতসারে তার চাইতে মহত্তর বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জীবন তাঁদের প্রতিভা থেকে লাভ করেছে।—এই যে আমাদের সৌভাগ্য এর জন্য পর্যাপ্তিবোধ অশোভন নিশ্চয়ই, কিন্তু এ বিষয়ে উদাসীন হয়ে পরধন লোভে মত্ত হলে তা হয় শোচনীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হবে—কি সেই নব বাংলা সাহিত্যের অভিনবত্ব? কি তার স্বরূপ?

এ প্রশ্নের খুবই সন্তোষজনক উত্তর কেউ যদি দিতে পারেন তবু বাংলার অন্যান্য সাহিত্যসেবীর সেজন্য অব্যাহতি মেলে না। তাই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এমন একটা প্রশ্নের অবতারণাই আমাদের জন্য সবচাইতে বড় লাভ। হয়তো এই প্রশ্নের আঘাতেই বাংলার জীবন ও সাহিত্য সমস্যার নব নব দ্বার আমাদের জন্য উদ্ঘাটিত হবে। এর উত্তর বাংলার সাহিত্য-দরবারে, তথা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে, পেশ করতে চেষ্টা করবেন বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁদের শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে। আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা নিবেদন করতে চেষ্টা করব।

শোনা যায়, বাংলাদেশ এক সময়ে জলমগ্ন ছিল। তখন সমুদ্রের তরঙ্গ তার বুকের উপর খেলা করত। সেই তরঙ্গভঙ্গের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে বাংলা নিজেকে প্রকাশ করেছে। বাংলার লোকদের জীবনেও তেমনি বহুবার বহু ভাব-প্লাবন এসেছে। আর্য দ্রাবিড় কোল মঙ্গল বৌদ্ধত্ব হিন্দুত্ব এসব তো ছিলই, তার উপর এসেছে মুসলমান-প্লাবন তার নবাবী বাদশাহী শরিয়ত মারেফাত এই সব নিয়ে; তার উপর এসেছে ইউরোপীয় প্লাবন তার বাণিজ্য রাজনীতি ফরাসি বিপ্লবের বার্তা খ্রিস্টধর্ম সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে। অবশ্য এমন বৈচিত্র্য যে বাংলারই বৈশিষ্ট্য তা নয়; প্রায় সব দেশেরই ইতিহাস যথেষ্ট বিচিত্র। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এইসব বিচিত্র উপকরণের কেমন এক জৈব মিলন ঘটেছে—এ মিলন সব দেশে সব সময়ে ঘটে না—একালের বাংলা সাহিত্যে ফুটে উঠেছে বাংলার এই নবগঠিত মানসলোকের শ্রী।—বাংলার নব ধর্মাচার্যবৃন্দ নব সাহিত্য-রথিবৃন্দ এঁদের সবারই জীবনে প্রাচী-র ও প্রতীচীর বিচিত্র সাধনার সমাবেশ ঘটেছিল বাংলার শিক্ষিত লোকেরা তা জানেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের কাছে এই সমাবেশ বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ এইজন্য যে এতে এই অগ্রণীদের জীবনই এক আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত হয় নাই; বরং এঁদের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞাপিত হয়েছে সমগ্র বাঙালি জীবনের জন্য এক নব সূচনা; এঁরা যেন পর্বতশীর্ষ—নব প্রভাতের সুপ্রসন্ন আশীর্বাদে প্রথম উজ্জ্বলিত এঁদের ভালদেশ।

বলেছি, এই বৈশিষ্ট্য সাধনের জন্য খুবই চেষ্টিত আমাদের মনীষীরা যে হয়েছিলেন তা নয়। এমনকি তাঁরা অনেক সময়ে কেমন করে যেন একে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। তিনি ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিন্দুধর্মের স্থান নির্দেশ করেছেন সব ধর্মের উপরে। কিন্তু বেদের বহু উর্ধ্বে তিনি যে গীতার স্থান নির্দেশ করেছেন এতেই তাঁর হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দুর ভক্তির চাইতে সংশয় জাগায় বেশি। তেমনিভাবে তাঁর প্রফেট স্টেটসম্যান ও বৈজ্ঞানিক-বিচারে-পূর্ণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত হিন্দুর বিস্ময়ের সামগ্রী। অথচ এসব বঙ্কিমচন্দ্রের খেয়ালী সৃষ্টি নয়; তাঁর জিজ্ঞাসায় তীব্রতা যথেষ্ট।—তাঁকে যদি বলা হয় কঁৎ-স্পেন্সার-মিল্-বেন্থামের হিন্দুবেশী শিষ্য তাতেও ঠিক কথাটি বলা হয় না; কেননা এইসব পাশ্চাত্য মনীষীর মতো পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতা তাঁর বড় লক্ষ্য নয়।—আসলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৌন্দর্যবোধ ও অনুসন্ধিৎসা, প্রবল স্বদেশ কল্যাণ-কামনা ও কিছু মোহ, সমস্ত নিয়ে বিশেষভাবে একজন Man of faith—কল্যাণ-জিজ্ঞাসু কর্মী—তাই দেশের জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তাঁর এই আলো ও অন্ধকার উদ্গীরণকারী অদ্ভুতপ্রতিভা থেকেও কিছু নির্দেশ লাভ হয়েছে—কি কল্যাণ, কি পথ, কি গ্রহণীয়, কি বর্জনীয়।

আর রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিভা তাঁর সমসাময়িকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ অনবদ্য বিবেচিত হবে এ স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো কিছুরই পূর্ণাঙ্গতালাভে প্রকৃতির বোধ হয় আপত্তি। তাই পরবর্তীকালের সাহিত্য-রসিকেরা হয়তো দেখবেন, যে-বিশ্বপ্রেমের জন্য এই কবির কোনো কোনো স্বদেশবাসী তাঁর প্রতি অনুরক্ত অথবা বিরক্ত হয়েছেন সেই প্রকাণ্ড বিশ্ব-প্রেমের চাইতে অপ্রকাণ্ড স্বদেশ-প্রেম বা বঙ্গ-প্রেম তাঁর ভিতরে কত নিবিড়! সেজন্য তার প্রতিভা তাঁদের কাছে কম গৌরবের হতে পারত, কিন্তু কবির নিজের ও তাঁর স্বদেশবাসীদের সৌভাগ্য এই যে কবির জন্মগত সত্যের আকর্ষণ মহাজীবনের আকর্ষণ তাঁর সমস্ত আরাম ও তুচ্ছতা-প্রীতির ভিতরে বার বার জয়ী হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই যে সত্যের আকর্ষণের ছবি, এই যে সৌন্দর্যপ্রিয় আরামপ্রিয়, স্বদেশ স্বজাতি ও স্বকালের সঙ্গে নিবিড় স্নেহের যোগে যুক্ত, কবি বারবার উন্মনা হয়ে উঠছেন সত্যের আহ্বানে ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত মোহপাশ অপসারিত করে নতমস্তক হতে পেরেছেন সত্যের সামনে,—এই অপরূপ জীবন-আলেখ্য,—এরই জন্য মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার চাইতে তাঁর প্রতিভা তাঁর দেশ ও জাতির জন্য বেশি অর্থপূর্ণ হয়েছে।

... একটা দেশের লোক বহুকাল ধরে বাস করে আসছিল অনেকখানি জড়ধর্মের ধর্মী হয়ে। সময় সময়ের চিত্তোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও একটা অপ্রবলজীবন অপ্রচুর জীবনায়োজন এই ছিল জগতের সামনে তাদের পরিচয়। সেই জীবনে কোথা থেকে জেগেছে নবসাধ—নব স্বপ্ন! পাড়াগাঁয়ের ব্যাপারি যেন আলাউদ্দিনের প্রদীপের

দৈত্যের সাহায্যে রাতারাতি হয়ে উঠেছে বিশ্বের বন্দরের সওদাগর!—গ্রাম্য সমাজের অন্ধ গতানুগতির পরিবর্তে জগৎ সমাজের সাহিত্য ধর্মতত্ত্ব সৌন্দর্য বিজ্ঞান সমাজনীতি রাজনীতি তার অবলম্বন ও উপজীবিকা! ...

বাংলার সাধারণ জীবনের সঙ্গে বাংলার সাহিত্যের জীবনের এই প্রভেদ।—এই সাহিত্যকে বিশেষিত করা যেতে পাবে idealistic বলে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে idealism-এর সুখস্বপ্ন এর মর্মকথা নয়। এ তার চাইতে বীর্যবন্ত। এ বরং prophetic—বাংলা যা হবে বা তাকে যা হতে হবে তারই সূচনা এতে।—সব ত্যেরই দোষক্রটি থাকে; একালের বাংলা সাহিত্যেরও আছে। হয়তো বড় ত্যের তুলনায় কিছু বেশি আছে। কিন্তু গণনার বিষয় এর ক্রটি নয়, এর প্রাণশক্তি—এর অর্থ ও সম্ভাবনা।—কিন্তু একালের বাংলা সাহিত্যের এই অর্থ ও সম্ভাবনা-জিজ্ঞাসায় বাংলার 'কাব্যরসিক'রা আশ্চর্য ক্ষীণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন!

কিন্তু তাঁদের এত নিন্দা করে লাভ নাই। সমালোচকরা মোটের উপর দেশের পাঠকদের প্রতিনিধি। তাই তাঁদের দোষ তাঁদের একলার দোষ নয়। সে দোষ হয়তো গোটা পাঠক সমাজের।

আসলে ব্যাপারটাও তাই। সত্যকার সাহিত্যিক বোধ ও রুচি বাংলার পাঠকসমাজের খুব কমই প্রসারলাভ করতে পেরেছে। এ ব্যাপারে আশ্চর্যভাবে সফলকাম হয়েছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা নন—আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিকরা। তাঁদের পরিচয়স্বরূপ বলা যেতে পারে, মধুসূদন বলতে তাঁরা বুঝেছেন—পরধর্মো ভয়াবহ, বঙ্কিমচন্দ্র বলতে বুঝেছেন—হিন্দুত্বের পুনরুত্থান, আর রবীন্দ্রনাথ বলতে বুঝেছেন Idealism, Mysticism—অর্থাৎ কিছু কবি-কবি ভাব।

আর এই সাহিত্যসমঝদারি নিয়ে বাংলার পাঠকসমাজ মোটের উপর আরামেই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে আরাম ভেঙে দিতে চাচ্ছে, অথবা দিয়েছে—'অতি-আধুনিক সাহিত্য'।

এই 'অতি-আধুনিক সাহিত্য' বা 'তরুণ সাহিত্য' বাঙালি জীবনে মহা চাঞ্চল্যের সূচনা করেছে। এর প্রশংসা হয়তো এর লেখকদেরই মুখে, তাঁদের বাইরে দুই-চার জন প্রসন্ন পাঠকও হয়তো আছেন। কিন্তু বাদবাকি সমস্ত বাঙালি, লেখক পাঠক নির্বিশেষে, এর উপর অসন্তুষ্ট। তাঁদের এত অসন্তোষের কারণ নির্ণয় কিন্তু খুব সহজ নয়; কেননা 'তরুণ সাহিত্যে'র যে সব অবিচার অনাচারের দিকে তাঁরা অঙ্গুলি নির্দেশ করেন সহজিয়া ও কবি-খেউড়ের বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যে তা পুরোপুরি নতুন নয়। তবে 'তরুণ সাহিত্যিক'দের বড় অপরাধ হয়তো এই যে বাংলার ভদ্র-সাধারণ একটা শতছিদ্রপূর্ণ অথচ ভব্যতামণ্ডিত জীবন নিয়ে কিছু নিরুদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন, 'তরুণরা' সেই ক্ষণভঙ্গুর ভব্যতার আবরণ নিয়ে নেহাৎ অল্পমতির মতো টানাহিঁচড়া আরম্ভ

আমি নিজে 'তরুণদের' সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছুই বলতে চাই না; কেননা, মনে হয়, তা অনাবশ্যক। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির যে বুদ্ধি বিবেচনা নীতি রুচি 'তরুণ সাহিত্যিকরা' মোটের উপর তার চাইতে বেশি ভাল বা বেশি মন্দ নন। 'তরুণদের' নব্য-ইউরোপি-প্রীতি ও অতরুণদের প্রাচীন ভারত-প্রীতি একই মনোভাবের এপিঠ আর ওপিঠ। কিন্তু মনে হয় বাংলার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছে এই 'তরুণদের' চেষ্টাই হবে বেশি অর্থপূর্ণ; কেননা যে ধ্বংস বাংলার সমাজজীবনে অবশ্যম্ভাবী—এবং সেই পথেই হয়তো কল্যাণ—এই 'তরুণদের' প্রচেষ্টায় ফুটতে চাচ্ছে সেই ধ্বংসেরই রূপ। রচনাবিষয়েও এই 'তরুণদের' কারো কারো ভিতরে দেখা যাচ্ছে তাঁদের অতরুণ নিন্দুকদের চাইতে কিছু বেশি শক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে নজরুল ইসলামকে অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। নজরুল ইসলামকেই ধরা যাক। তাঁর রচনা বহুত্রুটিপূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু তাতে আঁকা পড়েছে একটি তাজা মনের অভিমান-উন্মাদনার আশা-আনন্দের ছাপ। অর্থাৎ এ কাব্য-ফুল তাজা গাছের ফুল—হোক না বন্যফুল। কিন্তু এর পাশে দুই-চার জন অতরুণ শিক্ষিত কবির রচনা দাঁড় করালে দেখা যাবে, তাতে না আছে রঙ না আছে গন্ধ। রঙের আভাস যেটুকু লাগে তা প্রলেপ; গন্ধও দুই-এক ঝলক যা পাওয়া যায় তা প্রক্ষেপ;—আসলে এ কাগজের ফুল!

বাস্তবিক, বাংলা সাহিত্যে 'তরুণদের' অবজ্ঞা ও মস্তিষ্কহীনতা আসল সমস্যা নয়; আসল সমস্যা বরং সাধারণ বাঙালি জীবনের জড়তা ও স্বল্পতুষ্টি বা অন্ধতা— তরুণদের পূর্ববর্তী আরামপ্রিয় অকর্মণ্য খেয়ালী কবি ও সমালোচক-নিবহ যার প্রতীক—আর 'তরুণরা' একই সঙ্গে যার ভয়াবহ পরিণতি ও ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া।— এই সাধারণ বাঙালি জীবনের অবাঞ্ছিত চেহারা বদলে দেওয়াই একালের বাংলা সাহিত্যের এক বড় কাজ। কিন্তু এ কাজ এখনো অসম্পন্ন।

প্রাকৃতিক নিয়মে যে-জলধারা পাহাড় থেকে নেমে এসে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্মৃত হয় তারই কূলে কূলে লোকের বসতি জমে, সভ্যতার বিকাশ ঘটে। বাংলার বুকে যে ভাবগঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে তারই কূলে কূলে ফুটবে বাংলার জাতীয় জীবনের শ্রীছাঁদ। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সমস্ত ঔদাসীন্য ও তুচ্ছতাপ্রীতি সর্বান্ত:করণে দূর করে দিয়ে এই ভাবনদী যে আমাদের বহু দেশদেশান্তরের বিচিত্র সম্পদ সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেছে সেই মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হওয়া। এমনিভাবে, শুধু সাহিত্য-চর্চা নয়, ব্যাপকভাবে জীবন-চর্চাতেই আমাদের নবসাহিত্যের প্রকৃত সার্থকতা। আর এইভাবেই আমাদের সমস্ত মুগ্ধতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ও সাহিত্যে আমাদের সমস্ত চেষ্টার real হবার, সত্যাশ্রয়ী হবার, সুযোগ ঘটবে।

Realism কথাটার সঙ্গে বাংলার 'তরুণরা' বেশ পরিচিত। কিন্তু মনে হয় এ কথাটা তাঁরা বুঝতে চাচ্ছেন বেশ খানিকটা বিকৃত করে। মৃত্যু আমাদের পদে পদে, কিন্তু মৃত্যু real নয়, real জীবন যা মৃত্যুকে ডিঙিয়ে চলে। তেমনিভাবে মোহ দুর্বলতা মানুষের পদে পদে, কিন্তু তাই real নয়, real তপস্যা যা মানুষকে সত্যকার মনুষ্যত্ব দান করে। আমাদের দেশের যে খণ্ডিত বিপর্যস্ত রুগ্ন জীবন একে real ধরে নিয়ে নাকিসুরের কান্না-চর্চায় না হয় সাহিত্যচর্চা না হয় জীবনচর্চা।

তাজা ঘোড়াকে জীর্ণ আস্তাবলে পোরায় যে বিপদ, বাংলার মনীষীদের নব-জীবন ও নব-মানবতার সাধনা বাংলার সমাজ-জীবনে হয়তো সেই বিপদের সূচনা করেছে। কিন্তু সেই ঘোড়া বিদায় দিয়ে জীর্ণ আস্তাবলটি যে অটুট রাখবার চেষ্টা হবে সে সময়ও তো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে!

কিন্তু বৃথা এই অস্বস্তিবোধ, বৃথা এই ক্ষোভ। 'এক হাতে এর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার'—এই যে আমাদের একালের সাহিত্য এ আমাদের বিভ্রান্ত করতে আসে নাই, এ প্রকৃতই আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ জীবন real করবার বল ও স্বাস্থ্যসমন্বিত করবার সুন্দর করবার অমোঘ শক্তি এর আছে।—তাই এ যদি এ-কালের বাংলা সাহিত্যিকদের কাছে দাবি করে অকুণ্ঠিত আত্মসমর্পণ, তবে অসম্ভব কিছু দাবি করে না নিশ্চয়ই।

সাহিত্যকে মোটামুটি দুই অংশে ভাগ করে দেখা যেতে পারে—তার সৃষ্টি অংশ ও আলোচনা-অংশ। আমরা এতক্ষণ মুখ্যত বুঝতে চেষ্টা করেছি এ-কালের বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি-অংশ, আর তারই সঙ্গে এও দেখা গেছে যে এই সাহিত্যের সমঝদারি, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-অংশের এক অংশ, খুবই ত্রুটিপূর্ণ।

কিন্তু শুধু আংশিক ভাবে নয়, বরং মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা অংশ যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ—জ্ঞান ও উন্নত রুচির এক প্রকৃষ্ট বাহন এ আজো হয়ে ওঠে নাই।

কিন্তু আলোচনা-অংশ এমনিভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকলে গৌরবান্বিত সৃষ্টি-অংশেরও যে অনেকখানি ব্যর্থতা,—যেমন বায়ুমণ্ডলের কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে সূর্যোত্তাপের সাফল্য। তাই বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-অংশ কিসে দোষমুক্ত হতে পারে সেটি বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য বাস্তবিকই এক সাহিত্যিক সমস্যা। অর্থাৎ, এর উৎকর্ষ বিধানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হবার সময় তাঁদের এসেছে।

Matthew Arnold তাঁর একটি লেখায় ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় ইংরেজি সাহিত্যের দুটি ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর নির্দেশ ইংরেজি সাহিত্যে কতখানি গ্রাহ্য হয়েছে সে বিচারের ভার ইংরেজ সাহিত্যিকদের উপর ন্যস্ত; কিন্তু আমাদের মনে হয়; বাংলার আলোচনা-অংশের উৎকর্ষের জন্য

তাঁর সেই দুটি কথা থেকে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাবে। তাঁর সেই দুটি কথার দিকে বাঙালি সাহিত্যসেবী-মাত্রেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া সঙ্গত। সে দুটি কথার নাম তিনি দিয়েছেন Urbanity ও Clear mind, তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া যেতে পারে ভব্যতা ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা।

ভব্যতা বলতে তিনি বুঝেছেন গ্রাম্যতা ও আতিশয্য বর্জন; অর্থাৎ, লেখক তাঁর কথাগুলো পেশ করছেন এক শিক্ষিত মণ্ডলীর কাছে, কাজেই তাঁর চিন্তায় ও ভাষায় মার্জিত রুচির পরিচয় থাকবে এই সমীচীন।—এই ভব্যতা যে আমাদের সাহিত্যে একান্তই বিরল তা নয়। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ এঁদের রচনায় এর সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে। তবু শুধু সাধারণ বাঙালি জীবনে নয় আমাদের শ্রেষ্ঠদের কারো কারো ভিতরেও (যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র) এই ভব্যতার অসদ্ভাব মাঝে মাঝে সেই একভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে উঠে, জ্ঞান ও রসের আসরে বিভ্রাট ঘটিয়েছে। এই ভব্যতা রচনায় শ্রী ও মাধুর্য বাড়িয়ে দিয়ে তাকে যে কত অর্থপূর্ণ করে তোলে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একে পুরোপুরি আয়ত্ত করবার ক্ষমতাও হয়তো তাঁরই আছে যিনি প্রেমিক, ও জ্ঞানের পথে অকুতোভয়।

এই ভব্যতা-সাধন বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য নিশ্চয়ই খুব সহজ হবে না, কেননা বাংলার প্রচলিত জীবনধারা এর বিপরীত। বাংলার কবি যাত্রা ও একালের থিয়েটার সাংবাদিকতা এ সবের অন্য গুণ যতই থাকুক গ্রাম্যতা ও সংকীর্ণতার প্রাচুর্য এসবের বেশ এক বড় পরিচয় চিহ্ন। কিন্তু কষ্ট-সাধ্য হলেও এ থেকে পেছপাও হওয়ার সময় আমাদের আর নাই। গ্রামের লোক শহরবাসী হলে নাগরিক ভব্যতা আয়ত্ত না করে তার কল্যাণ নাই; আমাদেরও বৃহত্তর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এই ভব্যতা সাধনের।

তারপর পরিচ্ছন্ন চিন্তা। শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনের সকল ব্যাপারেই এই পরিচ্ছন্ন চিন্তার দাম যে কত বেশি এই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার যুগে তা আর নতুন করে বলবার দরকার করে না। কিন্তু আমাদের পুরুষপরম্পরাগত গ্রাম্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচ্ছন্ন চিন্তার এক বড় অন্তরায় হচ্ছে—আমাদের অতীতের মোহ ও বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভয়।

এই অতীতের মোহ আমাদের মনীষীদের জন্যও অপ্রবল ছিল না সত্য, কিন্তু সেই মোহ তাঁদের চিত্ত বন্দি করে রাখতে পারে নাই; রক্তমোক্ষণশীল স্যার ফিলিপ সিডনীর মতো শেষ পর্যন্ত তাঁরা জয়ী হয়েছেন। আর এক হিসাবে এই মোহ ছিল তাঁদের জীবনের এক অলঙ্কার। কিন্তু অল্পশক্তি লোকদের জীবনে এই মোহ মহা অনর্থ ঘটিয়েছে। আমাদের কত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক চিন্তা যে এই মোহের কবলে পড়ে অদ্ভুত দর্শন হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। বাঙালি বাস্তবিকই মুক্ত বুদ্ধির লোক হলে একালের বাঙালির বহু গবেষণা তার হাসিতামাশার প্রচুর খোরাক যোগাতে পারবে।

কিন্তু এই পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সামনে চলার বিড়ম্বনা বহু ভোগ করা হয়েছে। এ পালা এখন চুকিয়ে দেওয়া ভাল। অবশ্য তার জন্য অতীতকে অস্বীকার করবার দরকার করে না, কেননা তা অজ্ঞানতা। আমরা পিতামাতার সন্তান নিশ্চয়ই।—তবে সেই আমাদের একমাত্র পরিচয় নয়।

আমরা অতীত ইতিহাসের সৃষ্টি;—বেশ। কিন্তু আমাদের পরের যে ইতিহাস তার পুরো চেহারা অতীত থেকে ত অনুমান করা যায় না। এমনকি আমাদের অতীতের সত্য পরিচয় পাবার জন্য প্রয়োজন হয় আমাদের পরের ইতিহাস বুঝবার। অর্থাৎ, আমরা বাস্তবিকই নব নব ইতিহাস সৃষ্টি করি, অথবা আমাদের ভিতর দিয়ে নব নব ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। তাই অতীতের বন্ধন আমাদের জন্য অসত্য—মোহ।

এই অতীতের মোহের হাত থেকে উদ্ধার পেলে শুধু সাহিত্যে নয় শিক্ষা স্বাস্থ্য আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সব বিষয়েই আমাদের চিত্ত যে কত সত্য ও কল্যাণ-অভিসারী হতে পারবে, ভবিষ্যৎ ভীতির স্থল না হয়ে কত মোহন স্বর্গের ধাত্রী হবে, একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারা যায়; অথচ এই মোহকে মোহ জেনেও আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বহু মূল্যবান সময় এর পেছনে নষ্ট করি!

উপসংহার Goethe-র একটি উক্তি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—'The great works of art are brought into existence by men, as are the great works of Nature, in accordance with true and natural laws; arbitrary phantasy falls to the ground; there is Necessity, there is God.'—একালের বাংলা সাহিত্যে এই 'প্রয়োজন' এই 'বিধাতৃ-বিধান' অল্প-বিস্তর আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে।—বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এইসব প্রাণপ্রদ জিজ্ঞাসা উত্তরোত্তর আপনাদের গভীরতর চিন্তা-ভাবনার বিষয় হবে, আশা করি।

তরুণ আন্দোলনের গতি

আবুল ফজল

মানুষের জীবনে—শুধু মানুষের কেন,—প্রত্যেক জিনিষের জীবনে সৃষ্টি হইতেছে বড় কাজ।—বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়। প্রত্যেক জীবন্ত জিনিষ এই নতুন সৃষ্টির দুঃসাধ্য সাধনে মশগুল। যেখানে কারণে বা অকারণে সৃষ্টির দরজা বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে বলিতে হইবে। ব্যক্তির জীবনে যাহা খাঁটি, জাতির জীবনে তাহা আরও ব্যাপকভাবে খাঁটি। একদিন নব নব সৃষ্টির সাধনায় মানুষের চিন্তারাজ্যে গ্রীকেরা প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে; প্রাচীন ভারতের আর্যসভ্যতা মানুষের মনোরাজ্যে জ্ঞান পরিবেশন করিয়া গিয়াছে, আরব ও পারস্যের সংমিশ্রণে যেই অপূর্ব সারাসিন সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল, তাহা বহু শতাব্দী ধরিয়া মানুষের চিন্তাধারার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। কিন্তু নব নব সৃষ্টির দীপ-শিখাকে কেহই নিত্যকালের জন্য সজাগ রাখিতে পারে নাই। তাই সকলের মরণ আসিয়াছিল,—দেহে না হইলেও মনেতে বটে।

আজ ইউরোপ আমেরিকা বিশ্বের মনোরাজ্যের প্রভু। ইহা শুধু গায়ের জোরে নয়—নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার নব নব সৃষ্টিতে। গায়ের জোরে মানুষের দেহের প্রভু হওয়া যায় মনের নয়। আজ দেহে মনে আমরা ইউরোপের বন্দি। জীবনের গতিপথ নির্দেশের জন্য আমাদিগকে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হয় পশ্চিমের দিকে। নতুন সৃষ্টির জন্য যে অপরিসীম সাধনা, যে নির্মম বেদনা ও কৃচ্ছ সাধনার দরকার, তাহা করিবার শক্তি যেন আমাদের নাই। আমরা দেহমনে দুর্বল—কিন্তু দেহের চাইতে মনে ভয়ানক দুর্বল। মন আমাদের বেদনা সহ্য করিতে অক্ষম—কাঁটাপথে চলিতে শক্তিহীন। আজ ইউরোপ কী দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী। তাহারা আজ সাগরে ডুব দিতে দ্বিধাহীন, আকাশে উড়িতে সঙ্কোচহীন, হিমালয়ের চড়া লঙ্ঘন করিতে দৃঢ়সংকল্প। কৌতূহল, বিচার (Experiment) ও সাধনা এই তিনটি জিনিষ নতুন সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য। এই তিনটি জিনিষের উপর ভর দিয়া আজ পশ্চিম বিশ্বজয়ী। পশ্চিমের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি এই তিনটি জিনিষকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া কত মানুষ সাগর সাঁতরাইয়া মরিতেছে, পাহাড় জঙ্গলে ঢুকিয়া হিংস্র জন্তুর আহার্যে পরিণত হইতেছে। আকাশে ভূ-প্রদক্ষিণ করিতেছে—এই সেদিন আটলান্টিক 'নন-

স্টপ' উড়া দিতে যাইয়া কত মানুষ মরিল। পদব্রজে, সাইকেলে, মোটরে, ট্রেনে কত প্রকারে আজ পশ্চিম পৃথিবীটাকে নাড়িয়াচাড়িয়া বিচার করিয়া দেখিতেছে। ইহাতে বহু মানুষের জীবন নষ্ট হইবে, ইহা তাহাদের অবিদিত নহে। কিন্তু, নব সৃষ্টির প্রসব বেদনা যাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, সেকি সুবোধ বালক হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে। শুধু Experiment করিবার জন্য পশ্চিমের কত লোক বিষ খাইয়া প্রাণ দিল। আমাদের দেশের লোকে আত্মহত্যা করে না, তেমন কথা বলিতেছি না। পরীক্ষায় ফেল করিয়া অনেকে আফিং খায়, নিজের ইচ্ছামতো বিবাহ করিতে না পারিলে অনেকে বিষ খায়, মেয়েদের কেরোসিনে পুড়িয়া মরা বাংলাদেশের একটা বৈশিষ্ট্য হইতে চলিয়াছে। আবার সে বৎসর মোহনবাগান গোল খাইয়াছে বলিয়া তাহার একজন ভক্ত নাকি বিষ খাইয়া প্রাণ দিল! কিন্তু দুর্বলতার জন্য প্রাণ দেওয়া, আর জ্ঞানভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বাড়াইবার জন্য সজ্ঞানে বহাল তবিয়তে নিজেকে উৎসর্গ করা ভিন্ন কথা। একটি হত্যা অন্যটি ত্যাগ। নতুন সৃষ্টির জন্য যে উন্মাদনা, যে সাধনার দরকার তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে এখনো অনেক দূর বলিয়া মনে হয়। নতুনের কৌতূহল আমাদের মনে জাগে নাই, বিচার (Experiment) করিবার মত মনের শক্তি আমাদের নাই, সাধনাও তথৈবচ।

আমাদের সমাজে নায়েবে রসুল যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বর্তমানে হইয়া উঠিয়াছেন এক একটা নায়েবে খোদা। তাঁহাদের মতের খেলাফ কোনো কথা হইলে অমনি তাঁহাদের অমোঘ অস্ত্র ফৎওয়া 'কাফের হো গেয়া!' ইহারা বুঝেন না, মানুষ কি চিরদিন অতীতের নির্দেশিত পথ ধরিয়া চলিবে? মানবেতিহাসে এই চৌদ্দশত বৎসরের সাধনা কি মুসলমানের জন্য একেবারে ব্যর্থ হইবে? সমগ্র জাতিনিচয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় মানবসভ্যতার সমুন্নত মত ও পথগুলিকে শুধু আমাদের অতীতের সঙ্গে মিলে না বলিয়াই কি আমরা অস্বীকার করিয়া বসিব? যাঁহাদের মস্তিষ্ক সজীব, তাঁহারা নিত্য নতুন নতুন পথে জ্ঞানের অভিযান চালাইবেন। নতুন নতুন পথের আবিষ্কার করিবেন, ইহাতে যদি অতীতের বিরুদ্ধতা হয়, তাহাতে কিছু আসে যায় না। অতীতের বিরুদ্ধতা মুসলমানের জন্য বড় ক্ষতির কথা নয়। কিন্তু অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার জীবনে চলার পথে একটা ফুলস্টপ দেওয়াই তাহার পক্ষে মারাত্মক। অতীতকে অস্বীকার করিতে আমি বলি না। কিন্তু অতীতের দিকে ফিরিয়া যাওয়াতেই আমার আপত্তি। অতীতের কাছে যতখানি আলো পাওয়া যায় তাহা আমি হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু পুরাতনের গৌরব দিয়া তাহার অন্ধকারকে নিতে আমি রাজি নাই। ইসলামের আবির্ভাব হইতে এই চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে মানুষের জীবনে এবং জ্ঞানে অনেক উন্নতি হইয়াছে। কাজেই অতীতের সঙ্গে আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রার বিরুদ্ধতা অনিবার্য। পিতামহরা যে পথ ঘোড়ায় চড়িয়া দুই দিনে অতিক্রম করিতেন, আমরা যদি আজ তাহা মোটরে অর্ধদিনে বা এরোপ্লেনে এক ঘণ্টায় অতিক্রম করি, ইহাতে পিতামহের tradition

ভঙ্গ করা হয় সত্য, কিন্তু অপরাধ করা হয় না, একথা সকলেই বুঝে। জীবন্ত প্রাণবাণ মানুষের মন মস্তিষ্ক অনুসন্ধিৎসু। কোনো একটা জিনিষকে যে কোনো প্রকারে পাইয়া তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার সত্য পরিচয় অনুসন্ধানেই তাহার আনন্দ। জার্মান দার্শনিক Nietzche বলিয়াছেন—'If you desire peace of soul and happiness, believe. If you want to be a disciple of truth, search.' এই অনুসন্ধিৎসাই মানুষকে সত্যের পথে টানিয়া লইয়া যায়। বিশ্বাস করিয়া মানুষের সুখ আছে জানি, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধানে বা সত্যকে আবিষ্কার করিয়া মানুষের যে সুখ, আত্মপ্রসাদ—তাহার তুলনা নাই। সন্দেহই জ্ঞানের গোড়া—এই তো বড় বড় দার্শনিকদের কথা। সন্দেহ হইতে মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে। এই অনুসন্ধিৎসাই মানুষকে জ্ঞানের পথে চালিত করে। আজ মুসলমান ছেলের মনে জীবনের বড় কিছু সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিতে পারে না। সন্দেহ জাগিলে তাহার গলা টিপিয়া ধরা হয়। এই ভাবে তাহার জ্ঞান আহরণের সদর দরজাই বন্ধ পড়িয়া গিয়াছে। একটা উদাহরণ দেই। পিতা পিতামহ বিশ্বাস করেন, খোদা এক। ধর্মশাস্ত্র বলে খোদা এক। ব্যাস, আমিও বিশ্বাস করি—খোদা এক। এই তো আমাদের জ্ঞান। কিন্তু খোদা নাই বা খোদা একাধিক, এই সন্দেহ কোনো মুসলমান ছেলে প্রকাশ করিলে তাহার কি আর নিস্তার আছে। অনুসন্ধানের ভিতর দিয়া তাহার সত্যে পৌঁছার পথে এই যে বাধার সৃষ্টি করা হইল, ইহাতে তাহার ক্ষতি ছাড়া কি কোনো লাভ হইল? এই প্রশ্ন হইতে যদি মানুষের চিন্তাক্ষেত্রে আর একটি নতুন সত্য পাওয়া যায় তাতে গৌরব ঢের বেশি।

একটা বথা বড় বেশি শোনা যায়। বহু দিন হইতে দেশে অসংখ্য মাদ্রাসা চলিয়া আসিতেছে এবং বছর বছর তাহা হইতে অসংখ্য ছাত্র পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। শরিয়তের সব কিছুই তো এখানে পড়ায় না। তথাপি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহারা নতুন কিছু দান করিতে পারিতেছেন না কেন? শরিয়তের বিধিনিষেধগুলিরও আধুনিক জীবনের মতবাদ অনুযায়ী ইহারা কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেন না কেন? ইহার উত্তর,—ইহাদের মনে জ্ঞান ও চিন্তার গোড়া সন্দেহ জাগিতে পারে নাই। ইহারা যখন পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের মনে এই শিক্ষাও সংস্কার বদ্ধমূল হইতে দেওয়া হয় যে এই আরবি ফারসি কেতাবে যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহা অলজ্ঘনীয় সত্য। ইহার কোনো বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহের স্থান নহে। যাহার মনে সন্দেহ জাগে, সে গুনাহগার। এমনি করিয়া মুসলমানের জ্ঞানের উৎসকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

কোরানে ও হাদিসে শুধু সাময়িক সমস্যা সমাধানের জন্য বহু আয়াত নাজেল হইয়াছে, বহু হাদিস বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা দেশকালপাত্র ভেদে নিত্যকালের জন্য প্রযোজ্য হইবে এমন কি কথা আছে। সুদ দেওয়া নেওয়া হয়তো একদিন হারাম করা দরকার ছিল, কিন্তু আজ তো দেখা যাইতেছে সুদ ছাড়া মুসলমান

চলিতে পারে না। পৃথিবীর কোনো বড় ব্যবসায় বাণিজ্য বর্তমানে সুদ দেওয়া নেওয়া ছাড়া অচল। ব্যাংকের মধ্যস্থতায় আজকাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতেছে, অথচ ব্যাংকের গোড়া হইল সুদ। কোরান কি কারণে কি পারিপার্শ্বিক ঘটনার জন্য সুদ হারাম করিয়াছিল, সে সব চিন্তা না করিয়া কোরান হারাম করিয়াছে, শুধু এই দলিলকে নিত্যকালের জন্য ধরিয়া লইয়া মুসলমানের অর্থনৈতিক উন্নতিকে প্রতিহত করিয়া দিবার কি হেতু আছে?

চিত্রশিল্পকে নাকি ইসলাম হারাম করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর হয়তো এমন অন্ধকার যুগ ছিল, যে সময় মানুষ যে সে চিত্রকে পূজা করিয়া বসিত। কামাল পাশার ন্যায় আমরাও কি আজ বলিতে পারি না—'পৃথিবী সে যুগ পার হইয়া আসিয়াছে।' মোগলযুগে শাস্ত্রবাণীকে উপেক্ষা করিয়া চিত্রশিল্প ও সংগীত চর্চা বাড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে মানুষের অমঙ্গল হয় নাই। সে যুগের মুসলমান চিত্রের পূজা করে নাই। এখনো সমাজের গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা চিত্রশিল্পের সাধনায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রকে মুসলমানেরা পূজা করিতেছে, এমন কথা শোনা যায় নাই। ইসলাম মানুষের ধর্ম, বিবেকের ধর্ম, বিবেচনাকে ইসলাম কখনও অস্বীকার করে নাই। মানুষের অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চিত্রে ফুটাইয়া তোলাতে ইসলাম কি দোষ দিতে পারে?

আবার আরবিতে খোৎবা পড়া হয়। সেই ধূয়া ধরিয়া আমরাও চলিয়াছি তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া। মনে করি, সুন্নত পালন করিতেছি! আর ভুলিয়া যাই আরবি আরবদের মাতৃভাষা, আরবি তাহারা বুঝে আমরা তাহা বুঝিনা অথচ পুণ্য লাভের দুরাশায় বুঝবার ভান করিয়া হাহুতাশ করিয়া বুক ভাসাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা ঘুমাইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করেন! খোৎবা প্রথাটি আমাদের জাতীয় জীবনে ইসলামের একটি মহাদান। সমস্ত সপ্তাহের ধর্মনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ মানুষের সুখ দুঃখের যে সব কথা আলোচনা করিবার আছে, তাহা আলোচনা করাই এই খোৎবার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখন হয়তো কোনো এক কালে কোনো আরবি দাঁ মৌলবী বারমাসের জন্য তেষট্টিটা খোৎবা লিখিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের সব চিন্তা, সব আলোচনা এবং সব সুখ দুঃখের কথা ভাবিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমরা তাহা দুর্বোধ্য আরবি ভাষায় পড়িয়া এবং শুনিয়া কৃতার্থ হইয়া যাই।

আমাদের সমাজের অর্ধভাগ আজ প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ। তাঁহাদের জীবন চতুর্দিক হইতে রুদ্ধ। জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির জন্য তাহার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য বর্তমান অবরোধ প্রথাকে দূরীভূত করিয়া তাহাকে সভ্যতানুমোদিত করিতে হইবে; নতুবা মুসলমানের জীবনের উৎস চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আলো বাতাস লাগিলে মেয়েদের চরিত্র অমনি হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এরূপ ভাবিবার কি আছে? গোড়ায় বিপদ একেবারে নাই বলিতেছি না। কিন্তু সেই

বিপদকে এড়াইয়া চলিতে পৌরুষও নাই, জাতীয় জীবনের উন্নতিও নাই। আলো বাতাসের ধাক্কা না খাইয়া যে চরিত্র বড় হইবে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর। চতুর্দিক হইতে প্রাচীর ঘেরা তথাকথিত সতীত্বের কোনো মূল্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিলে বন্ধুর পত্নীর পদস্খলন হইবার ভয় থাকিলে সে রকম পত্নী লইয়া ঘর করিতে যে কোনো মানুষের লজ্জা হওয়া উচিত। সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের দিকে চাহিয়া এখানে কতকগুলি অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতেছি।

মেয়েদের শিক্ষা, অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙালি-মুসলমান সমাজে বহুদিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু আমাদের সমাজনেতারা শুধু বাক্যের ব্যবসাদারিতেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া নিজেরা ফতুর হইতেছেন এবং সমাজকেও বিড়ম্বিত করিতেছেন। Example is better than precept, একথা তাঁহারা বুঝিতেছেন না, বা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া মনে করিতেছেন আমরা সমাজের নেতা, সংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত pioneer—ইয়া উয়া! আজ এই ঢাকা সাহিত্য সমাজের সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদের স্ব স্ব পরিবারের মহিলাদের এই সভায় যদি লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে এই আন্দোলন আজ একদিনে অন্তত আরো দশ বৎসর আগাইয়া যাইতে পারিত এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহাদের যে নাড়ির যোগ রহিয়াছে, তাহাও প্রমাণিত হইয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ আমরা তাহার উল্টা দেখিতেছি।

দিন তিন চার আগে সাহিত্য সমাজের কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির (যাঁহাকে আমি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে সব চাইতে বেশি শ্রদ্ধা করি) বাসায় গিয়াছিলাম। দুয়ারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিলাম। মাত্র হাত পাঁচেক দূরেই ভিতরে মেয়েরা আমাদের সাড়া পাইয়া জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছেন দেখা গেল, কিন্তু কেহই মুখ খুলিয়া বলিলেন না তিনি বাড়ি নাই। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই দিকে খুব অগ্রসর ও radical বলিয়া দাবি করিতেছেন এবং সময় সময় কথায় এবং লেখায় অবরোধের বিরুদ্ধতা করিয়া থাকেন, এই তো তাঁহাদের অবস্থা। গত নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মিলনের সুযোগ্য সভাপতি সাহেবের অভিভাষণের কয়েকটা লাইন এইরূপ—পর্দা দু'রকম। এক রকম ইসলামী পর্দা, সে হচ্ছে মুখ হাত পা ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢাকা। আর এক অনিসলামী পর্দা। সে মেয়েদের চার দেওয়ালের মধ্যে চিরদিনের জন্যে কয়েদ করে রাখা। ইসলামী পর্দার বাইরে খোলা হাওয়ায় বেরোনো কি অন্যের সঙ্গে দরকারি কথাবার্তা মানা নয়। অনিসলামী পর্দায় এ সব হবার জো-টি নেই। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, এই অনিসলামী পর্দা ফাঁক করে দিতে। বঙ্গীয় মুসলমান যুবক সম্মিলনীর শ্রদ্ধেয় সভাপতি সাহেব অনৈসলামিক পর্দা ফাঁক করিয়া দিবার জন্য নিজে কখনও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন কিনা জানি না। তবে এই কথা জানি, তিনি শুধু ইচ্ছা করিলেই ইসলামী পর্দার সাথে মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করাইয়া তাঁহার পরিবারের

মেয়েদের এই সভায় লইয়া আসিতে পারিতেন। শুধু উপদেশের খাতিরে যদি উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার সঙ্গে যদি উপদেষ্টার জীবনের কোনো সম্বন্ধ না থাকে, সে উপদেশের কি কোনো মূল্য আছে? সেই অতিরিক্ত চিনি খাওয়া ছেলের চিনি ছাড়ানোর গল্প না হয় নাই বলিলাম এখানে। মুসলমান মেয়েদের পর্দার বাহিরে আনার বড় অসুবিধা সম্বন্ধে আমি অজ্ঞাত নহি। বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষার অভাবে মুসলমান মেয়েদের জীবনযাত্রাপ্রণালী, বেশবিন্যাস, চলাফেরা হয়তো সুরুচিসঙ্গত নয় এবং বাহিরে আমার মতো তাঁহাদের মনও হয়তো তত সাহসী নয়। কাজেই তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিয়া হাস্যাস্পদ হইতে অনেকেই রাজি হইবেন না, তাহা আমি জানি। কিন্তু আমি যাঁহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছি আমি জানি, তাঁহাদের কাহারও বিবাহিত জীবন দশ বছরের নিচে নয়। এই দশ বছরের মধ্যে তাঁহারা নিজেদের স্ত্রীকে যাঁহাদের উপর তাঁহাদের despotic monarch যখন কোনো দিকে সংস্কার করিতে পারেন নাই, বা দশ বছরের মধ্যে একটি মেয়ের মনোভাব বাহিরে আসিবার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই সম্বন্ধে অন্যকে উপদেশ দিতে যাওয়া কতখানি সমীচীন তাহা ভাবিবার বিষয়। যাঁহারা কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাঁহারা অনর্থক বাগাড়ম্বর না করিলেই পারেন। সংস্কার আন্দোলন এইরকমভাবে চলিলে মুসলমানদের যে উপকার হইবে, তাহার সহস্রগুণ ক্ষতি হইবে একটা পবিত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ যদি ভণ্ডামি করিয়া বেড়ায়। এইরকম তথাকথিত আন্দোলনকারীদের মেরুদণ্ড এবং মন মোটেও শক্ত নয়। বিপক্ষের সামান্য হুমকিতেই ইহারা তওবা করিয়া বসিতে পারেন এবং এই করিয়া সমস্ত আন্দোলনের স্পিরিটকে এক মুহূর্তেই ধ্বংস করিয়া দিতে একটু দ্বিধাবোধ করেন না। এই আন্দোলনে অনেক নিষ্ঠাবান নির্ভীক তরুণ আছেন, যাঁহারা সর্বান্তঃকরণে এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করিয়া থাকেন। এই তওবা তাঁহাদের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিয়া না দিলেও অনেকখানি পেছনে ঠেলিয়া দিবে। এক পা অগ্রসর হইয়াই যদি তওবা করিয়া দশ পা পেছনে চলিয়া যাইতে হয়, তবে এই আন্দোলনের সাফল্য সুদূরপরাহত। পৃথিবীতে সব সময় এবং সব দেশেই সমস্ত আন্দোলন বাধা, বিপত্তি ও অত্যাচারের ভিতর দিয়াই জয়যুক্ত হইয়াছে। শুধু ফাঁকা বক্তৃতা বা প্রবন্ধের দ্বারা কখনো কোনো আন্দোলন সাফল্য লাভ করে নাই।

মুসলমানের সৃষ্টি বহুদিন হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু শাস্ত্রের জাবর কাটিলে সে শক্তি ফিরিয়া আসিবে না। শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না। বুদ্ধি, বিবেচনা ও জ্ঞান দিয়া আধুনিক জীবনের মতবাদ অনুসারে শাস্ত্রকে বিচার করিয়া লইতে হইবে। অন্ধের মতো অনুসরণের কোনো মূল্য নাই। ইসলাম যুগধর্মকে কোনোদিন উপেক্ষা করে নাই এবং কোনো জীবন্ত ধর্মই উপেক্ষা করিতে পারে নাই। যুগের পরিবর্তনকে মানিয়া যে লইবে না তাহার মৃত্যু অনিবার্য। হিন্দু

যদি আজ সমুদ্রযাত্রাকে অধর্ম ভাবিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত, অথবা খ্রিস্টান যদি আঘাতের প্রতি আঘাতের পরিবর্তে অন্য গালখানি পাতিয়া দিত, তাহা হইলে তাহাদের জায়গা স্বর্গে হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু এই মাটির দুনিয়ায় একেবারে অসম্ভব হইত। মুসলমানকেও যদি দরকার হয় এইরকম নির্মমভাবে সামাজিক বিধি নিষেধকে পরিবর্তন করিতে হইবে। ইসলামের মূল সূত্রকে পরিবর্তন করিতে বলিতেছি না এবং তাহার দরকারও নাই।*

আজ যাঁহারা নতুন সৃষ্টি করিতে চাহিবেন তাঁহাদিগকে মুক্ত অন্তকরণে স্বাধীনভাবে জ্ঞানের পথে চিন্তা করিতে হইবে। কোনো বিধিনিষেধ ও বাহিরের বাধা যেন মানুষের চিন্তাকে রুদ্ধ করিতে না পারে। যুগযুগান্ত হইতে মানুষের সৃষ্টির অভিযান চলিয়াছে। এ অভিযান রুদ্ধ হইতে পারে না।

জীবনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় আমাদের সাহিত্যকে ভরিয়া তুলিতে হইবে। জীবনের উপলব্ধিই সাহিত্য, সে উপলব্ধির পরিসর যতই ব্যাপক হইবে আমাদের সাহিত্যও ততই বহুধা, বিভিন্নমুখী ও শক্তিশালী হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের জীবনের উপলব্ধি সীমাবদ্ধ; তার পরিসর নেহাৎ ক্ষুদ্র, তাই আমাদের পূর্ব সাহিত্যও একেবারে হালকা। নারীজীবন একটা জিনিষ আমাদিগকে সম্পূর্ণ কল্পনা করিয়া গড়িতে হয়, কিন্তু কল্পনা করিয়া রূপকথা লেখা যায় কথাসাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। পশ্চিমের জীবন বহুমুখী তাহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যাপক এবং তার সঙ্গে বহু বেদনা ও অশ্রু মিশিয়া তার সাহিত্যকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বাদ দিই, বেদনা ও অশ্রুজলের ভার বহনেও আজ আমরা অক্ষম। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের লেখা হইতে পশ্চিমের একটা দৃষ্টান্ত দিই—'আমার এক ফরাসি বান্ধবী লেখিকা ও তাঁর স্বামী কবি। ... জীবন তাঁদের সুখময় ছিল। এমন সময় আমার বান্ধবীর একটি রূপসী সখী তাঁদের মধ্যে অবতীর্ণ হলেন। বান্ধবী সখীকে প্রায়ই স্বামীর কাছে একলা ছেড়ে দিতেন। স্বামী একদিন হঠাৎ তাঁকে বললেন যে, দম্পতির মাঝে তৃতীয়ার উদয় এত ঘন ঘন হওয়াটা ঠিক নয়। বান্ধবী হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললে, তোমার প্রেমকে জোর করে পাওয়ার কোনো দামই আমার কাছে নেই। যদি ছাড়া পেয়েও সে বাঁধা থাকে তবেই আমার কাছে তার মূল্য। স্বামী চুপ করে রইলেন। কিন্তু ছাড়া পেয়ে প্রেম বাঁধা রইল না। বিপদ এল—যে বিপদ স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই আশঙ্কা করেছিলেন। স্বামী তাঁর স্ত্রীর রূপবতী সখীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বান্ধবী অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে তাঁকে বিবাহ বন্ধন হতে

[*লেখকের শেষোক্ত বাক্যটির তাৎপর্য কি বুঝিলাম না। পাছে তওবা করিতে হয় সেই ভয়ে কি এ বাক্যটি লেখকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলমের আগায় বাহির হইয়াছে? তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে এই বাক্যটি খাপ খাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।—সম্পাদক, শিখা]

মুক্তি দিলেন। শুধু একটি নতুন পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর সব গেল—যা এ পরখ করতে না গেলে সম্ভবত যেত না। কিন্তু তবুও তিনি এজন্যে আক্ষেপ করেন না। এখন তিনি একান্ত বেদনার মাঝে একটি সামান্য বোর্ডিং চালিয়ে জীবিকা অর্জন করেন— কিন্তু বিপদের ভয়ে স্বামীকে যে রূপসী সখীর আকর্ষণ হতে মুক্তি দিতে চাননি এ জন্যে গৌরব গর্ব তাঁর অসীম। সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে পড়ে নাকি?' এত বড় মন আমাদের সমাজের মেয়েদের কথা বলি না, কয়টি পুরুষের আছে? আমাদের দেশেও যাঁহারা মেয়েদের স্বাধীনতা দিয়াছেন তাঁহাদের কাহাকেও হয়তো সময়-বিশেষে এরকম বেদনার সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু মেয়েদের অবরোধ দূরীকরণে মানব জাতির যে বৃহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার তুলনায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের ভুলত্রুটি বা দুর্বলতা কিছুই নয়—বিশেষত যখন সেই একই ভুলত্রুটি ও দুর্বলতা যাঁহারা মেয়েদের বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের নিজেদের জীবনে বেশি করিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে।

বাহিরের ত্যাগ-মহিমার অশ্রু মিশিয়া আজ ইউরোপের সাহিত্য বহুমুখী প্রতিভা লাভ করিয়াছে। এমনি করিয়া বেদনা ও অশ্রু দিয়া ইঁহারা জীবনকে অধ্যয়ন করেন, উপলব্ধি করেন।

বাংলা সাহিত্য আজ যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে। বিদ্যাসাগর মাইকেল বঙ্কিমের যে-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, সে-সাহিত্য এখন তরুণদের হাতে আবার নতুন দিকে মোড় ফিরিতেছে তাই আজ প্রবীণ দলে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। শৈলজা প্রেমেন্দ্র নজরুল কল্লোল কালিকলমের উদ্দেশ্যে অনর্থক গালিগালাজ বর্ষিত হইতেছে—তথাকথিত অভিজাত সাহিত্যের পক্ষ হইতে। বাংলা সাহিত্যের এ নব সাধনা হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন রাখিলে চলিবে না, আমাদিগকেও নতুনভাবে ভাবিতে হইবে, সমাজজীবনকে নতুনভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আমাদের সমাজ বড় পতিত, তার জীবন বড় হীন ও তাই আমাদের সাহিত্যস্রষ্টাদিগকে নির্মমভাবে কলম ধরিতে হইবে। নির্মম ও কঠোরভাবে সমাজের গলদগুলিকে খুলিয়া ধরিতে হইবে। ভুলভ্রান্তি ও গলদকে যদি বাহির করা না যায় তবে চুনকাম করা সাহিত্যের দ্বারা কোনো লাভ- হইবে না। নিজেদের ভুল চুক পাপকে স্বীকার করিতে হয়তো, বুকভাঙা বেদনা ও অশ্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে—কিন্তু তাহাকে সহ্য করিয়া না লইলে উপায় নাই। রোগকে ঢাকিয়া আরোগ্য সুদূরপরাহত।

আমাদের এ আন্দোলনকে যদি স্থায়ী ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে হয় তবে তাহাকে সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কারণ সাহিত্যই জাতির বাহন, সাহিত্যই চিরদিন তাহার জীবনের খোরাক যোগাইবে, তাহার জীবনে স্থায়ী অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিবে। কোন ব্যক্তিত্বের উপর যদি এ আন্দোলন ভিত্তি স্থাপিত হয় তবে ইহার ব্যর্থতা অনিবার্য।




শিখা

চতুর্থ বর্ষ

১৯৩০

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'




অভ্যর্থনা

ড. সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি সাহিত্যিক নহি, সাহিত্যের আসরে আমার স্থান নাই, সাহিত্য-সাধনা করিবার সময় বা সুযোগ আমার হয় নাই। সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে কিছুটা সাহিত্যের রঙ রস ও গন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়, অনেকেরই হয়তো সে ধারণা থাকিবে। কিন্তু আমি জানি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে আমার সাহিত্যিক কর্তব্য কিছুই নাই। আপনাদিগকে এ সাহিত্যের মজলিসে সাদরে গ্রহণ করার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এ কাজের আমি কতটুকু উপযোগী সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই ঘোর সন্দেহ আছে।

আমার বিলাত যাত্রার পূর্বক্ষণে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' ভিত্তি পত্তন হয়। এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখনই খুব আশান্বিত হইয়াছিলাম। সুদীর্ঘ কাল পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি এ তরুণ সমাজ সময় ও যুগধর্মের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে সংসারটা যেখানে ছিল আজ আর সেখানে নাই। চলার আনন্দে সব কিছু ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষের চিন্তারাজ্যের বিপুল সচলতা ও তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া যে-সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার মনে হয় চিন্তার দৈন্যই মানুষের অতি ভীষণ, মারাত্মক দৈন্য। যাহাদের মন সজাগ, বুদ্ধি-বৃত্তি যাহাদের তীক্ষ্ণ-প্রখর, তাহারাই আজ সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব করিতেছে। তাহারাই বর্তমান জগতে বর্দ্ধিষ্ণু জীবন্ত, উন্নতিশীল ও সচল বলিয়া বিখ্যাত।

দেশ-বিদেশের লোকের সঙ্গে মিশিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে সাহিত্যের জাতীয় জীবনের ভিত্তি কোনো জাতির শতধাবিচ্ছুরিত জীবন-স্পন্দন একমাত্র সাহিত্যের মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। এ নিছক সত্য কথা, কেবল কথার কথা নয়। জীবনের স্ফূর্তি যেখানে যত বেশি সাহিত্যের বিকাশও সেখানে তত সুস্পষ্ট। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা জাতির ভাবধারা প্রবাহিত হয়। মানুষের জীবনের গণ্ডি যত প্রশস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রও সেখানে তত বিস্তৃত। 'Literature is the criticism of life'—এ অতি

প্রয়োজনীয় কথা। পরিপুষ্ট, পূর্ণাঙ্গ জীবনের জ্বলন্ত ছবি সাহিত্যের মধ্যেই আমরা খুঁজিয়া পাই। জীবন যেখানে একঘেয়ে, নীরস, বৈচিত্র্যহীন ও অচঞ্চল, সাহিত্যও সেখানে আড়ষ্ট ও মরণাপন্ন।

মুসলমান সমাজ শিক্ষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে নিতান্ত পশ্চাৎপদ। বিদেশে ঘুরিয়া মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি, ভারতীয় মুসলমানকে বিদেশীয়েরা মোটেই চিনে না। আমি যখন বলিয়াছি যে বাংলাদেশে শতকরা ৫৫ জন মুসলমান অধিবাসী তখন তাহারা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছে, তবে রবীন্দ্রনাথের মতো লোক কয়টি? ইহার কি উত্তর আছে? অন্যান্য জাতির সাধনা, সজীবতা, চিন্তাচর্চা ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সঙ্গে যখন আমাদের সমাজের স্থবিরতা ও নিস্পন্দভাব তুলনা করি তখন মনে বড় দুঃখ হয়। মনে হয় আমরা কোথায় পড়িয়া আছি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দেখি আশার ক্ষীণালোক মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দেশবিদেশের তরুণদের মতো আমাদের তরুণেরা বসিয়া নাই। তাহাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে হয়তো আমাদের প্রবীণেরা খুব আশান্বিত নহেন। আর এরূপ মতদ্বৈধ ও সংঘর্ষ থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়, কারণ বৈষম্যই চিরকাল উন্নতির পরিপোষক। একথা ভুলিলে চলিবে না যে সমাজের বাস্তব মঙ্গল সাধনই উভয় দলের চরম ও পরম লক্ষ্য। প্রবীণের অভিজ্ঞতা, সুচিন্তা ও সাবধানতা আর তরুণের উদ্দামতা কর্মকোলাহল ও বাস্তবতা যদি পাশাপাশি কাজ করিতে পারে তবেই সমাজের দৈন্য ঘুচিবে।

'সাহিত্য সমাজ' একদল শক্তিশালী সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল লেখক ইতিমধ্যেই গড়িয়া তুলিয়াছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এর কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত এবং বহুধা বিভক্ত বিভক্ত হইবে। অতীতের স্বপ্ন আমরা বহুদিন দেখিয়া আসিতেছি; আজ আমাদিগকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে হইবে। বর্তমানকে ভিত্তি করিয়া আমাদের স্বপ্নসৌধ গড়িতে হইবে। তবেই আমাদের জয়যাত্রা সফল হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি বলবার মতো আমার কিছুই নাই। আপনাদিগকে আমি আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। যথোপযুক্তভাবে আপনাদিগকে অভ্যর্থিত করিবার মতো আয়োজন আমাদের কিছুই নাই।

আমাদের আয়োজন অতি সামান্য। পরস্পরের চিন্তা ও ভাবের সঙ্গে সুপরিচিত হইবার জন্যই আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। আমাদের সকলের সমবেত সহযোগিতা ও সহানুভূতি আমাদের এ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুক, ইহাই প্রার্থনা। সাহিত্যের পূত আবহাওয়ায় আসুন আজ আমরা ব্যক্তিগত হিংসা, দ্বেষ ও মতানৈক্য ভুলিয়া শুদ্ধ ও বুদ্ধ হই। আমিন!

অভিভাষণ
খান বাহাদুর নাসিরউদ্দীন আহমদ

বন্ধুগণ,

আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন করে আপনারা কম দুঃসাহসের পরিচয় দেননি। আমার পক্ষেও এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করা কম ধৃষ্টতার পরিচায়ক নয়। তবে আমার অজুহাত এই যে আমি সুহৃদ্‌বর ওদুদ সাহেবকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম যে আমার মতো সম্পূর্ণ অযোগ্য অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে আসরে নামিয়ে যেন সং না সাজান। কিন্তু তিনি কোনো মতেই আমাকে রেহাই দিলেন না; তাই আমাকে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য করতে হয়েছে। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যে কেউই যে এ কাজ আমার চেয়ে অধিকতর দক্ষতার সহিত সমাধা করতে পারতেন, তা বলা বাহুল্য। আমার ভ্রমপ্রমাদ ত্রুটিবিচ্যুতি অনেকই হবে, তবে আশা আছে আপনাদের উদারতাগুণে সে সব মার্জনা করে নেবেন।

যদিও এ যাবৎ আমার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়নি আপনাদের সাহিত্য সমাজে যোগ দিতে, তবুও তিন বৎসরের 'শিখা' আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি ও তদ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছি। মুসলমান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধাবলী একত্রে কমই পাঠ করবার সুযোগ হয়েছে। আপনারা যে এরি মধ্যে আপনাদের মহৎ উদ্দেশ্যে এত দূর সফলতা লাভ করতে পেরেছেন তা শ্লাঘনীয়। আপনাদের সাহিত্য-সমাজ স্বতই আমাকে মুসলমানদের গৌরবের যুগের 'ইখওয়ানুসসফা' ভ্রাতৃমণ্ডলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রার্থনা করি, আপনাদের সাহিত্য-সমাজ সফল হোক—সার্থক হোক।

আপনাদের motto-টি—'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'— আমার বড়ই ভাল লেগেছে; এ সুন্দর আদর্শ লক্ষ্য করে চললে সমাজের অশেষ উন্নতি হবে তাতে সন্দেহ নেই। আজ এ motto মুসলমানদের নিকট কেমন-কেমন ঠেকা বিচিত্র নয়, কিন্তু এই ছিল আদি মুসলমানদের motto, এই আদর্শ অনুসরণ করে চলে মুসলমানেরা এক সময় পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে শিক্ষিত উন্নত ও সভ্য জাতিতে গড়ে উঠেছিল। কোরানে জ্ঞানের মহিমা

বহুস্থানে কীর্তিত হয়েছে। প্রথম Revelation সুরা 'ইকরায়' লেখনীর প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে; 'আল্লাজি, আল্লামা বিল কলমে আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়ালাম', এ ছাড়া অসংখ্য হাদিসে জ্ঞানান্বেষণকে মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে। যথা :

'জ্ঞানচর্চা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে ফরজ'
'জ্ঞানের অন্বেষণে আবশ্যক হলে চীনেও যাও'
'শিশুকাল হতে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো'
'জ্ঞানের একটি বচন শত শত প্রার্থনার আবৃত্তির চেয়ে মহত্তর'
'জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্রতর'
'একটি বুদ্ধির কথা শিখা, ও অন্য একজন মুসলমানকে শিখান,
এক বৎসরের এবাদতের চেয়েও মূল্যবান'
'খোদা বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু সৃষ্টি করেননি'
'যে জ্ঞানান্বেষণের জন্য গৃহ ত্যাগ করে সে খোদারই পথে চলে'
'এক ঘণ্টা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করা, সহস্র শহিদের জানাজায় যোগ দেওয়া বা সহস্র রজনী দাঁড়িয়ে উপাসনা করার চেয়েও বেশি পুণ্যের'
'জ্ঞানীকে যে সম্মান করে সে আমাকে সম্মান করে'
'যে শিক্ষার জন্য জীবন দান করে সে অমর'।

বাস্তবিক অন্য কোনো ধর্মপ্রচারকই জ্ঞানকে এত উচ্চ আসন দেননি। এ ভাগ্যের এক ক্রূর পরিহাস যে তাঁরই অনুবর্তিগণ আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অশিক্ষিত মূর্খ ও নির্বোধ বলে নিন্দিত।

ইস্‌লামে Reason-কে যে কত বড় স্থান দেওয়া হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। কোরানের বহু স্থানে Reason-এর প্রতি appeal করা হয়েছে। আমার মনে হয় দুর্দমনীয় জ্ঞান-স্পৃহা ও ব্যাকুল সত্যানুসন্ধানই ইসলামের এক প্রকাণ্ড বিশিষ্টতা। ইবনে রোশদের জীবনী-লেখক ফরাসী মনস্বী Renan লিখেছেন : 'There is nothing to prevent our supposing that Ibn Roshd was a sincere believer in Islamism specially when we consider how little irrational the supernatural element in the essential dogmas of this religion is, and how closely this religion approaches purest Deism.'

এই প্রসঙ্গে আমি ইসলামের অন্যান্য দু'একটি বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিছু বলার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ইসলাম অত্যন্ত সরল ধর্ম। এতে প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের কোনো স্থান নেই। পৌরোহিত্য বা priesthood ইসলামে নেই। স্রষ্টা এবং সৃষ্টের মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে টেনে আনা হয়নি। জ্ঞান-শিক্ষা প্রত্যেক

মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ করার উদ্দেশ্য এই যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাল মন্দ স্বাধীনভাবে বিচার করতে শিখবে এবং অন্যের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা খোদার নিকট নিবেদন করতে পারবে।

কোরানের উদারতা বা 'Catholicity' বিস্ময়কর। সত্যকে সর্বত্রই সম্মান করা হয়েছে। কোরান ভিন্ন এমন উদারতাপূর্ণ পরমত-সহিষ্ণুতা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে দেখা যায় না। 'লা ইকরা ফিদ্দিন' অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে কোনোই বল প্রয়োগ খাটিবে না। বিশেষ করে, 'এমন কোনো জাতি নেই যাদের মধ্যে কোনো prophet-এর আবির্ভাব হয়নি'—এই উদার ঘোষণার দ্বারা কোরান সমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে চূর্ণ করে দিয়েছে! কোরানের এই ঘোষণাবাণী মানলে স্বতই কি একথা মনে হয় না যে ভারতের মতো বিপুল মহাদেশে না জানি কত পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে! হিন্দুদের পর-ব্রহ্মের কল্পনা নিশ্চয়ই কোনো পয়গম্বরের দান।

ইসলাম সমস্ত মানবকে সমান চোখে দেখেছে। ধনী-নির্ধন, শ্বেত-পীতের ভিতর বিভিন্নতা করেনি। এর ছায়া-সুনিবিড় বুকে যে আশ্রয় মেগেছে তাকে ফিরে যেতে হয়নি। ইসলামে কোনো 'আশরাফ' 'আতরাফ' নেই। বাস্তবিকই Islamic brotherhood মিথ্যা কাহিনী নয়। যদি কোনো ধর্ম সামাজিক জীবনে equality ও fraternity-র আদর্শ পৃথিবীতে প্রচার এবং শুধু প্রচার নয় কার্যে পরিণত করে থাকে—সে ইসলাম। রাষ্ট্র-জীবনেও ইসলামের Democracy এক বিস্ময়কর বস্তু। পাদ্রী J. R. Mott-ও তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, 'The most perfect form of Demeocracy has only been approached by Islam.' 'খোলাফায়ে রাশেদিন' কি পৃথিবীর ইতিহাসের এক গৌরবময় পৃষ্ঠা নয়?

ইসলাম স্বাভাবিক ধর্ম। এর কোরানিক বিধানগুলি মানুষের প্রবৃত্তি ও তার অবস্থার চির-পরিবর্তনশীলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। হজরত বলেছেন 'আমি মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নই। যখন আমি তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে কোনো আদেশ দিই তা গ্রহণ করবে, আর যখন সাংসারিক বিষয়ে কিছু বলি তখন মনে রাখবে আমিও মানুষ'; অন্যত্র দূর ভবিষ্যতের বিরাট আবর্তন-বিবর্তন উপলব্ধি করেই যেন তিনি বলে গেছেন, 'তোমরা এমন যুগে এসেছ যে তোমাদেরকে এখন যা বলা হচ্ছে তার এক দশমাংশ পরিত্যাগ করলেই তোমাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত, কিন্তু এমন কালও আসবে যখন এখন যা বলা হচ্ছে তার এক দশমাংশ প্রতিপালন করলেই যে কেউ মোক্ষলাভ করতে পারবে।'

এই হাসিকান্না-ভরা পৃথিবীতে সুখে দুঃখে আন্দোলিত মানুষের জন্যেই ইসলাম। ইসলামের আদর্শ পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা। মানুষের কোনো বিশিষ্ট কামনা- বাসনা দমন করে তার particular faculty-র development ইসলাম চায়নি। সমগ্র মানুষটিকে তার সহস্র কার্যকারিতার ভিতর দেখতে চেয়েছে ইসলাম। ইসলামে তাই তথাকথিত বৈরাগ্যের স্থান নেই।

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। / অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় / লভিব মুক্তির স্বাদ'—বিংশ শতাব্দীর যে সত্যান্বেষী কবি এ বাণী ঘোষণা করেছেন তিনি আমাদের মনে হয় আরবের হজরত মোহাম্মদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

এই যে সুন্দর সুষ্ঠু ইসলাম পৃথিবীতে যে কী কল্যাণ বহন করে এনেছিল এক সময়, সে কথা ইতিহাসের বিষয়; বিস্তারিতভাবে তার আলোচনা করবার দরকার নেই। এই বললেই চলবে যে মধ্যযুগে একমাত্র মুসলমানরাই পৃথিবীর সভ্যতা ও কালচার (culture)-কে জীবিত রেখেছিল এবং তাদেরি সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞানের চর্চা ও আবিষ্কার ইউরোপে Renaissance-র যুগ আনয়ন করেছিল। বাস্তবিক Reason-এর আলোসম্পাতে উজ্জ্বল করে ধরা, বুদ্ধির কুঞ্জি নিয়ে তার মর্মকোষ থেকে নব নব আবিষ্কারের মণি আহরণ করাই ছিল তৎকালীন মুসলমানের আকুল স্পৃহা। Draper-এর মতে 'Essential characteristics of their (আরবদের) method were experiment and observation', এবং এর ফলে বিজ্ঞানের চর্চায় তাঁরা কিরূপ অগ্রসর হয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এমন সব আবিষ্কারও তাঁরা করেছিলেন যা বর্তমান জগতকেও নতুন বলে সময় সময় তাক লাগিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে তৎকালীন আরবীয় স্কুল কলেজে Evolution-এর doctrine পর্যন্ত পড়ানো হত যা এ যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কার বলে সাধারণের ধারণা। এই Evolution-এর process আরবেরা অজৈব বা খনিজ দ্রব্যের মধ্যে পর্যন্ত দেখেছিলেন। বাস্তবিকই world culture-এ ইসলামের যে কী অপূর্ব দান তা ভাবলে গর্বানুভব না করে পারা যায় না। S. P. Scott বলছেন,—'Modern science unquestionably owes everything to Arab genius', এদিকে আলবেরুনির 'ইণ্ডিকা' পুস্তকের অনুবাদক Dr. Sachau বলছেন, 'Were it not for Al-ashari and Al-ghezali the Arabs would have been a nation of Galileos and Newtons.'

কিন্তু বহুদিন মুসলমানেরা তাদের সভ্যতা বজায় রাখতে পারলে না। যে বুদ্ধিবৃত্তি বা Reason-এর পরিচালনা ও অদম্য জ্ঞানস্পৃহা তাদের উন্নতির কারণ হয়েছিল তা পরিত্যাগ করাই তাদের দুর্গতির কারণ হল। ইলম ও ইমানের আদর্শ বিকৃত হয়ে গেল। শিয়া, সুন্নি, হাম্বলি, হানাফী প্রভৃতি বহু সংখ্যক দল ও মতবাদের সৃষ্টি হয়ে ইসলাম শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। প্রত্যেক দল ভাবতে শুরু করলে যে প্রকৃত ইমান বা ইসলাম তাদেরি; অন্য পক্ষে মোতাজিলা-বাদ তথা Rationalism বিলুপ্ত হয়ে গোঁড়ামি দেখা দিল। যে 'ইলমকে' কেবল 'ইলমের' জন্যই আমল করা নারী পুরুষের ফরজ করা হয়েছিল সেই ইলমের অর্থ সঙ্কীর্ণ করে শুধু 'দিনিয়াত' আলোচনায় সীমাবদ্ধ করা হল। ফলে স্বাধীন চিন্তা হারিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দর্শন বিজ্ঞান শিল্প-কলার দিকে কিছু contribute করতে না পারায়

মুসলমানেরা সমস্ত বিষয়ে অন্যান্য জাতি হতে নিচে পড়ে গেল। জীবন্ত ইসলামের পরিবর্তে তাই আজ দেখতে পাই আচার-পদ্ধতির ইসলামের কঙ্কাল, আর প্রাণবন্ত মুসলমানের স্থানে তাই আজ দৃষ্ট হয় সংস্কারাচ্ছন্ন Parrot মুসলমান বা মোল্লা, যার চিন্তার উৎস Rituals বা dogma-র পাথর-চাপে নিরুদ্ধ হয়ে গেছে। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে এই যে পরবর্তীযুগের Ritualistic ইসলাম এ মানবের কোনো কল্যাণে আসেনি। পরন্তু মুসলমান জাতিগুলির মধ্যে এক অভিসম্পাতের মতো কাজ করেছে।

কিন্তু যে জাতির ভিতর জীবনের ধারা একেবারে শুষ্ক হয়ে যায়নি, তার মৃত্যু নেই। যে-ধর্মের ভিতর শাশ্বত সত্যের অচঞ্চল আলো ঘুমিয়ে আছে তা আবার কোনো শুভ মুহূর্তে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠবে। সাড়া পাওয়া যায় মুসলমানদের প্রাণ স্পন্দন যেন stethoscope-এ ধরা পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মুসলমানদের সুপ্ত চিন্তাশক্তি যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠছে। আবার 'দেশ দেশ নন্দিত করে' ইসলামের ভেরী যেন তাই মন্দ্রিত হয়ে উঠছে। ইসলামের এই নবজাগরণ ইউরোপের Protestantism-এর সঙ্গে তুলিত হওয়ার যোগ্য।

বর্তমান যুগ হয়েছে বুদ্ধির যুগ। এই Rationalistic world culture ও ইউরোপীয় জাতিগুলির intense nationalism-এর আদর্শের সংস্পর্শে এসে তুরস্ক, আরব, আফগানিস্থান, ইজিপ্ট প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলির মধ্যে নব জাগরণের বান এসেছে। তুরস্কে পৌরোহিত্য প্রথা বর্জন ইসলামের প্রকৃত আদর্শানুযায়ী-ই হয়েছে। খেলাফত খোলাফায়ে রাশেদিনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। পরে স্বার্থান্বেষী লোকেরা পরবর্তী যুগের এই অন্তঃসারশূন্য খেলাফতকে বাঁচিয়ে রেখেছিল! এই bogus খেলাফত থাকায় মুসলমান জগতের ক্ষতিই হয়েছে, উপকার হয়নি। Pan-Islamism-এর ideaও মুসলমান জগতের সত্যিকার কোনো উপকার করতে পারেনি, তুরস্ক এসব খেয়ালি পোলাওয়ের স্বপ্ন ত্যাগ করে খেলাফত, Pan- Islam প্রভৃতি বর্জন করে ভালই করেছে। ভারতীয় অনেক মুসলমান 'তুরস্কে ইসলাম আর state religion নয়' এই ঘোষণার জন্য মুস্তফা কামালের প্রতি দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এটা ভালই হয়েছে। যে State-এর অধীনে বহু ধর্মাবলম্বী লোকের বাস তার কোনো বিশেষ ধর্মমতকে favour করা সঙ্গত নয়। বিশ্বমানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুরস্ক এই পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়েছে। এমন মনে হয় ভবিষ্যতে সমস্ত state-এই তুরস্কের এই উদাহরণ অনুসৃত হবে। যদি British Government ঘোষণা করেন যে আজ হতে Christianity (Church of England) আর State religion নয় তাহলে হিন্দু মুসলমান উভয়েই কি সন্তুষ্ট হয় না? এ খুবই আশার বিষয় যে সমস্ত মুসলিম দেশগুলি Time spirit-কে অনুসরণ করে চলবার জন্য

ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও Rationalism-এর প্রসার লক্ষিত হয়। ভারতে এ আন্দোলন খুব ধীরে চলছে তথাপি মনে হয় এর উন্নতি অনিবার্য। স্বাধীন চিন্তার হাওয়া বাংলাদেশেও যে এসেছে তার পরিচয় এই ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ হতেই পাওয়া যায়।

এখন বাঙালি-মুসলমানদের অবস্থা কিছু আলোচনা করে দেখা যাক। প্রথমেই চোখে পড়ে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক—এক কথায় এদের সর্বাঙ্গীণ দুর্দশার ছবি। অথচ এদের দুর্দশা বোঝবার মতো শক্তিও যেন এরা হারিয়ে ফেলেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের অবস্থা ভাল না হলেও এদের চেয়ে ভাল। বাঙালি-মুসলমানেরা একরূপ চাষী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষিতের সংখ্যা এত কম যে তা বলতেও লজ্জা হয়। এই শিক্ষাহীনতার জন্য মোল্লা, মোক্তার, উকিল, জমিদার, তালুকদার, মহাজন প্রভৃতি এদের অহরহ শোষণ করতে পারছে এবং এই সমস্ত লোকের এক স্বার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে এদের মূর্খ রাখা। এইসব শোষকদের মধ্যে মোল্লারাই হয়েছে সবচেয়ে ভীষণ। এরা টাকাতো নিচ্ছেই অধিকন্তু ভ্রান্ত আদেশ নির্দেশের বেড়াজালে এদের ভবিষ্যত উন্নতির পথও বন্ধ করে দিচ্ছে।

তথাকথিত আলেমগণের শিক্ষার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহরূপে এক পরকালের মোহ সৃষ্টি হয়েছে। এদের ধারণা হয়েছে এ পৃথিবী তাদের নয়; যারা যত ইমানদার খোদাতালা পৃথিবীতে তাদের তত রোগ শোক কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন, এবং যারা এখানে যত কষ্ট ভোগ করেন পর-জগতে তারা তত বেশি সুখভোগ করবেন। এই পরকালের মোহ, বাস্তবের প্রতি সেই নিদারুণ উদাসীনতারই ফল (Lamentable lack of appreciation of stern realities of life) যা বর্তমানে মুসলিম জগতকে ছেয়ে ফেলেছে। এরূপ শিক্ষা প্রকৃত ইসলামের পরিপন্থী। এ পৃথিবীকে মুসলমানদের ভাল করে চিনতে হবে। যে সব সুন্দর জিনিষ পৃথিবীর দেবার আছে তা খোদার দান বলে কৃতজ্ঞ মনে গ্রহণ করতে হবে এবং ইনসানের উপকারার্থে সেগুলি চালাতে হবে। এই জগতই আমাদের একমাত্র ও প্রকৃত কর্মক্ষেত্র একথা ভুললে চলবে না।

এদিকে অতীতের মোহ মুসলমান সমাজকে এক অভিশাপের মতো পেয়ে বসেছে। এ পৃথিবীতে আমরা আছি এটা যেমন সত্য, বর্তমানে আমাদের কাজ করতে হবে এটাও তেমনি সত্য। অথচ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের গৌরব-কাহিনী কীর্তন করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। অতীতের গাথা আমাদের বুকে যেন কেবলমাত্র আশার গীতি জাগিয়ে তোলে, বর্তমানের পথে চলার যেন প্রেরণা যোগায়। Let us live in the present with an eye to the future. এই সম্পর্কে মুসলমানদের যে চেহারাটা মনে জাগে সেটা এই যে তারা যেন 'না ঘাটকা,

না ঘরকা।' শত শত বৎসর তারা এদেশে আছে অথচ তাদের দৃষ্টি যেন আরবের খর্জুর বন ও পারস্যের দ্রাক্ষাকুঞ্জে নিবদ্ধ। ফলে ভারতীয় বলে নিজেদের ভাবতে পারছে না অথচ আরবি পারসীকও হতে পারছে না। মাতৃভূমিকে স্বর্গাদপী গরিয়সী বলে তারা এখনো ভাবতে শিখেনি। রাস্তা দিয়ে হিন্দু মুসলমান যুবকরা যখন চলে আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি, হিন্দুদের চলাফেরা দেখে মনে হয় তারা যেন নিজের দেশের মাটির উপর দিয়ে চলেছে—দেশ যেন তাদেরই। আর মুসলমানেরা এমনভাবে চলে যেন তারা এখানকার মুসাফির। এ হতভাগ্য 'কওম' কি এখনো ভাববে না যে বাংলা যদি তার দেশ নয়—আরব পারস্য আফগানিস্থান যদি তার দেশ নয় (সে সব দেশ যে তার নয় তা কি সেবারকার হিজরতের পরেও বুঝবে না?) তবে কি সে শূন্যে বাসা নির্মাণ করবে?

দেশকে পর করে দিয়ে দেশের ভাষা মাতৃভাষাকেও মুসলমানেরা ঘৃণার চক্ষে দেখেছে। যদি মাতৃভাষার সঙ্গে বাঙালি-মুসলমানদের নিবিড়ভাবে পরিচয় থাকত, দেশপ্রেম বোধ হয় অন্তরে তার জাগরিত হত। কিন্তু বাংলাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে; তাই তার চিন্তাশক্তি প্রসার লাভ করতে পারেনি। হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা যতটুকু উন্নতি করতে পেরেছে আমার মনে হয় তা তাদের মাতৃভাষা উর্দু চর্চার ফলে। তাদের ভিতর বহু চিন্তাশীল লেখক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু বাঙালি-মুসলমানদের মধ্যে এরূপ কোনো লোক জন্মেননি বলা অন্যায় হবে না। বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষাকে অবহেলা করার দুর্বুদ্ধি কেন হল? অথচ পূর্ববর্তী যুগের মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কি করেছেন তা বঙ্গভাষা ও সাহিতের ঐতিহাসিকগণের জানা আছে। দিগ্বিজয়ী মুসলমানেরা যখন পারস্য জয় করেন—তাঁরা পারস্য ভাষাকে আরবি অক্ষরে গ্রহণ করেন। ভারতে এসে তাঁরা হিন্দিকে গ্রহণ করে আরবি অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করেন। এই ভাষাই উর্দু নামে পরিচিত। বঙ্গদেশে এসে তাঁরা বাংলাকেও আরবি অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করেন। এই চেষ্টা বিশেষভাবে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছিল। অবশ্য এ চেষ্টা সফল হয়নি। রাজ-ভাষা উর্দু ফারসির প্রচলন ক্রমে অধিকতর হয়ে উঠল। মুসলমানদের ভাষা-সাহিত্যের সফলতার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় পারস্য ভাষার ব্যবহারে। ফারসি ভাষার উন্নতি ভাষা সাহিত্যে অতুলনীয়। উর্দুরও উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে কিন্তু বাংলার কিছু উন্নতি হয়ে উঠল না। কারণ উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে বরাবরই তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখে আসছিলেন। কিন্তু আমাদের নিরক্ষর গ্রাম্য কবিরা যে সব সুন্দর কবিতা সংগীত গাথা রচনা করতে পেরেছিলেন তা'র লালিত্য, মাধুর্য, কমনীয়তা অপূর্ব। ময়মনসিং Ballads-এর মধ্যে মুসলমান কবিদের বহু রচনা আছে। সাহিত্য রসিকদের মতে পূর্ববঙ্গের

এই সব গীত ও গাথা অমূল্য বস্তু। যখন মিলামিশায় হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বন্ধনের সূত্রপাত হয়—একে অন্যের আচারপদ্ধতিগুলিকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করে—কখনও বা অনুকরণ করতে থাকে—তখনই পণ্ডিত ও মোল্লারা Religion in danger বলে চিৎকার করে উঠে, তখনই আবার Reaction আরম্ভ হয়। এই Reaction-এর ফলে আমাদের গ্রাম্য কবিদের কবিতার উৎস শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। যদি হাফেজ প্রভৃতির কবিতার 'ময়' 'সাকি' ও 'ময়খানা' ইত্যাদি আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হতে পারে 'রাই' 'কানু' 'ত্রিবেণী' ইত্যাদির অর্থ আধ্যাত্মিকভাবে নিলে কী যে অনর্থ সাধিত হয় বোঝা কঠিন। কত যে প্রতিভা এই Reaction-এর ফলে অকালে বিনষ্ট হচ্ছে তা ভাবতেও কষ্ট হয়। যে গীত রচনা করতে পারে তাকে তা করতে দেওয়া হবে না, যে গাইতে জানে তাকে গাইতে দেওয়া হবে না, যে চিত্র আঁকতে পারে তাকে চিত্র আঁকতে দেওয়া হবে না, যে অভিনয় করতে জানে তাকে সে শক্তির বিকাশ করতে দেওয়া হবে না—পদে পদে বাধাবিপত্তি। ফল এই হয়েছে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে হাসি ও আনন্দ এক কথায় 'Joi de vivre' নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এইসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাহিত্যশিল্পের বিকাশ অসম্ভব। বাঙালি-মুসলমানের তাই সাহিত্য প্রভৃতি কিছুই নাই বললেই চলে। কলা, শিল্প, সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য স্বাধীন চিন্তা Freedom of thought and expression-এর একান্ত আবশ্যক।

এই মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলক বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। যে Primary Education বা প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় আলোচনা চলছে তার প্রচলন যত শীঘ্র করা হয়, ততই মুসলমানদের মঙ্গল। Literacy-তে মুসলমানেরা depressed class-এর হিন্দুদের চাইতেও নিম্নে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থের সঙ্গে তো তুলনা করা চলেই না, কেননা তাদের স্ত্রীপুরুষ ধরতে গেলে cent percent-ই literate. Literacy-র প্রসার না হলে সমাজের উন্নতি হবে না—সমাজের চিন্তা করবার শক্তি আসবে না। অথচ সমাজের চিন্তা করবার শক্তি যে পর্যন্ত না আসে, বা বৃহৎ কল্পনা বা idea তাকে অনুপ্রাণিত না করে সে পর্যন্ত এর উন্নতির কোনোই আশা নেই। সামাজিক বা জাতীয় জীবনে আর্থিক অভাব তত গুরুতর নয়, যত গুরুতর চিন্তা বা ভাবের দৈন্য। মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে বর্তমান জগতের ভাবধারার সাথে পরিচিত করে দিতে হবে আমাদের সমাজকে—তাহলেই আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হবে। জার্মান কবি Goethe-র কথাটি যেন আমাদের মনে থাকে, 'It is easy to act but difficult to think.' বাস্তবিকই যে জাতি যে দিন থেকে চিন্তা করতে শিখেছে সেই দিন হতে তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখা দিয়েছে। জার্মান জাতির ইতিহাস এ বিষয় খুব উপদেশপূর্ণ।

ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে বলা চলে যে, যে পর্যন্ত না আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলি মাতৃভাষায় অনূদিত হয়, সে পর্যন্ত আশা করা বৃথা যে আমরা সত্যিকার ধার্মিক হতে পারবো। Europe-এ Reformation এসেছিল Bible vernacular-এ তর্জমা হওয়ার পরে। আজ বাংলা সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য বলে আমরা আক্ষেপ করে থাকি, যদি উর্দু ফারসির মোহ ত্যাগ করে বাঙালি-মুসলমানেরা নিজদের মাতৃভাষা শিখবার চেষ্টা করত, তাহলে তাদের এ আক্ষেপ করতে হতো না; অথচ মাতৃভাষা শিক্ষা করা কী সহজ! শুধু কয়েকটি অক্ষর পরিচয় হলেই একটা ভাষা শেখা যায়। ব্যাকরণের কোনো বালাই নেই। সামান্য অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গেই একটি সাহিত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। আজকাল বাংলা বইগুলিতেও এমন ভাষায় লেখা হচ্ছে, যে তা বুঝতে কারো কষ্ট হয় না। Law of demand and supply অনুসারে একটি বিরাট মুসলিম সাহিত্যের অচিরেই সৃষ্টি হবে। অর্থনীতি, সমবায়, কৃষি, স্বাস্থ্যনীতি, পশুচিকিৎসা প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে মুসলমানদের জানা একান্ত আবশ্যক। এসব বিষয়ে সহজ ভাষায় বই লিখতে হবে। তাহলে আমাদের কৃষকদের জীবন সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়ে উঠবে। আমাদের এ কথা মেনে নিতে হবে যে মাতৃভাষার মতো এমন আবশ্যকীয় তথা পবিত্র ভাষা আর নেই।

আরবি ফারসি উর্দু বা মাদ্রাসা মক্তবের মোহে পড়ে মুসলমানদের যে কি অনিষ্ট সাধন হচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না। এই শিক্ষাতে বুদ্ধি কোনোরূপ প্রসার লাভ করতে পারে না। এতে অযথা সময় শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়। Dr. Stoddard তাই এই শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : 'The traditional Education in the entire orient from Morocco to China was a mere memorising of sacred texts combined with exercises of religious devotion. The Mahomedan or Hindu student spent long years reciting to his master (a 'holy man') interminable passages from books which, being written in classic Arabic or Sanskrit, were unintelligible to him, so that he usually did not understand a word of what the was saying. No' more deadening system for the intellect could possibly have been devised. Every part on the brain except the memory, atrophied and the wonder is that any intellectual or original thinking ever appeared.'

অনেক সময় আমাদের মাদ্রাসায় ছাত্রদের অবস্থা, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে কষ্ট হয়। দেখেছি গ্রীষ্মে শীতে বর্ষায় বড় বড় কেতাব নিয়ে এই সব ছেলেদের মাদ্রাসায় যেতে। মুখে তাদের ক্ষুধার চিহ্ন, গায়ে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাব—জায়গিরে থেকে দশ বারো বছর কত কষ্ট করে পড়ছে! অথচ তাদের ভবিষ্যৎ কি? স্মরণ আছে একবার কোনো District board-র meeting-এ প্রস্তাব

হয়েছিল যে New Scheme মাদ্রাসার Experiment-এর জন্য সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে Old Scheme মাদ্রাসায় সাহায্য দেওয়া হোক, কারণ New Scheme মাদ্রাসায় পড়া যুবকরা জানাজার নামাজ পড়াতে পারে না!! এতে মনে হয় যেন সমস্ত মুসলিম বঙ্গ মৃত বা মৃতপ্রায় হয়ে আছে, কেবল আমাদের মৌলবী মৌলানা সাহেবেরা দয়া করে জানাজা পড়ে কবরস্থ করলেই হয়। আজকাল মাদ্রাসার সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে। এক গ্রামে একটি মাদ্রাসা হলে অন্য গ্রামের লোকেরা অন্য একটি না খুলতে পারলে তাদের মানের লাঘব হল বলে মনে করে। আমি দেখেছি গ্রামে গ্রামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর District board-এর Free primary school ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বহু কারণে আমাদের ত্যাগ করতে হবে। এই গোটা System-টিই বিজ্ঞানসম্মত নয়। Stoddard থেকে ইতোপূর্বে যে quotation দেওয়া গেছে তা থেকেই বেশ বোঝা যায়। যদিও New Scheme মাদ্রাসা Old Scheme মাদ্রাসার তুলনায় মন্দের ভাল বলা যেতে পারে তবুও আমার বিশ্বাস পরিণামে এও মুসলমানদের জন্য অনিষ্টকর হবে। জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের সমস্ত শক্তিই নিয়োজিত করতে হবে এই জীবন সংগ্রামের জন্য। এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে অহর্নিশি জীবনমরণ সংগ্রাম চলছে, এই যুদ্ধে জয়ী হতে হলে অযথা শক্তির অপচয় করলে চলবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা জীবনচালনপ্রণালী গঠন করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা এই জীবন যুদ্ধের জন্য আমাদের কতটা উপযুক্ত করে গড়তে পারে তা বিবেচনার বিষয়। এতে ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি প্রভৃতি modern subjects শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা নেই অথচ এগুলি শিক্ষা না করলে বর্তমান জগতে জীবিকা অর্জনই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্যপক্ষে এখানে এমন কতকগুলি ভাষা ও বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় যা বাঙালির জীবিকার্জনের জন্য আদৌ আবশ্যকীয় নয়। এই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আমাদের মুসলমানদের অতিরিক্ত নজর থাকাতে শিক্ষা বিষয়ে তথা আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও প্রতিবেশী হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছনে পড়ে যাচ্ছি। তাই আমার বক্তব্য যে আরবি ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা Classics রূপে স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে হওয়াই যথেষ্ট। মাদ্রাসা শিক্ষার আবশ্যকতা কি? যদি ধর্মজ্ঞান বিস্তারের জন্য এর আবশ্যক হয়, সে উদ্দেশ্য তথাকথিত মাদ্রাসার সাধিত হচ্ছে না, সে জন্য দরকার মাতৃভাষায় ধর্মগ্রন্থগুলির অনুবাদ কেননা একমাত্র তাতেই সর্বসাধারণের পক্ষে ধর্মশিক্ষা সম্ভবপর হবে। যদি Classics পড়ার জন্য এর আবশ্যক হয়—সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে এগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ালে। বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীতে পড়া হয় বলে আজকাল আরবি

ও সংস্কৃতের চর্চা জার্মানি ও ফ্রান্সে যেরূপ হয় আরব বা ভারতে সেরূপ হয় না।

State দেশের দশজনের জন্য, তার অনুষ্ঠানগুলিও সাধারণের উপকারের জন্যই। সেগুলি ভাল না হলে দেশের প্রয়োজনানুসারে তাদের সংশোধন করা যেতে পারে, কিন্তু সে গুলিকে boycott করে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করতে যাওয়া মারাত্মক। গভর্ণমেন্ট প্রবর্তিত ইউনিভার্সিটির আবশ্যকানুযায়ী সংস্কার করে দেওয়া দরকার, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়।

আমাদের মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্য-বিবাহ পর্দা সম্বন্ধে ইতোপূর্বেই অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। নতুন করে এ বিষয়ে বলবার কিছুই নেই; তবুও অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলতে হচ্ছে কেননা কিছু না বললে কেউবা মনে করেন বিষয়টিকে আমি ততটা গুরুতর বলে মনে করি না। ঠিক তার উল্টো—ভারতীয় মুসলমানের জন্য পর্দা ও স্ত্রীশিক্ষা সমস্যা যেরূপ গুরুতর হয়ে উঠেছে এরূপ আর দ্বিতীয়টি নেই। একথা আজ সর্ববাদী সম্মত যে শিক্ষা ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব। অন্যপক্ষে পর্দা উঠিয়ে না দিলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব এটাও প্রমাণিত হয়েছে। এইসব খেয়াল করে উন্নততর মুসলিম দেশগুলি পর্দা তুলে দিয়েছে এবং মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বাস্তবিকই মেয়েদের শিক্ষা না দিলে দেশের মঙ্গল কি করে সম্ভবপর হবে? মেয়েরা পঙ্গু হয়ে থাকলে সমাজের এক অর্ধেক যে কেবল পঙ্গু হয়ে রইল তা নয়—বাকী অর্ধেকও অকেজো হয়ে পড়ে। এ পয্যন্ত মেয়েদের আমাদের দেশে কেবল Child bearing machine করে রাখা হয়েছে। কিন্তু একটা machine-এর দ্বারাও ভালো কাজ পাবার জন্য তার যতটা যত্ন নেওয়া দরকার মেয়েদের প্রতি তাও আমরা নেইনি। সুন্দর স্বাস্থ্যবান সন্তান ধারণ করতে হলে মাকে স্বাস্থ্যবতী হতে হবে, কিন্তু কৈ, আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য কোথায়? অস্বাস্থ্যকব গৃহে আজীবন বদ্ধ থাকার দরুণ তাদের মনও দিন দিন সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—তাদের স্বাস্থ্যও তেমনি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। Dr. Bentley প্রভৃতির health report দেখলে জানতে পারা যায় যে কী ভয়াবহরূপে মুসলমান মেয়েরা যক্ষ্মা রোগে মারা যাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ খোলা হাওয়া ও আলোর অভাব—অর্থাৎ পর্দা। এদিকে এই স্বাস্থ্যহীনা মেয়েরা যেসব সন্তান প্রসব করছেন তারা স্বভাবতই হীন স্বাস্থ্য নিয়ে এসে জাতিকে দুর্বল করে ফেলছে। বাস্তবিকই এই পর্দা যে কি ঘৃণিত অনুষ্ঠান তা ভাবতেই লজ্জা হয়। এটি নারীত্বের প্রতি এক নিদারুণ অপমান বা standing insult স্বরূপ। এ সর্বক্ষণই যে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে sex-life ছাড়া অন্য কোনো জীবন মেয়েদের নেই। এই পর্দা প্রথার ফলে আমার মনে হয় আমাদের মেয়েদের অতি অল্প বয়সেই sex consciousness এসে পড়ে। এখনও এই সব কুৎসিত প্রথা বাঁচিয়ে রাখায় ভারতীয় মুসলিম সমাজকে মধ্যযুগের যাদুঘর বা Museum বলেই মনে হয়। যদি

মানুষ হিসাবে মেয়েদের দাবির কথা আলোচনা করা যায়—তা হলে বলতে হয় পুরুষের কোনো অধিকারই নেই মেয়েদের এরূপ আটকে রাখার। যদি ধর্মের কথা বলা হয়—তাহলে দেখতে পাই ইসলামে এমন কোনো নির্দেশ নেই যদ্বারা এইরূপ অবরোধ প্রথা সমর্থন করা চলে! যদি এর ভাল মন্দের আলোচনা করা হয় তা হলে দেখতে পাই এর চাইতে অনিষ্টকর institution মানুষের কল্পনা কোথাও কোনো দিন সৃষ্টি করেনি।

মেয়েদের শিক্ষার দরকার কেন? যদি মেয়েদের আর কিছুই না হতে হয়, তাদের গৃহিণী ও মাতা এ দুটিতো নিশ্চয়ই হতে হবে। শিক্ষার অভাবে তাঁরা বর্তমান জগতের প্রয়োজনানুযায়ী সুগৃহিণী হতে পারছেন না। সুজননীতো নয়ই। শিক্ষা না পাওয়ায় তাদের মনের প্রশস্ততা জন্মাতে পারে না; এমনকি স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ যে জ্ঞান সকলের থাকা দরকার তাও তাদের হয় না। সে কারণে কি গৃহস্থালী কি সন্তান পালন কোনোটাই তারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে না। মায়েদের অজ্ঞতার দরুণ অনেক শিশুই যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তা বোধ হয়, আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হতে সাক্ষ্য দিতে পারবো। এই গেল সাধারণ গৃহস্থালী কাজের জন্য শিক্ষার আবশ্যকতা। কিন্তু এ সামান্য শিক্ষাই মেয়েদের জন্য যথেষ্ট নয়। বৃহত্তর জাতীয় জীবনে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের উচ্চ শিক্ষা পেতে হবে। স্বামীর সহধর্মিণী, সহকর্মিণী হবার জন্যে হতে পারে না। মূর্খ স্ত্রী পণ্ডিতের কিরূপ ভাবে সহকর্মিণী হতে পারে? বিশেষ কথা আমাদের দৃষ্টিকে বিস্তৃত করবার সময় এসেছে, ক্ষুদ্র সংসার প্রাঙ্গন ছেড়ে বৃহত্তর জাতীয় জীবন—তার সমাজ ও সভ্যতার বিষয়—ভাবতে হবে। নারীর শারীরিক বীর্য, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি হেলার বস্তু নয়। তার সেই ঘুমন্ত শক্তি পুরুষের শক্তির সঙ্গে মিলিত করতে হবে; তাহলেই জাতির কল্যাণ হবে। আজ ইংরেজ আমেরিকান তুর্কী প্রভৃতি জাতির কথা ভাবলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

অন্য বিষয়ে আলোচনা করবার পূর্বে বাল্যবিবাহ তথা শর্দা-আইন সম্বন্ধে দুটি কথা বলা বোধ হয় অবান্তর হবে না। বাল্যবিবাহ যে দূষণীয় এতে সন্দেহ নাই। এতে একদিকে যেমন মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং তজ্জন্য সন্তানের স্বাস্থ্য খারাপ করে, অন্যপক্ষে মেয়েদের শিক্ষায় ভয়ানক বাধা জন্মায়। তা হলে শর্দা-আইন সম্বন্ধে এত আপত্তি কেন? Orthodox party বলছেন সমাজ নিজে ধীরে ধীরে এ প্রথা ত্যাগ করবে, সে জন্য আইন করা কেন? কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে শাস্ত্র ও শরিয়ত প্রপীড়িত ভারতে আইন ছাড়া কি এ দূর করার সম্ভাবনা আদৌ আছে? আইন না হলে সতীদাহ প্রথা এতদিনে উঠে যেত কি? মুসলমানদেরতো বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন হওয়ায় কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না, কারণ ইসলামের বিধি অনুযায়ীই বাল্য বিবাহ একরূপ হতে পারে না। মুসলমান সমাজের বিবাহ social

contract বা civil marriage-এর মতো। তা হলেই বোঝা যায় contracting parties নিশ্চয়ই বালেগ বালেগা হবেন—না হলে free consent দেওয়া সম্ভব কি? Muhammedan Law-তে adult marriage সম্বন্ধে যেরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে এমন আর কোথাও নেই। 'বাপ' ও 'দাদা' ভিন্ন অন্য কেউ না বালেগা অবস্থায় কোনো মেয়ের বিয়ে দিলে, বালেগা হওয়া মাত্র সে মেয়ে ইচ্ছা করলে সে বিয়ে বাতিল করে দিতে পারে। মুসলমান আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে, উপযুক্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। পিতা পিতামহের discretion-এর জন্য একটা exception clause রাখা হয়েছে মাত্র। কিন্তু এই discretion অনেক স্থলে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়েছে। অনেক সময় নিজ নিজ স্বার্থের বশীভূত হয়ে পিতা পিতামহ অল্প বয়সের মেয়েদের অনুপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করে তাদের সমস্ত জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে। সময় এসেছে—পবিত্র ইসলামিক আইনের মহান উদ্দেশ্যের ধারার অনুসরণ করার। যাঁরা শুধু literal sense নিয়ে ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার প্রয়াস পান, তাঁরা ভেবে দেখেন না যে ইসলামের কতদূর অনিষ্ট করছেন।

নারীসমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সমাজের অনেক হিতৈষীরা এ পর্যন্ত বহু প্রবন্ধ লিখেছেন ও বক্তৃতা করেছেন; কিন্তু কার্যকালে কেউই বিশেষ কিছু করেননি। তাঁরা বোধহয় ভুলে যান যে an ounce of example is worth a ton of precepts. যা ন্যায় বলে মনে করা যায় তাম্ব না করার চাইতে কাপুরুষতা নেই।

মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সব চেয়ে হৃদয়বিদারক। অর্থই জাতির শোণিত wealth is the blood of a community. যদি কোনো লোকের শরীরে কোনো জখম হয় এবং তা হতে ক্রমাগত রক্তপাত হতে থাকে তা হলে যেমন তার মৃত্যু অনিবার্য, মুসলমানদেরও শোণিতরূপ অর্থ ক্রমাগত বের হয়ে তারা যেরূপ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে এবং তা নিবারণার্থে যেরূপ কোনো ব্যবস্থা করাও হচ্ছে না, তাতে এ সমাজ সত্বরই ধ্বংস মুখে পতিত হবে। ধীরভাবে আমাদের সুদ সমস্যাটিকে বিচার করে দেখা কর্তব্য। অর্থাভাব হেতু আমাদিগকে ক্রমাগত মহাজনের নিকট হতে ঋণ করে সুদ দিতে হচ্ছে। কিন্তু হারাম বলে ঋণ দিয়ে সুদ নেবার বিধি আমাদের নেই। কি spirit-এ রেবা নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং কোন সুদ রেবা, তা বিবেচনা করে না দেখে আমরা শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছি! যাতে লোকের উপর জুলুম করা হয় এরূপ সুদ গ্রহণ করা পাপ। কোরানের মধ্যে usury condemn করা হয়েছে।

'ইয়া অইও হাল লাজিনা আ মানুলা তা কুলুরেব! আদ-আ ফাম মুদা-আ-ফাতান।'

'Do not devour usury making addition again and agani of doubling and redoubling.'

Banking system-এর সুদে ব্যক্তিবিশেষের উপর জুলুম হয় না, কাজেই আমাদের এটাকে রেবা বলে হারাম করা সঙ্গত হবেনা। অন্যপক্ষে বাজারদর সুদ market rate of interest নিয়ে কর্জ দেওয়াও অসঙ্গত বোধ হয় না। আমার কোনো বন্ধুর কথা জানি, যিনি provident fund-এর সুদ হারাম মনে করে বছর হাজার টাকা করে গভর্ণমেন্টকে ছেড়ে দিচ্ছেন। এখন মনে করুন এই টাকাগুলি মুসলমান শিক্ষার জন্য কিংবা এই দুর্ভিক্ষের দিনে Relief work-এ ব্যয়িত হলে কি দেশের উপকার হত না? বালুর ঘাটের দুর্ভিক্ষের সময় সে বন্ধুকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে তুমি এ টাকা নিয়ে নিজে ব্যবহার না করে এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থানের জন্য ব্যয় কর। কিন্তু বন্ধুবর কিছুতেই সম্মত হলেন না। এরূপে কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে মুসলমানেরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য হারাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এই সমাজের লোকই অন্নাভাবে মরছে, অর্থাভে পীড়িতের চিকিৎসা হচ্ছে না এবং সহস্র সহস্র মেধাবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সংস্থান হচ্ছে না। মুসলমানদের রেবার বিকৃত অর্থ করে যে কোনো সুদকে নিষিদ্ধ মনে করায়, গোটা সামাজিক জীবনে লাভ ও ক্ষতি যার উপরে ভিত্তি করে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলে-সেই লাভ ও ক্ষতির ধারণাটি তাদের ভিতর লোপ পেয়ে গিয়েছে। ফলে মুসলমানেরা বেহিসাবী হয়ে পড়েছে। তাই তাদের ভিতরে দেখা যায় অমিতব্যয়, অপব্যয়, সঞ্চয়ের প্রতি উদাসীনতা।

বাঙালি-মুসলমানের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তার প্রতিবেশী হিন্দুর সম্বন্ধে দু একটি কথা না বললে এ প্রসঙ্গ একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হিন্দু আজ শিক্ষা-দীক্ষা সর্ব বিষয়ে মুসলমান হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে। তারা বিশ্ব-সভ্যতায় ইতোমধ্যেই অনেক কিছু দান করেছে। জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আজ তাই জগদ্বিখ্যাত। ব্যবসা বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রেও হিন্দু আজ দিন দিন খুবই সফলকাম হচ্ছে। তুলনামূলক সমালোচনা করলে তাই দেখা যায় হিন্দু আজ জমিদার, মুসলমান তার প্রজা, হিন্দু আজ চিকিৎসক, মুসলমান চিকিৎসিত রোগী, হিন্দু প্রফেসার, মুসলমান ছাত্র, হিন্দু উকিল, মুসলমান মক্কেল, হিন্দু সওদাগর, মুসলমান তার খরিদ্দার, হিন্দু উত্তমর্ণ বা মহাজন, মুসলমান অধমর্ণ বা দায়িক—এক কথায় জাতীয় জীবনে সমস্ত দিকে হিন্দুর প্রভাব অনুভূত হয়। মুক্তি কিসে হিন্দু সে কথা বুঝতে পেরেছে। মুসলমান এখনও যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হিন্দুর কর্মধারা আজ সহস্রমুখে উৎসারিত হচ্ছে—আর মুসলমান এখনও যেন নেশাখোরের মতো ঝিমোচ্ছে। হিন্দু যুবকেরা আজ কী প্রাণোন্মাদনায়ই না মত্ত; তারা বন্যা দুর্ভিক্ষের সময় যে অদম্য উৎসাহের সহিত পীড়িতদের শুশ্রূষা করে, তা অতীব প্রশংসার বিষয়। হিন্দুর সেবাশ্রম, night স্কুলরূপ বহু সদানুষ্ঠান দেশে প্রভূত কল্যাণ সাধন করছে।

অবশ্য সমাজ হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে এখনও বহু কু-প্রথা আছে—সে সবের সংস্কার হওয়া একান্ত দরকার। তাদের অস্পৃশ্যতা, বর্ণবিভাগ প্রভৃতি সমস্যাগুলির এখনও সুমীমাংসা হয়নি। তাদের বিধবাদের দশা এখনও আগের মতই মর্মবিদারক; পণপ্রথা এখনও বহু পরিবারের সর্বনাশ সাধন করছে। কিন্তু এদিকেও হিন্দুরা চুপ করে বসে নেই। এই বাংলাতেই গত একশত বছরের মধ্যে কত না মহাপ্রাণ সংস্কারক এলেন, তাদের সমাজের সংস্কারের জন্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, কেশব প্রভৃতির নাম প্রাতস্মরণীয়। কিন্তু বাংলার বাহিরের দু'এক জনের কথা ছেড়ে দিলে গোটা ভারতীয় মোসলেম সমাজে এমন একজন সমাজসংস্কারকও জন্ম নেননি, যাঁর কথা মনে করে এতটুকু গর্বও অনুভব করা যায়। বাস্তবিকই আজ দেড়শত দুশত বছর ধরে বাঙালির, তথা ভারতীয় মুসলমানদের ভিতর কী মৃত্যুসম অবসাদ, কী ভীষন চিন্তার দারিদ্র্য—ভাবের দৈন্য, ভাবুকের অভাবই না দৃষ্ট হয়। ফলে মুসলমানদের ভিতর এখনও সেই ঘৃণিত পর্দা প্রথা তেমনি অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করছে—মৌলানা মৌলবী সাহেবদের দাওয়াত খাওয়ার ঘটা কথায় কথায় কাফেরী ফৎওয়া দেওয়া তেমনি জোরে-শোরেই চলছে। আজ মুসলমানদের একতার আদর্শ নিয়ে হিন্দুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে—যারা ইতোপূর্বে অহিন্দু বলে পরিচিত ছিল, আজ হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে—আর তারা হিন্দু বলে পরিচিত হচ্ছে—কিন্তু মুসলমানেরা আজ নিজেদিগকে শতভাগে বিভক্ত করে দুর্বল হয়ে পড়ছে। শিয়া, সুন্নি, হানাফি, হাম্বলী প্রভৃতি দলতো আগে হতে ছিল, এখন বাংলাদেশে এক হানাফী বিভাগই না কত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন মৌলানা সাহেবদের নেতৃত্বে পরস্পরকে গালাগালি ও কাফেরী ফৎওয়া দিয়ে ও বিবাহ-সাদী, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি সামাজিক কার্য কলাপে পরস্পরকে একঘরে করে, কি ভয়াবহভাবেই না ইসলামকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও শক্তিহীন করে তুলছে। এক কথায় বলতে গেলে, বর্তমানে হিন্দুরা পরকে আপন করে নিচ্ছে, আর মুসলমানরা আপনকেও পর করে দিচ্ছে।

ইতোপূর্বে মুসলমানেরা স্বাস্থ্য ও শারীরিক বীর্য হিসাবে দেশের গৌরব ছিল। কিন্তু আজকাল তারাই দুর্বল ও ভীরু বলে কলঙ্কিত হচ্ছে। হিন্দুরা শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আজ খেলাধূলায় দেশ বিদেশ হতে তারা জয়মালা নিয়ে আসছে। শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক শৌর্যও তাদের ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। বিমানপোত চালনা প্রভৃতি সাহসিক কার্যে তারাই আজ অগ্রগণ্য। মুসলমান এসব কি করে করবে? তাদের মৌলানা সাহেবরা যে বলেছেন এসব হারাম! হায় হতভাগ্য সমাজ!

মুসলমানদের কর্তব্য তুরস্ক, ইজিপ্ট, পারস্য প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলির বর্তমান যুগের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা। হালিদা এদিব, সেখ

মুহম্মদ আব্দুহ প্রভৃতি বিদেশীয় লেখক লেখিকাদের লেখা পড়লে, তাদের ভিতর উন্নত হবার স্পৃহা জাগরিত হবে। তাদের চোখের সামনে ভবিষ্যত উন্নতির পথ খুলে যাবে। বিশেষ করে তাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী কুসংস্কার ও অবসাদের শৃঙ্খল থেকে বীর সামসনের মতো কি অদম্য Determination-এর বলে মুক্ত হচ্ছে, এবং শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে তা তাদের অনুধাবন করা দরকার।

এই সম্পর্কে গত কয়েক বৎসর হিন্দু মুসলিম বিরোধের কথা স্মরণ হয়ে মনে বড়ই দুঃখের উদ্রেক হচ্ছে। এ নিতান্তই লজ্জার বিষয় যে একই দেশে যাদের জন্ম—একই দেশের আলো-বাতাস যাদের প্রাণে আনন্দগান বহন করে আনে, একই দেশের মাটি যাদের শেষ শয্যা—তাদের মধ্যে কলহ, তাদের মধ্যে বিরোধ। এর কারণ আমার এই মনে হয় যে, হিন্দু মুসলমান এখনও পরস্পরের সহিত ভালরূপে পরিচিত হতে পারেনি—বিশেষত আজও তারা বৃহত্তর জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়নি, বা ভাবতে শিখেনি।

হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য পরস্পরকে পরস্পরের সভ্যতা ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য পরস্পরের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প নিবিড় ভাবে জানতে হবে। তাদের ক্রমে ক্রমে এই মনোভাব আনয়ন করতে হবে যে হিন্দু মুসলমান এক জাতি, ভারতীয়। তাদের মনে করতে হবে যে শুধু ধর্ম বিষয়ে তারা হিন্দু তারা মুসলমান-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তারা ভারতীয়। এ কথা স্মরণ থাকলে যে পরমত-অসহিষ্ণু militant Islam ও militant Hindusim দেখা দিয়েছে তা অচিরেই দূরীভূত হবে। এই দুই জাতির ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের পথ সহজ করণার্থে পরিবারে পরিবারে এদের সামাজিক ভাবে মেলা-মেশার ব্যবস্থা করার দরকার হয়েছে। বিশেষ করে এমন উদার সাহিত্য প্রচলনের ব্যবস্থা করা দরকার মনেহয়, যাতে জাতিবিদ্বেষ আদৌ স্থান পাবে না। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মিলন হওয়া খুব সোজা—কেননা সাহিত্য চিন্তার বাহন হওয়ায় যেরূপ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন আর কিছুতেই নয়। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি আনয়ন ও মিলন স্থাপন আপনাদের সাহিত্য সমাজের এক মহান প্রয়াস হোক।

আশা হয় ইসলামের প্রাণশক্তি এখনও নিভে যায়নি। মনীষী H.G. Wells বলছেন—'Islam is an open air religion, it knows not how to die,' এ কথার সত্যতা কি আজ প্রমাণিত হচ্ছে না? আরবে, তুরস্কে, পারস্যে ইসলামের কি নব অভিযান শুরু হয়নি? আমার মনে হয়—এবং বহু ইউরোপীয় মনস্বীরাও বলছেন যে ইসলামে এমন একটি vitality আছে যে তার গভীর নিরাশার সময় এমন এক একটি মহাপুরুষের সে জন্ম দেয়, যিনি এই ঘন নিরাশার কালিমাকে আশার আলোকে রূপান্তরিত করে তুলেন। মুস্তফা কামাল, রেজাশাহ, ইবনে সউদ,

আমানুল্লাহ, নাদির খাঁ প্রভৃতি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করছেন। মুসলমানদের ভিতর এমন একটা Stamina আছে যে যদি তার মুক্তি কিসে এ একবার বুঝতে পারে, তবে তাদের কোনো প্রতিবন্ধকই আটকিয়ে রাখতে পারবে না।

Stoddard পঞ্চদশ শতাব্দীর খ্রিস্টানদের সঙ্গে বর্তমান মুসলমানদের তুলনা করে বলেছেন : 'ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে, Reformation এর প্রারম্ভে, খ্রিস্টীয় জগতের যে অবস্থা ছিল, মোসলেম জগতের আজ ঠিক সেই অবস্থা। reason-এর উপর dogma-র একই রকম প্রাধান্য ও একই রকমের অন্ধ গতানুগতিকতা, এবং স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান চর্চার প্রতি একই রকমের সন্দেহ ও বিরুদ্ধভাব। সন্দেহ নাই, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থাদি বিশেষত শরিয়ত পড়লে, এবং তাদের গত সহস্র বৎসরের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করলে মনে হয় যে ইসলাম বর্তমান উন্নতির এবং সভ্যতার পরিপন্থী। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খ্রিস্টীয় জগতের কি হুবহু এই অবস্থা ছিল, না? শরিয়তকে খ্রিষ্টান Canon Law-র সঙ্গে তুলনা কর, দুটিরই উদ্দেশ্য এক। উদাহরণ স্বরূপ সুদ নেওয়ার নিষেধ বিধির উল্লেখ করা যেতে পারে যা মানলে আধুনিক জগতের শিল্প বাণিজ্য অসম্ভব হয়ে পড়ে; ইসলাম যে বর্তমান সভ্যতার সম্পূর্ণ অনুপযোগী তার প্রমাণ স্বরূপ এই সুদ নিষেধ বিধিকেই দেখা হয়। খ্রিস্টান Canon Law ঠিক এইভাবেই সুদ নিষেধ করেছিল। এত কড়াকড়িভাবে এই নিষেধ বিধি চালিয়েছিল যে কয়েক শতাব্দী ব্যাপি ইউরোপের সমস্ত কারবার ইহুদীদের একচেটিয়া ছিল। যেসব খ্রিস্টান সর্বপ্রথম সুদে টাকা খাটাতে সাহস করেছিল, (The Lombards) তারা প্রায় ধর্মদ্রোহী বলে বিবেচিত হতো, এবং সকলেই তাদের ঘৃণা করত এবং অনেক সময় তারা অত্যাচারিত হত।

স্বাধীন চিন্তা এবং বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধের কথা দরা যাক! ন্যূনাধিক তিনশত বছর পূর্বে Papal Inquisition মহাত্মা গ্যালিলিওকে 'পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে' এই সর্বনেশে ধর্মদ্রোহী (?) মতো অস্বীকার করতে ভীষণ শারীরিক অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিল। ইসলামের ইতিহাসে এর চেয়ে জঘন্যতর কিছু আছে কি?

Christianity যদি এ সব কুসংস্কার অজ্ঞানতা প্রভৃতির আবর্জনা হতে মুক্ত হতে পেরেছে তবে ইসলাম কেন পারবে না?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে জগৎ ও জীবন

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন জগৎ ও মানুষের জীবনকে কি ভাবে দেখিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে তাদের উপদেশ কি, সেই কথাই আমার আজ পনের মিনিটের ভিতর এইখানে বলিতে হইবে। সকলেই জানেন যত সব বিদ্যা মানুষ এযাবৎ আয়ত্ত করিয়াছে, তার ভিতরে এক গণিতশাস্ত্র বাদ দিলে বোধ হয় দর্শনের চেয়ে প্রাচীন আর কিছু নয়। সে সব বিদ্যা ও বিজ্ঞান আজ সভ্যতার আসর জমকালো করিয়া বসিয়া আছে, সে সকলের কারুরই যখন জন্ম হয় নাই—তখনও দর্শন তার ভাবের প্রবীণতায় এবং ভাষার মুখরতায় সভ্যতামুখী মানুষের জীবনকে বৈচিত্রমণ্ডিত করিয়া দিতেছিল। এশিয়ার, বিশেষত ভারতের জাতি সমূহের সময় গণনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা খুব শ্রদ্ধাবান নহেন; সুতরাং এসব দেশের কথা বাদ দিয়াও যদি কেবল ইউরোপের দর্শনের ইতিহাসের দিকেই তাকাই, তাহা হইলে ন্যূনকল্পে দর্শন-শাস্ত্রের বয়স ২৫০০ বৎসর হইবে। এই পঁচিশ শত বৎসরের চিন্তাধারায় মানুষের জীবনকে কিভাবে দেখা হইয়াছে, তাহা বলিবার জন্য আমি যে সময়টুকু পাইয়াছি, এই দীর্ঘ আয়ুর অনুপাতে তাহা কত, সে বিচারের ভার গণিতজ্ঞের উপর রহিল; তবে আমার ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য এই কথাটিকেই আমি যথেষ্ট কৈফিয়ত মনে করি।

দার্শনিকেরা সংক্ষেপ ও বিস্তার এই দুই প্রকার ক্রিয়াতেই পটু বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, অবশ্যই অজ্ঞলোকে তাঁদের সাধারণত যে দুর্নাম করিয়া থাকে সেটি এই যে তাঁরা অনাবশ্যকরূপে বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া থাকেন; কিন্তু সুধীজনমাত্রেই বোধ করি ইহাও স্বীকার করিবেন যে, প্রয়োজন হইলে দার্শনিকেরা অল্প কথায়ও কাজ সারিতে পারেন। ভারতীয় সুত্রসাহিত্যের কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা না মানিয়া পারিবেন না যে, পাঁচ সাতটি কথার ভিতরে ৫/৬ শত পৃষ্ঠার মালমসল্লা সেখানে সহজেই পুরিয়া রাখা যাইতে পারে। আর বেদান্তের সহিত যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে—'ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং'—এই ওঁকারে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্তই রহিয়াছে এবং এক ওঁকার উচ্চারণ করিলেই সমস্তই বলা হয়। ইহার চেয়ে সংক্ষেপোক্তির দৃষ্টান্ত আব কোথায় পাওয়া যাইবে? সুতরাং আড়াই হাজার বৎসরের চিন্তা-সমষ্টিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পনের মিনিটের ভিতর পুরিয়া দেওয়া যায়, হয়তো।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে সাধারণত তিনটি যুগ কল্পিত হইয়া থাকে—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। এই তিনটি যুগের প্রত্যেকেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে—গোড়াতে সেই কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার। প্রাচীন যুগ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা গ্রীকদের যুগ। এই যুগের দর্শন গ্রীক জাতির কৃতিত্ব;—তারা কখনও বা এশিয়ার পশ্চিম উপকূলে ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ, কখনও বা এথেন্সে আবার কখনও বা মিশরের উত্তরাংশে কিংবা ইতালী ও সিলিলি দ্বীপে—তাদের দার্শনিক প্রচেষ্টার কেন্দ্র করিয়া লইয়াছিল। ভূমধ্য সাগরের ঐ চারটি দিক ঘুরিয়া তাদের গবেষণা স্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল। এই জাতির জীবনের বৈশিষ্ট্য তাঁদের দর্শনের উপর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। এঁদের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এঁরা খ্রিস্টান ধর্মের বাহিরে ছিলেন—প্রধানত খ্রিস্টান ধর্মের উৎপত্তির পূর্বে এঁদের আবির্ভাব হইয়াছিল; আর যাঁরা খ্রিস্টান ধর্মের পরে আসিয়াছিলেন, তারাও নিজেদিগকে যথাসম্ভব এই ধর্মের প্রভাবের গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়াছিলেন। সেই হিসাবে ইউরোপের পরবর্তী দর্শন হইতে এঁদের দর্শনকে সহজেই পৃথক করিয়া লওয়া যায়।

গ্রীসের শিক্ষা ও শিল্প ইউরোপ এত গ্রহণ করিয়াছে—গ্রীসের কাছে ইউরোপের ঋণ এত বেশি এবং গ্রীসকে ইউরোপ এতই আপন ভাবিয়া থাকে যে এশিয়ার সহিত গ্রীসের কোনো সম্বন্ধ থাকিতে পারে কিংবা ছিল, এ কথাটা যেন ইউরোপ ভাবিতেই চায় না। তথাপি অকাট্য যুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে গ্রীসের দর্শন ইউরোপের চেয়ে এশিয়ার—বিশেষত ভারতের দর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত;—এমন কি, ভারতীয় দর্শনের নিকট তাহার ঋণও প্রচুর রহিয়াছে। সাধারণভাবে গ্রীক দার্শনিকেরা অনেকেই ভারতীয় চিন্তাধারার নিকট কি ভাবে এবং কি পরিমাণে ঋণী ছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য মনীষীরাও অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। জিজ্ঞাসুগণ এই সম্বন্ধে Richard Garbe-এর 'Philosophy of Ancient India' নামক গ্রন্থে অনেক সংবাদ পাইবেন। বিশেষভাবে গ্রীক দার্শনিকদের শিরোমণি Plato হিন্দু দার্শনিকদের নিকট কি পরিমাণে ঋণী ছিলেন, তাহার কতক আলোচনা আমরাও অন্যত্র করিয়াছি, এখানে আর তার পুনরুক্তি করিতে চাই না।

কিন্তু এই যে ঋণের কথা তুলিলাম, সেটা শুধু আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐশ্বর্যের এবং ভাবসম্পদের গরিমা দেখাইবার জন্য নয়। ইহা হইতে গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের বহুল পরিমাণ সাদৃশ্যও সহজেই অনুমতি হইতে পারিবে এবং এই সাদৃশ্য হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারিব যে যদিও ইউরোপের পরবর্তী দর্শনে এই গ্রীকদের দর্শন অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তথাপি এই দর্শন হইতে গ্রীক দর্শনের পার্থক্যও কম ছিল না।

পরবর্তী ইউরোপীয় দর্শন হইতে ইহার পার্থক্য এবং ভারতীয় দর্শনের সহিত ইহার সাদৃশ্য, এই উভয়টি হইতে আমরা ইহার স্বরূপ সহজে বুঝিতে পারি, হয়তো। জগৎ ও জীবন—অর্থাৎ ঐহিক জীবন সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ মূলত এই উভয়বিধ দর্শন হইতেই ভিন্ন ছিল।

দর্শন শাস্ত্রে ইহজগৎ এবং ঐহিক জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি প্রধান মতো দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা মনে করেন, জগৎ মিথ্যা, মায়া—একটা বন্ধন, একটা পাপের স্থান—সুতরাং পরিত্যাজ্য। দুই একজন এই জন্য আত্মহত্যা করিয়া দেহত্যাগ করিতে এবং ঐহিক জীবনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেও উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু মুক্তির এই উপায় খুব অল্প লোকেরই মনঃপূত হইয়াছে। বরং দেখিতে পাই অনেক দার্শনিক, যেমন Plotinus, এবং অনেক শাস্ত্র, যেমন হিন্দুর স্মৃতি, অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করা ধর্মসঙ্গত কি না সে বিচারও করিয়াছেন, এবং ইহা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া রায় দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আত্মহত্যাকে যাঁরা অত্যন্ত গর্হিত মনে করিয়াছেন তাঁরাও সকলে ইহজগৎ ইহজীবন এবং এই দেহকে একেবারেই লোভনীয় এবং বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। বরং এঁরা অনেকেই জীবন ও জগৎকে একটা বিরাট কারাবাস—একটা তুচ্ছ দুর্ভোগ, একটা প্রকাণ্ড হেয় পদার্থ মনে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে মানবাত্মার মহত্তর জীবন রহিয়াছে ঐহিক মরণের ওপারে এবং বৃহত্তর ও অধিকতর সত্য জগতে আমাদিগকে মরণের সেতু অতিক্রম করিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে।

আর এক শ্রেণীর দর্শানিক রহিয়াছেন যাঁদের কাছে ওপারের কাহিনী ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো সত্যে-অসত্যে মিশানো—সে দেশ 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেরা';—এখানে মানুষের কাছে যা যা ভাল ঠেকে তারই স্মৃতি এবং অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের লোভনীয় স্বপ্ন—এই দুই দিয়া পারত্রিক জগতের একটা চিত্র আঁকিয়া দুর্বল মানবচিত্ত আপনাকে মোহিত করিয়া রাখে—এই পর্যন্ত। এর বেশি তার সম্বন্ধে বলা যায় না। সুতরাং ঐহিক জীবন ও এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া যে অবহেলা করে, সে ধ্রুবকে পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবের আলেয়াতে নিজেকে প্রতারিত করে।

এই দুই শ্রেণীর দার্শনিক ছাড়া আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, যাঁদের 'মুরারে স্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ।' দর্শন শাস্ত্রে যেখানেই কোনোও একটি প্রশ্ন নিয়া পরস্পরবিরোধী দুইটি মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, দেখা গিয়াছে সেখানেই একটি তৃতীয় পন্থা ঐ বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় স্বরূপ উপস্থাপিত হইয়াছে। ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের সত্যতা সম্বন্ধেও তেমনি একটি তৃতীয় মতবাদ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই মতবাদ অনুসারে সত্য শুধু ঐহিক কিংবা পারত্রিক জীবনেই সীমাবদ্ধ

নয়—এ জগৎকে শয়তানের সৃষ্ট মনে করিবারও কোনো হেতু নাই। উভয়েই সত্য এবং কর্মানুসারে উভয়েই শিব এবং সুন্দরও হইতে পারে। এপার এবং ওপারের ভিতর সেতু রহিয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই—একটি আর একটির পরিপন্থী নয়। বরং এপারে ওপারে সম্বন্ধ এত নিকট যে, যে খেয়া দেয় তার যেমন নদীর এপার ওপারের ভিতর বিশেষ কোনো তফাৎ নাই, তেমনি মানবাত্মারও ঐহিক জীবন ও পারত্রিক জীবনের ভিতর পার্থক্য করিবার বিশেষ কোনো কারণ নাই। তবে নদীর যে-পারে খেয়ারির ঘরখানা থাকে সেটি তার একটু বিশেষ আপন হয়; তেমনি মানুষের আত্মারও ঘর রহিয়াছে ওপারে—

—Like trailing clouds of glory do we come,
From God who is our home.—

সুতরাং ওপারের জন্য আমাদের দরদ একটু বেশি হওয়া উচিত—এই পর্যন্ত। তাছাড়া জীবনহিসাবে একেও একেবারে তুচ্ছ করিবার কোনো যুক্তি নাই।

ইহজগৎ এবং ঐহিক জীবন সম্বন্ধে এই যে তিনটি মতবাদের কথা উপস্থিত করিলাম, বলা বাহুল্য, এদের ভিতরও আবার স্তরভেদ আছে। বিশ্বাসের গভীরতা এবং অনুভূতির প্রবলতা অনুসারে এদের প্রত্যেকটির ভিতরও আবার পৃথক পৃথক মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত প্রভেদের বিচার এখানে করা সম্ভব হইবে না।

ইউরোপের সমগ্র প্রাচীন যুগের দর্শন শাস্ত্রকে—অর্থাৎ সমগ্র গ্রীক দর্শনকে যদি এক সঙ্গে উপযুক্ত তিন শ্রেণীর ভিতর কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তার স্থান এই তৃতীয় শ্রেণীর ভিতর হইবে, এ কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। গ্রীকদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা যাঁরা একটু ভাবিয়াছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এ জাতির সৌন্দর্যবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল;—এ পৃথিবীটাকে তারা সৌন্দর্য এবং আনন্দে পরিপূর্ণ মনে করিত; তাদের কাব্যে এবং শিল্পে তাদের এই ভাবটি সর্বত্রই মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। এমন কি, তাদের সাহিত্যে যে এত tragedy সৃষ্টি হইয়াছে সেই tragedy-র ভিতরও কোনো কিছুই বেমানান থাকিবার জো নাই; সব জিনিষই আইন-মাফিক ঘটিবে—একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়তি—(ananke) সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিক করিয়া দিতেছে; যে অসামঞ্জস্য এবং বৈষম্য কুৎসিতকে সৃষ্টি করে, সেটি তারা tragedy-তেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। এমন জাতি পৃথিবীর আকাশে, বাতাসে, আলোতে, জ্যোৎস্নাতে এবং রূপে ও রসে যে আনন্দ রহিয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং এ জাতির দার্শনিকও কখনও ঐহিক জীবন ও ইহজগৎকে নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী মনে করেন নাই। বরং দেখিতে পাই, এদের নীতিশাস্ত্র এবং আধ্যাত্মিক আলোচনায় ঐহিক সম্পদ ও ভোগের উপকরণকে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করা হইয়াছে। এঁদের ভিতর Plato-র মতো ঐহিকের অসত্যতার কথাবোধ হয় এত জোরে আর কেহ

ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু এই Plato-ও স্বর্গে যে আদর্শ রহিয়াছে,—সত্যসন্ধিৎসু ভাবুকের অর্ন্তদৃষ্টিতে যে আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে—সেই আদর্শের অনুকরণে ইহজগতে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। অনাদি ও অনন্ত কালের তুলনায় এ জীবন অবশ্যই অতবি হ্রস্ব; এবং উজ্জ্বল, অনশ্বর, অভঙ্গুর পারত্রিক সত্যের তুলনায়, এ জগৎ একটা ছায়াবাজি মাত্র; কিন্তু এখানে যে আমরা কিছু দিনের জন্য আসিয়াছি, তাতে তেমন ক্ষুব্ধ হইবার কিছু কারণ নাই; কর্মবশে আবারও হয়তো আসিব—হয়তো বা মানব দেহে না আসিয়া অন্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া আসিব। এটা অবশ্যই আমাদের চিরন্তন বাসভূমি নয়—এবং হওয়া উচিতও নয়। বস্তুর চেয়ে তার ছায়া যেমন কম সত্য, তেমনই সনাতন পারত্রিক সত্যের তুলনায় ঐহিক জীবন ও জগৎও অসত্য—কিন্তু উহাকে একেবারে অসত্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহারই ভিতরে আদর্শ জীবন ও রাষ্ট্র গঠিত করিয়া আমরা পারত্রিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি এবং মানুষের ভিতরে থাকিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় নিজেদিগকে ব্যয়িত করিয়া ভবিষ্যতে আমরা দেবগণের সংসদে বাস করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

Plato-র উপরে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব বেশি বলিয়াই হউক, কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হউক, ঐহিক জীবনে Plato-র আস্থা হয়তো খুব বেশি নয়, এবং তাঁর মতবাদ অনুসরণ করিয়া পরবর্তী সময়ে তাঁরই নামে অভিহিত সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা এই অনাস্থাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা এখানে Neo-Platonist-দের কথা ভাবিতেছি। এঁদের ভিতর Plotinus ছিলেন প্রধান। Plotinus সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তী আছে তাতে দেখা যায় যে, তিনি ইহজীবন ও ইহজগতের প্রতি এত অবজ্ঞা মনে পোষন করিতেন যে, তাঁর নাম কিংবা বয়স জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন, কেননা এই সব প্রশ্ন এ দেহের সহিত তাঁর সম্পর্কের কথা মনে করাইয়া দিতে পারিত। রোগে তিনি ঔষধ খাইতেন না এবং কেহ তাঁর ছবি আঁকিতে চাহিয়াছিল বলিয়া তাকে তিনি শত্রু মনে করিতেন।

কিন্তু ঐহিক জীবনের প্রতি এই অবজ্ঞা গ্রীক দর্শনের সাধারণ সম্পত্তি নয়। Plotinus Plato-র প্রায় ৬০০ শত বৎসর পরের লোক আর তাঁর উপর প্রাচ্য দর্শনের এবং খ্রিস্টান ধর্মের ঢেউ অত্যন্ত প্রবলবেগে আঘাত করিয়াছিল।

গ্রীক দর্শনের স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে Plato, Aristotle-এর কথাই ভাবিতে হয়। Aristotle জগতকে Plato-র চেয়ে ঢের বেশি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ঐহিক সম্পদ, রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা, সমাজে সম্মান—এসব ছাড়া মানুষের পক্ষে প্রকৃত ধর্মজীবন যাপন করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়েও Aristotle সন্দিহান ছিলেন। মানুষের ধর্ম জীবন ও নৈতিকজীবনে দৈব ও পুরুষকারের স্থান কতটুক—মানুষ

একমাত্র নিজের চেষ্টায়, দেবতার সাহায্য ছাড়া, নিজের নৈতিক আদর্শ গড়িয়া তুলিতে পারে কি না—এই প্রশ্নের বিচার করিতে যাইয়া Aristotle স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষ একেলা নিজের ভাগ্যের বিধাতা নয়; তার ধর্ম জীবনের কর্ম চেষ্টায় ঐহিক সম্পদের প্রয়োজন রহিয়াছে, আর এই ঐহিক সম্পদ দেবতাদের দান। সুতরাং দেবতার অনুগ্রহের প্রয়োজনও আমাদের রহিয়াছে।। আর এই অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ ঐহিক সম্পদ আমাদের আদরণীয়। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ইহাই গ্রীক দর্শনের মতো, মোটামুটিভাবে একথা আমরা মানিয়া লইতে পারি। একদিকে Stoic-দের ত্যাগ ও ঔদাসীন্য অপর দিকে Epicurean-দের জীবন-প্রীতি ও ভোগলিপ্সা—এ দুই মেরু-প্রদেশের মধ্যে গ্রীক দর্শনের যে স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মোটামুটিভাবে জীবন ও জগতকে এইভাবেই দেখা যাইতেছে।

কখনও আলেকজাণ্ড্রিয়া, কখনও বা সিসিলিতে কখনও বা কনস্তান্তিনোপলে—ভূমধ্য সাগরের চারিদিকে এইভাবে এক হাজার বৎসর ধরিয়া যে গ্রীক দর্শন রশ্মি বিকিরণ করিয়াছিল, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে অবশেষে আততায়ীর বল প্রয়োগে তাহার আকস্মিক মরণ ঘটে। সম্রাট Justinian যখন ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে এথেন্সের দার্শনিক বিদ্যালয়গুলি জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন হইতে গ্রীক দর্শনের শেষ প্রদীপটি নিভিয়া গেল। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যুন এক হাজার বৎসর পর্যন্ত ইউরোপের চিন্তা-রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব অক্ষণ্নভাবে বর্তমান ছিল। এই ধর্মের প্রবল আধিপত্যের আনাচেকানাচে যতটুকু দার্শনিক চিন্তা বাঁচিয়া ছিল, তার মূল্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতো দেখা যায়। অনেকে মনে করেন এই হাজার বছরের ভিতর সত্যিকার দর্শন একটুও ছিল না; ধর্মের ধ্বজার নীচে মানুষের স্বাধীন গবেষণাশক্তিকে একেবারে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছিল। আবার অনেকে এমনও আছেন যাঁরা মনে করেন যে, সত্যিকার দর্শন যদি কোথাও আদৌ হইয়া থাকে তবে সেটি ইউরোপের মধ্য যুগের দার্শনিক প্রচেষ্টায়ই দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এ উভয় মতের কোনোটিই হয়তো সত্য নয়। একটা কথা সাধারণভাবে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই এক হাজার বৎসরের ভিতর ইউরোপ যতটুকু দার্শনিক গবেষণা করিয়াছে, তার ভিতর যুক্তিজাল দ্বারা ধর্মের গৃহীত মতগুলির সমর্থনের চেষ্টাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ঐহিক জীবন ও ইহজগৎ সম্বন্ধে তার একটা নিজস্ব ধারণা ছিল সেটি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে খ্রিস্টান ধর্মের জন্মগত ও স্বরূপগত প্রকৃতির কথা একটু মনে করিতে হইবে। খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে ঐহিক ও পারত্রিক জগতের প্রভেদের কথা অত্যন্ত পরিস্ফুট; এবং দেহ ও আত্মার স্বার্থ যে এক নয়; সেটিও এ ধর্মের একটু গূঢ় তথ্য। Flesh এবং Spirit-এর দ্বন্দ্ব সনাতন—ইহাদের একের সেবক অন্যের পরিচর্যা করিতে পারে না। আর

ইহাও সত্য যে, Flesh-এর চেয়ে Spirit-এর মূল্য বেশি। সুতরাং ঐহিক জীবনের প্রলোভন ত্যাগ না করিলে আধ্যাত্মিক কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায় না।

এই বিশ্বাস এবং এই মতবাদ হইতেই খ্রিস্টান ধর্মের আবছায়ায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। গ্রীসের ইতিহাসে আমরা সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই না এবং গ্রীকদের সভ্যতায় গৃহহীন সন্ন্যাসীর কোনো দান নাই। কিন্তু মধ্যযুগে খ্রিস্টান ইউরোপে দলে দলে লোক গৃহস্থ ধর্মে পরান্মুখ হইয়া আধ্যাত্মিক মঙ্গলের অনুসন্ধানে ধর্ম ও দর্শনের চর্চায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে লাগিল। এথেন্সের মতো হর্ম্যরাশিশোভিত নগরের জনসমাকীর্ণ স্থানে কিংবা Plato-র মতো ধনীগৃহীর কার্পেট মণ্ডিত গৃহে নয়—কিন্তু লোক কোলাহলের বাইরে সন্ন্যাসীদের নিভৃত মঠে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধের ভিতর দিয়া মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং এই প্রকার দার্শনিকদের মতে ঐহিক সম্পদ ধন ও মান প্রভৃতির কি মূল্য ছিল, বুঝা কঠিন নয়। এমনকি, দেহের স্বাভাবিক ধর্মকে পর্যন্ত ইহারা আদিম মানব আদমের বিধাতার আদিম আদেশ অমান্য করার পাপের ফলস্বরূপ মনে করিতেন। জগৎটাকে উহারা একেবারে স্বপ্ন কিংবা মায়া মনে করিতেন না—দৈহিক জীবনও ওঁদের কাছে সত্যই ছিল; এ সকলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং এদের সত্যতা সম্বন্ধে মায়াবীদের মতো কিংবা Plato-র মতো এঁদের মনে কোনো সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু ইহজগৎ এবং ঐহিক জীবনের মূল্য সম্বন্ধে এই যুগের দার্শনিকেরা খুব উচ্চ ধারণা পোষন করেন নাই। জীবনটা অসত্য মোটেই নয় বরং এটা একটা প্রকাণ্ড অনভিপ্রেত সত্য, যাকে পাপের দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছু মনে করা সম্ভব নয়।

১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে যখন Des Cartes তাঁর 'Discours de la Mithode' নামক বই প্রকাশ করেন, তখন হইতেই ইউরোপীয় মধ্যযুগের অবসান হয় এবং নবীন যুগের আরম্ভ হয়। এই যুগ এখনও চলিতেছে। ইহার বিশালতা, ঐশ্বর্য এবং সম্পদ, এত বেশি—এই যুগে ইউরোপের দার্শনিক ভাবধারা এত গভীর এত স্বচ্ছ এবং এত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাচীন যুগের সম্পদ মধ্যযুগের কঠোরতা এবং নবীনের বৈচিত্র্য—সমস্তই এর ভিতর রহিয়াছে। কিন্তু এই যুগ আপন সম্পদে এমনই আত্মহারা যে বর্তমানকেই সে সব চেয়ে বড় বলিয়া মনে করে।

George Santayana তাঁর 'Egotism in German Philosophy' নামক বইয়ে আত্মম্ভরিতা এবং অহমিকাকেই German দর্শনের মূল কথা বলিয়া মনে করিয়াছেন। Germany-র বাইরে German দর্শনের এরূপ বর্ণনা—বিশেষত বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে—অনেক পাওয়া যায়। আমরা প্রায়ই শুনি যে,

জার্মানদের মতে নাকি জগতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি জার্মানেরা এবং গৌরবান্বিত দেশ জার্মানী, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাবসম্পদ প্রকাশ করিবার উপযোগী একমাত্র ভাষা জার্মান ভাষা ইত্যাদি এবং প্রত্যেক জার্মান দার্শনিকই মনে করিয়া গিয়াছেন যে, জগতের সমস্ত চিন্তাধারা তাঁরই দার্শনিক মতবাদে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেখানেই তার পরিসমাপ্তি। এই প্রকার অমার্জনীয় অহমিকা জার্মানীর দর্শনে সত্য সত্যই আছে কি না, সে বিচার এখানে করিতে চাই না; কিন্তু এই অভিযোগে যদি কোনো সত্য থাকিয়া থাকে তবে, মনে হয়, সেটা আধুনিক ইউরোপের সমগ্র চিন্তাপ্রবাহের ভিতরই কম বেশি রহিয়াছে। সেটা পৃথিবীতে ইউরোপের বর্তমান রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের জন্যই না, অবিসংবাদি উৎকর্ষের জন্য সে কথাও এখানে ভাবিবার দরকার নাই—কিন্তু এ ভাব ইউরোপের সাহিত্য ও দর্শনে যে কম বেশি রহিয়াছে তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

এ কথা আমরা এখানে বলিতেছি এ জন্য যে, ইহা হইতেই আধুনিক দর্শনের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধারণার একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে। বর্তমান যুগের ইউরোপীয় দর্শনে যে আধ্যাত্মিক ও আমুত্রিক সত্যের সন্ধান পাইবার চেষ্টা নাই, তাহা কেহ বলিবে না। কিন্তু ঐহিক ও পারত্রিকের ভিতর ঐহিক যে আমাদের বেশি নিকট—সুতরাং সেই পরিমাণে অন্তত বেশি সত্য—এ কথা ইউরোপের দর্শন আজ একটু বেশি বলে বলিয়া মনে হয়। Empiricism বলিয়া যে একটা মতবাদ প্রচলিত আছে, তাতে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার বাইরের কোনো সত্যের অনুভূতি অস্বীকৃত হয়; আর Positivism সে সত্যকে একেবারে অস্বীকার করে। Pragmatism ওপারের বালাই নিয়া মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নয়, তার কাছে মানুষের জীবনটা বড় সত্য—এবং অন্য সব কিছুরই সত্যতা এই জীবনের সহায়ক হিসাবে পরিমিত হইবে। এই জগৎ ও জীবন স্বীকার করিয়া তারপর অন্য সত্যের তল্লাস করাই আধুনিক দার্শনিক প্রচেষ্টার ধারা। আমার দেশ, আমার জাতি, আমার ভাষা এবং পরিশেষে আমার দর্শন ও আমি সকলের সেরা—এ কথা হয়তো জার্মান পণ্ডিতদের মতো সকলেই বলেন না, কিন্তু এ জগৎ মিথ্যা, আমার জীবন একটা মায়া কিংবা মতিভ্রম এ কথাও আজ আর ইউরোপের দর্শনে কুত্রাপি নাই।

এইখানেই পাশ্চাত্য দর্শন প্রাচ্য হইতে ভিন্ন। প্রাচীতেও ঐহিক সুখ ও ঐহিক জীবনের ভূয়সী প্রশংসা হইয়াছে। মরণের পর আর কিছু নাই, ঐহিকই আমাদের সর্বস্ব, লোকসিদ্ধ রাজাই একমাত্র পরমেশ্বর, অঙ্গনালিঙ্গনাদিজন্য সুখই একমাত্র পুরুষার্থ—ইত্যাদি কথা দেবভাষা সংস্কৃতেও বলা হইয়াছে। কিন্তু চার্বাকের এই সব মতই ভারতীয় দর্শনের সার কথা নয়। ভারতীয় দর্শন—হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন—মূলত নিঃশ্রেয়স-বিদ্যা।

অন্যচ্ছ্রেয়ো হন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তে হর্থাদ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥

—শ্রেয় ও প্রেয় আলাদা, একটিকে পাইতে হইলে আর একটিকে ত্যাগ করিতে হয়—ইউরোপের মধ্যযুগের খ্রিস্টান দর্শনের ন্যায় ভারতীয় দর্শনও ঐ কথা বার বার বলিয়াছে। আমাদের দার্শনিকেরা সব সময়ই জগৎকে একেবারে মিথ্যা হয়তো বলেন নাই—কিন্তু ইহ জগৎকে খুব সারবানও কখনও এ দেশে বলা হয় নাই—আর ইহ জগৎকে একমাত্র সত্য মনে করা ভারতের ধাতের বিরুদ্ধে। মধ্যযুগের খ্রিস্টান ধর্মের ন্যায় এ দেশের দর্শনেও সন্ন্যাসীর প্রভাব অত্যন্ত বেশি হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু—বিশেষত হিন্দুর বেদান্ত—মোটামুটি সন্ন্যাসধর্মীয় দর্শন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এ কথাও আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে আর সে কথা তুলিতে চাই না। স্মৃতিতে গৃহস্থধর্মের এবং গৃহীর জীবনের ভূয়সী স্তুতিবাদ রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানেও ঐহিক ও পারত্রিকের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। কর্মবাদ এবং শ্রদ্ধাদি ক্রিয়াই তার প্রমাণ। এ দেশের লোকেও ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছে, রাজ্যবিস্তার করিয়াছে, পররাষ্ট্র অপহরণ করিয়াছে, নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সৌধ নির্মাণ করিয়াছে—এ দেশের লোকও ভোগৈশ্বর্যের মোহে, ঐহিকের মোহে, মত্ত হইয়াছে—এথেন্সের মতো উজ্জয়িনী কিংবা পাটলিপুত্র এ দেশেও ছিল। কিন্তু তথাপি শিল্পে, সাহিত্যে এবং বিশেষ করিয়া দর্শনে যে এ দেশের লোকের প্রতিভা উর্ধমুখী ছিল, তার প্রমাণের অন্ত নাই।

একটা কথা এখানে আমাদিগকে মনে করিতে হইবে যে, ভারতীয় দর্শন প্রাচীন —অতীতের দর্শন—বর্তমানের দর্শন উহা নহে। বর্তমানে ঐহিককে বড় মনে করিবার ঝোঁক যে দর্শনের রহিয়াছে, সে কথার ইঙ্গিত আমরা পূর্বে করিয়াছি। দেহের দাম আজ আগের চেয়ে ঢের বেশি হইয়াছে; দৈহিক সুখকে উপক্ষো করা এখন আর ধর্ম নয়। এমন কি দেহের আবরণ পোষাকের কথাও আজ সুধীজনের ধীর বিবেচনার বিষয়। 'Latest Fashion in Gowns' ছবিতে আমরা প্রতি রবিবারে Statesman-এ দেখিতে পাই। ভোগের নেশা, ঐহিকের মোহ, ইহজীবনের সম্পদের চিন্তা, আজ ইউরোপকে এবং ইউরোপের প্রভাবে প্রভাবান্বিত সমস্ত জগৎকে উন্মত্তবৎ করিয়া রাখিয়াছে। এর ছায়া আজ দর্শনেও পড়িয়াছে। কিন্তু এর ভিতর বিপদ আছে। মনে হয় আজ জগৎ জুড়িয়া যে অশান্তি ও কলহের ঢেউ চলিয়াছে, সেটা ঐহিক ঐশ্বর্যের নেশার উন্মত্ততারই তাণ্ডব নৃত্য। ঐহিকের দাবী

উপেক্ষা না করিয়াও যে পারত্রিক সত্য স্বীকার করা যায়—বর্তমানকে পরিত্যাগ না করিয়াও যে ভবিষ্যতকে গ্রহণ করা যায়—লোকান্তর স্বীকার করিলে যে ইহলোককেই বৃহত্তর করা হয়,—ভোগের সঙ্গে ত্যাগের সমন্বয় যে একেবারে অসম্ভব নয়—স্বার্থ ও পরার্থ যে প্রকৃত পক্ষে একেবারে পরস্পর বিরোধী নয়—দেহকে স্বীকার করিলেই যে আত্মাকে অস্বীকার করিতে হয় না—জীবনের জন্যই যে ধর্ম এবং প্রকৃতরূপে জীবনে বাঁচিতে হইলে যে ধর্মকেই বরণ করা হয়—মনে হয়, জগতের ইতিহাসে আজ আমরা এমন একটা যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যখন এই কথাটাই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে। জীবনটা যে একটা দুঃসহ যাতনা কিংবা অসংযত উত্তেজনা কিংবা শুধু একটা কঠোর সাধনা নয়—কিন্তু এটা যে সাধনা ও ভোগের সমন্বয়ে একটি মহনীয় বস্তু, বোধ হয় দার্শনিকদের পক্ষে আজ জগৎকে সেই কথা বলাই বিশেষ দরকার।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য
কামালউদ্‌দীন

শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় খ্রিস্টের দীক্ষাগুরু 'জন'-কে স্বস্তিকধারী বৌদ্ধ শ্রমণ বলেই অনুমান করেছেন। (যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিনে প্রাচ্য সাধু পুরুষগণ তাঁহাকে সুতিকাগারে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, এ কথা খ্রিস্টধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তৎকালে এশিয়াখণ্ডের জলে স্থলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অব্যাহত গতির ও স্বধর্ম বিস্তারের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিলে যিশুখ্রিস্টের দীক্ষাগুরুকে ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণ বলিয়াই স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়।—ফিরিঙ্গি বণিক, ৭৪ পৃষ্ঠা)। পরবর্তী যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের লেখায় এ বক্তব্যের যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, একথা নিখুঁত সত্য যে প্রাথমিক খ্রিস্ট ধর্মনীতির উপর বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রভাব প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যিশুখ্রিস্ট ছিলেন প্রাচ্যেরই অধিবাসী। তাঁর তিরোধানের বহুদিন পরে পর্যন্ত তাঁর প্রচারিত ধর্মমত প্রাচ্যদেশেই নিবদ্ধ ছিল। প্রতীচ্য প্রাচ্যভূমি হতেই এ ধর্ম নিজের অলিতে গলিতে বহন করে নিয়েছিল এবং পরিণামে সমগ্র ইউরোপকে এক করে গড়ে তুলতে, এক লক্ষ্যে নিয়োজিত করতে, অনেকখানি সহায়তা করেছে এ খ্রিস্টধর্ম। কোনো একটা বিশিষ্ট ধর্মমতের বিশেষ প্রয়োজন ইউরোপ আজ অনুভব না করলেও একদিন করেছিল। সেই দিন সে খ্রিস্ট বনাম প্রাচ্যকে প্রাণের সাথেই গ্রহণ করেছিল। কোনো জাতির অভ্যুদয়যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে এই সত্যটি দেখতে পাই—তারা তখন সবল হস্তে গ্রহণ করতে ও দান করতে শেখে। যুগ-যুগের সংস্কার তাদের বেঁধে রাখতে যথেষ্ট প্রয়াস পেলেও এ প্রেরণাই তাদের জয়ী হয়। দুনিয়ার কালচারকে গ্রাস করে নিতে এবং দুনিয়ার সভ্যতার পর্যায়ে তাদের নিজস্ব কালচারের বিশিষ্ট ছাপ এঁকে দিতে তারা দিকে দিকে ছুটে যায় অদম্য উৎসাহে, অখণ্ড প্রাণে।

এর বিপরীত সত্যটিও কিন্তু মানুষের ইতিকথা অনেক দিন ধরে পুনরাবৃত্তি করে আসছে। অধঃপতনের যুগে জাতি এমনই আত্মসর্বস্ব হয়ে পড়ে যে, তারা মনে করে, ভুপৃষ্ঠে মানুষ যদি থেকে থাকে তবে তারাই, কালচার যদি কিছু থাকে, তবে তাদের এককালে যা ছিল তাই। উদ্দেশ্যহীনভাবে নিজের অতীতের দিকে চেয়ে গর্ব

অনুভব করে বা চোখের জল মুছে তারা দিন কাটায়। এ মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়েই ইহুদিরা অ-ইহুদীদের Gentile নাম দিয়েছিল, আর্যগণ 'যবন ম্লেচ্ছ'-শব্দের ও মুসলমানগণ 'কাফের' আখ্যার এত ছড়াছড়ি করেছিল।

খ্রিস্টান সমাজের আর একটি কথা মনে পড়ে। দিগদর্শন-শলাকাকে তারা এক সময় 'শয়তানের যন্ত্র' মনে করত; কোনো নাবিক সে যন্ত্র ব্যবহার করে পোত চালনার সাহস বা চেষ্টা করলে তার জন্য পরকালে নরকের ব্যবস্থা হত। এর একমাত্র হাস্যাস্পদ কারণ হচ্ছে এই যে কম্পাস আবিষ্কৃত হয়েছিল অ-খ্রিস্টান মুসলমানের দ্বারা।

আজ ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রের এই একই অবস্থা দেখি। ইউরোপের শাসনাধীন পৌণে দু'শ বছর বসবাস করেও আমরা যেন সত্যিকার প্রাণ দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারছিনে। একটা স্বজাতীয়-বিজাতীয় বিদ্বেষ-ভাব আমাদের সব সময় তার প্রকৃত স্বরূপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার যা গ্রহণ করছি বা আয়ত্ত করছি, তা যেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে। বাধ্য হয়ে যে নয় তা সত্য না হলেও বাধ্যতামূলক সব কাজই যে খুব মন্দ তার কোনো মানে নেই। ধরা যাক ইংরেজি শিক্ষার কথা। রাজভাষা বলে প্রকারান্তরে বাধ্য হয়ে যদিও আমরা এটি শিখছি এবং এর চর্চা করছি, তথাপি এর ভিতর দিয়ে যে বর্তমান সভ্য জগতের সাথে আমাদের যোগ ঘনীভূত হচ্ছে, তা অস্বীকার করারও উপায় নেই। ইংরেজি সাহিত্যকে এক কথায় সর্বভুক বলা যায়। দুনিয়ায় এমন বড় কবি বা সাহিত্যিক কমই জন্মেছেন যাঁর সাধনার পরিচয় ইংরেজি দিতে পারে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শাসন করছে। তাকে আয়ত্ত না করে কোনো জাতিই খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছে না; কারণ তা সুচিন্তিত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

পশ্চিমের ভাল দিকটা আমরা আনন্দেই গ্রহণ করতে পারি এবং এ আনন্দ দিয়ে বাধ্যতার তিক্ততাটুকুর অনেকটা উপশমও হতেপারে স্বচ্ছন্দে।

তথাপি আমাদের এ ক্ষুন্নতার, কথান্তরে কূপমণ্ডুকতারও যে সঙ্গত কারণ আছে সত্য বলতে তা স্বীকার করতে হবে। তার মূলে রয়েছে আমাদের প্রতি পশ্চিমের জাতীয়তা জাত তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার ভাব। তবে এ ঘৃণা আমাদের বর্ণের জন্যই সম্পূর্ণ নয়। আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধোগতিই এর প্রকৃষ্ট কারণ। আরও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে, আমাদের দাসত্বের চাইতে দাস-মনোভাবই এর জন্য অধিক দায়ী।

আবার নতুন করে আমাদের দেনা-পাওনার সম্বন্ধ খাড়া করতে হবে। কারণ এ যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্বন্ধ—সুখের হোক বা দুঃখেরই হোক,—অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কথায়, আমরা পশ্চিমের দুয়ারে দাঁড়িয়েছি ভিক্ষাপাত্র হাতে। তাই পাচ্ছিও তাদের কাছে অবমাননার চাইতে বেশি কিছুই না। প্রতীচ্যের মন জয় করতে হবে আমাদের শক্তি ও প্রতিভা দিয়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে ভালটুকু সাধনা দিয়ে আয়ত্ত করে নিতে হবে আমাদের ন্যাশনাল চরিত্রে। পশ্চিমকে দেবার আমাদেরও আছে। দানের উপযুক্ত আমাদের আগে হতে হবে। তখন আগ্রহে তারা লালায়িত হাত বাড়িয়ে দাঁড়াবে প্রাচ্যের দরবারে। এ সাম্য-মৈত্রীর যুগেও যে Kipling-এর 'East is East and West is West and never the twain shall meet' কথা বিদ্বেষদুষ্ট ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে না, তার কারণ এশিয়ার, বিশেষ করে ভারতবর্ষের, অজ্ঞতা ও স্থবিরতা। ভারতের এ কলঙ্ক-কালিমা মুছাতে হবে, প্রতীচ্যের এ উদ্ধত মনোবৃত্তির অযৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে একাগ্র সাধনা দিয়ে আমাদের—এ বিংশ শতাব্দীর নবালোকজাগরিত তরুণদলকে।

তরুণের দায়িত্ব

ফাতেমা খানম

কোনো যুগে কোনো দেশে কি করেই যে আজিকার এই দুর্ভেদ্য পর্দার প্রথম জন্ম হয়েছিল, কোনো ঐতিহাসিকই বোধ হয় তার সঠিক ইতিহাস লিখে যাননি। কিন্তু তবু মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, পর্দার জন্মদাতা স্বয়ং আল্লাহ এবং প্রচারক হজরত মোহাম্মদ। এ বিশ্বাস যে কতদূর সত্যমূলক নিরপেক্ষরূপে তা ভেবে দেখার জন্যই আজ আমি প্রসিদ্ধ উর্দু গ্রন্থ 'আকসীরে হেদায়েত' থেকে দুটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করছি।

(ক) একদিন মদিনার কোনো পথে কয়েকটি স্ত্রীলোক পরস্পর কলহ করিতেছিল। ঘটনা ক্রমে হজরত 'রেসালত পানাহ' ঐ পথ দিয়া চলিয়াছিলেন। রমণীগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু কলহ করিতে নিবৃত্ত হইল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই বহুদূরে হজরত ওমর ফারুককে সেই পথেই আসিতে দেখা গেল। তখন রমণীগণ ভয়ে কলহ বন্ধ করিয়া যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল। একজন পথিক আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হে আল্লার রসুল! উহারা আপনাকে ভয় করিল না কিন্তু হজরত ওমরের ভয়ে পলাইয়া গেল'। তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন 'উহারা জানে যে আমি উহা দিগকে ক্ষমা করিব কিন্তু ওমর ক্ষমা করিবেন না'।

(খ) একদা কতকগুলি স্ত্রীলোক উত্তম বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া চলিয়াছিল। তাহা দেখিয়া হজরত ওমর বলিলেন—'হে আল্লার রসুল! স্ত্রীলোকদিগকে উত্তম বেশভূষা পরিধান করিতে দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু উহারা উত্তম সাজে সজ্জিত হইয়া নিষ্প্রয়োজনে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে বাড়ী বাড়ী গমনাগমন করে'।

'হুর' নামক উর্দু মাসিকে দেখেছি, 'হজরত এমাম হোসেন শহিদ হইলে শত্রুগণ তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করে। দুর্বৃত্তগণ এমাম-পরিবারস্থ মহিলাগণের মাথার ওড়না পর্যন্ত লুটিয়া লইয়াছিল। নিরুপায় উৎপীড়িতা বন্দিনী মহিলাগণ যখন নগ্ন মস্তকে দামেস্কে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সমস্ত দেশময় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। অনুতপ্তা এজিদ মহিষী ও সিরিয়ার রাণী এমমা-পরিবারের জন্য ওড়না উপহার

লইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বন্দিনী মহিলাগনের নেত্রী হজরত জয়নাব সমস্ত মহিলাদের আদেশ করিলেন—'বেণী খুলিয়া দাও, খোদার দেওয়া কুন্তলাবরণে তোমাদের মুখ, বুক ও পৃষ্ঠ আবৃত্ত কর'। তিনি নিজেও তাহাই করিলেন। সেদিন সেই বন্দিনী নারীগণের ওড়নাহীন মস্তক, সেই মুক্ত কেশাবৃত্ত মুখের শোকদগ্ধ গম্ভীর অবিচলিত শুভ্র স্বর্গীয় শ্রী দেখিয়া এজিদের বেগম ও সিরিয়ার রাণীর মূল্যবান ওড়নাশোভিত মস্তক লজ্জায় নুইয়া পড়িয়াছিল, এবং উপহার ফেরত লইয়া আসিতে হইয়াছিল'।

এখন একথা ভাবা অন্যায় নয় যে, যে দুশ্ছেদ্য নিবিড় পর্দার চাপে বাংলার মুসলমান নারীর নিশ্বাসের বায়ু পর্যন্ত রোধ করে রাখা হয়েছে এ যদি হজরত মোহাম্মদেরই প্রচলিত বিধান হত তবে তাঁরই সম্মুখে প্রকাশ্য পথের উপর নারীগণ কলহ করতে, অথবা সাজ সজ্জা করে বাইরে যেতে প্রার্থনা এবং তাঁর দৌহিত্রী হজরত জয়নাব শত্রুর দেওয়া উপহার নির্বিরোধে গ্রহণ করে আপনাদের মুক্ত রূপ সভয়ে আবৃত্ত করে ফেলতেন। পর্দা রক্ষা করার চেয়েও যে আত্মসম্মানের মর্যাদা অনেক বড় এ ধারণা তাঁর মনে আসতেই পারত না। অবশ্য কোনো কোনো লেখকের মতে পর্দা প্রথা হজরত মোহাম্মদের পরবর্তী খলিফাগণের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে বলে অনুমতি হয়। কিন্তু এ অনুমানের কোনো মূল্য নেই। পর্দা প্রথা হজরত মোহাম্মদই প্রচলন করেছিলেন সত্য কিন্তু তাঁর সেই জটিল-গ্রন্থি-বিরল উদার পর্দা প্রথার সঙ্গে যুগে-যুগের স্বার্থপর সংকীর্ণহৃদয় ব্যক্তি বিশেষের সন্দেহশঙ্কুল সতর্ক বন্ধন জড়িয়ে-এঁটে একাকার হয় আজ একেবারে কোরানের বাণীরূপে সমাজের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।

যদিও কোরানের বাণী বুঝবার শক্তি আমার নেই, হজরত রসূলে করিমের আদেশ অনুশাসন আলোচনা করার শক্তিও কোনো দিন হয়নি, তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জীবনের মুক্তির জন্যই যিনি জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, প্রাচীন ইব্রাণী ধর্মের অন্ধ কুসংস্কার এবং অনাবশ্যক গোড়ামীবন্ধন ছিন্ন করে যিনি ইসলামের উদার মুক্ত মতো বিশ্বে প্রচার করেছেন এবং যিনি সাহাবীদের সম্মুখে নিজ মুখে একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন—জগতে দুটি জিনিষকে আমি সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসি, তাহার একটি ফুল, অপরটি নারী, এই দুইটি সুন্দর জিনিষের মধ্যে দিয়াই স্রষ্টার সৌন্দর্য ফুটিয়া বাহির হয়—সেই হজরত মোহাম্মদ নারীকে তার স্বাধীন আত্মবোধ থেকে চিরবঞ্চিত করে, তার স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ করে, শুধু জড়পদার্থের মতো পুরুষের সেবাদাসী রূপে অন্তপুরে আজীবন বন্দী হয়ে থাকার আদেশ দিতে পারেন, এ কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যে পর্দা বর্তমানে সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে এর চতুর্থাংশও হজরত মোহাম্মদের প্রবর্তিত নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু তবু কেন বিদ্রোহভীতা শান্তিপ্রিয় নারী যুগের পর

যুগব্যাপী এই কঠিন বন্ধনে নিঃশব্দে বাঁধা পড়ে আছে, এ বন্ধনের কতটুকু যে খোদার দেওয়া এবং কত বেশি যে মানুষের দেওয়া, আজ আমি তাই বুঝাতে চেষ্টা করব।

যুগ যখন একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে, তখন অতীতে যা থাকে তারই একটা বিপরীত রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যেমন পাশ্চাত্য জাতির এই পূর্ণ সভ্যতার যুগ বন্ধন কেটে মুক্তি, আবরণ ছিঁড়ে নগ্নতা নিয়ে এসেছে। তাই এ যুগে যে পরিবার যত উন্নত ও শিক্ষিত যে পরিবারের মেয়েরাও তত বেশি মুক্ত এবং তাদের পোষাক পরিচ্ছদও তদনুপাতে নগ্নরূপ প্রকাশক। এমনি অতীতেও একটা নতুন যুগ চলছিল। কিন্তু সে ছিল ঠিক এর বিপরীত, উলঙ্গের মধ্যে আবরণ টানা যুগ। সুতরাং সে যুগের মানুষ এমনি সব অদ্ভুত পোষাক তৈয়েরী করে সর্বাঙ্গ আবৃত করত, যার বাহুল্যে তাদের স্বাভাবিক গতিবিধির উপর অস্বাভাবিক রকম ভাব চেপে যেত। তাই আমরা দেখতে পাই বাদশাহ, নবাব, আমীর, ওমরাহগণের মহলে পুরনারীগণের চলার সময় তাদের পেছনে বাঁদিরা পাজামার পা ধরে চলেছে। এযুগে যেমন হাঁটুর উপরে তোলা পোষাক উচ্চ সভ্যতার পরিচায়ক সে যুগেও তেমনি নারীর মাথায় ওড়না থেকে পাজামা পর্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়া ছিল অতি বড় সভ্যতা এবং আমিরী ফ্যাসন। সে যুগের পুরুষ চাইত, পত্র এবং আবরণী দিয়ে আবৃত ফুলের তোড়ার মত নারীর মধুর রূপ নিরুদ্বেগে উপভোগ করতে। বাইরের সহস্র তৃষিত দৃষ্টির অন্তরালে নারীকে পৃথক করে, স্বতন্ত্র করে, একান্ত আপনার করে পেত। এইজন্যই তারা পোষাক পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে গৃহ, দ্বার, সমস্তগুলিতেই পর্দার উপর পর্দা জড়িয়ে নারীকে একেবারে দুর্লভ মহার্ঘ্য করে তুলেছিল। এই যে আমিরী ফ্যাসন এই যে প্রকৃতির স্বাধীন মুক্তরাজ্য থেকে নারীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে একান্ত নিজস্বরূপে ভোগ করার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা এ থেকেই বর্তমানের এই দুর্ভেদ্য পর্দার প্রথম জন্ম। নারী জানে যে এ পর্দার মধ্যে হজরত মোহাম্মদের আদেশের সত্যতা যতটুকু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আমিরী চাল এবং স্বার্থপর পুরুষের সদাসন্দিগ্ধ মনের অনাবশ্যক সতর্ক বন্ধনের জটিলতা এঁটে মিশে গেছে। তাই আজও সৈয়দ, শেখ, ও উচ্চ বংশোদ্ভব পাঠান শ্রেণী যিনি যত বেশি বংশ মর্যাদার দাবী করেন তাঁদের অন্তঃপুরে পর্দার বন্ধন তত বেশি দৃঢ়তর দেখা যায়, আবার যত নিম্নদিকে অবতরণ করা যায় পর্দার বন্ধন ততই শিথিল হতে শিথিলতর বোধ হয়। অবশেষে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে এর অস্তিত্ব একেবারে খুঁজেই পাওয়া যায় না। অথচ মুষ্টিমেয় ভদ্র সমাজ অপেক্ষা সংখ্যায় এরা অনেক বেশি ধর্মের দিক দিয়েও দৃঢ় বিশ্বাসী এরাই। কিন্ত আশ্চর্য এই যে ইসলামকে সম্পূর্ণ স্বীকরে করে নিয়ে, রোজা, নামাজ, প্রভৃতি ফরজ প্রতিনিয়ত পালন করেও যে পর্দা

প্রথাকে কেন গ্রহণ করেনি? এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, কৃষক সমাজ চিরদিন আমিরী সভ্যতার বাইরে জীবন যাপন করেছে বলেই পর্দার বালাই তাদের নেই। এরা যা সত্যিকার শাস্ত্রবিধান তা সমগ্র হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে। কিন্তু যা শুধু আড়ম্বর, শুধু আমিরী চাল তাকে সবলে পরিত্যাগ করেছে। তাই কৃষক নারী চিরদিনই স্বাধীন। সাংসারিক জীবনে তারা তাদের স্বামীর বিশ্বাসী ভৃত্য বা কনিষ্ঠ সহোদরের মত নিত্য সাহায্যকারী। তাদের স্বামীপুত্র যখন ক্ষেতে কাজ করে তারা তখন শয্যায় পড়ে ঘুমোয় না। মাঠে গরু বাঁধে, ঘাট থেকে পানি আনে, স্বামী পুত্রের আহার্য প্রস্তুত করে ক্ষেতে পৌঁছে দেয়। যারা বর্ষীয়সী বিধবা তারা হাটে বাজারেও যায়। কিন্তু তাই বলেই অধিকাংশ কৃষক নারী দুশ্চরিত্রা তো নয়ই বরং পর্দানশিন অনেক ভদ্র-নারীর চেয়েও সরল, ধর্মে নিষ্ঠাবতী। স্ত্রীস্বাধীনতার নামে যে সকল পুরুষ চমকে ওঠেন তাঁদের একবার চিন্তা করে দেখা উচিত স্বাধীনতাই শুধু নারীর চরিত্রদুষ্টির একমাত্র কারণ নয়। এর অতি বড় প্রমাণ কৃষক নারী। ইউরোপের নারীসমাজের অনুকরণে আমাদের উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় মেয়েদের মতো, ক্লাবে, পার্কে, অথবা পাবলিক থিয়েটার-ষ্টেজে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন পুরুষের সঙ্গলাভ চেষ্টার অনুকরণে এরাও পথে, ঘাটে যেখানে সেখানে অনর্থক পুরুষের সঙ্গলাভ চেষ্টা মোটেই করে না।*যে উদ্দেশ্যে হজরত মোহাম্মদের পর্দাপ্রথা প্রচলন সে উদ্দেশ্য কৃষকনারী মর্মে মর্মে অনুভব করে। তাই প্রকৃতির মুক্ত কোলে মানুষ হয়েও এরা নারীত্বের মর্যাদা সম্পূর্ণ নিজের বলেই বাঁচিয়া চলে। পক্ষান্তরে উচ্চ বর্ণের মুসলমান নারী পুরুষের শেখান আমিরী চাল ও আভিজাত্যের মোহে আত্মরক্ষার সমস্ত সামর্থ পুরুষের স্কন্ধে ন্যস্ত করে ৭ বৎসর বয়স থেকে মরণাবধি পর্দার অভ্যন্তরে বন্দিনী জীবন কাটিয়ে দেন। পুরুষের দেওয়া ছদ্ম অত্যাচারের বিধানটাকেই তাঁরা নিজেদের অতি বড় মঙ্গলদায়ক শাস্ত্রবিধি বলে এমনি আশ্চর্য রকম বিশ্বাস করেন যে, যদি একটি ১২/১৩ বছরের মেয়েও মাথার কাপড় ফেলে পর্দার বাইরে এসে দাঁড়ায়, তবে পুরুষের চেয়েও অনেক বেশি লজ্জা এই নারীগণই অনুভব করেন। নিজেদের দেহ ও রূপকে তাঁরা শুধু চৌর্যবস্তু ভিন্ন অন্য কিছু বলে ভাবতেই পারেন না। একজন ভিখারী একজন কুলিকে দেখলে তাঁরা এমন সশঙ্ক

[শ্রদ্ধেয়া লেখিকা তাঁহার ইউরোপীয় ভগিনীদের প্রতি, তথা এক শ্রেণীর ভারতীয় ভগিনীর প্রতি, কিছু বেশি রূঢ় হইয়াছেন মনে হয়। ইউরোপীয় নারী সে আজ 'সসীম' নয় 'অসীম' স্বাধীনতা চাহিতেছেন, অথবা ভোগ করিতেছেন, তাহা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবার মতো মনীষীর সংখ্যাও বর্তমান জগতে কম নয়—সম্পাদক শিখা।]

হয়ে পলায়ন করেন, আপন সন্তানদের সহপাঠী, গর্ভজাত সন্তানের মত যারা তাদের দেখেও এমন করে আত্মগোপন করেন যা দেখলে শ্রদ্ধার চেয়ে দুঃখই বেশি হয়।

বাঘ দেখলে লোকে দৌড়ে পালায়, তা নেকড়ে বাঘই হোক আর ব্যাঘ্র শিশু হোক। যেহেতু ব্যাঘ্র মাংসভোজী জন্তু। তার চোখে পড়লেই সে মানুষকে আক্রমণ করবে। পুরুষ দেখলেই ভয়ে আমাদের মেয়েদের পলায়ন প্রথাটাও ঠিক সেইরূপ? পুরুষমাত্রেরই নারীমাত্রকে আক্রমণ করার যথেচ্ছ শক্তি আছে, এ পলায়ন স্পষ্ট করে তাই ব্যক্ত করে। এ যে নারীর কত বড় দৈন্য কত বেশি দুর্বলতার প্রমাণ তা বোধ হয় অনেকে বুঝেও স্বীকার করবেন না।

আমাদের 'নায়েবে নবী' যাঁরা তাঁরা উপদেশ দেন—'পর পুরুষের দিকে চাইলে নারীর চক্ষু সাঁড়াশী দিয়ে উৎপাটিত করা হবে'; 'মাথার কাপড় ফেলে দাঁড়ালে, মস্তিষ্কে জ্বলন্ত বিদ্ধ করে দেওয়া হবে'; 'মুখ খুলে দেখালে সমস্ত মুখ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য, পুরুষেরাও তো এমনি নারীদের সঙ্গে সম্মানিত ও সংযত ব্যবহার করার শত শত বিধান শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তার একটিও তাঁরা দাঁতের ফাঁকে বের করেন না! তাঁদের উপর প্রযোজ্য শাস্ত্রবিধানগুলি যদি তাঁরা পালন করে যান তাহলে প্রকাশ্য হাটে বাজারে বিশ্বের সমস্ত নরনারী পাশাপাশি দাঁড়িয়েও যে পৃথিবীতে স্বর্গ করে তুলতে পারেন, একথা কেন একটি বারও স্বীকার করেন না? পর্দার প্রয়োজন কেন হয়? শুধু তাঁদের অন্যায় অত্যাচারের জন্যই নয় কি?

নারী দুর্বল, পুরুষ সবল, তাই পুরুষ আজ নারীর মাথায় সমস্ত শাস্ত্র এবং শাস্তির ভার চাপিয়ে তাদের পর্দার চাপে চেপে পিষে আধমরা করে রেখেছেন। আর মুক্তি এবং প্রভুত্বের গর্বে নিজেরা এমনি বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছেন যেন তাঁদের জন্য শাস্ত্রও নেই, শাস্তিও নেই।

পর্দার বাইরে আসা নারীর জন্য অমার্জনীয় অপরাধ! কিন্তু আবার সেই পর্দার ভিতরে গিয়েও তাঁরা অত্যাচার যখন করেন তখনও দুর্বল নাবীর স্কন্ধে সমস্ত অপরাধ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের পৌরুষগর্ব বজায় রাখতে এতটুকু লজ্জিত হন না!!

অত্যাচার যাঁরা করেন, প্রতিকারের ব্যবস্থাও তাঁদের হাত দিয়ে আসে। পুরুষ চিরদিনই বড় এবং নারী চিরদিনই ছোট। পুরুষ চালক, নারী চালিতা; পুরুষ শাসক নারী শাসিতা। নারীর জীবনযাত্রার পথ চিরদিন নির্দেশ করে দেয় পুরুষই। অতীতের পর্দার বন্ধন, বর্তমানের মুক্তির নগ্নতা, এদুটাই পুরুষের দেওয়া। কিন্তু নারীর জন্য বোধ হয় এর একটিও যথেষ্ট নয়। এর একটি যেমন অত্যন্ত সংকীর্ণতার পরিচায়ক, অপরটি তেমনি অতি বেশি উশৃঙ্খলতার পরিপোষক। নারীর স্বাধীনতা সসীম, গতি সংযত এবং সাংসারিক জীবনের পবিত্রতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। স্বাধীন অথচ অধীন, মুক্ত অথচ বাঁধা, চঞ্চল অথচ ধীর

এবং উচ্ছৃঙ্খল অথচ সংযত এমনি একটি ব্যবস্থা বর্তমানে মুসলমান নারীদের জন্য বড় প্রয়োজন। এইরূপ একটা ব্যবস্থা জাতির ভবিষ্যৎ জনক তরুণ মুসলিম, ভবিষ্যৎ তরুণ জননীদের জন্য নিরূপিত করুন। পর্দা তাঁরা ততটাই রাখুন যতটা হজরত মোহাম্মদের নিরূপিত। যেটা শুধু আমিরী, শুধু সংকীর্ণ সন্দেহপরায়ণ মনের বন্ধনপ্রচেষ্টা সেটা তাঁরা সবলে ছিন্ন করে ফেলুন। তরুণ মুসলিমকে চিন্তা করে দেখতে হবে। তাঁরা আর আমীর নন। অতীতের বিশ্বজয়ী মুসলমান আজ বিজিত। তাদের আকাশস্পর্শী উচ্চ সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত। তাদের অসীম ঐশ্বর্য, উৎকট জ্ঞানপিপাসা, প্রবল বুদ্ধিবীর্য সমস্তই একটা বিরাট স্বপ্নের মত বিস্মরণের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পর্দার অন্তরালে নারীকে শুধু ভোগের বস্তু, সেবাদাসী, সন্তানের ধাত্রী এবং রন্ধনের যন্ত্র করে রাখার সময় আর নেই, নারীর শক্তি বিকাশের এই নতুন যুগ মুসলিম নারীর রুদ্ধ দ্বারে বার বার আঘাত করছে।

ভদ্রনারীর মুক্তির দ্বার যাঁরা অসংখ্য শাস্ত্রকুলুপের জোরে এঁটে দিয়েছেন সেই সব 'নায়েবে নবীরাই' কিন্তু কৃষকনারীদের মুক্তি ব্যাপারে ফতোয়া দেন—'লাচারির মসলা নেই'। এ যদি সত্য হয় তবে আজ গোটা মুসলমান সমাজই দুর্বার পতন প্রবণতার বেগে এমনি সংকটাপন্ন বিপদসঙ্কুল অধঃপতনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে শুধু জরা শুধু মৃত্যু ভিন্ন জীবনের সজীব স্পন্দন এতটুকু নেই! জাতির এত বড় দুর্দিনে নারীর মুক্তির অত্যন্ত আবশ্যক। নারীর মত একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত কষ্টসহিষ্ণু সহকর্মীর বড় প্রয়োজন।

কিন্তু এ প্রয়োজন নারীকে বোঝাবার শক্তি বৃদ্ধের নেই, প্রাপ্তবয়স্কদেরও নেই। আছে শুধু তরুণের। নবীন যুগের নতুন জ্ঞানালোক দিয়ে তরুণ মুসলিম তাঁদের নারী সমাজকে সঞ্জীবিত করে তুলুন। নারীর বন্ধন, নারীর অজ্ঞতা, আজ তরুণ মুসলিম দলের বলিষ্ঠ বাহুর দৃঢ় আকর্ষণে ছিন্ন হয়ে যাক। নারী বুঝুক, তারা শুধু সচল মাংস পিণ্ড নয়। দুর্গম জীবন পথে তারা পুরুষের সহকর্মী। স্বামী-পুত্রের আনন্দ দাত্রী জাতির শক্তিময়ী কল্যাণময়ী জননী।

নারীর সাহায্য ব্যতীত জাতি বোধ হয় উন্নতিলাভ করতে পারে, কিন্তু সে উন্নতি যেমন অতি বিলম্বে সংঘটিত হয় তেমনি পূর্ণাঙ্গও লাভ করে না। এর ধ্রুব প্রমাণ নবীন তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলমান শাসিত দেশ। আমাদের চোখের সম্মুখে খ্রিস্টান জাতির দেওয়া 'Sick Man' আখ্যাপ্রাপ্ত দুর্বল তুরস্ক আজ এই যে নিরোগ, পুষ্ট এবং বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে এর মূলে পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত শক্তি। তুরস্ককে বাদ দিয়ে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের দিকে চাইলেও দেখতে পাই সহস্র বৎসর যাবৎ বিজাতীয় শক্তির অধীনে দলিত পিষ্ট হয়েও আজ তারা এত অল্প সময়ের মধ্যেই এই যে নতুন বীর্যবান জাতিরূপে ইতিহাসে স্থান করে নিচ্ছে এও শুধু তাদের নয় এবং নারীর সম্মিলিত শক্তির অক্লান্ত প্রয়োগের ফলে। তাদের

সমাজের সংস্কারক পুরুষের সঙ্গে সংস্কারিকা নারীর মঙ্গলহস্ত নিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যেও আমিরী সভ্যতার পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আর তার প্রয়োজন নেই বলেই তারা সে পর্দা ছিন্ন করে ফেলেছে। তাই তাদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, কুমারী লীলা নাগ ও লতিফা বসু প্রভৃতির মত শত শত কর্মী মহিলার আবির্ভাব হয়েছে। নব যুগের নতুন চলার পথে হিন্দু নারী আজ প্রদীপ ধরে দাঁড়িয়েছে।

পর্দার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছি; কিন্তু তবু যদি কেউ আমাকে উশৃঙ্খলতার সমর্থক মন করেন তনে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করবেন। আমি তরুণ মুসলিম জননীদের জন্য মুক্তি কামনা করি সত্য কিন্তু সে শুধু মুক্তিই, তার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। এবং কেন কৃচ্ছতারই দুটি কৈফিয়ত দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।

আমাদের সমাজে সুধী চিন্তাশীল ব্যক্তি নেই এ আমি বলতে পারি না। কিন্তু এরা থাকা সত্ত্বেও কেন সমাজের কোনো সংস্কারমূলক শুভ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না? সমগ্র বঙ্গদেশে দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী মুসলমান তবু শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের কথা দূরে থাক ছেলেদের সংখ্যা আজো আশানুরূপ বৃদ্ধি হচ্ছে না? 'সাহিত্য সমিতি', 'ছাত্র সম্মিলনী', 'যুবক সঙ্ঘ' কোনো কিছুরই স্থায়িত্ব নেই কেন? এ সম্বন্ধে কোনো সুধীজন কোনো দিনও চিন্তা করেন কি? আর্থিক অস্বচ্ছলতা হয়তো এর একটি কারণ হতে পারে, কিন্তু পর্দাপীড়িত মুসলমান নারীর শিক্ষার অভাবই সব চেয়ে বড় কারণ নয় কি? হিন্দুদের দেখাদেখি অনেক কিছুই আমরা করতে চেষ্টা করি। কিন্তু সে সমস্ত চেষ্টাই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরে মিটে শেষ হয়ে যায়। এর একমাত্র কারণ আমাদের যুবসমাজ পেছন থেকে অর্থাৎ নারীদের কাছ থেকে কিছুমাত্র সহানুভূতি পায় না। জীবনের প্রতি ২৪ ঘন্টার প্রায় ২০ ঘন্টা সময় পুরুষ যে নারীদের সংসর্গ ভোগ করে সেই নারীর হৃদয়ের প্রদীপ্ত প্রেরণা, নারীর চোখের প্রসংশমান গৌরবদীপ্তি, নারীর প্রাণের গভীর শ্রদ্ধাব নিঃশব্দ নিবেদন, পুরুষের হৃদয়ে দৃর্দম্য শক্তির সঞ্চার করে, অকৃতকার্যতার ভয়সঙ্কুল বিঘ্নবিপত্তি দূর করে দিয়ে অবশ্যম্ভাবী জয়ের আশায় পুরুষকে উন্মাদ করে তোলে। পাথেয়হীনাবস্থায় পথ চলা যেমন অসম্ভব, নারীর উৎসাহ এবং প্রেরণা ব্যতীত কর্মক্ষেত্রে জয়লাভ করা পুরুষের পক্ষেও তেমনি সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে এ জিনিষটির একান্তই অভাব। আমাদের তরুণেরা তাই ছাত্রজীবনে যে উদ্যম নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় সংসারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে উদ্যম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের জননী, ভগিনী, স্ত্রী সমস্তই অশিক্ষিত। বহির্জগতের অবস্থা বিপর্যয়জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। কত বড় আশা কত বড় মহৎ অনুষ্ঠানের আগ্রহ যে তাদের পুরুষদের হৃদয়ে মাঝে মাঝে সাড়া দেয়, অজ্ঞ নারী সমাজ তার কিছুই বোঝেনা। তাই তারা উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে উপহাস করে

সহানুভূতিজ্ঞাপনের স্থলে বিদ্রূপ করে, স্বামী ভ্রাতার উক্ত কল্পনাসমূহকে অর্থহীন পাগলামী বলে উড়িয়ে দেয়। দিনকয়েক তাঁদের মুর্খতার বিরুদ্ধে লড়াই করে, অবশেষে ছেলেরাও একদিন সত্যি সত্যি সমস্ত অনুষ্ঠান ভেঙ্গে দিয়ে দুবেলা দুই মুষ্টি অন্ন সংস্থানে কোমর বেঁধে লেগে পড়ে। তারা আশৈশব দেখে আসে, কোনো প্রকারে দুবেলা খাওয়া এবং পাতলা ফিনফিনে বিলেতী কাপড় পরাই মানবজীবনের পরম এক চরম সার্থকতা। তাই বড় হয়েও শৈশবের সে বদ্ধমূল সংস্কার তারা কিছুতেই ছাড়িয়ে যেতে পারে না। এমনি করেই আজো গোটা মুসলমান সমাজ নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে নিদ্রিত অবস্থায় পড়ে আছে—প্রতিবেশী হিন্দুদের সমকক্ষতা লাভ করতে এখনো তাদের একশত বৎসরের প্রয়োজন।

পাঁচ বৎসর যাবৎ শিক্ষা কার্যে ব্যপৃত থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান ছেলে মেয়েদের অকৃতকার্যতার যতটুকু কারণ অনুমান করতে পেরেছি আজ তা ব্যক্ত না করে থাকতে পারলুম না। হিন্দু ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে সাফল্য লাভ করে অধিকাংশ ভাগ গৃহে তাদের শিক্ষিতা মাতা-ভগ্নির সাহচার্যের ফল। প্রাথমিক গণিত-সংজ্ঞার দুরূহতা ও বর্ণজ্ঞানের জটিলতা সমস্তই সহজ হয়ে আসে তাদের শিক্ষিতা জননী ভগিনীর অপর্যাপ্ত সাহায্যে।

যে কর্ম যত সরল যত সহজ বোধ হয় মানুষের উৎসাহ স্বভাবতই তাতে তত বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকে। গৃহে লেখা পড়ার চর্চার মধ্যে সর্বক্ষণ অতিবাহিত এবং অপর্যাপ্ত সাহায্য পেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার দুর্বোধ্যতা হিন্দু ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকেই দূরীভূত হয়ে যায়। এরফলে যতই তারা উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হতে থাকে ততই মনোযোগী, মেধাবী ও প্রতিভাশীল ছাত্র হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে মুসলমান ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে বাড়ী গিয়েই একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতে এসে পড়ে। যেখানে সাহায্য পাওয়া দূরে থাক লেখাপড়ার নামগন্ধও নেই। এমনি একটা অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে বাস করে, তাদের শিক্ষকের নির্দিষ্ট পাঠ দিনের পর দিন পুস্তকের ভিতরেই চাপা পড়ে যেতে থাকে। তাদের শিশুসুলভ চঞ্চল মন নিয়ে একা কিছুতেই প্রাথমিক শিক্ষার জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সুতরাং যত উপরে উঠতে থাকে ততবেশী 'কাঁচা ছেলে' বলে শিক্ষকদের তাড়না খায়, সহপাঠীর গঞ্জনা ভোগ করে। বাড়ীর অবিভাবকগণও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। অবশেষে সম্পূর্ণ ভগ্নোৎসাহ হয়ে একদিন তারা শিক্ষাক্ষেত্র থেকে চিরদিনের জন্য অবসর নিয়ে বাড়ী এসে বসে। অর্থাভাব ও আনুসঙ্গিক আরো অনেক কারণের সঙ্গে খুব সম্ভব এই অতিবড় কারণের জন্যই মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে আজও অল্পই রয়ে গেছে।

যদিওবা অল্প সংখ্যক মুসলমান ছেলের বিদ্যার দৌড় হাই স্কুল ও কলেজ ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছে, কিন্তু তাও ঐ পর্যন্তই শেষ হয়। যে বয়সে হিন্দু ছেলেরা অপ্রতিহত উদ্যমে দৃঢ় পদে কর্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায়, ঠিক সেই বয়সেই

মুসলমান ছেলেরা আলস্য ও জড়তায় আশি বৎসরের বৃদ্ধকেও হার মানিয়ে ছেড়ে দেয়। তাদের জীবনের সজীব চাঞ্চল্য ততটুকু সময়ই থাকে যতটুকু সময় বাল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ভিতর অধ্যয়নে অবসাদ, কর্মে অনাশক্তি ও পরিশ্রমে ক্লান্তি এত বেশি পরিমাণে দৃষ্ট হয় যে পরবর্তী জীবনে তারা শুধু কোনো প্রকারে অন্নসংস্থানের চেষ্টা করা ছাড়া মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতর কোনো কর্মে একপদও অগ্রসর হতে পারে না। একি চিন্তার বিষয় নয় যে, একই দেশে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করেও যে জড়তার লেশমাত্র হিন্দুদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না সেই জড়তা মুসলমানকে কেন এমন করে আড়ষ্ট করে রেখেছে! একি তাদের মাতৃগত শোণিতের প্রতিক্রিয়া নয়! আশৈশব মুসলমান মেয়েদের কঠিন পর্দার অভ্যন্তরে নিরক্ষর মূর্খ করে রাখা হয়। সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ কাজ নিয়ে একঘেয়ে নিয়মে জীবন যাপন করে তাদের জীবনের সজীবতা অকালে নষ্ট হয়ে যায়, মনও নিষ্ক্রিয় জড়ভাবাপন্ন হয়ে উঠে। দেহের সমস্ত স্নায়ু যৌবনেই শিথিল ও অবসাদ গ্রস্ত হয়ে যায়। এবং এরই ফলে তাদের গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে রক্তস্রোতের ভিতর দিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় অবসাদগ্রস্ত মনের সমস্ত উদ্যমহীনতা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তরুণ মুসলিম তাই তরুন হিন্দুদের তুলনায় আজো নিতান্ত অকর্মণ্য এবং অনগ্রসর।

একজনকে পায়ের তলায় চেপে পিষে ছোট করে রাখতে গেলে আর একজন সম্পূর্ণ সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে নত হয়ে পড়তে হয়। আমাদের হয়েছেও তাই। নারীকে চেপে পিষে ছোট করে রাখতে গিয়ে সমস্ত পুরুষ সমাজেরই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। আজ তারা সুস্থ নন। সমুন্নত মস্তকে অন্য জাতির সঙ্গে দাঁড়াবার সামর্থ্য তাদের মোটেই নেই? তাই আমি আবার বলছি, হে তরুণ মুসলিম, তোমরা এস, তোমাদের পূর্ব পুরুষদের সমস্ত দৌর্বল্য সমস্ত সংকীর্ণতা দূর করে দাও। নতুন যুগের নব প্রভাতে তোমাদের নবীন জীবনে নারী আসুক অগ্রদূত রূপে সমস্ত কল্যাণসম্ভার নিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের পবিত্র জয়যুক্ত শুভ অভিনন্দন নিয়ে,—দেখুক, তাদের তরুণ সম্প্রদায় জীবনসংগ্রামে জয় লাভের আশায় মার্চ করে চলেছে।

আমাদের মুসলমান নারীরাও যে জগতের কোনো সভ্য জাতির নারীদের চয়ে শক্তি সামর্থে ছেট নয়, এক কালে সাম্রাজ্যশাসন করা থেকে জগতের প্রত্যেক গৌরবান্বিত কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার শক্তি যে প্রচুর পরিমাণে তাদেরও ছিল। সে শক্তি পর্দার চাপে চেপে না রাখলে তাদের মধ্যেও আজ হিন্দুদের মতই অসংখ্য কর্মী মহিলার আবির্ভাব হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিলনা। এই শাশ্বত সত্যটিকে প্রচার করার ভার তরুণ মুসলিম গ্রহণ করুণ। তারাই নিমজ্জমান জাতীয় তরণীর শক্তি, কর্ণধার, সুতরাং এ কর্তব্য সম্পাদন করার শক্তি ও সাহস একমাত্র তাদের আছে।

সাহিত্যে শুচিতা

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ব্রাউনীং তাঁর 'One word more' কবিতাটির একস্থানে বলিয়াছেন যে চিত্রকর রাফেল, 'জন্মের মধ্যে কর্ম চৈত্র মাসে রাস' একবার মাত্র করিয়াছিলেন। তাহার আজীবন তুলি-পেশার পর একটিবার মাত্র একটি সনেট লিখিয়াছিলেন তাঁর প্রিয়ার উদ্দেশে। আমিও আমার পরমপ্রীতিভাজন ওদুদ সাহেবের পাল্লায় পড়িয়া এই প্রথম অনধিকার চর্চায় 'হাতে খড়ি' নিলাম। 'পুতলো বাজির' নাচে যে ব্যক্তি সূতা টানে আসলে সেই নাচে এবং তার সুরেই 'ছেঁড়া ন্যাক্ড়ার পুঁটুলি' কথা কয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমার ত্রুটি-প্রমাদের 'ওয়ারিশান' ওদুদ সাহেব।

যে প্রসঙ্গের অবতারণা—অবতারণামাত্র—আজ আপনাদের সম্মুখে করিতে সাধ্য হইয়াছি এ বিষয়ে হাটে হাটে সর্বত্রই একটা কাণাঘুষা চলিতেছে। সুতরাং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক কথা কানে আসে এবং কথার পাল্টা জবাব জিহ্বাগ্রে আসিতে চায়। বোবার সোনালী গাম্ভীর্যের অপেক্ষা বাচালের রূপালী মুখরতা নিকৃষ্ট হইলে 'বিতরতি সময়বিশেষে চিঞ্চা পঞ্চামৃতামোদং'। অবস্থা বিশেষে মানুষ পথ্য ফেলিয়া তেঁতুলের অম্বলের বাটিতে চুমুক দেয়। আমার অদ্যকার আচরণেরও এইরূপ ধৃষ্টতা লক্ষিত হইবে।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। মোটের উপর সাহিত্য সম্বন্ধেও ওই একই কথা, সাহিত্যের প্রাণবস্তু রস। এখন প্রশ্ন এই, রসবস্তুটি কি? যাহার আস্বাদনযোগ্য তাহাই রসস্বরূপ। প্রাচীন বিশেষজ্ঞেরা রসকে নববীজাতক বলিয়াছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নয়টির মধ্যে যেটিই বপন করা যাক না কেন, তার ফলে যদি মধুর আস্বাদনটুকু না জাগে, তাহা হইলে সে বীজ নিষ্ফল হইল বলিতে হইবে।

এই মাধুর্যের অনুভূতি লইয়াই মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা। কথায় বলে 'চাষা কি বুঝবে মদের তার'। শৈবলিনীর প্রেম লইয়া মরণপথযাত্রী প্রতাপ ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন 'কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী?' আজ এই অরসিক বৃদ্ধের মুখে রসতত্ত্বের অবতারণা শুনিয়া হয়তো আমার তরুণ বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ অরুণ আঁখি করিয়া বলিবেন—'কি বুঝিবে তুমি বৃদ্ধ?' প্রাচীন কবি মনের দুঃখে চতুরাননের নিকট আবৃত্তি করিয়াছিলেন, 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ

মা লিখ।' তাহার সেই সময় পাঠান্তর করিয়া ইহাও লিখা উচিত ছিল—'অরসিকাচ্চ রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।' অরসিকের কাছে রসের নিবেদন অথবা তাহার নিকট হইতে রসতত্ত্বের আবেদন দুইই তুল্যমূল্য, অর্থাৎ বিড়ম্বনা; কিন্তু যে প্রার্থনাই করা যাক না কেন, সব সময় দেবতা প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না,—অষ্টকর্ণ হইলেও। সুতরাং দায়ে পড়িয়া অরসিক ব্যক্তির নিকট রসের নিবেদন করিতে হয় এবং অরসিক প্রমুখাৎ রসের অনধিকার চর্চা ববদাস্ত করিতে হয়। 'লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্‌ঝিতুং কঃ সমর্থঃ?'

তবে একটা কথা আমার স্বপক্ষে বলিবার আছে। গানের আসরে যখন সংগীতজ্ঞ গুণীর সমাবেশ হয় তখন পাড়ার 'হরে, নোরে, পরাণের' দল গিয়াও জোটে। কেবল যে ঝামেলা করিবার জন্য, তাহা বলিলে বেচারীদের উপর বোধ হয় কিঞ্চিৎ অবিচার করা হয়। তাহারা নিশ্চয়ই কিছু আনন্দ পায়। সে আনন্দের মূল্য তাহাদের নিজেদের কাছে সব সময়েই আছে এবং আজ এই অনায়মান বলশেভিক যুগে আপামর সাধারণ আমরা সকলেই যখন শূদ্রতান্ত্রিক শাসনের অনুকূল, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হোক হইয়া উঠিতেছি তখন সেই অত্যাধুনিক ডিমক্রেসির দোহাই দিয়া, man in the street's point of view অর্থাৎ পথের লোকের মতামতের প্রতি একটু নেক নজর আকর্ষণ করিয়া আপনাদের ধৈর্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সুন্দর আমরা অনেক জিনিষকেই বলি এবং সৌন্দর্যের তারতম্যের আর অবধি নাই। তবু এই বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে কতকগুলির কপালে যেন একটা চিরন্তন সৌন্দর্যের ফোঁটা আছে। কুলেশীলে ইহারা সুন্দর কুলের ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে বলে 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ—ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ।' আমি এই বিশিষ্ট অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দটি এইখানে ব্যবহার করিতেছি। চিরসুন্দরই রূপব্রহ্ম। যে সৌন্দর্যে নিত্যমাধুরীর একটা আভাস বা ইঙ্গিতমাত্র আছে তাহার গলায় সাহিত্যোক্ত যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। চির সুন্দর, নিত্যমাধুরী, ব্রহ্ম প্রভৃতি কতকগুলি গুরুবাক্য ব্যবহার করিয়া ফেলিলাম। কি জন্য বাক্যগুলি প্রয়োগ করিলাম বলিতে চেষ্টা করিব।

আমরা সকলেই জীবনের অভিজ্ঞতায় জানি, কতকগুলি ক্ষুৎপিপাসা আছে যাহা অন্ন পানের মত পূর্ণতৃপ্তিতেই মিটিয়া যায়। তাহাদের সঙ্গে আমাদের নগদ কারবার। উভয় পক্ষেই কোনো দেনা থাকে না। জীবনে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলেও, কাব্যে ও সাহিত্যে ইহাদের স্থান খুঁজিয়া পাই না। আমাদের সকলের ভিতরই সৌন্দর্যবোধ বলিয়া যে জিনিষটি আছে তাহা আমাদের প্রত্যেকের অন্তপ্রকৃতির অনুপাতে। এই লইয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা ও বিরোধ থাকিলেও একটি বিষয়ে বোধ করি সাদৃশ্য আছে। যাহা সুন্দর তাহার মুখে এমন কিছু আছে যাহার জোরে সে অবলীলাক্রমে প্রাণের শীর্ষস্থানটি অধিকার করিয়া

বসে, আর সবাইকে পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া। জনতার ভিতর একখানি সুন্দর মুখ অন্য মুখগুলিকে নিমেষে নিভাইয়া দেয়। যে মুখখানি আমার ভাল লাগিল সেটা আপনার ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরের উচ্চাসন খানি সেই প্রিয়দর্শনের জন্য পাতিয়া দেই। এই যে preferential treatment বা তুলনামূলক পক্ষপাতিত্ব, ইহা সৌন্দর্য রাজস্বের মতই জোর করিয়া আদায় করে এবং সেজন্য মনে civil disobedience জাগায় না। বরং তাহাকে সমাদর করিয়া প্রণতি জানাইয়া কৃতার্থ হই।

দ্বিতয়িত, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনুভূতির পার্থক্য থাকিলেও আমরা সকলে অনুভব করি—'A thing of beauty is a joy for ever' যা সুন্দর তা চিরনবীন চির মধুর। Speace-এ বা দেশে সিংহাসন ও time-এ বা কালে চিরন্তনত্ব লাভ করিবার শক্তি সৌন্দর্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। সাহিত্য-রচনায় এই দুটি লক্ষণ আমরা খুঁজি এবং ইহাদের আমেজ যদি কোনো লেখায় জাগে তবে তাহাকে সৎসাহিত্য বলিতে দ্বিধা হয় না। সৌন্দর্যের এই স্বাভাবিক আভিজাত্য বা বিশিষ্টতা আছে। বুঝি এই সৌন্দর্য বোধ সেই অমোঘ অন্ধানুভূতি, যাহা সৃষ্টি শতদলের নব নব দল যুগ যুগান্তর ধরিয়া উদ্বিগ্ন করিয়া চলিতেছে। বাঁদরকে মানুষ করিতেছে, মানুষকে superman বা অতিমানবের পদে উন্নীত করিবার জন্য অতন্দ্রিত চেষ্টা করিতেছে।—তৃতীয়ত, আর একটি কথা বলিতে চাই। ধরুন বেলফুল। কতটুকু পরিসর তার আকাশে, কতটুকু আয়ু তার কালে? কিন্তু বাস্তবিক বেলফুলটির প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে কি কেবল দেশ কালেই বদ্ধ? যদি তার সৌরভটি চোখে দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে হয়তো দেখিতাম যে, ক্ষুদ্র পাপড়ি-সমষ্টির কেন্দ্রবিন্দুটি আশ্রয় করিয়া একটা সৌরভের জ্যোতির্মণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া আছে। কিন্তু এখানেও শেষ কথা বলা হইল না। সেই সুগন্ধের সঙ্গে মনে যে আনন্দের অনুভূতি জাগে এবং সেই আনন্দ-চেতনার সঙ্গে পূর্বানুমতি সুখস্মৃতির ঝঙ্কার যদি বাজিয়া ওঠে, তাহা হইলে দেখুন কি দৃশ্যপটই চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলিলেন—'ফুল দেখে মনে পড়ে কারে ভালবাসি' তখন সে কবির চোখে ফুলের যে বিরাট বিশ্বরূপ ফুটিয়া ওঠে সে ছবি তুলিতে আঁকিতে হইবে চিত্রপটখানি দিকচক্রবাল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া যায়, সুদুর অতীতকে আপনার চিত্রবন্ধনীর মধ্যে টানিয়া আনে।

ধ্বনি-বিজ্ঞানে বলে যে প্রত্যেক স্বরটির একটি মৌলিক সুর বা fundamental note আছে। বেহালার 'সা' বা হারমোনিয়ামের 'সা' মূলত একই সুর, কান বলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, যাহার দ্বারা কোনো যন্ত্র হইতে সুরটি বাহির হইতেছে তাহা ধরিতে কিছুমাত্র মুশকিল হয় না। কি সে বিশেষত্ব? বিজ্ঞান বলে যে, মুল সুরটিকে ঘিরিয়া অনেকগুলি Harmonics বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

ক্ষীণধ্বনির অনুসরণ আছে, তাহারা মূল সুরটিকে বজায় রাখিয়া তাহাকে বিশেষ বিশেষ রঙে যেন অনুরঞ্জিত করে—কালো মেয়ের মুখে সায়াহ্নের সোণার আলো যখন পড়ে তখন সে মুখে যেমন ত্রিদিব কান্তি ফুটিয়া ওঠে। সাহিত্য সেই অনুরঞ্জনা যাহা বস্তুতান্ত্রিকের স্থূল রূপের উপর একটা অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় আভা মাখাইয়া দেয়। তখন অসুন্দরও সুন্দর হয়, তখন বেহালার ছড়ের মধুনিষ্যন্দিনী সুরধারার সঙ্গে হারমোনিয়ামের কাংস্যনিনাদিনী মধুশ্রবার প্রভেদ বুঝিতে আর বেগ পাইতে হয় না। কাগজের ফুলে গোলাপী আতর মাখাইয়া দর্শকের চক্ষু নাসিকায় ক্ষণিকের বিভ্রম উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু তার পাশে সদ্য-প্রস্ফুট গোলাপ যদি রাখেন তবে দেখিবেন যে ভ্রমর উড়িয়া গিয়া সেই সাচ্চা গোলাপটির উপরই বসিবে, তা পার্শ্ববর্তিনীর যতই রঙের বাহার ও গন্ধের তীব্রতা থাকুক না কেন!

Realism in art নিয়ে যে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের আমদানী আজকাল বাজারে দেখা দিয়াছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও একেবারে চোখাচোখি হয় নাই তাহা নয়। তাহাদের দেখিয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে তাহা বলিব? আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া যখন আমার হ্যাট-কোট পরিহিত ইঙ্গবঙ্গ মূর্তিটি দেখি তখন যে হাস্যকর চিত্রটি চোখে জাগে, এই সব রচনায় তাহার আদল পাই। এই সকল লেখায় যে Continental Literature-র দোকান থেকে Hat, Coat, Tie এর আমদানী সব সময় হয় তা নয়, কিন্তু যে নগ্নতা পশ্চিম সাহিত্যে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে সেই বেআব্রু রচনার একটা সচেষ্ট নির্লজ্জ অনুকরণ আছে। একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে বেশভুষা সম্বন্ধে যে একটা কলাবিধি, Esthetic Convention আছে তাহা দেশে দেশে কালে কালে বিভিন্ন। কিন্তু মনের উপর প্রতিক্রিয়া হিসাবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নিকট আত্মীয়তা আছে। নারীর নগ্ন পদ আমাদের দৃষ্টিকটু নয়, কিন্তু পাশ্চাত্য রুচির চক্ষুশূল। সেইরূপ যে সবদেশে ও সমাজে স্ত্রী পুরুষের মুক্ত গতিবিধি ও অবাধ মিলনের আনুকূল্য আছে, তাঁহাদের সে স্বৈরগতি ও অকুণ্ঠিত আচার ব্যবহারে রুচি ও নীতিকে আঘাত দেয় না এবং সকল স্থলে বিতৃষ্ণা উৎপাদন করে না। দেশ-ভেদে ও পাত্র পাত্রী ভেদে সেইরূপ আচরণ সঞ্চরণ ন্যক্কারজনক হইতে পারে। নীতিবাগীশের তরফ হইতে এ কথা বলিতেছি না। রূপদক্ষের সমীভূত দৃষ্টিতেও সে দৃশ্য দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিতে বেসুরা লাগিতে পারে, সেই কথাই বলিতে চাই। সাহিত্যে কতটা পরিমাণে আবরণ খসান যাইতে পারে তাহার কোনো ধরা বাঁধা আইন কানুন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এ কথা ঠিক যে নিবারণ-প্রকটতা, যাহা এক স্থলে কোনো গ্লানি উৎপাদন করে না, অন্যত্র তাহা বীভৎস হইয়া দাঁড়ায়। কেন? বলা শক্ত। তবে মনে হয় প্রকাশ বা অপ্রকাশ আসল কথা নয়, আসল কথা যে আলোকে যবনিকার উত্থান পতন হইতেছে সেই আলোকের এমন একটি অনির্বচনীয় শক্তি আছে যাহা অসুন্দরকে

সুন্দর এবং সুন্দরকে কুৎসিৎ করিতে পারে, সুরুচি কুরুচির মুণ্ড বদল করিয়া দেয়। সেইরূপ রূপদক্ষ প্রাণের প্রদীপে যে শিখাটি জ্বালিয়া লন সেই আলোকে কোন ছবিটি কতকক্ষণ কিভাবে ধরিবেন যাহাতে বিরক্তি, বিতৃষ্ণা বা কলুষের সৃষ্টি করিবে না, তাহা তাঁহার অভিজ্ঞ দৃষ্টি ও নিপুণ লেখনীর উপর নির্ভর করে। বাইসিকেলের দুচাকার উপর ভার-কেন্দ্রটি ঠিক রাখিয়া, আছাড় না খাইয়া, চলিতে পারার প্রধান সহায় গতি। যে লেখকের রচনায় গণ্ডীর ভিতর, বাস্তবের ভিতর, একটা কল্প লোকাভিসারিণী প্রগতি আছে, তিনিই কর্দমাক্ত পথে অচলপ্রতিষ্ঠা লাভ না করিয়া সৌন্দর্যের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, আর আমাদের মত অপটু লোকেরা তাঁহাদের পৃষ্ঠে ভর রাখিয়া চক্রবাহনে বিনা খরচায় বিনা বিপত্তিতে, সাদা কাপড়ে, বাণীমন্দিরের দেউড়িতে পৌঁছিতে পারে। সীমার ভিতর সীমাতীতের ব্যঞ্জনা, অপূর্ণতার ভিতর পূর্ণতাভিমুখী ইঙ্গিত, জড়ের ভিতর অতীন্দ্রিয়ের ঝঙ্কার যে লেখার ফাঁকে ফাঁকে আছে সেই রচনাই সাহিত্যপদবাচ্য।

আমরা দেহী জীব হইলেও, এই রক্তমাংসের বনিয়াদের উপর আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনুভূতি দিয়া একটি ইমারত গাঁথিয়া তুলিতেছি। দেহলোকের উপর ইহাই আমাদের স্বরচিত অধ্যাত্মলোক। এই লোকেই বাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পাষাণ ভিত্তির ফাঁকে যাহারা গর্ত করিয়া, কুরিয়া কুরিয়া মাটি বাহির করে, তাহাদের এই মূষিকবৃত্তিকেই সাহিত্যে কুরুচি বলিতেছি। সুখ দুঃখ পাপ পূণ্য অবিচার অত্যাচার লইয়া আমাদের সামাজিক জীবন। ইহাদের সকলেরই সৎসাহিত্যে স্থান আছে। কিন্তু সাহিত্যিককে পঙ্ক হইতে পঙ্কজ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, পঙ্কজ হইতে পঙ্কোদ্গীরণ করা তাঁহার ধর্ম নয়।

কাব্যের ও কথা-সাহিত্যের একটা প্রধান মৌলিক উপাদান নর-নারীর প্রেম। স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রাণসৃষ্টির মূলে। মানবসভ্যতা বহু যুগ ব্যাপী সাধনায় ইহাকে চাপে পিশিয়া ছাঁচে ঢালিয়া দাম্পত্য প্রেমের আকার দান করিয়াছে। মানবের ঈষণা ও চেষ্টায় যাহার সৃষ্টি, তাহা এক হিসাবে কৃত্রিম, 'সহজিয়া' নয়, সামাজিক বিধি নিষেধের ভিতর দিয়া, দেশে দেশে কালে কালে স্ত্রী-পুরুষের যে আত্মীয়তার ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে মোটের উপর এক পথ দিয়া চলে নাই। পূর্ব এবং পশ্চিম দুই-ই নর নারীকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে বটে কিন্তু এই গ্রন্থিবন্ধনের প্রণালীর ভিতর মূলত পার্থক্য আছে। পশ্চিমে পাত্র পাত্রীর পরস্পর মনোনয়নের পথ আমাদের দেশের তুলনায় অনেকটা অবারিত। আমাদের দেশে সহজিয়া ব্যবস্থা যে একেবারে ছিল না তাহা নয়। তবে আমাদের দেশে সাধারণত প্রাগবৈবাহিক পূর্বরাগের ব্যবস্থা ছিল না, পশ্চিমে আছে। বর্তমান যুগে পশ্চিমের হাওয়া আমাদের দেশের উপর উত্তরোত্তর প্রবল ভাবে বহিতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আটচালায় ভাঙনের মড়মড়ানি স্থানে স্থানে জাগিয়া

উঠিতেছে। সেই ঝোড়ো হাওয়া কথা-সাহিত্যে লাগিয়াছে। সাহিত্য, সমাজের ভড়ে পালের হাওয়া, সুতরাং ঊনপঞ্চাশ বায়ুর ফুৎকার এই ভরা পালে লাগিবেই। কিন্তু নোঙর গড়িয়া, হালে দাঁড়ে মাঝি দাঁড়ি না বসাইয়া, যদি কেবল ঝোড়ো হাওয়ায় পাল মেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তীরে বসিয়াই নৌকা ডুবির সুব্যবস্থাই করা হয়।

আকাশের মুক্ত বাতাসের মতই সাহিত্যের মুক্তগতি। তাহার সদর অন্দর নাই। অসূর্যম্পশ্যার কাছেও সে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে। সামাজিক রীতি নীতির মর্যাদা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া যদি তরুণ কথা-সাহিত্য কঞ্চুকীর মত অন্তপুরচরোবৃদ্ধের নিরঙ্কুশ গতিবিধি লাভ করে তাহা হইলে 'যথারণ্যং তথাগৃহ'-এর অবস্থায় সমাজকে পৌঁছিতে বিশেষ গৌণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, যৌবন-বিবাহ, এমন কি স্থল বিশেষে 'ডাইভোরসের'-ও প্রয়োজনীয়তা না হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু এ সকল সমাজ-সংস্কারের ব্যবস্থা যদি এক দল গুণ্ডা ও লম্পটের হাতে দেওয়া যায়, যাহারা গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া free love বা অবাধ প্রেমের সুসমাচার প্রচার করিবে এবং পৌরহিত্যের কর্তব্যভার বহন করিবে তাহা হইলে গ্রামবাসী রমণীদের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি নিকট আত্মীয়েরা এই নবীনপন্থীদের কিরূপ অতিথি সৎকার করিবেন তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে উক্ত মহোদয়গণ সশরীরে প্রবেশাধিকার আপাতত না পাইলেও সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া অন্তপুরে প্রবেশাধিকারের জন্য সাহিত্যিক passport বা ছাড়পত্র সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। এরূপ লেখক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সম্প্রতি সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। তবে ইহাদের তাড়াইবার ভার বোধ করি পুরুষদের না লইলেও চলে। যাঁহাদের কল্যাণ হস্তের সম্মার্জনী এখনও বাংলার ঘরে ঘরে গৃহের আবর্জনা ঝাঁটাইয়া আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে, তাঁহারাই ইহাদের সদ্গতি করিবেন। নীতি জিনিষটা কেবলমাত্র বিধি নিষেদ নয়—উহা Instinct of Self-preservation- —আত্মরক্ষার অমোঘ অস্ত্র। প্রাণের ধর্ম প্রাণ রক্ষা। ভাবী দেশমাতৃকারা দশভুজা হইয়া দশসম্মার্জনী ধারিণী হইবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সব সমাজেই গলদ আছে—আমরাও সৃষ্টিছাড়া সাধু নাই। আমাদের সমাজকে ভাঙিয়া গড়িতে হইবে এবং সেই জীর্ণ-সংস্কারের প্রধান অস্ত্র সাহিত্য। সে অস্ত্র যেন 'ভালুকের হাতে খোন্তা' না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাহিত্যে শুচিতা পাপীকে বা পতিতাকে ঘৃণা করিয়া রক্ষিত হয় না, রক্ষিত হয় পাপকে ঘৃণা করিয়া, জঘন্যতাকে ঘৃণা করিয়া।

মনে পড়ে, বিলাতে কসাই-এর দোকানে বড়দিনের উৎসব সজ্জা দেখিয়াছিলাম। শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর একটি ছাল ছাড়ান শুকরের মুণ্ড—তাহার কানে ও নাকে ফুল গুজিয়া গলায় মালা দিয়া তাহাকে সজ্জায় সাজান

হইয়াছে। বর্তমান সাহিত্যে এইরূপ রক্তমাংসের পূজার আয়োজন আমার চক্ষে পড়িয়াছে। ঘোরতর মাংসাশীর পক্ষেও এরূপ দৃশ্যে রসভঙ্গ হয়। মাংসের পূজা ফুলে নয়,—পেঁয়াজ, রশুন, গরম মসলায়। আর্টের এমন বীভৎস দুর্গতিও মাঝে মাঝে দেখিতে হয়!

উপসংহারে আর একটিমাত্র কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকদের ভিতরে এমন সব লেখক দেখা দিয়াছেন—যাঁহাদের ললাটে নবরবির অনাবিল দীপ্তিচ্ছটা আছে। তাঁহারা সকলেরই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া যখন নবসৃষ্টির অভ্যুদয় হয় তখন তাহার বিদ্রোহ, প্রমত্তা, আবেগান্ধতা উদ্দাম হইয়া উঠে। বিজয়ী সেনাপতি যখন প্রাচীন দূর্গের পর দূর্গ ধুলিসাৎ করিয়া দিয়া অগ্রসর হন তখন সে-জয়যাত্রার ধুলির অন্তরালে সামরিক অরাজকতা বিশৃঙ্খলার সুবিধা লইয়া দুবৃত্তের দল নারীবিগ্রহ, পরস্বাপহরণ, বৈরনির্যাতন ইত্যাদি পাশবিক অত্যাচারের 'মরশুম' পায় এবং 'নলিচার আড়ালে গুড় ক ফুঁকিয়া লয়'। ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে নৃশংশ বর্বরতার বাঁধভাঙ্গা বন্যা আসিয়া পড়ে। বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আনিতে যাঁহারা বদ্ধপরিকর তাঁহাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক যে তাঁহাদের প্রচেষ্টার আশ্রয়ে এই সাহিত্যক দুর্বৃত্তেরা প্রশ্রয় না পায়। উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যিনি ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ইতিহাস তাঁহার সাত খুন মাপ করিতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র পাশবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই চরমরূপ ধারণ যাহাতে না করিতে পারে সেজন্য প্রবর্তকবর্গের আত্মসংযমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিরাখা কর্তব্য। কারণ পশুরাজ আমাদের সমস্তের ভিতরই বিদ্যমান। দুশভুজার বাহনও কেশরী। কিন্তু সোয়ার হুঁসিয়ার না হইলে বিদ্রোহী বাহনের নখদন্তে উচ্চাদর্শের অন্তেষ্টিক্রিয়া অনায়াসেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। সত্য বটে, স্রষ্টা প্রাণের আনন্দেই সৃজন করেন কিন্তু দ্রষ্টাকে একেবারে বাদ দিয়া নয়। কারণ মানুষ আপনার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করে অপরের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে, বিশ্বের সহিত নিবিড়তম যোগাযোগ দ্বারা। সুতরাং সত্যংকে শিবং হইতে হইবে। এবং প্রীতির বন্ধন, যিনি সুন্দর তিনিই কেবল বাঁধিতে পারেন। যাহা কদর্য, অসুন্দর, তাহা প্রীতিকে আনন্দকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। মেঘমালার মতই কাব্যসৃষ্টির ঋজুবঙ্কিমরেখাধৃত সুনির্দিষ্ট আকার আয়তন নাই। কিন্তু বায়ুবিজ্ঞানের মত মেঘেরও শ্রেণীবিভাগ আছে, কালাকাল আছে যাহার সহিত ধরণীর শুভাশুভ নিত্যযুক্ত। মেঘরাশি কখনও বা উষরক্ষেত্রের শ্যামলিমার উর্বরতার রসধারা কখনও বা ঝড়ঝঞ্ঝাঅশনিসম্বলিত মহাপ্রলয়ের বাদরুখানা। অন্ধ প্রকৃতির সৃষ্টিলীলায় প্রজননী রক্ষণী ও বিধ্বংসিনী শক্তির বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত। কিন্তু এই চিরবৈচিত্র ও বিরুদ্ধতার ভিতর মানবকল্পনা সত্যং শিবং সুন্দরমের একটি মুর্তির ছায়া দেখিতে পাইয়াছে। কারণ এই যে,

ঐক্যের একটি অখণ্ড তাৎপর্য্য তাহার প্রাণে আছে। মানুষ স্বয়ং যেখানে স্রষ্টা, সাহিত্যের সেই সৃজন ক্ষেত্রে এই Harmony বা সুগভীর সমন্বয়ের ঐক্যতানটি তাহার প্রাণে সজাগ রাখিতে হইবে নতুবা তাহার সৃজন সার্থকতা লাভ করিবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি এই দেহই অধ্যাত্মলোকের বানিয়াদ। এই ইন্দ্রিয়ের তারেই অতীন্দ্রিয় সুর বাজে, বেতার বীণায় নয়। যে সভ্য নর সমাজের স্রষ্টা সাহিত্য তাহারই অধ্যাত্ম সৃষ্টি। আজ যাহা চিন্তনে ও ধ্যানে, কাল তাহাই উদ্ভিন্ন হইবে জীবনে, গৃহপরিবারে, সমাজে। সাহিত্যিক ঋষির ন্যায় মন্ত্রদ্রষ্টা—তিনি আজ যাহা চোখে দেখিতেছেন অনাগত ভবিষ্যতে তাহাকেই আমরা সমাজে রাষ্ট্রে মূর্তিমান দেখিব। সেইজন্য সাহিত্যিককে ঋষির সম্মান দিতে চাই। 'জবাকুসুমশঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহদ্দ্যুতিং' তরুণ সাহিত্যিকদের আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিতে চাই। তাই বলি তাঁহারা নমস্য হউন. 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং' হউন, তাঁহাদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

ব্রিটিশ-ভারতে মুসলমান-আইন

আবুল হুসেন

মানুষ আপনার শক্তি বিকাশ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আইন গঠন করে। তাই আইন ও মানুষে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একে অপরকে এড়িয়ে যেতে পারে না বরং একে অপরের হাত ধরাধরি করে চলে। তাই বলে যে আইন ও মানুষ সনাতন অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে তা নয়। মানুষ তার আপনার প্রয়োজনে আইন গড়ে, ভাঙ্গে, পরিবর্তন করে ও ছেড়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে আইন মানুষকে ক্রমেই বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। মানুষের এগিয়ে চলা যেমন স্বাভাবিক আইনের পরিবর্তন করবার শক্তিও তার তেমনি অনিবার্য। কিন্তু যে মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় ও আইনকেও ধরে রাখতে চেষ্টা করে সে মানুষ তার জীবনস্রোত হারাতে বাধ্য।

যুগেযুগে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাড়নায় আপনার সত্ত্বার প্রয়োজনে আইন গড়েছে। সেই অবস্থা বিশেষই আইনের জন্ম দিয়েছে। কাজেই অবস্থার পরিবর্তন হলে আইনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

হজরত মুহম্মদের যুগে আরব দেশের প্রয়োজন অনুসারে যে আইন রচিত হয়েছিল সে আইন জগতের সর্বত্র সর্ব অবস্থাতেই প্রযোজ্য বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সে বিশ্বাস মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাস সমর্থন করতে পারে না। সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এদেশের মুসলমানদের জন্য ব্রিটিশ-প্রভু যে মুসলমান আইনের প্রচলন করেছেন তার জন্মভূমি ছিল আরব-মরু, বোখারা, খোরাসান ও সমরকন্দ—যার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে আধুনিক ভারতীয় মুসলমানের পরিপার্শ্বের আদৌ মিল নাই। এই জীবন্ত পরিপার্শ্বকে তুচ্ছ করে জোরজবরদস্তি খোরাসান-বোখারার আইন হুবহু প্রবর্তন করবার চেষ্টা করা

ফলে ভারতীয় মুসলমান-মানুষ ও মুসলমান-আইনের মধ্যে যে বিরোধ দিন দিন প্রবল হয়ে উঠেছে এবং তাতে ভারতীয় মুসলমান সমাজের যে অবস্থা হয়েছে তা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন। আজ আমি ব্রিটিশ ভারতের মুসলমান-মানুষ ও মুসলমান-আইনের পরস্পরের সম্বন্ধ কি ও তার ফলাফল কি

হয়েছে ও হচ্ছে সে সম্পর্কে সামান্য কিছু ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হব। এ সম্বন্ধে যোগ্যতর ব্যক্তি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে ভারতীয় মুসলমান সমাজের বহু ব্যাধি দূরীকরণের পথ উন্মুক্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

গোড়াতেই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ব্রিটিশ-রাজ ভারতীয় মুসলমানের মাত্র ওয়ারিসী স্বত্ব, দান, বিবাহ, তালাক, ওয়াকফ ও হকশোফা সম্পর্কিত আইনের প্রচলনে সম্মতি দিয়েছেন, কিন্তু অপরাপর আইনের প্রচলন বন্ধ করেছেন। তারপর ঐ সমস্ত প্রচলিত আইন পরিচালনার জন্য মুসলমান আইন সঙ্গত যে বিধি বিধান প্রচলিত ছিল, যেমন ইজমা, কেয়াস, ইজতিদাহ, তাও বন্ধ করেছেন। তাতেও পক্ষান্তরে ব্রিটিশ-অনুমোদিত মুসলমান আইনের ব্যবহার (practice) অনেকখানি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাতে মুসলমান সমাজে মুসলমান-আইনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও ভয় অনেকখানি কমে গেছে এবং সে জন্যই মুসলমান সমাজের শ্রী ফুটতে পারছে না। আর একদিক থেকে ভারতীয় মুসলমানের জীবন বিকশিত হতে পারছে না। আরবি না জানার দরুণ অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমান আইনের প্রকৃত মর্ম বিচারকগণ উপলব্ধি করতে না পেরে ভুল অর্থে আইনের প্রযোগ করায় মুসলমান সমাজের বর্তমান অবস্থার সাথে মুসলমান আইনের সামঞ্জস্য হারিয়ে গেছে ও প্রতিনিয়ত যাচ্ছে। কথাটি বেশি বিস্তৃত করে বলবার ইচ্ছা প্রবল হলেও এ প্রবন্ধে বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। এ কটি কথা কেবল বন্ধুদের পুনঃ পুনঃ তাকিদের জন্য লিখতে বাধ্য হয়েছি।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিই। হকশোফার (Right of Pre-emption) আইন বলেছে, যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তি আপনার কোনো শরিকের অংশ ক্রয় করে তবে আপনি সেই অংশ ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হতে কিনে নিতে বা ফিরিয়ে নিতে পারেন। উদ্দেশ্য—আপনার কোনো শত্রু বা অপ্রীতিকর পড়শী এসে আপনার সংসারকে বিপর্যস্ত না করে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজির অনুসারে যদি কোনো হিন্দু আপনার শরিকের অংশ খরিদ করে তবে আপনি তাঁর থেকে সেই অংশ ফিরিয়ে নিয়ে আপনার সংসার শান্তিময় রাখতে পারবেন; কিন্তু বাংলাদেশে হকশোফার আইন হিন্দু খরিদ্দারকে আপনার শরিকের অংশ খরিদ করতে অনুমতি দিয়েছে। মুসলমান আইনের উদ্দেশ্য এখানে অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশের সমস্ত শহরে মুসলমানের সম্পত্তি হিন্দুর হাতে চলে গেছে ও যাচ্ছে; কিন্তু মুসলমান ইচ্ছা থাকলেও ফেরাতে পারে নাই ও পারছে না। তাই দেখতে পাবেন অনেক শহরে আজ যেখানে হিন্দুর বড় বড় এমারত উঠেছে সেখানে অতি নিকট-অতীতে মুসলমানের বসতি ছিল। মুসলমান সম্পত্তি বিক্রয় করেছে বা করছে কেন তার কারণ ঢের আছে, কিন্তু হকশোফার আইন এমনি করে ক্ষুণ্ন হয়ে যাওয়ায় মুসলমান একেবারে শহর থেকে বিতাড়িত হচ্ছে।

তারপর ধরুন ওয়াকফ আইন। মুসলমান তার বংশধরদের জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করতে পারে। মুসলমান বাদশাহদের আমলে এই আইন অনুসারে বহু মুসলমান বড় বড় সম্পত্তি আপন বংশদরদের জন্য ওয়াকফ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের বিচারকগণ ঐ প্রকার ওয়াকফকে বাতিল করে দিলেন। ফলে শত শত সম্পত্তি হস্তান্তর যোগ্য হয়ে গেল। বংশধরগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঝগড়া বিবাদে প্রবৃত্ত হল—মহাজন জমিদার নিলাম করে ওয়াকফ সম্পত্তি গ্রাস করতে লাগল। ক্রমশ এক নজিরের বলে শত শত মুসলমান পরিবার অনিবার্য দারিদ্র্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। তার গতি এখনও প্রতিহত হয় নাই।

তারপর ওয়ারিশী স্বত্বের আইন। এই আইন প্রচলিত থাকায় ভারতীয় মুসলমান বিশেষত বাংলার মুসলমান, বাটোয়ারা (partition) মোকদ্দমা করতে করতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। একদিন আমার জনৈক senior হিন্দু উকিল বন্ধু মুক্ত চিত্তে বলছিলেন, 'Thanks to the great Prophet of the Desert. Because but for his Law of Inheritance 60% litigation of our courts would have been diminished and half of our Judges would have been discharged.' এতেই আপনারা বুঝতে পারবেন এই আইনের ব্যবহার বাংলার মুসলমানকে দিন দিন অশান্তি ও দারিদ্র্যের চরম সীমায় নিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে বিবাহ ও তালাকের আইনের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিবাহের ভিত্তি হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর সম্মতি ও উভয়ের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। এই সম্মতি ও ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য যখন হারিয়ে যায় তখনই তালাকের আইন ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই আইন ব্যবহার করবার অধিকার মুসলমান স্বামী স্ত্রী উভয়েরই সমান। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতে মুসলমান-স্ত্রী এই সমান অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে স্ত্রীর উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের অবধি নাই। স্ত্রী আজ মূক নিরুপায়। সমাজের অর্ধাঙ্গ যদি এমনি করে আইনের অধিকার হতে বঞ্চিত থাকে এবং তার জন্য অপর অর্ধের স্পর্দ্ধা যদি বৃদ্ধি পায় তবে সমাজের স্বাভাবিক স্ফূর্তি প্রতিহত হতে বাধ্য। আজ মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা লক্ষ্য করলে এই তালাকের অধিকার পুরুষের একচেটে হয়ে পড়ায় কতখানি ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

উপসংহারে, এই কথা বলতে চাই যে, বর্তমান ব্রিটিশ-ভারতের প্রচলিত মুসলমান আইন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা দরকার। নতুবা মুসলমান সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভবপর হতে পারে না। সে আইন আধুনিক ভারতের অবস্থার সাথে মুসলমান-মানুষের সামঞ্জস্য সাধন করবে। তা করতে হলে আমাদের দেখতে হবে মুসলমান বাদশাহদের আমলে মুসলমান-আইনের অবস্থা কি ছিল। আমি যতদুর জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় এ দেশের অবস্থার সঙ্গে

সামঞ্জস্য রেখে মুসলমান বাদশাহগণ আইন রচনা করেছিলেন। গজনীর বাদশাহ মাহমুদের ফতওয়া-ই-মহম্মদী ও ফিরোজশাহ্ তোগলকের ফতোয়া-ই-ফিরোজশাহী হতে আরম্ভ করে টিপু সুলতানের ফতোয়া-ই-আহমদী ও যাখিরা-ই-ওয়ারেন হেস্টিংস পর্যন্ত যে সমস্ত আইনের পুস্তক রচিত হয়েছে তাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ দেশের মুসলমানদের জীবনের প্রয়োজনে ঐ সমস্ত আইন রচিত হয়েছিল। আরব, পারশ্য, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের মধ্যযুগীয় ফিকাহ বা ব্যবহার শাস্ত্রের বিধি বিধান তাঁরা অন্ধভাবে প্রবর্তন করেন নাই। বর্তমানে এ দেশের রচিত ও প্রবর্তিত ব্যবহার-শাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র ফতোয়া-ই-আলমগিরি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ফতোয়া-ই-আলমগিরি হতে মুসলমান বাদশাহদের আইন রচনার অধিকার ও তার স্বাধীন ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় না। ফতোয়া-ই-আলমগিরি Reaction-এর যুগে রচিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল। সে সময় বাদশাহ্ আলমগীর ভারতকে না দেখে দেখছিলেন মক্কার মরুভূমির পবিত্রতা। সেই মনোভাব ফতোয়া-ই-আলমগীরিকে অনেকখানি technical ও artificial করেছে। সেই মনোভাব ব্রিটিশ-ভারতে আজও আমাদের রাজা ও প্রজা উভয়কেই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।




শিখা

পঞ্চম বর্ষ

১৯৩১

সম্পাদক : আবুল ফজল

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'




অভ্যর্থনা

আবদুর রব চৌধুরী

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

মুসলিম সাহিত্য সমাজের এই পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে আপনাদিগকে অভিবাদন করার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। আমি বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছি যে এই কর্তব্য কোনো যোগ্যতর ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইলেই সাহিত্যের মর্যাদা বজায় থাকিত। যাহা হউক অভ্যর্থনা সমিতির আহ্বান আদেশরূপেই গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষন জানাইতেছি। প্রার্থনা করি, আপনাদের সকলের সমবায়ে আমাদের অদ্যকার অধিবেশন সফল হউক।

সাহিত্যচর্চা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। সাহিত্যচর্চা জাতীয় জীবনের পরিচায়ক ও পরিপোষক। যে জাতির মধ্যে সাহিত্যচর্চা নাই, তাহার প্রাণ-চাঞ্চল্যের সাড়া পাওয়া যায় না; যে জাতির জীবন চারিদিক দিয়া পুষ্ট ও বিকশিত হইয়া উঠে নাই, তাহার নিকট হইতে কোনো সাহিত্যের আশা রাখা বিড়ম্বনা মাত্র। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে আমরা এই সত্যের নিদর্শন দেখিতে পাই। লোক-সংখ্যায় আমরা অর্ধেকের অধিক, কিন্তু লোক সংখ্যা ভিন্ন অন্য কোনো কিছুতেই বা কোনোরূপ যোগ্যতারই আমরা বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট অনুপাতের দাবী করিতে পারি না। শিক্ষায়, শিল্পে, ব্যবসায়বাণিজ্যে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহারই নিদর্শনস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, সাহিত্যচর্চায় আমরা উদাসীন। বাংলা সাহিত্য আজ বিশ্বের দরবারে গৌরবান্বিত আসনে সমাসীন, কিন্তু ঐ গৌরবের প্রতিষ্ঠানে আমাদের দান কিছুই নাই। আমরা সাহিত্যচর্চা করি না বলিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে গভীর হইতে গভীরতর অবসাদে নিমজ্জিত হইতেছি।

সাহিত্যের আসরে আমরা মুসলমানেরা করিতেছি কি? যাহারা শিক্ষিত তাহাদের অনেকেই তো ইংরাজি বা উর্দুর মোহেই পড়িয়া আছি। আর যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের মধ্যে অনেক 'ছহি সোনভান' বা 'আসল কেয়ামত নামা' নিয়া মশগুল আছি। এই বিভিন্নমুখী ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যভাগে আমাদের সমস্ত সাহিত্যচর্চা ব্যবস্থিত রহিয়াছে।

ভাষা-সমস্যার পূর্ণ সমাধান প্রকৃতভাবে এখনও আমাদের হইয়া উঠে নাই। হয়তো তর্কের খাতিরে যেন বিশেষ দয়াপরবশ হইয়া আমরা স্বীকার করি যে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু এই কথার পূর্ণ অনুভূতি আমাদের মনে এখনও জাগে নাই। বাংলা ভাষাকে এখনও আমরা অন্তরের সহিত নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখি নাই। কাজেই বাংলা সাহিত্যে আমাদের দান আজও এরূপ নগণ্য।

কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুসলমান আমলেই বাংলা সাহিত্যের সবিশেষ পুষ্টিসাধন হয়, তখন মুসলমানেরা বাংলার প্রতি এইরূপ উদাসীন ছিলেন না। বরং বাংলার মুসলমান বাদশাহ ও ওমরাহগণের উৎসাহে ও সাহায্যেই সংস্কৃতের গুরুচাপ এড়াইয়া বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্ভবপর হয়। সেই আমলে দৌলত, আলাওল, মর্তুজা, প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি বাংলা সাহিত্যে অমর কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান নরপতিগণের উৎসাহে ও প্রেরণায়ই বাংলা সাহিত্যে অমর কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান নরপতিগণের উৎসাহে ও প্রেরণায়ই বাংলা সাহিত্য তৎকালে সংস্কৃত ও ফারসির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিয়াছিল।

ধীরে ধীরে মুসলমানের জাতীয় জীবনে নানারূপ অবসাদ আসিতে থাকে, তাহারই ফলে তাঁহারা ক্রমশ রাজ্যহারা ও বিত্তহারা হইয়া পড়েন। এ সত্ত্বেও বহুকাল মুসলমানগণ শিক্ষার প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে প্রাচ্যশিক্ষা ও প্রতীচ্যশিক্ষা নিয়া এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলন বেণ্টিঙ্কের আমলের পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বেণ্টিঙ্কের আমলেই ইহা বিরাট সমস্যার আকার ধারণ করে। লর্ড মেকলে ও তাঁহার সহযোগীদের প্রেরণায় ১৮৩৫ সালে প্রতীচ্য শিক্ষার পত্তন হয়। ইহার পর হইতেই হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষায় এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যায়। হিন্দুগণ প্রতীচ্য শিক্ষা বিপুল আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন আর মুসলমানগণ মনে করেন, 'আজ্য-হারা হইয়াছি বলিয়া কি নিজ কালচারও খোয়াইব।' তাঁহারা নব উৎসাহে আরবি ও ফারসির চর্চায় লাগিয়া যান। সমস্ত বাংলা জুড়িয়া মুসলমানেরা একমাত্র মাদ্রাসা-শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। ইহারই ফলে মুসলমানেরা স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দিকে মন দেয় নাই। সেই মাদ্রাসা শিক্ষার জের এখনও মিটে নাই। মাদ্রাসা এখনও মুসলমান-শিক্ষার এক বড় সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। স্যাডলার কমিশন বলেন, যদি ১৮৫৪ সালের Education dispatch এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সময়োপযোগী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্গত করা হইত, তবে মুসলমান শিক্ষার ধারা একেবারে বদলাইয়া যাইত। দেখা যাইতেছে, মাদ্রাসা শিক্ষার সাহায্য ভিন্ন মুসলমান শিক্ষার পথে আসিতে চায় না। এই জন্যই ১৯১৪ সালে মাদ্রাসা শিক্ষাকে

বহু পরিমাণে Secular করিয়া Reformed Madrasah Scheme প্রবর্তিত হয়; Reformed Madrasah Scheme-এর ফলে মাদ্রাসা বহু পরমিাণে Secular ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই Scheme মুসলমানকে অনেকটা সাধারণ শিক্ষার দিকে টানিয়া আনিতেছে। বর্তমানে ৬৩৬টি Reformed Madrasah আছে। কিন্তু এখনও বাংলা জুড়িয়া বহু Old Scheme Madrasah রহিয়াছে। গত ১৯৩০ সালের লিষ্টে দেখা যায় যে গভর্ণমেন্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও এখন বাংলায় ২০৮টি Old Scheme মাদ্রাসা রহিয়াছে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি মুসলমানের এই যে বিপুল আগ্রহ ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদিগকে শিক্ষার পানে অগ্রসর হইতে হইবে। মাদ্রাসা শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত হইলে ধীরে ধীরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান ছাত্রে ভরিয়া যাইবে।

আমার বিশ্বাস শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যচর্চাও বাড়িতে থাকিবে ও আমাদের দানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমাদের দানের জন্য অপেক্ষা করিতেছে; কারণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য মুসলমানের দান অপরিহার্য।

ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, Norman conquest-এর পর হইতে প্রায় কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত Anglo-Saxon-দের সহিত নবাগত Norman-দের প্রকৃত মিলন হয় নাই, বহুকাল তাহাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান সম্ভবপর হয় নাই। ধীরে ধীরে পরস্পরে পরস্পরকে চিনিতে পারে। এই উভয় জাতির মিলনে যে নতুন জীবনের সৃষ্টি হয়, তাহারই মূলে ইংরাজি সাহিত্যে ও ভাষায় জীবনী শক্তি ও সমৃদ্ধির নির্দেশ করা হইয়া থাকে। এই মিলনের ফলেই Anglo-Saxon common sense-এর সহিত Norman imagination-এর Synthesis হয়। তাহারই ফলে চতুর্দশ শতাব্দীতে চসার ও ষোড়শ শতাব্দীতে সেক্সপীয়র দুই স্বর্ণযুগের অবতারণা করেন। বাংলা সাহিত্য ও ভাষাতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি ধারা দেখিতে পাই। একটি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, অপরটি এখনও আমাদের মাতৃভাষার একটি অনাহত তন্ত্রী রহিয়া গিয়াছে। কোন শুভ মুহূর্তে এই উভয় জাতির প্রকৃত মিলন হইবে, কোন ভাগ্যবানের মঙ্গল হস্তে এই উভয় তন্ত্রী একতানে বাজিয়া উঠিয়া সমগ্র বাংলাকে এক গভীর আনন্দ-গানে মুখরিত করিবে! হয়তো রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামে আমরা সেই স্বর্ণযুগের পূর্বাশার আভাস পাইতেছি।

বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষা কি? মুসলমানের ভাষায় বা সাহিত্যে কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িকতা আনিতে বলে না। ভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা চলিতে পারে না। যে ভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা যত

বেশি ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে তাহা তত খাটো। মুসলমানগণ যে ভাষা ও সাহিত্যকে আদর্শ মনে করে তাহা সাম্প্রদায়িকতা বা আভিজাত্য প্রভৃতি অহমিকা হইতে বহু উর্ধে। সাম্প্রদায়িকতা ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধেই তাহাদের অভিযান। তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাংলার মাটি বাংলার জলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ। লেখ্য ভাষা কথ্য ভাষা হইতে যতই দূরে চলিবে, ততই উহা আড়ষ্ট ও প্রাণহীন হইবে; লেখ্যভাষা যতই কথ্য ভাষার নিকটবর্তী হইবে ততই উহা সতেজ, সহজ ও সুন্দর হইবে এবং ততই কথ্য ভাষাকে আদর্শের দিকে টানিয়া তুলিতে পারিবে; এবং কথ্য ভাষার বহুরূপী রূপকে একত্বের দিকে টানিয়া আনিবে। বাংলার লেখ্য ভাষা প্রথমত আড়ষ্ট ও প্রাণহীন ছিল, ধীরে ধীরে উহা কথ্য ভাষার দিকে অগ্রসর হইতেছে; এবং কথ্য ভাষাও ধীরে ধীরে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এখনও সংস্কৃতের মোহ কাটে নাই, আভিজাত্য দূর হয় নাই; ফলে হিন্দু সমাজের কথ্য ভাষাই সাহিত্যের বাহন হইয়াছে। এই সংস্কৃতের সহিত আমার কোনো বিরোধ নাই। আমার বিরোধ তাহাদের সহিত যারা বলে যে, যেসব শব্দ দেবভাষা হইতে আসে তাহাদের কোনো বিশেষ আভিজাত্য আছে। আমরা মুসলমানগণ নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের জন্য আমাদের কথ্য ভাষায় যে সব শব্দ ব্যবহার করি, তাহা সংস্কৃত নয় বলিয়াই পরিহার করিলে চলিবে না। ঐ সব ভাব প্রকাশ করিতে যদি মুসলমানদিগকে অনুবাদের সাহায্য লইতে হয়, তবে পূর্ণভাবে প্রকাশ হয় না। আমাদের কথ্য ভাষার এই সব শব্দ সংস্কৃত না হইতে পারে, কিন্তু এগুলি প্রকৃত বাংলা শব্দ এবং এগুলি ব্যবহারে আমাদের লজ্জার কোনো কারণ নাই। অনেক সময় হিন্দু লেখক ও সমালোচকগণ সুবিচেনার অভাবে এই সব শব্দ ব্যবহারের জন্য তীব্র সমালোচনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত বাংলা ভাষা কেবলমাত্র তাঁহাদের নয়, আমাদেরও। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মূক মুসলমান যতই কথা কহিতে শিখিবে, তাহার কথ্য ভাষা ততই বাংলা ভাষাকে নব শব্দসম্পদে ভূষিত করিবে।

সাহিত্যের দিক দিয়াও আমাদের ভাব ও আমাদের আদর্শ এখনও বাংলা সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে নাই। এই জন্য আমাদের অনেকেই বলেন, বাংলা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী এত বেশি যে আমাদের আদর্শ উহাতে কখনও স্থান পাইতে পারে না। সাহিত্যের উৎস প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে। কাজেই হিন্দু লেখকগণের লেখায় যে কতক হিন্দুয়ানী থাকিবে, তাহা অনিবার্য। আমরা মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্যে নিজ কর্তব্য করি নাই, আমাদের নিজের আদর্শ ও ভাব ফুটাইয়া তুলি নাই; তাই বলিয়া কি যাঁহারা নিজ কর্তব্য করিয়াছেন, নিজেদের আদর্শ ও ভাব ফুটাইয়া

তুলিয়াছেন, তাঁহাদের দোষ দেওয়া চলে? দোষ দেওয়ার যে মনোবৃত্তি তাহা হইতে আমাদিগকে বহু উর্ধে উঠিতে হইবে, এবং আমাদের নিজ আদর্শ ও ভাব সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তবেই আদর্শ জাতীয় জীবন ফুটিয়া উঠিবে ও প্রকৃত সাহিত্য গঠিত হইবে। সুখের বিষয় ইদানীং বহু হিন্দু লেখকগণেরও লেখায় আমাদের আদর্শ ও ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। এরাও নবযুগের অগ্রদূত। আমার বিশ্বাস, আমাদের তরুণ কবি ও লেখকদের লেখায় আমাদের আদর্শ ও ভাব মূর্ত হইয়া উঠিবে এবং নবযুগ আরও নিকটবর্তী হইবে। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় আদর্শের মিলন ও সমবায় বাংলা সাহিত্যের এই নবযুগের ভিত্তি হইবে।

মুসলমান-সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলার কৃষক। মুসলমান কৃষকের আশা ও আকাঙ্ক্ষায় সোণার বাংলা সোণার ফসলে ভরিয়া উঠে। মুসলমান সাহিত্যিকদের এই বিপুল আশা ও আকাঙ্ক্ষায় কি সোণার বাংলা সোণার সাহিত্যে ভরিয়া উঠিবে না?

অভিভাষণ

হাকিম হবিবুর রহমান

বন্ধুগণ,

পারস্যভাষায় একটি প্রবাদ আছে—আদমিয়ান গুম শুদন্দ ও মূলক-ই-খোদা খর গিরফত—আপনাদের সবারই বোধগম্য বাংলাভাষায় ইহার অনুবাদ দিয়া নিজেকে নিতান্তই লাঞ্ছিত করা সঙ্গত নয়। বর্তমানে আমাদের সমাজে কর্মক্ষম লোকের 'দুর্ভিক্ষ' সুস্পষ্ট; তবু আমাকে আপনাদের এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচন বিশেষভাবে অপ্রশংসার যোগ্য এই জন্য যে আমার মাতৃভাষা উর্দু, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ু সেবন আমার ভাগ্যে কোনো কালেই ঘটে নাই। যাহা হউক আমাদের উভয় পক্ষের ভুল-ত্রুটির জালে ধৃত হইয়া যখন সভাস্থল পর্যন্ত আসিয়া জুটিয়াছি তখন মুখতো আমাকে খুলিতে হইবেই। আমার মত একজন সেকেলে ও সেকালপ্রিয় লোকের বাগবিস্তার যদি শেষ পর্যন্ত আপনারা সহ্য করিতে পারেন তবেই যথেষ্ট।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই মুসলমানগণ আমাদের এই ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন। ভারতের সঙ্গে আরববাসিগণের পরিচয় সুপ্রাচীন, কিন্তু এদেশের অধিবাসীরূপে পরিগৃহীত তাঁহারা হন নাই। মুসলমানগণ কিন্তু এদেশের স্থায়ী অধিবাসীই হইয়া গেলেন। ভারতের উপকুলভাগ তাঁহাদের প্রথম অবতরণভূমি এবং 'আল আকরাবু ফাল আকরাবু' (যত কাছে তত আগে) নীতির অনুসরণে ঐ সকল ভুভাগে নবাগতগণের সংখ্যাধিক্য স্বাভাবিক। তাই পাঞ্জাব ও দোআবা মোগল তুর্কীগণের এবং সিন্ধু বঙ্গ সিঙ্গাপুর ও যবদ্বীপের উপকূলভাগ আরব বণিকগণের ও মুসলিম প্রচারকগণের বিচিত্র কর্মভূমি। এই সমুদ্র-উপকুলবাসীদের যে স্বরভঙ্গি ও তাহাদের মুখমণ্ডলের যে গঠন তাহাই অনেকখানি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয় ইহাদের পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান কোথায়।

সবাই জানেন আরব তুর্ক মোগল ও হাবসীদের হাজার-করা একজনও এদেশে স্ত্রীপুত্র সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। তৎকালীন ঔপনিবেশিক প্রথানুযায়ী এদেশ হইতেই তাঁহারা স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী সৈয়দ, হিন্দুস্থানী তুর্ক ও হিন্দুস্থানী মোগলের বংশ-ভিত্তি-স্থাপন এই ভাবেই। তারপর, ইহারা আবুমাশেরে

ফলকী ও আলবেরুনীর ন্যায় বিদ্যাচর্চার ব্রত লইয়া এদেশে আসেন নাই। তাই এদেশের যে ভাষা তাহাতেই তাঁহারা বুৎপত্তি লাভ করিবেন ইহা সম্ভবপর নয়। এ ভিন্ন বিজেতা ও বিজিত উভয়েই উভয়ের ভাব ও ভাষা আয়ত্ত করিতে চির-উৎসুক। তাই ইহাদের ভিতরে এক নব ভাষার উৎপত্তি হইতে লাগিল—তাহার নাম হইল হিন্দি ও হিন্দুস্থানী। পারস্য ঐতিহাসিকগণ এদেশের হিন্দুগণের ভাষা 'হিন্দূভি' ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমার বক্তব্য, হিন্দিভাষা মূলত হিন্দুমুসলমানের সম্মেলন-জাত ভাষা, আর ক্রমশ রূপান্তরিত অবস্থায় উহা দেশের চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। এইরূপে মোগলসাম্রাজ্য স্থাপনের কিছু পূর্বে পাঞ্জাবে এই ভাষার বর্ণমালা গুরুমুখীতে পরিণত হয়।

মুসলমানগণ তাহাদের আনীত বর্ণমালা স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহার করিতেন, যেমন, সিন্ধু প্রদেশের আরবগণ তথায় আরবি (নস্‌খ) বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন। অদ্যাবধি সিন্ধুবাসিগণ আরবি বর্ণমালায় দেশীয় ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্য-অধিবাসিগণের ব্যবহৃত বর্ণমালা মোগল-প্রভাবে ফারসি (নস্‌তালিক) বর্ণমালায় পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহের দশম শতাব্দীর লিখিত, অধুনা ইউরোপের বহু গ্রন্থাগারে রক্ষিত, পত্রাদি আমার এই উক্তির স্বপক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এইরূপে দোআবার ভাষায় ফারসি বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সৈন্যবাহিনীর ভিতরে যে ভাষার জন্ম হইয়াছিল তাহাই উর্দুভাষা—তুর্কভাষায় সৈন্যবাহিনীকে উর্দু বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের ভাষা ও উর্দুভাষা প্রকৃতপক্ষে একই ভাষা। ইহাদের ভিতরে পার্থক্য এই যে দিল্লীতে আসিয়া উর্দু ভাষা অধিক পরিমাণে পরিমার্জিত হইয়াছে এবং রাজশক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিপুল কলেবর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

বাংলায় যে সকল মুসলমান সর্বপ্রথম দেশের উপকূলভাগে বসতি স্থাপন করেন তাঁহারা বাণিজ্য ও নাবিকতাতেই আত্মনিয়োগ করেন; কেহ বা দেশে আল্লার নাম ও বাণী পৌঁছাইতে নিযুক্ত হন। এই আরব ও পারস্য-আগত মুসলমানগণ তাঁহাদের বংশধরদের ভাষায় এমন কতকগুলি বিশিষ্টধ্বনিযুক্ত শব্দ রাখিয়া গিয়াছেন যাহার উচ্চারণযোগ্য বর্ণ বাংলাভাষায় আদৌ নাই।

পশ্চিম হইতে দ্বিতীয় জাতি যাঁহারা বাংলায় আসিয়াছিলেন তাঁহারা তুর্ক ও পাঠান। ইহারা সকলেই সৈনিকপুরুষ ছিলেন আর রাজ্যবিস্তারই ছিল ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, বিদ্যার্জন বা অধ্যাপনা নয়। বাংলাসাহিত্যে মুসলমানদের 'তুর্ক' বলা হইয়াছে, আর এদেশে নবদীক্ষিতকে 'খান' উপাধী দেওয়া হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় পাঠান প্রভাব বাংলায় কত গভীর। সম্রাট আকবর বাংলাকে 'বেল্‌গাকখানা' (ভীমরুলের চাক) বলিতেন। বাস্তবিক পাঠানগণ আফগানিসস্থানের

পরেই বাংলাকে তাঁহাদের দ্বিতীয় আবাসস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকল 'খেল' ও 'জই' যথেষ্ট সংখ্যায় এখানে বসবাস করিতেছিলেন এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাঁহারা দিল্লীর শক্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে পূর্ণ গৌরব রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, শেষ ভাগে বাংলার সন্তান শের শা ও ইসলাম শা সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। হুমায়ূন হইতে জাহাঙ্গীর পর্যন্ত সকলকেই বাংলায় আধিপত্য বিস্তার কালে পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

পাঠানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন সৈনিক-যোদ্ধা, তবু মাদ্রাসা স্থাপন, অনুবাদ করণ, স্বাধীন রচনাবলীর দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন, ইত্যাকার বিদ্যানুরাগের পরিচয়ও তাঁহারা দিয়াছেন। বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিনের নাম মহাকবি হাফেজ চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

[কবি হাফেজ ও সুলতান গিয়াস উদ্দিন সম্পর্কিত সুবিখ্যাত গল্পটি এই : সুলতান গিয়াস উদ্দিনের সর্‌ব, গুল ও লাল নাম্নী তিনটি বাঁদী ছিল। তাহারা প্রত্যহ সুলতানকে স্নান করাইত। তাহারা সুলতানের খুব প্রিয়পাত্রী ছিল। একদিন সুলতান এই অর্ধ শ্লোক রচনা করিলেন—'সাকী, হাদিসে সর্‌বো গুলো লালা মিরওদ' (হে সাকী, সর্‌ব, গুল, ও লালার কথা স কলে বলিতেছে), কিন্তু দ্বিতীয় চরণটি তিনি আর সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দরবারের কবিদের আহ্বান করিলেন, তাঁহারাও কেহ বাদশাহের মনের মত চরণ যোগাইতে পারিলেন না। অবশেষে সুলতান প্রথিতযশা হাফেজ শিরাজির কাছে অর্থ ও উপঢৌকন সহ লোক প্রেরণ করিয়া এই অনুরোধ জানাইলেন যে কবিবর যেন এই শ্লোকার্ধ লইয়া ও ইহার ছন্দ ও মিল বজায় রাখিয়া একটি গজল রচনা করেন : হাফেজ সুলতানের অভিলাষানুযায়ী একটি গজল রচনা করেন ও সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি নিজে ভারতবর্ষে আসেন নাই। সেই গজল হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

১। সাকী হাদিসে সর্‌বো গুলো লালা মিরওদ
বিঁ বহস্ বা সালাসায়ে গস্‌সালা মিরওদ।

হে সাকী, সর্‌ব (সাইপ্রেস) গোলাব ও 'লালা' ফুলের কথা সবাই বলছে, তিন পাত্র শারাবের কথাও সবাই বলছে। (পারশ্যের লোকেরা ফুল সামনে রেখে অথবা ছোঁড়াছুঁড়ি করে শারাব পান করতেন)।

২। শক্‌র শিক্‌ন শওয়ন্দ হামা তুতিয়ানে হিন্দু
জিঁ কন্‌দে পারসী কে ববাঙ্গালা মিরওদ।

পারশ্যের এই মিছরি বাংলায় পাঠানো হলো; এতে ভারতবর্ষের সমস্ত টিয়া মধুকণ্ঠ হবে।

৩। হাফিজ জে শওকে মজলিসে সুলতাঁ গেয়াসেদীন
গাফেল মশো কে কারে তু আজ নালা মিরওদ।

হাফিজ, সুলতান গিয়াস উদ্দিনের দরবারের প্রীতি সম্বন্ধে সজাগ থেকো, নইলে মোতাকে নিদারুণ অনুশোচনায় পড়তে হবে।

এই গল্পের কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা তাহা যাচাই করিবার কোনো উপায়ই নাই; তবুও অন্তত এটুকু সত্য যে হাফেজ এই গজল সুলতান গিয়াস উদ্দিনের জন্য লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাংলা তাই ইহাকে, বিশেষত ইহার এই চরণ 'জিঁ কন্‌দে পারসী কে ববাঙ্গালা মিরওদ' ইহার নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে।]

তবুও বলিতে হইবে এসব তাঁহাদের শেষ সময়ে কীর্তি; আর দক্ষিণদিক হইতে লিখিবার উপযুক্ত বর্ণমালার সৃষ্টি বাংলায় হইতে পারে নাই। বাংলার এই মুসলমানগণ যখন রাজ্যহারা হইয়া তরবারির পরিবর্তে হল বা হাল ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই 'পেদরম সুলতান বুদ' (আমার পিতা বাদশা ছিলেন) অবস্থায় নিজ সম্প্রদায় ও ধর্ম-সংশ্লিষ্ট পত্রিকাদিতে মুসলমানী বাংলা দক্ষিণদিক হইতে লিখিবার প্রথার প্রচলন করেন। অদূর অতীতের এই ধরণের বহু বাংলা রচনা এখনও দুর্লভ নয়।

মুসলমানদের শাসনকালে বাংলার দফতরের ভাষা ফারসি ছিল এবং হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে শিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণ ইহাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বহু হিন্দু লিপিকার ও গ্রন্থকারের সুন্দর হস্তলিপির নিদর্শন আমরা এই ঢাকা নগরীতেই পাইয়াছি। মুসলমান রাজত্ব যখন ইউরোপীয় বণিকগণের হাতে আসিল তখনও বাংলার দফতরের ভাষা ফারসি ছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন ইংরেজগণও ইহাতে বুৎপত্তি লার্ভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের ফারসি অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বহু পুস্তক এখনও মজুদ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দূরদৃষ্টি ইংরাজ দেখিলেন যে আশ্রয়হীন অথচ জনসাধারণের ভাষা উর্দুর ভিতরে উন্নতির সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে; তাই কলিকাতায় ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ খোলা হইলে তথা হইতেই বর্তমান উর্দুর বিকাশ আরম্ভ হইল। আমার বিশ্বাস, এই কলেজের সৃষ্টি হইতেই বাংলার সরকারি দফতরের ভাষা অকস্মাৎ ফারসি হইতে উর্দুতে পরিবর্তিত হইল। এই উর্দুভাষা কতিপয় বৎসর বাংলার দফতরের ভাষা রহিল। এই সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণও উর্দুর ভক্ত হইয়া উঠিলেন। বাংলার এক প্রসিদ্ধ নেতার (শ্রীযুক্ত জে. এম. সেন গুপ্তের) ঠাকুর দাদা একটি উর্দু পুস্তকের রচয়িতা। উর্দুভাষার কবিগণের সর্বপ্রথম বিবরণীর সংকলক জনৈক বাঙালি হিন্দু (নুসখাই-দিলকুশা—রাজা জনমেজয় মিত্র)। উর্দুভাষা শুধু মুর্শিদাবাদ ঢাকা ও কলিকাতার সহিতই সম্পর্কিত ছিল না, সমস্ত বাংলাই ইহার চর্চা ও আলোচনা স্থল হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখনকার বাঙালি অপেক্ষা তখনকার বাঙালি অধিকতর সাহসী ছিলেন; তাই লক্ষ্ণৌর নবাব-দরবারের একজন রাজকবি ছিলেন হুগলীর জনৈক মুসলমান (মালিক-উশ-শোয়ারা কাজী মোহাম্মদ সাদেক খান আক্তার)। হজরত মোহাম্মদ ও আম্বিয়াগণের যে জীবনী সর্বপ্রথম উর্দুভাষায় মুদ্রিত হয় উহার রচয়িতা ছিলেন কুমিল্লার জনৈক মুসলমান (মৌলবী মোহাম্মদ সইদ)। উর্দুভাষায় সর্বপ্রথম নাটকের রচয়িতা রংপুরের জনৈক মুসলমান (সওলাতে আলমগিরি—সৈয়দ মোহাম্মদ হায়াত)। আর সব চাইতে গৌরবের কথা এই, লক্ষ্ণৌওয়ালাদের কবিত্ব বিষয়ে গবেষণামূলক সর্বপ্রথম পুস্তক সুপ্রসিদ্ধ 'তুমার-ই-আগলাত'-এর রচয়িতা এই

বঙ্গমাতারই ফরিদপুরের এক সন্তান (মৌলবী আবদুল গফুর খান মসসাখ); উর্দুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের কাছে আজও ইহার মর্যাদা অতুলনীয়। মুর্শিদাবাদের জনৈক উর্দু সাহিত্যিকও সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি উর্দুতে স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত ভাষার (রেখতি) প্রথম বিবরণলেখক অথবা আবিষ্কারক। বাংলার স্ত্রী-উর্দুসাহিত্যিকদের রচনার পরিমাণও কম নয়। মোট কথা, উর্দুভাষা ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় এক বড় সার্থকতা লাভ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করয়াছে।

কিন্তু এক রাজনৈতিক চালে হঠাৎ বাংলার সরকারী দফতরের ভাষা উর্দু হইতে বাংলায় পরিবর্তিত হইল। এই অচিন্ত্যপূর্ব দুর্ঘটনায় মুসলমানদের এই অগ্রগতিত বিষম বাধা পাইল এবং বাংলার মুসলমান ধ্বংসমুখে পতিত হইলেন। এইভাবে বাংলার মুসলমানকে যে সরকারী দফতর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল সে দুঃখের কান্না আজও আমাদের সভাসমিতিগুলি কাঁদিতেছে।

সেকালে আমাদের সাহিত্যিকদের এক বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই একাধিক ভাষায় সবিশেষ বুৎপত্তি রাখিতেন। আলাওল সুপ্রসিদ্ধ বাঙালি কবি, তিনি আবার নেজামি গাঞ্জাবীর 'হাপত পায়কর' নামক পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ-কর্তা, পারশ্য ভাষায়ও তিনি কবিতা লিখিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পুঁথি-সাহিত্যের প্রতি আমাদের শিক্ষিতদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু এই পুঁথি সাহিত্যের মূলে যে সাধনা আছে তাহা বাস্তবিকই শ্রদ্ধার যোগ্য। শাহনামার মত অতি বৃহৎ ও সুকঠিন ফারসি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ উহার উর্দু অনুবাদের প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে নিস্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ একাধিক ভাষায় বুৎপন্ন রচয়িতার সংখ্যা অদ্য হইতে ২৫/৩০ বৎসর পূর্বেও কম ছিল না।

ভ্রাতৃগণ, পূর্বেই চলিয়াছি আমি একজন সেকালপ্রিয় লোক, তাই সেকালের কথা ভিন্ন আর কিইবা আমি আপনাদের কাছে বলিতে পারি। বাংলায় উর্দুচর্চার কথা যে একটু বিস্তৃতভাবে বলিলাম তাহার আর এক বড় কারণ, বাংলায় উর্দু ও বাংলা চর্চার ভিতরে যে একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অবাঞ্ছনীয়। উর্দু বাস্তবিকই কোনো প্রদেশের খাস ভাষা ছিল না। উহা বরং সমগ্র ভারতবর্ষেরই ভাষা। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীবাসিগণ ইহাকে নিতান্তই এক খেলার সামগ্রী করিয়া তুলিলেন, নানা ভাবে ইহার এক বিশেষ মুর্তি দিলেন, তাই ইহা একটি সীমাবদ্ধ স্থানের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আজও উর্দুর প্রসার ও প্রভাব বাস্তবিকই খুব বেশি। আজও ইহা ভারতের এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের ভাব আদান-প্রদানের ভাষা। বিদেশীয়গণও ভারতবর্ষীয়গণের সঙ্গে সাধারণত এই ভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন। আর বঙ্গভাষাভাষীদেরও ক্রোধ-বিরক্তি প্রকাশের ভাষা এই উর্দু ভাষা। আপনাদের মাতৃভাষা বাংলার পুষ্টিসাধন তো আপনারা করিবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু উর্দুকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে সমস্ত ভারতের সঙ্গে

আপনাদের যোগ ছিন্ন হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন, আপনাদের ধর্মকে তো আপনারা ছাড়িতে পারিবেন না, সেই ধর্মের সাহিত্য-অংশ উর্দুতে যে ভাবে বিকাশ লাভ করিয়অ চলিয়াছে তাহা একান্তই প্রশংসার যোগ্য। সেখান হইতে আপনারা প্রভূত প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমরা বাঙালি-মুসলমান ভারতের সমগ্র মুসলমান-জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক, অথচ আমরাই সর্বপ্রকারে অবনতির গভীর তলে পতিত আছি। কিন্তু আফসোস করিয়া আর কি লাভ হইবে। আপনারা একদল তরুণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, এর চাইতে আশা ও আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে। আপনারা আপনাদের মাতৃভূমির প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পূণ্যব্রত সর্বান্তকরণে গ্রহণ করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ।

কিন্তু কর্মারম্ভের পূর্বে কর্মবিভাগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপনারা কে কে পারস্য ভাষায় লিখিত অংশ গ্রহণ করিবেন,কে কে আরবি ভাষায় লিখিত অংশ গ্রহণ করিবেন তাহা ঠিক করিয়া ফেলুন। এই সব প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া আপনারা যে শুধু প্রাচীন ইতিকথাই জ্ঞাত হইবেন তাহা নহে, আমার বিশ্বাস, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাংলার লোকদের উৎপত্তি-কাহিনী, ইত্যাদি বিষয়েও বহু মুল্যবান তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন, যেমন, বাংলার কবিত্বের উপরে পারস্য সাহিত্যের কি প্রভাব পড়িয়াছে ও বাঙালি-মুসলমানের দেহে আরব রক্ত কি পরিমাণে আছে, এবং আরবের কোনো প্রদেশেরই বা প্রভাব বাংলাদেশে বেশি, ইত্যাদি বহু মূল্যবান তথ্য আপনারা উদ্ধার করিয়া স্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশেরই মুসলিম ইতিহাস বাংলার মুসলিম-ইতিহাসের মত এত অন্ধকারে পতিত নয়। অথচ এই বাংলার মুসলমানসমাজে প্রতিভাবানের জন্ম কম হয় নাই। এই বাংলার সোনারগাঁয়ে মাতামহের আলয়ে হজরত মখদুম-উল-মুলকের মত মনীষী জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রথমজীবনের শিক্ষাদীক্ষা সোণারগাঁয়ের ওলামা ও 'মোশায়েখদের' সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। ইমাম খাজেগীর মতো ইলমে-হাদিস-অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই বাংলায়ই ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। এই বাংলারই জনৈক সুসন্তান সম্রাট ফিরোজ শাহের মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মেহেদিভি সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা এই বাংলারই সন্তান; সে সম্প্রদায় অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে অবস্থিতি করিতেছে; 'মানাদুর' নামক মুসলমান করদরাজ্যটি এই মেহেদিভি সম্প্রদায়েরই স্মৃতি বহন করিতেছে। আর শুধু ধর্মচর্চা নয়, কলাবিদ্যার চর্চাও সেকালের বাংলায় কম ছিল না। ইবনে বতুতা এরূপ গায়িকা এই বাংলাদেশে দেখিয়াছিলেন যাঁহারা ফারসি গজলে ও মজলিসি সংগীতে কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন। কিন্তু আফসোস, সেই বাংলার ঐতিহাসিক বিবরণ আজ আমরা শিক্ষা করিতেছি কতিপয় পক্ষপাতদুষ্ট ইংরেজি ইতিহাস হইতে! আমার

ধারণা এই যে যে সমস্ত অমুদ্রিত ফারসি ভাষার ইতিহাসে বাংলার ইতিহাসের উপকরণ আছে, সেইগুলির এক লিষ্ট তৈয়ার করিয়া আমাদের তরুণদের হাতে দিতে হইবে। (এই উদ্দেশ্যে একটি ছোটখাট লিষ্ট অভিভাষণের শেষে দেওয়া হইল।) কিন্তু এই সমস্তের অনেকগুলি এখন আর এদেশে পাওয়া যায় না— ইউরোপের বিভিন্ন পুস্তকাগারে সেসব রক্ষিত আছে। তাই আমাদের দেশের যাঁহারা ইউরোপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা যদি ঐ সকল পুস্তকের নকলাদি প্রস্তুত করাইয়া আমাদের জ্ঞানেচ্ছু যুবকদিগের হাতে দিতে পারেন তবে বড়ই ভাল হয়। বিভিন্ন জিলার ইতিহাস উদ্ধারেও আপনাদের ব্রতী হইতে হইবে। প্রচলিত ডিস্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারসমূহে ভুলক্রটি যথেষ্ট। এইরূপে সর্বক্ষেত্রেই দেশের বিশুদ্ধ ইতিহাস উদ্ধার আপনাদের লক্ষ্য হওয়া চাই।

মুদ্রালিপি ও শিলালিপি পাঠের চেষ্টা আপনাদের সামনে আর একটি অতি বড় কাজ। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মি. ভট্টশালী মুদ্রালিপি হইতে মুসলমান বাদশাহদের সম্বন্ধে বহু কিছু জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আরো অনেক কিছু বাকী।

ফারসি ও আরবি শিলালিপি পাঠ আর একটি বড় ও সুকঠিন বিষয়। বাংলার বহুস্থানে এখনও বহু শিলালিপি অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রিকা এসবের কিছু কিছু সন্ধান মাঝে মাঝে দেয়। আমাদের এই ঢাকার প্রভিনশীয়াল মিউজিয়ামে এরূপ অপঠিত শিলালিপি বর্তমান। এই শিলালিপি-পঠন-বিদ্যা আমাদের দেশে একরূপ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু মুসলমান বংশ হইতে ফরমান, নিশান, সোক্কা ইত্যাদি সংগ্রহের কাজও আপনাদের একদলকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার বহু ধর্মপ্রচারকের ও আউলিয়া দরবেশের হস্তলিখিত জীবনচরিত চেষ্টা করিলে ধ্বংশের কবল হইতে এখনও উদ্ধার করিতে পারিবেন। স্যার আর্ণল্ডের সুবিখ্যাত Preachings of Islam-এ এই দুঃখ করা হইয়াছে যে বাংলার ইসলাম-প্রচারকগণের জীবন-কাহিনী খুব কমই সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে। একটি বড় দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের প্রাচ্যবিদ্যার এম-এ-গণ শুধু মুদ্রিত পুস্তকই পড়িতে পারেন, হস্তলিখিত পুস্তক পড়িতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের হস্তলিপি পাঠের দক্ষতা অর্জন করা চাই।

বন্ধুগণ, বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে এক বর্ণহীন চিত্র আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহাকে বিভিন্ন রাগ রঞ্জন দ্বারা চিত্রিত করিয়া এক মোহন মুর্তিতে পরিণত করা আপনাদের কাজ। এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার গীতাদি সংগ্রহে ও উহা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণে আপনাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। আপনারা জানেন বর্তমানে রাজপুতনার যে ইংরাজি ইতিহাস লিখিত হইয়াছে উহা স্থানীয় গীতাদি হইতেই সংগৃহীত। বাংলার গানে দোস্তগাজি,

কালুগাজি, মনোয়ার খাঁ ইত্যাদি নামে সুপরিচিত। এইসব গীত হইতে তাঁহাদের কর্মজীবনের সন্ধান করিতে হইবে।

'রাত্রি ছোট আর কাহিনী দীর্ঘ'। এইবার অবসান করা যাক। আপনারা সর্বান্তকরণে কাজে লাগুন এই আমার কামনা। আমরা বৃদ্ধেরা কিছু করিতে পারি নাই। আপনাদের যুবকদের দায়িত্ব তাই অনেক বেশি। 'আগার পেদর ও তাওয়ানদ পেসর তামাম কুনদ'। আপনারা গৌরবান্বিত মুসলমান হউন এই প্রার্থনা করি।

আবতো জাতেই বুতকদেসে মীর,
ফের মিলেঙ্গে আগার খোদা লায়ে।

যে লিষ্ট নীচে দেওয়া হইল তাহার প্রায় সবই অমুদ্রিত হস্তলিখিত গ্রন্থ! এগুলি এদেশে পাওয়া যায়।

১. **তারিখ-ই-সালাতিনে আফগানা**

এই পুস্তকখানিতে লোদি এবং সুর বংশের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে; পুস্তকখানি বঙ্গদেশ ও বিহারের অধিপতি সুলেমান কররানীর কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদ শাহেব পৃষ্ঠপোষকতায় আহমদ ইয়াদগার কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। বাহলুল লোদিব সময় হইতে হিমুর পবাভব ও মৃত্যুব বিবরণ পর্যন্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। পুস্তকখানির নকল এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী ও বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

২. **তারিখ-ই-দায়ূদী**

এ পুস্তকখানিও লোদি এবং সুব-বংশের ইতিহাস; বাহলুল লোদির সময় হইতে দায়ুদ শাহের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী ইহাতে লিখিত আছে। পুস্তকখানি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আবদুল্লা কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। বাঁকীপুব লাইব্রেরীতে ইহার একখানি নকল আছে।

৩. **তারিখ-ই-শের শাহী**

এ পুস্তকখানি তুহফাহ-ই-আকবর শাহীব উর্দু অনুবাদ; শের শাহ ও তাঁহার পরবর্তী পাঠান সম্রাটগণের ইতিহাস ইহাতে লিখিত আছে। মূল পুস্তকখানি ৯৮৬/১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই সম্রাট আকবরের অনুরোধে আব্বাস খান সারওয়ানী কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। উর্দু অনুবাদক তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন যে পুস্তকখানির অনুবাদ ১২২০/১৮০৫ অব্দের মধ্যেই শেষ হইয়াছিল এবং উহা ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনেরল লর্ড ওয়েলেসলির নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। ইহার একখানি মূল গ্রন্থ ও তাহার উর্দু অনুবাদ ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

৪. **তারিখ-ই-শাহ শুজাই**

পুস্তকখানিতে সম্রাট শাহ জাহানের দ্বিতীয় পুত্র হতভাগ্য যুবরাজ মোহম্মদ শুজার (A. H 1025-1070) কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থখানি ১০৭০-১৬৫৯ অব্দে মোহাম্মদ মাসুম-বিন-সোয়ালেহ কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার শাহ শুজার অধীনে ২৫ বৎসর কার্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বের সমস্ত ঘটনাবলী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি শুজার জীবন, কার্য ও শেষ জীবনের নিদারুণ কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের একখণ্ড বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

৫. **তারিখ-ই-বাঙ্গালা মহাবত জঙ্গী**

বঙ্গের নাজিম নবাব আলিবর্দি খান মহাবত জঙ্গ এবং তাঁহার পরবর্তী নবাব শুজাউদ্দৌলার

জীবন ও রাজত্বকালের ইতিহাস। পুস্তকখানি ইউসুফ আলী খান (গোলাম আলী খানের পুত্র) কর্তৃক লিখিত। ইউসুফ আলী খান আলিবর্দি খানের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং নবাব সরফরাজ খানের কন্যাকে বিবাহ করেন। পুস্তকখানি ১১৭৭-১৭৬৩ অব্দে শেষ হইয়াছিল এবং উহা বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

৬. **মজাফফর নামা**

পুস্তকখানি বঙ্গের নাজিমগণের এক বিরাট ইতিহাস। ইহাতে নবাব আলিবর্দিখানের অভ্যুদয় হইতে নবাব মুজফফর জঙ্গের কারাবাস-কাল পর্যন্ত (১৭৬৬) লিপিবদ্ধ আছে। এই পুস্তকখানি মুর্শিদাবাদের করম আলী খান কর্তৃক প্রণীত (১১৮২-১৭৬৮) হইয়াছিল। তিনি নবাব মুজফফর জঙ্গের অধীনে কর্মচারী ছিলেন এবং স্বয়ং নাজিমবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানির কয়েক খণ্ড নকল বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে।

৭. **ওয়ারদাত-ই-কাসেমী**

১১৭৪-১৭৬০ অব্দে মীর মোহাম্মদ কাসিমের সিংহাসনাবোহন কাল হইতে ১১৯৮-১৭৮৩ অব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। বিহারের নায়েব রাজা কল্যাণ সিংহ কর্তৃক এই পুস্তক ১৭৮৩ অব্দে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে সেই (রাজ্য) বিপ্লবযুগের ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। বৃটিশ মিউজিয়ামে ইহার দুইখণ্ড নকল আছে।

৮. **তারিখ-ই-বাঙ্গালা**

১১০০-১৬৯৫ অব্দে সুবা সিংহের বিদ্রোহকাল হইতে নাজিম আলীবর্দি খানের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বঙ্গদেশেব নাজিমগণের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা বঙ্গের তদানীন্তন গভর্ণর Sir Henry Vansittart (1760-1764)- এর আদেশে মুন্সি সলিমুল্লা কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ১৮৮৮ অব্দে Mr. Gladwin কর্তৃক ইহা ইংরাজি ভাষায় অনুদিত হয়। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড নকল আছে। অপর দুই খণ্ড নকলের এক খণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ামে এবং আর এক খণ্ড এসিয়াটিক সোসাইটিব লাইব্রেরীতে আছে (noticed under Nos.1118 and 205 respectively).

৯. **ফাতিহা-ই-এবারিয়াহ**

এই পুস্তকখানিতে বঙ্গের শাসনকর্তা খান খানান মীর জুমলার (A H. ১০৭২-১০৭৩) আসাম ও কুচবিহার আক্রমণের বিবরণ অতি বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। পুস্তকখানি শিহাব-উদ্দিনতালিশ কর্তৃক প্রণীত। প্রণেতা ঐ দেশ এবং উহার অধিবাসিবর্গেরও বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই অভিযান-কালে তিনি পূর্বাপর মীর জুমলার সাহচর্য্যে ছিলেন এবং কার্য করিয়াছিলেন। ১৮০৫ অব্দে মীর বাহাদুর আলী হোসেনী তারিখ-ই-আসাম নাম দিয়া ইহার এক খণ্ড উর্দু অনুবাদ বাহির করেন ও উহা কলিকাতায় প্রকাশ করেন; ১৮৪৫ অব্দে উহা T. Pavie কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়। এই পুস্তককখানি এ পর্যন্তও মৌলিকভাবে প্রকাশিত হয় নাই; ইহা আলমগীরনামার সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহার উক্ত অনুবাদ মৌলভী জাকাউল্লা কর্তৃক তারিখ-ই-হিন্দুস্থান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। Dr. Blochmann এই পুস্তকের এক খণ্ড সংক্ষিপ্ত ইংরাজি অনুবাদ এসিয়াটিক সোসাইটির মুখ-পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং বর্তমানে ইহার সম্পুর্ণ ইংরাজি অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

১০. **মোবারক নামা**

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে বঙ্গের নাজিম মোবারক উদ্দৌলার শাসনকালের বিবরণ ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে। এই পুস্তক হইতে

মুর্শিদাবাদের শেষ দরবার সম্বন্ধে কিছু জানিতে পাবা যায়। ইহাব একখানি মনোবম সংস্করণ আমার নিকট আছে। ইহার অপব কোনো খণ্ড অন্য কোথাও বর্তমান আছে কি না তাহা আমার জানা নাই।

১১. দস্তুরুল আমল

উহাতে বঙ্গদেশের এবং ভাবতের অন্যান্য পার্শ্ববর্তী প্রদেশের জনসংখ্যা, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই পুস্তক ১১৮৯-১৭৭৫ অব্দে সমাপ্ত হয়। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড বর্তমান আছে।

১২. খোরশিদ জাহাঁ নুমা

এই পুস্তকখানিকে একখানি বৃহৎ ভূবৃত্তান্ত বলা যাইতে পাবে—ইহা ঐতিহাসিক বিবরণের আগাবও বটে। পরবর্তীকালেব বঙ্গদেশেব বিবরণ ইহাতে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে। পৃথিবীর জন্মকাল হইতে ১২৮০-১৬৬৩ অব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলী ইহাতে লিখিত আছে। আংরেজাবাদ-এর (নদীয়া) মৌলভী সৈয়দ এলাহি বকশ হুসেনী কর্তৃক এই পুস্তক প্রণীত হয়। ইহাতে প্রাচীন গৌড় ও পাণ্ডুয়া সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকারের আত্মচরিত-সম্বলিত যে পুস্তকখণ্ড বর্তমানে কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে বোধ হয় উহাই এই পুস্তকের একমাত্র কপি। মূল পুস্তকখানি হইতে কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীর ২০৯নং পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।

১৩. তারিখ-ই-মুজাফফরী

ইহা ভারতেব তৈমুরবংশীয় সুলতানদিগের ইতিহাস। তাঁহাদেব রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে ১২০৯-১৭৮৭ অব্দ পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ এই পুস্তকে লিখিত আছে। এই পুস্তকের প্রণয়ন মোহম্মদ আলী খান আন্সারী কর্তৃক ১৮৮৭ অব্দে সমাপ্ত হয়। তিনি বঙ্গেব নাজিম মুজফফর জঙ্গের অধীনে বিহার প্রদেশে সম্মানিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পুস্তকে প্রধানত গ্রন্থকারের সমসাময়িক বঙ্গদেশের বহু বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড বর্তমান আছে।

১৪. মুলাখখস-উত-তারিখ

এই পুস্তকখানি Siyarul Mutaachirin নামক গ্রন্থেব সংক্ষিপ্ত সার; মঙ্গেবেব ফবজন্দ-ই-আলী আল হুসেনী কর্তৃক সম্পাদিত। বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে ইহা রক্ষিত আছে।

১৫. তারিখ-ই-দালানে মকদ্দস হোসেনী

এই পুস্তকখানি ঢাকার বিখ্যাত ইমামবাড়ার ঐতিহাসিক বিবরণী; এই প্রাসাদ শাহজাহানের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি ঢাকার মির্জা মোহাম্মদ শিবাজি কর্তৃক লিখিত। তাঁহাব 'তখল্লুস' মাখ্‌মুর।! পুস্তকখানি বোধ হয় ১৩১৬-১৮৯৮ অব্দে রচিত হইয়াছিল। ইহার ঘটনাসমূহ প্রধানত প্রাচীন দলিলাদি এবং জনশ্রুতি হইতে গৃহীত। আমার নিকট গ্রন্থকারের লিখিত এক খণ্ড বর্তমান আছে; বোধ হয় ইহা ছাড়া আব কোথাও এই পুস্তক বর্তমান নাই।

১৬. শিগরিফ নামা-ই-বিলায়েত

এই পুস্তকে মুন্সি ইতিশাম উদ্দিনের ইউরোপ-যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তিনি ১১৮০ বঙ্গাব্দে ইউরোপ যাত্রা করেন। ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম ইউরোপ যাত্রা করেন। এই পুস্তক ১১৯৫ বঙ্গাব্দে রচিত হয়। ইহার ভূমিকায় সেই সময়ে বঙ্গদেশে কি কি ঘটনা ঘটিতেছিল তাহার বিবরণ আছে; অপর এক খণ্ড আমার নিকট সংগৃহীত আছে। ১২৫০ বঙ্গাব্দে আমার পুস্তকখানি নকল করা হইয়াছিল। মুন্সী ইতিশাম উদ্দিন ফতিহা-ই-এবারিয়াহ নামক গ্রন্থের বিখ্যাত লেখকেব পৌত্র।

১৭. **মজমুয়াতুল-ইনশা**

এই পুস্তকখানি চট্টগ্রামের ফৌজদার রহমত খান (d. ১১৩৫-১৭২২) এবং জাহাঙ্গীর নগরের মহম্মদ সাদিকের (মুজফর হোসেন মুন্সীর পুত্র) লিখিত পত্রাদির সংগ্রহ। মোহাম্মদ সাদিক ফৌজদাব রহমত খানের কর্মচারী ছিলেন। এই পত্রগুলি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগল-ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারা যায়। এই সংগৃহীত পত্রাবলীর একখণ্ড আমার নিকট আছে; কিন্তু অপর কোথায়ও আছে কি না জানি না।

১৮. **মজমুয়ে মকাতিব**

এই পুস্তকখানি রাজ্যশাসন-সম্পর্কিত পত্রাবলীর সংগ্রহ। ইহাতে প্রধানতঃ ১১৬২-১৭৪৮ অব্দ হইতে ১১৮৭-১৭৭৩ অব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশের ব্যাপার লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। নং ৪৮১।

১৯. **মুফিদুল ইনশা**

এই পুস্তকখানিও কতকগুলি সংগৃহীত পত্রের সমষ্টি। মুন্সী লেখ্‌রাজ ওরফে মুন্সী আলীকুলী খান কর্তৃক ১১২৭-১৭১৫ অব্দে উহা সংকলিত হইয়াছিল। আলকুলী রংপুরের ফৌজদার ও পরে কুচবিহারের রাজসরকারের রেসিডেন্ট নবাব ইকরামউল্লা খাঁর অধীনে কর্ম করিতেন। গ্রন্থকার তাঁহার পুত্র জান্নাৎ রায়ের জন্য এই লিপিসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সংগ্রহে মীলমুন্সি ও কুমার আজিম-উশশানের দেওয়ান-ই-বুয়ুতাত মহসিন খানের কতকগুলি পত্র আছে। গ্রন্থকারের সমসাময়িক বঙ্গের এই অংশের মূল্যবান তথ্যসমূহ ইহা হইতে পাওয়া যায়।

এই লিষ্টে বাংলার বহুমূল্য ইতিহাস 'বাহারিস্তানে গায়বী'র উল্লেখ কবা হয় নাই। প্যারিস লাইব্রেরী হইতে ইহার এক ফটোগ্রাফ-কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হইয়াছে। ইহার লেখক মির্জা নাথুন তাঁহার বর্ণিত প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধে নিজে যোগ দিয়াছিলেন। খুবই আনন্দের কথা প্রফেসার ফিদা খানি খান ও শাদানী ইহার ইংরাজি অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন।

নাস্তিকের ধর্ম

কাজী মোতাহার হোসেন

ধর্ম মানুষের বিপদে আশ্রয়, শোকে সান্তনা এবং সম্পদেও আত্মবিকাশের প্রধান উপায়। মানুষ দুর্বল বলে স্বভাবতই বিপদকালে অসীম ক্ষমতাশালী কারো কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা করে। দারুণ শোকে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে হয়তো এর ভিতরে এমন কোনো দূঢ় মঙ্গল-উদ্দেশ্য আছে যা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিশক্তির অতীত। সম্পদের সময় তার মন অন্যের দুঃখে বিগলিত হয় এবং সেই সহানুভূতির সূত্রে হৃদয়ের সহিত হৃদয় যুক্ত হয়ে মানুষের আত্মিক বিকাশ হয়। সুতরাং ধর্মভাব ব্যীক্তর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক সমাজের পক্ষে তেমনি প্রয়োজনীয়।

নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ধর্ম-ভাবের মনোহারিত্ব ফুটে ওঠে। মনে যেসব ধর্মভাব স্বভাবতই উদিত হয়, অনুষ্ঠানই তার কায়াস্বরূপ। প্রত্যেকের মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ভাব অন্যের থেকে কিছু না কিছু স্বতন্ত্র। এ জন্য ঠিক যে অনুষ্ঠানটি এক জনের ধর্মভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ, হতে পারে অন্যের পক্ষে সেটা আংশিক বা সম্পূর্ণ-প্রাণহীন অনুকরণ মাত্র। তবু এক এক জন বিরাট মানুষের আদর্শকে সামনে রেখে লোকে সর্বদা চেষ্টা করে যাতে তাদের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি ক্রমান্বয়ে উক্ত আদর্শের খাতে প্রবাহিত হয়। এর সুবিধা এই যে একটা ভাল আদর্শ চোখের সামনে পাওয়া যায়। কিন্তু অসুবিধা এই যে, যা নিজের পক্ষে স্বাভাবিক নয় তাকে স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস্ করবার বা প্রচার করবার প্রবৃত্তি জন্মে। এর ফলে নিজের পক্ষে যা স্বাভাবিক তাকে অবহেলা করতে করতে আত্মশক্তি ও আত্মচরিত্রে অবিশ্বাস জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিগ্রহের আদর্শ প্রবল হয়ে জীবন সরসতার স্থলে কৃত্রিমতায় পূর্ণ হয়। যাদের আত্মপ্রত্যয় বিরাট পুরুষের আদর্শের চাপে একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে যায়নি, সংসারে তারাই জীবন্ত ও শক্তিমান লোক। কিন্তু লোকে তাঁদের ক্ষমা করে না। যত বড় বড় মহাপুরুষ, ধর্মপ্রচারক, নতুন বাণী প্রচার করে গিয়েছেন, তাঁরা সকলেই তৎকালীন জনসাধারণের কাছে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হয়েছেন। জনসাধারণ সমস্ত নতুন 'আইডিয়া' বা ভাবকেই অত্যন্ত ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখে। এটা এক দিক দিয়ে মন্দ নয়। লোকের এই দ্বিধা ও সন্দেহ-জনিত অত্যাচারে নতুন ভাব বা সত্যের অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে যায়। তাতে

নতুন সত্যের দ্যুতি যেমন শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, নতুন মিথ্যারও তেমনি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। নতুন-পুরাতনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সমাজে হঠাৎ কোনো আকস্মিক অগ্নুৎপাত না হয়ে, অধিকাংশ সময়সহনযোগ্য দ্রুততা বা মৃদুতার সহিত পরিবর্তন ঘটে।

মহাপুরুষরা সকলেই নুতন নতুন সত্য প্রচার করে গেছেন, বা পুরাতন সত্যকেই নতুন দৃষ্টিতে দেখে গেছেন। যে সত্যকে কোটি কোটি লোকে কত কাল ধরে একভাবে বুঝে এসেছেন, মহাপুরুষের প্রতিভা তারই এরকটি রূপ (হয়তো সুন্দরতর বা পরিপূর্ণতর রূপ) লোকের সামনে তুলে ধরে। লোকে প্রথম প্রথম তার প্রখরতা সহ্য করতে পারে না, কিন্তু ক্রমান্বয়ে, হয়তো কয়েক শতাব্দী পরে—তার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এইরূপে মহাপুরুষদের প্রচণ্ড ধাক্কায় জনসাধারণ অল্পে অল্পে অগ্রসর হয়। যুগ-যুগ ধরে সর্ববিধ ধারণার ক্রমিক পরিবর্তন হচ্ছে, ধর্ম-বিষয়ে ধারণাও যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, তা অধুনা-প্রচলিত ধর্মমতের লিষ্ট দেখলেই বোঝা যায়।

বোধহয় আদিম মানুষ সহজ সরল বিশ্বাসে তাঁর দেবতার সান্নিধ্য বেশি করে অনুভব করতেন। পাহাড়ে, জঙ্গলে, সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে তাঁর জাগ্রত দেবতা ছিল। দেবতা রাখাল ভক্তের সাথে গামছা পেতে বসে কত মধুর আলাপ করতেন, গুরুতর জাতীয় সমস্যার সময় পাহাড় বা আকাশ থেকে দৈববাণী করতেন, কখনও বা স্বয়ং মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে অসুর-দলন করতেন, ভক্তকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলে সে অগ্নিকে কুসুম-শয্যায় পরিণত করতেন, এবং ভক্তের অনুরোধে অনায়াসে মৃতকে জীবন, অন্ধকে চক্ষু, তোতলাকে স্পষ্ট বাকশক্তি দান করতেন। বিশ্বাসের বলে পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করতো, আর শত নির্যাতন-নিষ্পেষণের পরীক্ষা অতিক্রম করেও পরিণামে ধর্মের অবধারিত জয় হোত।

কিন্তু লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে শুরু করলো। জীবনের দুঃখ-দৈন্য, অসম্পূর্ণতা, রোগ, শোক দেখে তারা দেবতাকে ভগবান বা করুণা-বিধান পূর্ণব্রহ্ম বলে স্বীকার করতে ইতস্তত করতে লাগলো। কেউ শোকে দেবতাকে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করলো, কেউ বা ঐশ্বর্য-গর্বে স্ফীত হয়ে দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য আকাশে তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। কেউ দেবতার অস্তিত্বেই অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করল, কেউ বা নিজেকেই খোদা বলে প্রচার করতে লাগলো। কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে পরম নির্ভরশীলতার সহিত সৃষ্টিকর্তাকে মঙ্গলময়-রূপেই ভাবতে চায়, এমনকি তার জাজ্বল্যমান নিষ্ঠুর রূপের সম্মুখীন হয়েও সংসারকে মায়াময় মনে করে নিজের অসহ্য দুঃখেও মঙ্গল হস্ত দেখতে ভালবাসে, তাতে আর সন্দেহ নাই। দুঃখ চিন্তাকে ভুলে থাকাই নিরুপায় দুঃখীর উৎকৃষ্ট পন্থা। তাই সান্ত্বনার জন্য নানারূপ কাল্পনিক মোহে নিজেকে আচ্ছন্ন

করে রাখা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী বলে বসলো, ঈশ্বর মানুষের মনের সৃষ্টি, কল্পনার কারসাজি। অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর জড়প্রকৃতিই অন্তর্নিহিত গুণবলে নির্দিষ্ট নিয়মে আপনাকে আপনি বিকশিত করতে করতে এই বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। এর জওয়াব কেউ দিতে পারলো না। তর্ক করতে করতে এই পাওয়া গেল, আস্তিক যাকে সৃষ্টিকর্তা বলছেন নাস্তিক তাকেই নামান্তরে প্রকৃতি বলছেন। এমনকি যাঁরা বলছেন বিশ্বের অনুপরমাণুতে ভগবান প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, প্রত্যেক বস্তুই সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশ, তাঁরাও তর্ক শাস্ত্রের দুই এক পদ এদিক ওদিক করে ঐ একই কথা বলছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে এঁরা ভগবানকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে চিন্ময় পরিচালক রূপে কল্পনা করছেন, আর প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক বলছেন জড়প্রকৃতির ভিতরই চিন্ময়ত্ব আছে, জড় ও চিৎ একই বস্তুর দুই অচ্ছেদ্য রূপ, জড়কে চালিত করবার জন্য জড়াতীত স্বতন্ত্র চিৎ-পদার্থের বা চিন্ময় পুরুষের কল্পনা করা নিস্প্রয়োজন। অবশ্য যাঁরা শোকের বশে বা মদ-গর্বে ঈশ্বরকে নিন্দা অভিশাপ বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, তাঁদের উত্তেজিত মানসিক অবস্থা প্রায়ই সাময়িক হয় এবং তাঁদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প। সুতরাং এঁদের কথা আমাদের আলোচনার বাইরে রাখলেও কোনো দোষ নাই।

সংসার হিতে-অহিতে ভালয়-মন্দয় মিশানো। তাই কেউ কেউ শিষ্ট ঈশ্বর ও দুষ্ট ঈশ্বরের স্বতন্ত্র কল্পনা করেছেন। প্রকৃতি বাদী বলেন, ঈশ্বর বা প্রকৃতি নিরপেক্ষ নিয়ম অনুসারে কাজ করে যাচ্ছে কারো হিত বা অহিতের দিকে লক্ষ্য করা তার ধর্ম নয়। মানুষ স্বভাবতই স্নেহ খোঁজে, সহানুভূতি খোঁজে, পাপের ক্ষমা চায়, পূন্যের পুরস্কার চায়। আস্তিকের এইখানে মস্ত সুবিধা। কার্যত যাই হোক, হৃদয়ের শান্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে মানুষের দুর্বলতার একটা শেষ আশ্রয়স্থল না থাকলে কেমন করে চলে? তা যদি ভুলও হয় তবু তাতে শান্তি পাওয়া গেলে সেই ভুলকেই বরণ করতে আপত্তি কি? যারা প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেন, তাঁরা তো একেবারে আত্মহারা। তাঁরা অতি বড় দুঃখেও বলতে পারে, তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ, তোমারই দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব; সুখেও বলে থাকেন, তুমি আপন লীলা-বিকাশে নিজের মধুরস নিজেই ভোগ করছ, হে আনন্দময়, আমার মধ্যে তোমারি প্রকাশ, তাইতো তো বিশ্বের যা কিছু সব এমন সুমধুর! কিন্তু প্রকৃতিবাদী বলেন, দর্শন ও কাব্যের মিথ্যা প্রলেপে জীবনকে মধুর আশা বা স্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়ে রেখো না, বীর্যবান পুরুষের মত যা সত্য, তার নগ্নরূপের দিকে দৃষ্টিপাত কর। প্রকৃতি তোমার স্বপক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়। যেমন কাজ করবে, বাঁধা নিয়ম অনুসারে তার ফল পাবে। পাপের ক্ষমা নাই, সঙ্গে সঙ্গে তার ফল ভোগ করতে থাকবে; পূণ্য করলেও তা বিফলে যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে তার পুরস্কার পেতে থাকবে। ঠিক যতটুকু পাপ ততটুকু দণ্ড, যতটুকু পুণ্য ততটুকু

পুরস্কার—এক চুল এদিক ওদিক হবার যো নেই। প্রকৃতি বড় কড়া বিচারক, এর কাছে দয়া মায়ার স্থান নাই। আগেই বলেছি, দুর্বল মানুষ কোমলতা চায়। তাই বৈজ্ঞানিকের দর্শন যদি নির্ভুলও হয়, তবও মানুষ তার কঠোর সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, বরং আস্তিকের মধুময় ভুলের শান্তিক্রোড়েই আশ্রয় নিতে চায়।

যা হোক সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ-তত্ত্ব আর ধর্ম-ভাব এক জিনিষ নয়। স্বরূপতত্ত্ব কর্ম-জীবনের উপর ক্রিয়াশীল কিনা, ঠিক বলা শক্ত হলেও তা অতি গৌণভাবে এবং খুব সামান্য পরিমাণে। পক্ষান্তরে মনের স্বাভাবিক ধর্মভাবের সঙ্গে ক্রিয়া-কলাপের খুব নিকট সম্বন্ধ। ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ধর্মের বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠানগুলি ধর্মভাবের স্বাভাবিক ব্যবহারিক প্রকাশ। তাই সচরাচর ভুল করা হয়ে থাকে যে যাদের ভিতর অনুষ্ঠানের কিঞ্চিৎ শিথিলতা দেখা যায়, বোধ হয় তাদের ধর্মভাব নাই। অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা ধর্মভাবের একটি প্রকাশ বটে, অনেক সময় সত্যই তার কাব্যময় রূপক প্রকাশ। কিন্তু এর কাব্যময়তা বুঝতে না পারলে সমুদয় রসভঙ্গ হয়—তখন এতে আত্মিক উন্নতি বা হৃদয়ের উন্নততর তৃপ্তি কিছুই হয় না। একান্ত নির্ভরশীলতা বা আজ্ঞা পালনের অস্পষ্ট দাস্য-তৃপ্তি যে একটু না হয়, তা নয়, কিন্তু সেইটুকুতে মানুষের সমস্ত অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয় না। তাই অনুষ্ঠান পালন করবার সময় তার ভিতরকার দৃঢ়ভাব বা spirit আমাদের স্পর্শ করছে কি না, সর্বদা তার আত্মযাচাই করা প্রয়োজন। তাই বহু লোককে এর বিরোধী দেখতে পাওয়া যায়। এর অন্তর্গূঢ়ভাবকে পুনঃ পুনঃ জাগ্রত করে এর অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। অনেক সময় নব-জাগরণের গতিবেগে এর আঙ্গিক পরিবর্তনও যে না হয় তা নয়। এই সব কারণে মুক্ত চিন্তা বা বিজ্ঞানের শিক্ষাকে অনেক সময় ধর্মবিনাশী বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ শিক্ষাই ধর্মের প্রাণ-সঞ্চারী।

এখন অনুষ্ঠানের দিক থেকে সাধারণ জগদ্ব্যাপারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান আমাদের জীবনের কত সামান্য অংশ। এর বাইরে যে অসীম কর্ম-কোলাহল, তার মধ্যেই ধর্ম-ভাবের প্রকৃষ্টতর বিকাশ। ধর্মভাব হৃদয়মনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থেকে সমস্ত সাধনা ও কর্মকে অনুরঞ্জিত করে। এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে, মানুষের সংস্রব থেকে দুরে গিয়ে গভীর চিন্তা বা ধ্যানে আত্মনিয়োগ করাই বুঝি শ্রেষ্ঠ ধার্মিকের কাজ। কিন্তু মানুষের সামাজিক বৃত্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে উপেক্ষা করে স্বার্থপরের মত আত্মোন্নতির চেষ্টা করাকে এখন আর কেউ ধর্ম বলে বড় বিশ্বাস করে না। এমনকি, প্রয়োগ-নিরপেক্ষ চিন্তনের দ্বারা যে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকার আত্মিক উন্নতি হয়, এ বিষয়েও অনেকেই সন্দেহ পোষন করেন। তাঁরা বলেন, উপযুক্ত সুপ্রয়োগ-দ্বারা যার অস্তিত্ব প্রমাণিত হল না, কার্যক্ষেত্রে যা টিকবে কি না টিকবে তার কোনোই স্থিরতা নাই, এরূপ জিনিষের কাল্পনিক মূল্য নিরূপণ করা নিতান্তই অর্থহীন।

ঐ শ্রেণীর সন্ন্যাসী ধার্মিকভাবে অত্যন্ত কৃচ্ছসাধন করতেন। দেখাদেখি গৃহীরাও আত্ম-পীড়নকে ধর্ম ও ধর্মভাবের একটি প্রধান অঙ্গ বলে মনে করতেন। তাঁদের মনে ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে আমাদের আত্মা ভগবানের অংশ, আর স্থূল দেহ শয়তানের খেলা-ঘর। কাজেই দেহ-পীড়ন করলে শয়তান নির্জ্জিত আর আত্মাপুষ্ট হবে। তাই বলে, রিপু দমন করতে গিয়ে, যা কিছু স্বভাবত আমাদের মনকে মুগ্ধ করে, সেই সমুদয়ের বিরুদ্ধেই 'ক্রুসেড' আরম্ভ হয়েছিল। এইরূপে রূপ, ধন সম্পদ, যৌবন, স্বাস্থ্য, কলানৈপুণ্য, আমোদ-প্রমোদ, এ সমস্তকে লোকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। উর্ধবাহু সন্ন্যাসী, শরশয্যার সাধক, কমলীওয়ালা সুফী, এঁরাই ধার্মিকের আদর্শ ছিলেন। লোকের কাছে প্রশংসা শুনলে পাছে তপোনষ্ট হয়, এই ভয়ে এঁদের অনেকেই লোকের সঙ্গে যাচ্ছে তাই দুর্ব্যবহার করতেন। তাঁরা ভাবতেন, একমাত্র ভগবানের সঙ্গে আমাদের কারবার, আমরা মানুষের কোনো ধার ধারি না। কিন্তু আজ কাল এই সব খেয়ালকে লোকে অদ্ভুত বলেই মনে করে। এখন অদ্ভুত ভৌতিক ক্রিয়া বা অলৌকিকত্ব-প্রদর্শনক্ষম সাধু সন্ন্যাসীকে উচ্চ আধ্যাত্মিক আসনের গৌরব দিতে অনেকেই দ্বিধান্বিত। বাস্তবিক, বর্তমানে জনসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে পরিকীর্তিত। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথাও ভুলে থাকলে চলবেনা। স্বাস্থ্যলাভ, সৌন্দর্য-চর্চা, খেলাধূলা এবং শারীরিক মানসিক সমুদয় বৃত্তির চরিতার্থতাই আজকালকার মতে প্রকৃত ধর্মভাব; চিরকাল জেলখানায় পুরে রেখে যার পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়, তার পবিত্রতার মূল্য কি? আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে নিগৃহীত করে সতী না বানিয়ে ছাড়া দিয়ে যাতে তারা আপনা আপনি সৎপথে চলতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই প্রকৃত ধর্মসাধনা।

প্রশ্ন হতে পারে, আস্তিক যেন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য, বা স্বর্গলোভে সৎকার্য করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিবাদী যার বিশ্বাস যে দেহ-লোপের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ সে কিসের জন্য সৎকাজ করতে যাবে? তার মনে তো ধর্মভাবের আবির্ভাব হওয়ার কোনোই কারণ দেখা যায় না। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ' এই আদর্শ থেকে তাকে কিসে বাঁচাবে? উত্তর অতি সহজ। প্রকৃতিবাদী আবার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনবাদী। তার বিশ্বাস, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চলাই ধর্ম, তার বিরুদ্ধে চলতে গেলেই লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। যেমন স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করা প্রকৃতি সিদ্ধ। অনিয়ম করলেই তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এই শাস্তিই নরক। সৎপ্রবৃত্তির অভ্যাস করতে করতে মানুষ ক্রমশ বিবর্তনের উচ্চতর সোপানে আরোহন করছে। প্রকৃতিবাদীর কাছে এই সব সোপানই সপ্ত স্বর্গ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আস্তিকের স্বর্গ-নরকের ন্যায়, বিবর্তন-সোপানের উঁচু নীচু ধাপগুলিই প্রকৃতি-বাদীর সদসৎ কর্মের নিয়ন্ত্রক। আস্তিক যেমন আত্মাকে অবিনাশী মনে করে, প্রকৃতিবাদীও তেমনি এক অখণ্ড মানবতায় বিশ্বাসী। এঁর মতে, মানুষ যার যার সঙ্গে

কর্মসূত্রে একত্র হয়ে যার যার মধ্যে নিজের ভাব ও স্বভাব সঞ্চারিত করে দেয়, তাদের ভিতর দিয়ে সে চিরকাল বেঁচে থাকে।

সন্তান, শিষ্য, পারিষদ এরা সবাই মিলে লোকের ব্যক্তিত্বকে বহন করে করে তাকে চিরজীবী করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আস্তিক ও প্রকৃতিবাদী উভয়ের মধ্যে কর্ম প্ররণায় বা ধর্মভাবে কোনো সত্যিকার পার্থক্য নাই। যদি বলা যায়, এদের ভিতর একই মূলগত জিনিষের শুধু নামগত পার্থক্য, তা হলে হয়তো বেশি ভুল বলা হয় না। তবে উভয়ে সৃষ্টিস্তরের বিভিন্ন সোপানের লোক। সাধারণ আস্তিকের আশা ও ভয়েল চেয়ে প্রকৃতিবাদীর কর্মপ্রেরণা আরও সূক্ষ্মতর। একজন প্রাথমিক ভক্তিযুগের লোক আর একজন বিচার ও চিন্তাজগতের লোক। কিন্তু তাই বলে যে কাব্যময়তা এবং লোকোত্তর রহস্যময়তার ভাব ধর্মের প্রাণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিকের বিচার ও চিন্তার ধুননে তা বিলুপ্ত তো হয়ইনি বরং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে আরো ছড়িয়ে পড়েছে। পক্ষ-পুট-বিশিষ্ট বা শিঙ্গাধারী স্বর্গীয় দূতের কল্পনার দিক দিয়ে, অনেকে বিজ্ঞানের আবির্ভাবে ধর্মের শ্রীভ্রষ্ট হওয়ার যে আশঙ্কা করেন, তা অমূলক।

আর একটি মাত্র কথা বলেই আলোচনা শেষ করব। স্বর্গ নরকে বিশ্বাস থাকা সত্বেও সংসারে এত পাপাচরণ কেন, এটি বাস্তবিকই বড় আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে অধিকাংশ লোকই মুখে বিশ্বাস করে, হৃদয়ে করেনা। উত্তরাধিকার সত্রে পাওয়া ধনের যেমন প্রকৃত কদর হয় না, বিশ্বাসেরও তাই। আপন চেষ্টার দ্বারা, চিন্তার দ্বারা সাধনার দ্বারা, আয়ত্ত না করলে কোনো জিনিষই আমাদের নিজস্ব হয় না। কিন্তু সংসারে অধিকাংশ লোকই অন্যের চোখে দেখে, অন্যের বুদ্ধিতে ভাবে, অন্যের অনুভূতির স্পন্দনকে নিজের অনুভূতি বলে ভুল করে। জাগ্রতভাবে, নিজের জীবনের উপর প্রভু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গড্ডালিকা স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া ঢের বেশি সহজ ও নিরাপদ। সুতরাং চোখ বুঁজে, না ভেবে চলাই সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। দুই একটা বুলি আউড়িয়েই তারা মনে করে, বিশ্বাস করেছি। এই আত্মবঞ্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে আত্মদৃষ্টি ও আত্মবিচার হারিয়ে ফেলে। কোনো বৃহৎ ভাব বা কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে চলবার সব চেয়ে বড় উপায় তাকে নির্বিবাদে স্বীকার করে নিয়ে সব পেয়েছি ভেবে তাকে মনের কোণ থেকে সরিয়ে রাখা। ঠিক এই পদ্ধতিতেই জগতের সব উচ্চ আদর্শ নীতিবাক্য, ধর্মকথা, কাব্য, কাহিনী, আর্ট, সব অভ্যস্ত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের এক মাত্র উপায় সকলের ভিতর অবিরাম চেতনা সঞ্চারিত করে রাখবার জন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্তিমান পুরুষের চেষ্টা। সজ্ঞানে পথ বুঝে বা পথ খুঁজে চলবার সময় এঁরা বারংবার ভুল করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে, শোধরানোর সম্ভাবনা থাকলে এই ভুলের ভিতর দিয়েই আছে।

আমাদের রাজনীতি

আবুল হুসেন

আপনারা জানেন—রাজনীতির প্রয়োজন রাষ্ট্রগঠন, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য; আর রাষ্ট্র গঠিত হয় বিশিষ্ট ভৌগলিক আবেষ্টন-লালিত দেশ ও অধিবাসীদের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। ভারতবর্ষ ও তার অধিবাসীদের অবিচ্ছেদ্য যোগে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তার সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য যে নীতির প্রয়োজন তাই হবে আমাদের রাজনীতি।

একই ভৌগলিক-পরিপার্শ্বপুষ্ট ভূভাগের অধিবাসীদের বিভিন্ন ধর্মের পোষাক পরিয়ে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। একই রাষ্ট্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠিত হতে পারে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হতে পারে না। পৃথক পৃথক ব্যক্তির সমন্বয়ে পরিবার (family), ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের সমন্বয়ে সমাজ এবং বিভিন্ন সমাজের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সকল মানুষ এক বৃহত্তর সমাজ বা জাতির অন্তর্ভুক্ত। কোরাণে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

সকল মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং আল্লাহ পয়গম্বরগণকে সুসমাচার প্রচার দ্বারা সতর্ক করতে অবতীর্ণ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন দেশে।—(কোরান। সুরা বকর-২১৩)

কাজেই রাষ্ট্রের দিক দিয়ে ভারতবাসীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে না। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী মিলে এক অখণ্ড রাষ্ট্র গঠন করেছে। ভারতবর্ষের কোলে জন্মলাভ করে বা আশ্রয় নিয়ে কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রিস্টান কেউই পৃথক পৃথক রাজনীতির দাবী করতে পারে না। বর্তমান ভারতে মুসলমানের রাজনীতি বা হিন্দুর রাজনীতি বা মুসলমান-রাষ্ট্র বা হিন্দু-রাষ্ট্র বলে কোনো কথা হতেই পারে না। অতএব আমাদের রাজনীতি বলতে বুঝতে হবে—ভারতের কোলে যাঁরা জন্মেছেন বা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের 'রাজনীতি'।

এ কথার প্রমাণের দরকার নাই যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিপুষ্টি লাভ করে সমাজে এবং সমাজ পরিপুষ্টি লাভ করে রাষ্ট্রে। তাই ব্যক্তিবিশেষের চেয়ে সমাজ বড় এবং সমাজবিশেষের চেয়ে রাষ্ট্র বড়। ফলত মানুষের বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব

(Greater personality of the individual) ফুটিয়ে তুলতে হলে সুপরিচালিত রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রকে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অনুকূল করবার জন্য সুচিন্তিত রাজনীতির প্রয়োজন।

এমন এক যুগ চলে গেছে যখন মানুষ তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আদৌ জাগ্রত ছিল না। তখন জনসাধারণ ব্যক্তিবিশেষের প্রভুত্ব স্বীকার করে চলত। সে যুগে ছিল পুরোহিতের বা দলপতির প্রাধান্য। রাষ্ট্র তখন রাজা বা পুরোহিত বা দলপতিতেই পর্যবসিত ছিল।

কিন্তু সে যুগ আর নাই। এখন গণশক্তি বলে একটা শক্তি রাষ্ট্রের 'প্রাণ' বলে পরিগণিত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়। কাজেই রাজা রাষ্ট্রের দোহাই গিয়ে মানুষের উপর অন্যায় অবিচার অত্যাচার করবার ক্ষমতা আজ হারিয়েছেন। তাঁকে আজ ব্যক্তির কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তার পরামর্শ নিতে হচ্ছে। এতেই মানুষ তার বৃহত্তর ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করছে এবং তাতেই তার নব জীবন চরিতার্থ হচ্ছে।

অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রের রূপ ও গঠন নিয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মাতৃভূমিতে জন্মেছে যে-মানুষ তার যে সমাজ ও রাষ্ট্র, তার রূপ ও গঠন সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত করবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড দেশ; নানা বর্ণের নানা গন্ধের ফুলের ন্যায় বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন সৌরভের মানুষ এদেশের কোলে জন্মলাভ করে এবং আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়েছে।

সুজলা সুফলা এদেশ, প্রাকৃতিক সম্পদের রাণী—খাদ্যের অভাব নেই, জীবন চর্চায় যা কিছু প্রয়োজন তার যথেষ্ট আয়োজন এখানে আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজ এদেশের অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না, তারা অবিকশিত অথবা বড়জোর অর্ধবিকশিত মানুষ নামধেয় জীবমাত্র। পূর্ণাঙ্গ মানুষের সংখ্যা এদেশে অত্যন্ত কম। কেন এ অবস্থা?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এদেশে সকল মানুষ জীবনের প্রয়োজনে চালিত না হয়ে ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের প্রয়োজনে পরিচালিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ-প্রধান যুগ হতে ব্রিটিশ-প্রধান যুগ পর্যন্ত এদেশে রাষ্ট্র জনসাধারণের বা গণের বৃহত্তর জীবন বিকাশে সাহার্য না করে শ্রেণীবিশেষের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্জনে সাহায্য করেছে। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের সম্বন্ধই এদেশের সকল রাজাই অক্ষুণ্ন রেখেছেন। মানুষ ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ এদেশে আজ পর্যন্ত মোটের উপর ব্রাহ্মণ-শূদ্রের সম্বন্ধ।

কিন্তু আজ ভারতের বাইরে অনেক দেশেই রাষ্ট্র গণের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে ও করছে। সে হাওয়া এদেশে এসে পৌঁছেছে। ব্রিটিশ-পরিচালিত রাষ্ট্র এদেশের সাধারণ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে বিশেষ (positive)

চেষ্টা না করলেও ব্রিটিশ-সংস্পর্শে এসে এদেশের গণশক্তি তাজা হয়ে উঠেছে। তাই এদেশে ইদানীং রাষ্ট্রের রূপ ও বিধিবিধান পরিবর্তন করবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ মোটের উপর ব্রাক্ষ্মণ-পরিচালিত রাষ্ট্রকেই বজায় রেখে চলছিলেন—পার্থক্য এই যে, তাঁরা শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্ব লাভে কিছু সাহায্য করেছেন ; কিন্তু শূদ্র ও ব্রাহ্মণকে গুলিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করবার জন্য তাঁরা কোনো বিশেষ আয়োজন করেছেন বলে আমি জানি না। ব্রাহ্মণ যেমন শূদ্রকে তার ব্যক্তিত্ব-বোধ লোপ করে দিয়ে তার উপর প্রভুত্ব করে রাষ্ট্রীয় সকল অধিকার ভোগ করতেন, ব্রিটিশও তেমনি দেশবাসীকে তার অধিকার সম্বন্ধে চাঙ্গা করে না তুলে তাকে রাজভক্ত (দচদ) করে তুলেছেন। ফলে দেশের লোক কি হিন্দু কি মুসলমান, হয়েই দিন যাপন করছে, তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় নিই, আর ব্রিটিশও মনের সুখে এদেশের ধন-সম্পদ আহরণ করে স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য ও গৌরব বাড়িয়েছেন।

সুখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতবাসী শনৈঃ শনৈঃ তার ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে চেতনা'লাভ করেছে। শূদ্রত্ব পরিহার করে মানুষ হয়ে সে বাঁচতে চাচ্ছে। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার। আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত ভারতীয় রাষ্ট্রের একদল মানুষ যে-আন্দোলন শুরু করেছে তার পরিপূর্ণ রূপ এখনও প্রকট হয় নাই। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের ফলে ভারতবাসী পূর্ণাঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকবার যে সব আয়োজন তা লাভ করতে সমর্থ হবে, ভারতীয় রাষ্ট্রও ভারতীয় মানুষের যোগে সহজ সুন্দর অথচ সুদৃঢ় হবে, এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া না হয়ে সকলেরই উপভোগ্য হবে। সে জন্য চাই শূদ্রত্ব হতে মুক্তিলাভের যে-আন্দোলন শুরু হয়েছে সে-আন্দোলনকে পরিপূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত করতে উঠে পড়ে লাগা।

দুঃখের বিষয়, ইসলামধর্মাবলম্বী ভারতবাসীরা ভারতীয় রাষ্ট্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়েও হিন্দুধর্মাবলম্বী ভারতবাসীর রাষ্ট্রীর আদর্শ ও সাধনাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছেন, এবং তাঁদের সাথে বিরোধ করে ব্রিটিশ পরিচালকদের হাত ধরে থাকতে চাচ্ছেন। তার কারণ, তাঁরা ভারতীয় রাষ্ট্র বলে কোনো আদর্শকে দেখেতে চাচ্ছেন না। কিন্তু কোরাণের আদর্শ অনুসারেই তাঁদের দেখা উচিত যে, ভারত-ভূমির মানুষ একজাতি কাজেই তাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সাধনা পৃথক করতে যাওয়া আহম্মকি। হিন্দু ও মুসলমান একই আল্লাহর প্রেরিত আদমের সন্তান, যে-আদমকে তিনি পাঠিয়েছিলেন দুনিয়াতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে! কোরান বলছেন—আমি পৃথিবীতে এমন একজনকে প্রেরণ করব যিনি সেখানে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। —(কোরান,সুরা বকর ১১, ৩০)

তাহলে বলতে হবে, এ ভারত আজ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু সে-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না উভয়ের সম্মিলিত

সাধনা ও শক্তি নিয়োগ ব্যতিরেকে। কিন্তু রাষ্ট্রের সাধনায় হিন্দু মুসলমানে কি সত্যকার কোনো বিভেদ হতে পারে? কোরান বলছেন—যিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করেন এবং যিনি অপরের হিত করেন তিনি প্রভুর নিকট হতে পুরস্কৃত হবেন, তিনি নির্ভয় ও দুঃখ ক্লেশের অতীত।—(কোরান II, ১১২)

অন্যস্থলে বলছেন,—এবং যাঁরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এবং অপরের হিতসাধন করেন তাঁরা এই স্বর্গোদ্যানে বাস করতে পারবেন এবং এখানেই তাঁরা থাকবেন।

আমার মনে হয়, কোরানের প্রচারিত ধর্মের মূল শর্ত হচ্ছে দুটি, আল্লাহতে আত্মসমর্পণ ও মানুষের কল্যাণ-সাধন। যে মানুষ এই দুইটি শর্ত পালন করবে তাকে মুসলমান বলে ধরা যেতে পারে, কারণ সে বেহেশতের অধিকারী। কিন্তু এক পরমব্রহ্ম বিশ্বপ্রভুতে আস্থাবান ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে সতত যত্নবান, —সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মানুষের কল্যাণ সাধনায় সহস্র অনুষ্ঠান খুলেছেন; কাজেই কোরাণের উদ্দেশ্য-অনুসারে হিন্দুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকা কোনো ক্রমেই উচিত হচ্ছে না। পরন্তু মুসলমানই আজ মানুষের কল্যাণ-সাধনায় পরাঙ্মুখ ও আল্লাহতে আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় ব্রিটিশ প্রভূর হাত ধরে চলবার আশা বা প্রবৃত্তি পোষন করে সে কিছুমাত্র উপকৃত হতে পারবে না।

বর্তমান ভারতে ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ। এ বিরোধের উৎপত্ত মূলত ব্রিটিশ-প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি বা policy of administration (শাসনের রীতি)। ব্রিটিশ বণিকেরা মুসলমানদের বদান্যতা ও উদারতার সুযোগ নিয়ে প্রতিপত্তি লাভ করতে করতে রাজত্ব লাভ করলেন। তারপর মুসলমান ক্ষোভে অভিমানে বহুদিন নতুন রাজশক্তির সাথে সাহচর্য না করে দূরে সরে রইল ; কিন্তু দুনিয়া এগিয়ে চলল। তারপর যখন হঠাৎ জেগে উঠল তখন সে দেখে—হিন্দুসমাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তখন সে তার অনুকরণে প্রবৃত্ত হল; সে তখন হিন্দুর মত চাকরী করতে চাইল—কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে হিন্দুর থেকে পিছনে থাকায় তাঁদের সাথে এঁটে উঠতে না পেরে সরকারের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে হাজির হল। সরকারও দেখলেন বড় সুযোগ, তার পিঠে হাত চাপড়ে বললেন, 'বেশ চাকরী পাবে'। তারপর রাষ্ট্রশক্তি অর্জনে হিন্দু আন্দোলন শুরু করল, কিন্তু মুসলমান ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে সে-আন্দোলনে যোগ দিতে সাহস করল না। হিন্দু রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করল; মুসলমান দেখল যে, 'আবার তারা হটে গেল।' তখন সে আবার সরকারের কাছে ভিক্ষা চাইল, 'আমায়ও কিছু রাষ্ট্র শক্তি ভিক্ষা দাও!' এমনি করে হিন্দু dynamic (সক্রিয়) সাধনার বলে সরকারের কাছ থেকে তার অধিকার আদায় করে নিচ্ছে, আর মুসলমান হিন্দুর পিছনে পিছনে সরকারের পা ধরে কান্নাকাটি করে দুএকটি অনুগ্রহ ভিক্ষা পেয়ে চরিতার্থ হতে চাচ্ছে।

এমনি করে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের ও মুসলমানের প্রতি হিন্দুর পরস্পর বিদ্বেষ হিংসা ও ক্রোধ দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে মুসলমান হিন্দুর সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে সরকারের হাত আঁকড়ে ধরে শিক্ষায় চাকরীতে ও রাষ্ট্রে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করে নিয়েছে। মুসলমান সরকারের মারফতে সর্বত্র representation by religion (ধর্মগত প্রতিনিধিত্ব) নীতির প্রবর্তন করিয়েছেন।

এ যাবৎ এই নীতি চলে এসেছে। কিন্তু গান্ধী-আরউইন-সন্ধির পর মুসলমান আবার এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তারা দেখছে, মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও হিন্দুর সঙ্কল্প ও সাধনা জয়যুক্ত হতে আদৌ বাধা পায় না,—লর্ড আরউইন সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে মুসলমান অন্তরে অন্তরে বেশ শঙ্কিত হয়েছে। তাই একদল বলছেন, 'আর দূরে সরে থেকে কাজ নাই, মিলে যাও হিন্দুর সাথে।' আর একদল বলছেন, 'না, মিলনে বিপদ,—হিন্দু বিজয়-মদে মত্ত হয়ে মুসলমানকে নিষ্পেষিত করবে, সংখ্যাধিক্যের গর্বে সে ন্যায় ও নীতির মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না, কাজেই ব্রিটিশের হাত ধরে চলাই অনিবার্য।'

এখন কোন নীতি মুসলমান ভারতবাসীর পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রদ, তাই হল বিবেচ্য। মুসলমান হিন্দুর স্বরাজ-সাধনায় পুরোপুরি সাহায্য না করলেও স্বরাজকে প্রতিহত করতে তার ইচ্ছা নাই। তবে তার ভয়, স্বরাজ হলে হিন্দু তার উপর অত্যাচার করবে। সে মনে করে, ব্রিটিশ থাকলে সে ঐ অত্যাচার হতে নিরাপদ হবে। এজন্য স্বরাজের যুগেও সে চায় তার স্বতন্ত্রনির্বাচন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে। স্বতন্ত্র-নির্বাচনে তার অস্তিত্ব বজায় থাকবে বলে সে বিশ্বাস করছে। বর্তমানে মুসলমান কেবল স্বতন্ত্রনির্বাচনের দাবী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে।

এখন দেখা যাক, স্বতন্ত্র-নির্বাচন বাস্তবিক মুসলমানকে রক্ষা করতে পারবে কি না! বাংলা দেশের কথা ধরা যাক। আজ প্রায় ২১ বৎসর স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রচলিত আছে—কিন্তু তাতে মুসলমান কি লাভ করেছে? তাদের স্বাস্থ্য নীতি, শিক্ষা, অর্থনৈতিক পরিতৃপ্তির জন্য নানা প্রকার মঙ্গলকর আয়োজন চাই; কিন্তু মুসলমান-নির্বাচিত সভ্যগণ কয়টির আয়োজন করতে পেরেছেন? অতি সামান্য। তার কারণ, হয়তো তাঁরা অকর্মণ্য, অথবা হিন্দুর সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো অনুষ্ঠানই সম্ভবপর নয়। বিগত ১০ বৎসর যাবৎ ব্রিটিশ পরিচালক মুসলমানের সাহায্য করেছেন, কিন্তু মুসলমান তার কোনো সুযোগ নিতে পারে নাই। স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছে, শত শত মুসলমান নিহত আহত হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালকগণ তো তাদের মৃত্যু ও আসন্ন ক্ষতি হতে রক্ষা করতে পারেন নাই!

মুসলমান ভিক্ষুক, কারা-নিগৃহীত, অশিক্ষিত, দরিদ্র; কিন্তু তাদের দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দুঃখ দূর করবার জন্য বিদেশীয় রাষ্ট্র নিয়ন্তা কয়টি ব্যবস্থা করেছেন? যা দু একটি দায় শোধ দেওয়া গোছের apology খাড়া করেছেন তাতে যথেষ্ট সাহায্য

দিচ্ছেন না। তবু মুসলমান তার পানে চেয়ে আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ-কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ ও New Scheme Madrasa খাড়া হয়েছে কিন্তু তার উন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য মিলছে না।

সরকারী চাকরীর নির্দিষ্ট সংখ্যা Circular ও Notification-এ লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু তা কি পুরোপুরি মিলছে? নিশ্চয় না। কারণ হিন্দু বড় বাবুরা (heads of departments) মুসলমান উমেদারদের চেষ্টা নানা প্রকারে ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে? নিশ্চয়ই না। মুসলমান-নির্বাচিত মেম্বরের মধ্যে অনেকেই হিন্দুদের থেকে টাকা ধার নিয়ে ভোটের লড়াই (election contest) করেন; আবার কেউ কেউ হিন্দুকে দিয়ে বক্তৃতা লিখে নিয়ে কাউন্সিলে পাঠ করেন। হিন্দু জমিদার ব্যবসায়ী ও মহাজনের হাতে মুসলমান বাঁধা। ব্রিটিশ পরিচালকগণ কি তাদের হাত থেকে মুসলমানকে রক্ষা করতে পারছেন? তাহলে স্বাতন্ত্র্য-নীতি অবলম্বনে মুসলমান আদৌ উপকৃত হয় নাই ও হচ্ছে না। এতে করে বরং হিন্দুর প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ-প্রবৃত্তি আরও প্রখর হয়ে উঠেছে ও উঠছে। আজ যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখে স্বাতন্ত্র্য-নীতির সমর্থন করা হচ্ছে, সে-সমস্তই এই স্বাতন্ত্র্য-নীতির ফল। স্বাতন্ত্র্য-নীতির ফলে মুসলমান সংকীর্ণ-চিত্ত ভীরু স্বার্থপর, এবং হিন্দু অধিকতর সংকীর্ণ ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়েছে, আর উভয়ের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। এর ফলে উভয়ে দেশের স্বার্থ ও কল্যাণকে না দেখে দেখছে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ। মুসলমান মেম্বারগণ তাঁদের নির্বাচক-মণ্ডলীর (constituency) প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে কেবল খানাপিনা ও রাহ্-খরচ (enterainments & T.A.) নিয়েই ব্যস্ত এবং কখন কখন মন্ত্রীপদ নিয়ে দল পাকাপাকি করেই নিজেদের কর্তব্য সাধন করছেন। বিরাট মুসলমান-সমাজের প্রয়োজন সুনির্ধারিত (catalogue) করে কজন দলবদ্ধ হয়ে একটি কর্মতালিকা (programme) নিয়ে কাউন্সিলে কাজ করতে চেষ্টা করেছেন? স্বাতন্ত্র্য-নীতির ফলে মুসলমান ভোটদাতা আদৌ সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারছে না। নির্বাচিত মেম্বরগণও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারছে না। তাই দেখতে পাই, এদের কেউ হিন্দু-নেতার পেছনে ছুটছেন, কেউ সাহেবদের (officials) পদলেহন করছেন, আবার কেউ পেটের দায়ে মুখবন্ধ করে ব্যক্তিবিশেষের মোসাহেবীতে আত্মবিক্রয় করেছেন। মুসলমান চাকুরেদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের অনেকেই পেছনের দরজা (back door) দিয়ে ঢুকে বিবেককে গলা টিপে মেরে ফেলতে বাধ্য হন। তাঁরা হিন্দুর কলমের (citicism) ভয়ে মুসলমানের প্রতি ন্যায় বিচার পর্যন্ত (bare justice) করতেও কুণ্ঠিত হন। তাঁরা কেবল ব্রিটিশ বড় সাহেবদের সুনজর অর্জনেই জীবনের সকল শক্তি ও বুদ্ধি ব্যয় করে দিয়ে খয়েরখাঁ হতে ব্যস্ত। এঁরাই নাকি খুব হুশিয়ার চাকুরে (tactful officer) বলে খ্যাতি লাভ করে থাকেন।

এমনি করে মুসলিম-স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে, সে-স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ নিজ ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সাধন করেই তাঁরা তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন। এতে করে কোটি কোটি মূখ অসহায় দরিদ্র মুসলিম নরনারীর আত্মাকে অপমানিত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করা হয়েছে ও হচ্ছে,—মুসলিম সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশকে প্রতিহত করা হয়েছে; মুসলিম যুবকের সৃষ্টিশক্তিকে ব্যর্থ করা হয়েছে—এতে তার আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বুদ্ধি বিকশিত হতে পারছে না, হৃদয়বৃত্তির কোনো সহজ স্ফূর্তি ঘটছেনা; মুসলিম-সমাজমন রাষ্ট্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না—মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ পাচ্ছে না। পক্ষান্তরে স্বাতন্ত্র্যনীতি দুর্বলকে লালন করছে, ভীরু অকর্মণ্য হৃদয়হীন ক্ষুদ্রচেতা ভণ্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে, ইসলামের প্রাণশক্তি ও সৃষ্টিধর্ম (dynamic and creative force) মুক্ত হতে দিচ্ছে না।

আজ স্বাতন্ত্র্যনীতি যাঁরা দাবী করছেন তাঁরা দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও তার আয়োজনের ধারণা করতেও অসমর্থ! দেশের লোকের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করবার জন্য যে রাজনীতির প্রয়োজন তার মূল নীতি হচ্ছে গণতন্ত্র (democracy)—ভারতবাসী তার নিজের প্রয়োজন নিজেই নির্ধারণ করবার ক্ষমতা চায়। সে ক্ষমতা তাকে দিলে সে যে-আয়োজন করবে তাতে সকলের ঠিক সূর্যের আলোক ও বর্ষার বারিধারার ন্যায় সমান অধিকার থাকবে এবং তা সকলের পক্ষে সমানভাবে কল্যাণ করা হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক—যদি বাংলাদেশের মৃত বা মৃতপ্রায় নদীগুলির সংস্কার হয়, যদি প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education) প্রবর্তিত হয়, যদি সেচন ও সার সরবরাহের সুবিধা (irrigation and manuring facilities) বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয়েই উপকৃত হবে। স্বাতন্ত্র্যনীতির ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মেম্বারগণ মিলে কখনও একযোগে বৃহত্তর কল্যাণের দ্বার উদ্ঘাটন করতে পারবেন না। একে অপরকে সন্দেহ করবেন, একের প্রস্তাবে অন্যে প্রমাদ গণবেন। তাছাড়া, স্বরাজ (kesponsible govt.) কখনও কার্যকরী হবে না। হিন্দু-মন্ত্রী মুসলমান-মন্ত্রীর সঙ্গে একমত না হলে সংঘর্ষ অনিবার্য। ব্যবস্থাপক সভার (hegislative council) নিকট তাঁরা কখনও সম্মিলিত দায়িত্ব (joint responsibility) অনুভব করবেন না। এমনি করে স্বতন্ত্র-নির্বাচন প্রণালী গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করবে। মিশ্রনির্বাচন-প্রণালীতে উভয় সম্প্রদায়ের মনোভাব পরিমার্জিত হবে। হিন্দু মুসলমান সভ্যপদপ্রার্থী (candidates) হিন্দু-মুসলমান ভোটদাতাদের (voters) নিকট যেতে বাধ্য হবেন। তা হলে ভোটদাতা (voter) বুঝবে তার নিজের মূল্য ক্রমে সে সভ্যপদপ্রার্থীদের (candidates) নিকট কাজ (programme) তলব করতে শিখবে ও হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করতে শিখবে। এই হল নির্বাচনের (election) একটা মস্ত বড় শিক্ষা। স্বতন্ত্রনির্বাচনে ভোটদাতা

(voter) তার আপনার শক্তি ও ব্যক্তিত্বে উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। এইটাই হল সবচেয়ে বেশি মারাত্মক।

মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু-সংখ্যাগুরুত্বের ভয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন চাচ্ছেন, কিন্তু সে মনোভাব (attitude) ভিক্ষুকের। ভিক্ষা করে কেউ কখনও শক্তিমান ও মহৎ হতে পারে না। তৃতীয় পক্ষের হাত ধরে চললেও হিন্দু বড় দল (majority) ইচ্ছা করলে মুসলমানকে নির্যাতিত করতে পারবেন। এখনই আমরা চোখের সামনে তা দেখছি। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখি তা হলে হিন্দু বড় দল সসম্ভ্রমে আমাদের দাবী বিবেচনা করবেন। সংখ্যায় গুরু হলেই মানুষের শক্তি বাড়ে না। মানুষের শক্তি বাড়ে বুদ্ধি চরিত্র ও জ্ঞানে।

স্বাতন্ত্র্য-নীতি দুর্বলের নীতি। সে নীতির ফল হচ্ছে চির দাসত্ব (perpetual slavery)। এতে মুসলমানের মনের ভয় কখনও দূর হবে না। হিন্দুর প্রতি তার বিশ্বাস কখনও ফিরবে না। কিন্তু সৃষ্টি-লোলুপ মুসলিম-যুবকের অভিধানে ভয় দাসত্ব ও ভিক্ষা বলে কোনো শব্দের স্থান নাই। সে চায় প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে তার ভিতরকার শ্রেষ্ঠ ও মহত্ত বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ। সে চায় নিজেকে জগতের সভায় একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে দাঁড় করাতে—যাকে দেখলে সভ্য-জগতে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে নমস্কার করবে। সে চায় মানব-জীবনের বৃহত্তর কল্যাণ তার জন্মভূমির প্রতিগৃহে পৌঁছে দিতে, সে চায় হিন্দুর প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষকে স্নেহ ও প্রীতিতে পরিণত করতে, সে চায় দেশের জলবায়ুতে জন্মেছে যে-মানুষ তারই পরিপূর্ণ জীবনের জন্য সকল প্রকার আয়োজন করতে।

সে এমন কিছু চায় না যার কোনো মূল্য তাকে দিতে হবে না—সে কিছুই ভিক্ষা চায় না, কিংবা কারও অনুকম্পার পাত্র হয়ে এ জগতে থাকতে চায় না। কারণ, তার চেয়ে বড় অপমান মুসলমানের পক্ষে আর কিছুই নয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলিম-স্বার্থ তখনই রক্ষা হবে যখন মুসলিম মানুষ বুদ্ধি জ্ঞান ও চরিত্রে উৎকর্ষ লাভ করে হিন্দুর সাহচর্যে কর্মক্ষেত্রে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণকে সফল ও সার্থক করে তুলতে পারবে।

নির্বোধ মূর্খ হয়ে দল পাকিয়ে অপরের হাত ধরে ধরে যে সকল মুসলমান-নামধারী মানুষ চলে তারা মুসলমান নয়। মুসলমান যে, সে মুক্ত, সে তার দেশের সম্পদ ও কল্যাণকে রক্ষা করবার জন্য সতত ব্যগ্র—তার কাছে মুসলমানের চেয়ে মানুষ বড়, সমাজের চেয়ে দেশ বড়।

স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত ফুটিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করবার অধিকারকে আমি বলি রাষ্ট্রীয় অধিকার (political right), সে অধিকার অনেক বড়। মানুষ সে অধিকার হতে বঞ্চিত হলে পঙ্গু হতে থাকতে বাধ্য। আজ ভারতে সে অধিকার পাওয়ার জন্য আন্দোলন চলছে।

কিন্তু মাতৃভূমির প্রত্যেক মানুষ যাতে সে অধিকার অর্জন করতে পারে সে পথ উন্মুক্ত করবার জন্য তথাকথিত মুসলমান নেতৃবৃন্দকে কিছুমাত্র চিন্তা-ভাবনা বা চেষ্টা করতে না দেখে মর্মান্তিক দুঃখ পাই এবং নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত মনে করি। তাঁরা নির্বাচন-প্রণালী নিয়ে হিন্দুর সাথে জিদ করছেন, কিন্তু সে-অধিকার প্রত্যেকের উপভোগ্য করবার জন্য সমবেত চেষ্টা করা দরকার সে চেষ্টা তাঁরা করছেন না। তাঁরা ঘোড়া কোথায় তার খোঁজ না করে খোঁজ করছেন চাবুকের। কিন্তু ঘোড়া কোনো চাই, ঘোড়ায় চড়তে শেখা চাই, তবে চাবুকের প্রয়োজন হয়। আমরা এখনও আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইনি, কিন্তু আগে থেকেই তাঁরা হৈ চৈ করছেন রাষ্ট্রীয় অধিকার পরিচালনা করবার প্রণালী নিয়ে।

তাই 'সাহিত্য সমাজের' তরুণ বন্ধুদের নিকট আমার এই নিবেদন যে, রাষ্ট্রীয় অধিকার মানুষের বড় অধিকার, সে অধিকারকে সার্থক ও চরিতার্থ করতে না পারলে মানব-জীবনের কোনো সাধনাই সাফল্য মণ্ডিত হয় না, কাজেই সে অধিকারকে আয়ত্ত করবার সাধনার চেয়ে কোনো সাধনাই মহত্তর হতে পারে না। কিন্তু বলতে লজ্জা হয়, ভারতীয় মুসলমানের সে সাধনা যো-হুকুম ও ভিক্ষুকের কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দন বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিকার ভিক্ষা করে অর্জন করা যায় না। সে অধিকার লাভের জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য দিতে হয়। সে মূল্য হচ্ছে হাসিমুখে সকল দুঃখ বরণ, অমিত সাহস ও নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ স্বীকার। কিন্তু মুসলমান-নেতৃবৃন্দ দুঃখকে এড়িয়ে ভয়কে বরণ করে চূড়ান্ত স্বার্থপরতাকেই রাষ্ট্র সাধনার পাথেয় করে নিয়েছেন। তাঁদের থেকে আপনারা কি আশা করতে পারেন? কাজেই সে-মূল্য দেওয়ার জন্য আপনার প্রস্তুত হতে হবে আপনাদের হিন্দু বড় দলের (Hindu Majority) প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষকে স্নেহ ও প্রীতিতে পরিণত করবার সাধনা করতে হবে। হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার জন্য আপনাদের তৈরী হতে হবে। কূপমণ্ডুক হয়ে ব্রিটিশ সঙ্গীনের (bayonet) আওতায় 'ইৎমিনানে' বসে হিন্দুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বাতন্ত্র্য (separate representation) বা সংরক্ষণ (safeguards) ভিক্ষা করলে মুসলিম সমাজের মৃত্যু অনিবার্য। তাতে আপনারা ব্রিটিশের কাছেও ঘৃণ্য হবেন এবং হিন্দুর বিরক্তিভাজন হবেন। হিন্দু আপনাদের মনে করবে পথের কন্টক—ব্রিটিশ মনে করবে এরা অপদার্থ। এমনতর দশা (position) কি আপনাদের কাম্য? তাতে কি আপনাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হবে? জোর গলায় বলুন, 'না, না'—বলুন—'আমরা চাই আমাদের অধিকার অর্জন করতে, ভিক্ষা করতে চাইনা।' আপনারা মানুষ হলে হিন্দু আপনিই তাঁর বড় আয়োজন সার্থক করবার জন্য আপনাদের সাদরে গ্রহণ করে তাঁদের কাজে লাগাবেন। আপনারা শ্রদ্ধেয় হলে দেশের কল্যাণ সাধনায় আপনাদের ডাক অনিবার্য হবে। স্বাধীনতার আবহাওয়ায় মানুষের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়—পশু বৃত্তিরও অবসান হয়। তখন জীবনায়োজনের সম্ভার চতুর্দিক হতে উৎসারিত হয়ে সকলকে

মঙ্গলের দিকে, শান্তির দিকে, প্রীতির দিকে, আকৃষ্ট করে। তখন হিন্দু মুসলমানের বর্তমান মনোভাব কিছুতেই থাকতে পারে না। হিন্দু তা না হলে কিছুই করতে পারবে না, আর মুসলমানও কোলাহল করতে থাকবে। কাজেই উভয়ের জীবনের প্রয়োজনেই উভয়েই আপনাপন স্থান বেছে নিয়ে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সার্থক ও চরিতার্থ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ফিরবে।

আপনারা এখন আপনাদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করুন, মুসলিম-সমাজের কোলে ইসলামের আদর্শে এমন মানুষ তৈরী হতে পারে যাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতীয় রাষ্ট্র একেবারেই সার্থক হতে পারে না। বেড়া (barrier) দিয়ে কোনো সমাজকে অন্য সমাজের দৌরাত্ম বা নির্যাতন হতে রক্ষা করা যায় না, তাতে রক্ষা (protection) না হয়ে হয় ধ্বংস (destruction); মহাত্মা গান্ধী তাই বলছেন, 'মুসলমান যা চায় তাই দাও—তবু আমাদের পূর্ণ-স্বরাজ হোক'! মুসলমান মনে করছে—'মার দিয়া কিল্লা!' কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বেশ জানেন যে, এতে মুসলমানের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

উপসংহারে বলি, আপনারা হিন্দুর হিংসা-বিদ্বেষের কথা ভুলে যান, তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত আদমের সন্তান। তাঁরাও মানুষ; স্নেহ-প্রীতি দয়া মমতাও তাঁদের যথেষ্ট আছে। তাঁদের সেই সুপ্রবৃত্তিগুলি আকর্ষন করার চেষ্টা করুন নিজেদের কাজ ও চিন্তাধারা। মুসলমানদের যাঁরা নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা মুসলমান সমাজের অন্তরতম মর্মকথা জানেন না, বা তাকে সার্থক করতে হলে যে আয়োজন করা দরকার সে সমস্ত আয়োজন যে হিন্দুর সাহায্য ব্যতিরেকে একেবারেই সার্থক হতে পারে না—সে কথা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। আপনাদের নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমান-মানুষের নেতা হতে হবে। আজ আমাদের রাজনীতি হবে-'দেশের মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করতে হবে'। তার জন্য বড় আয়োজন করতে হবে, সে আয়োজন সম্পূর্ণ হবে হিন্দু-মানুষ ও মুসলমান-মানুষ উভয়েই পূর্ণাঙ্গ হলে। দেশের মানুষের কল্যাণ হবে আমাদের লক্ষ্য ও এক আল্লাহতে বিশ্বাসই হবে আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মিলনসূত্র। তাহলে বোধ হয় আর কোনো সাম্প্রদায়িক সমস্যাই আমাদের উঠতে পারবে না। তখন কেবল কাজের কথাই (Programme) হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আপনারা হিন্দু বড় দলের (majority) ভয় মন থেকে দূর করে দিন। আপনারা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে দাঁড়ান। বড় দল (majority) হলেও আপনাদের দাবী উপেক্ষা করবার মত শক্তি অতি বড় বড় দলেরও (majority) কখনও হবে না, এই নতুন বিশ্বাস (faith) নিয়ে আপনারা জীবন্ত জাগ্রত ক্রিয়াশীল (dynamic) হয়ে চলুন, তা হলেই সকল দ্বন্দ্ব সকল দ্বেষ ঘুচে যাবে—আর ভারতের বুকে ছোট দল ও বড় দলের (minority and majority) এমন এক চমকপ্রদ সমন্বয় সাধিত হবে বিশ্বকল্যাণ সাধনায় যার আদর্শ অপরিহার্য হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্য-বিলাস

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য বিলাসিতার চির-বিরোধী। তাঁর সমগ্র কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে এমন কতকগুলি স্থান দেখতে পাওয়া যায় যা বৈবাগ্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই জরায় মরা দেশে যেখানে জন্ম লাভ করা মাত্র 'ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা' 'দুনিয়া কিছু নয় সব ফাঁকি' এ প্রকারের নানা বৈরাগ্য-সূচক বচন শুনতে হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথই প্রথমে জীবনের গান গেয়ে এসেছেন। অবশ্য তাঁর আগেও কেউ যে এ ধরণের গান গাননি তা নয়। তবে যাঁরা গেয়েছেন তাঁদের ভিতর মৌলিকতা জিনিষটা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের কেউবা ইংরাজ কবির কবিতা অনুবাদ করে গেছেন, আর কেউবা ইংরাজ কবির কবিতা হতে অনুপ্রেরণা লাভ করে লিখতে প্রয়াস পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ Longfellow-র Psalm of life-র অনুবাদ কর্তা হেম বাবুর নাম করা যেতে পারে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথাথের সুর তাঁর নিজস্ব, তাঁর অন্তরের স্বতউৎসারিত সুর। এই বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-ময়ী ধরণী তাঁর নিকট মিথ্যা বলে মনে হয়নি। এই মুক্ত নীল আকাশের তলে শ্যামল দুর্বাদলের উপরে বসে কি এক অনির্বচনীয় রসে তাঁর অন্তর আত্মা পুলকিত হয়ে উঠেছে! তাঁর অনন্ত-রূপ-পিয়াসী মন এই অপরূপ রূপসী পৃথিবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার কান্না-হাসি, আলো-ছায়ার খেলার মাঝে বাঁচবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক এই স্বাভাবিক বাঁচবার সাধটিই মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা ঢেকে রেখে বিশ্বের প্রতি বৈরাগ্য প্রকাশের দ্বারা নিজের বুজরগী জাহির করতে চেষ্টা করে—মনে করে, দুনিয়াকে অবহেলা করলেই বুঝি মস্ত বড় একটা কাজ করা গেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ভান করেন নি। তিনি তাঁর মনের কথাটি চাপা না দিয়ে বলে ফেলেন :

> মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
> এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
> জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
> ধরায় প্রাণের খেলা চির-তরঙ্গিত

বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যেন গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিও ফুল তার পরে, হায়,
ফেলে দিও ফুল যদি সে ফুল শুকায়।

বাংলা সাহিত্যে এ একেবারে অপূর্ব। ধরণীর প্রতি এমন প্রাণের টান এদেশে আর কোনো কবির কাব্যেই দেখা যায় না। আশ্চর্য্য এই যে, যে দেশে কি দর্শনে কি কাব্যে জগত ও জীবনকে 'কিছু না' বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসাল নন্দনে' ধরণের গানই চির-পরিচিত ও চির-আদৃত, সে দেশের কবি রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়েই বেরিয়েছে—

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাকে দুঃখে সুখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা-অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

কী নিবিড় ধরণী-প্রীতি ফুটে উঠেছে এ কটি লাইনে!—আমাদের মত সাধারণ মানুষের নিকট এ বড় অদ্ভুত বলে মনে হয়। কারণ আমরা দেখছি সব মানুষই মরছে, কেউই অমর হয়ে থাকছে না; এবং এই দেখে ঠিক করে নিয়েছি যে মরণটাই মানুষের জন্য সত্য, জীবনটা মিথ্যা। কিন্তু এটুকু ভেবে দেখছিনে যে যত দিন বেঁচে আছি ততদিন এই জীবনটারও একটা মূল্য আছে, এবং সে-মূল্য একটা বড় রকমের মূল্য।

রবীন্দ্রনাথের নিকট জীবনের সত্যতা আলোকের মত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি জানেন, মরণটা যেমন সত্য জীবনটাও তেমনি সত্য। তাঁর মতে জীবনটাকে এড়িয়ে চললে খুব বড় একটা শক্তিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং হীন দুর্বলতারই পরিচয় দেওয়া হয়। জগত জীবন ও মরণকে তিনি কিভাবে দেখেছেন 'বলাকার' একটি কবিতায় তা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন—কিভাবে তিনি এই জগতকে ভালোবেসেছেন। তাঁর সমস্ত জীবন এই জগতের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। প্রভাত সন্ধ্যার আলো-অন্ধকার তাঁর চেতনায় ভেসে গেছে। কিন্তু তিনি এও জানেন যে একদিন তাঁকে এই জগত হতে বিদায় নিতে হবে—একদিন তাঁর বাণী আর এ বাতাসে ফুটবে না, তাঁর আঁখি আর

এ আলোকে লুটবে না;—একদিন তাঁকে তাঁর শেষ দৃষ্টি, শেষ কথা, শেষ করে যেতে হবে। কিন্তু এ চিন্তার দ্বারা আমাদের মত তাঁর চিত্ত অবসাদগ্রস্ত হয়নি, তাঁর অন্তরের আনন্দ উবে যায়নি। কেননা তিনি জানেন—

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত—
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসি মুখে এত কাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্প সম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

এই তাঁর বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসই তাঁর অন্তরকে বলীয়ান ও উৎসাহপূর্ণ করে তুলেছে। এই বিশ্বাস আছে বলেই তিনি এই 'জগতেরে পাকে পাকে ফেরে ফেরে' ভালোবাসতে শিখেছেন। তাঁর জগতকে ভালোবাসার প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর অন্তরের কবিজন-সুলভ স্বাভাবিক সৌন্দর্যানুভূতি। এই সৌন্দর্যানুভূতিই তাঁকে চালিত করে নিয়েছেন রূপের পথ দিয়ে, ভোগের পথ দিয়ে এবং শেষে অরূপ রাজার দুয়ারে এনে হাজির করেছে। অন্য কথায়, সৌন্দর্যানুভূতি শেষে সর্বানুভূতিতে পরিণত হয়েছে।

২

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দার্যাভূতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা উচিত মনে করি। প্রথমে 'কড়ি ও কোমলের' সনেটগুলিতেই তাঁর সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কবিতাগুলিকে অনেকে ভোগের কবিতা বলে উল্লেখ করে থাকেন এবং এই জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেকের নিকট খোঁচাও খেতে হয়েছে। আমরাও এগুলো ভোগের কবিতাই বলি; কিন্তু ভোগের কবিতা বলে এ উপেক্ষার বস্তু মনে করিনে। ভোগের যে একটা সত্য আনন্দ আছে তাই এই কবিতাগুলোয় ফুটে উঠেছে। এই সম্বন্ধে 'রবীন্দ্রকাব্যপাঠের' লেখক অধ্যাপক ওদুদ সাহেবের উক্তি তুলে দিচ্ছি।

> এই সব সনেটের কতকগুলোর ভিতরে যে ভোগের সুর বাজছে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে। মনে হয়, নানা অর্ধ সত্যের অত্যাচারে আমাদের জাতীয় জীবন বড় ক্লিষ্ট বলেই একটুখানি সংস্কারবিমুক্ত হয়ে কাব্যের সৌন্দর্য উপভোগ করবার ক্ষমতা আমাদের ভিতরে এমন ব্যাহত। কাব্য আত্মারই এক প্রকাশ; কাজেই এর সৌন্দর্যও 'ন বলহীনের লভ্যঃ'।

এই ভোগের 'কুসুমের কারাগার' থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পরে কবির অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে বলেই যে কবি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তা সত্য নয়। অনেক বড় কবির ভিতরে এ বিদ্রোহ জাগেনি। তাই বলে তাঁদের কাব্য আমাদের কম প্রিয় নয়।
...
তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদেরও বিশেষত্ব আছে। নৈতিক বোধ তাঁর ভিতর দুর্বল ছিল, পরে সবল হয়েছে বলে সে তাঁর মনে এই প্রতিবাদ জেগেছে তা সত্য নয়। 'কুসুমের' কারাগারে বদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ভিতরে তেমনি বলবতী, কেননা, এই দুই-ই একই মূল থেকে উৎসারিত হচ্ছে—তাঁর ভিতরকার সেই চিরজাগ্রত রহস্যের সন্ধানপরতা থেকে।'

ওদুদ সাহেবের সঙ্গে আমরাও একমত। কবিগুরুর নিকট চিরদিনই নতুনের ডাক আসছে, আর তারই উত্তরে তিনি পুরাতনের 'জীর্ণ ঝরা ঝরিয়ে দিয়ে' সাড়া দিয়ে উঠছেন।

'কড়ি ও কোমলের' সনেটগুলি ক্ষুদ্র হলেও এক একটি সৌন্দর্যের আকর। 'যৌবন স্বপ্ন' কবিতায় তিনি বলেছেন :

আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত।
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস?
বসন্তের কুসুম কাননে গোলাপের আঁখি সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হয়ে এস, মরমের সরমে বিব্রত!
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ,
সচকিত স্বপনের মত জাগরণে পলায় সলাজে;
যেন কার আঁচলের বায় ঊষায় পরশ যায় দেহ;
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে;
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফোটে ফোটে বকুল মুকুলে;
কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোনো উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের লেখা। সুতরাং এর কবিতা গুলিতেও যৌবনসুলভ ভোগানুরাগ বর্তমান। জগতের সকল বৈচিত্র্যই এখন তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু নারী-সৌন্দর্য যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে ততটা আর কিছুই পারেনি। 'যৌবন স্বপ্ন' কবিতাটিতে কবি যৌবনের চিরন্তন রূপটিকে কি অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিরদিনই এটি যুবকদের জন্য নতুন আনন্দ বহন

করে আনবে। এ কবিতাটি শুধু কবির নিজের মনের কল্পনা নয়, সমগ্র যুবক সম্প্রদায়েরই মনের কথা। দুর্ভাগা আমরা যা প্রকাশ করতে পারছিনে—অথচ প্রাণের ভিতর আকুলি বিকুলি করছে, যে ভাবটা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ ধরা না দিয়ে 'আধেক ধরা পড়েছি গো আধেক আছে বাকি' অবস্থায় আছে, সেই কথাটা এবং সেই ভাবটাই রবীন্দ্রনাথের কলমের একটু আঁচড়ে ফুলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে।

'চুম্বন' নামক কবিতাটিও একটি ভোগের কবিতা :

অধরের কোণে যেন অধরের বাষা
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে,
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থ যাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।

দুখানি অধর হতে কুসুম চয়ন
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে
দুটি অধরে এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন।

আমরা এ কবিতাটিকে আর ভেঙেচুরে দেখাবার চেষ্টা করলাম না, কেননা, তাতে সৌন্দর্যহানি হবার আশঙ্কা আছে। সৌন্দর্য মানুষের চেহারাতেই পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ফেড়ে বিশ্লেষন করে দেখাতে হয় না। কারণ, তা করলে যা বের হয় তা হাড়গোড় নাড়িভুঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেগুলি যে কত সুন্দর তা সকলেরই জানা আছে।

'বাহু' 'অঞ্চলের বাতাস' 'দেহের মিলন' 'তনু' 'হৃদয়-আসন' 'কল্পনার সাথী' 'হাসি' প্রভৃতি এবং আরো কতকগুলি কবিতাও ভোগের কবিতা। এ গুলির সৌন্দর্য এক তাঁরাই নিবিড়ভাবে অনুভব করবেন যাঁরা একটি রঙিন মন, তথা, কবিতার রস গ্রহণ করবার একটি স্বাভাবিক শক্তি, নিয়ে এসেছেন। আর যাঁরা প্রথমেই কবিতা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন সেই হতভাগ্য অরসিকদের পক্ষে এগুলির রস আস্বাদন করবার পথ একেবারে বন্ধ। কারণ, আমাদের মনে হয়, 'ফাল্গুনীর' 'কবিশেখর যে বলেছেন, 'আমার কবিতা বুঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য', একথাটি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা।

জীবনকে ভালোবেসেছেন বলে জীবনের একটা দিক ভোগকেও তিনি অবহেলা করেননি। অবহেলা করলে হয়তো বুদ্ধিমানের কাজই করতেন; কেননা, তা হলে তিনি নিন্দা হতে মুক্তি পেতেন; কিন্তু সত্যকে ফাঁকি দেওয়া হত।

নারী-সৌন্দর্যকে আমরা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি, কিন্তু, এই নারী-সৌন্দর্য যে কীভাবে আমাদের জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলেছে সে দিকে আমরা মোটেই দৃকপাত করিনে। যখন যৌবন আমাদের দুয়ারে এসে হাজির হয় তখন রমণীর রূপ-লীলা আমাদের নিকট কতই না মোহন হয়ে দেখা দেয়।—মনে হয়, তার চলার ভঙ্গি, চোখের চাউনি, কণ্ঠের সুর, মুখের হাসি, সমস্তই আমাদের হৃদয়ের সুরের সঙ্গে বাঁধা;—মনে হয়, আমাদেরই মনের স্বপ্নময়ী রঙিন ইচ্ছাখানি তরুণী-আকারে, তন্বী-আকারে, মূর্ত হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্য-প্রিয় কবির নিকট সে যে আরো সুন্দর হয়ে দেখা দেবে তা বলা বাহুল্য। সে তাঁর 'কল্পনার সাথী', 'হৃদয়ের ধন'; আরো কত কি।

যে দেশে 'নারী নরকস্য দ্বারা', 'নারীই মানুষের সর্বপ্রকার পতনের মূল্য', এই প্রকারের নানা কথা প্রচলিত আছে সে দেশের কবিরই নারীর প্রতি এহেন অনুরাগ সাধারণের চোখে আশ্চর্য ঠেকবে বই কি। সাধারণে নারীজাতিকে মুক্তির অন্তরায় বলে মনে করে থাকে, কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ তাদিগকে মুক্তির সহায়স্বরূপ মনে করেন। নারীর সঙ্গ ব্যতীত পুরুষের কোমল বৃত্তিগুলির বিকাশ হয় না। পুরুষের অন্তরে অর্ধ চেতন অবস্থায় যে স্বপ্নলোক পড়ে আছে নারী সৌন্দর্যস্বরূপ সোণার কাঠির স্পর্শ ব্যতীত তা জাগ্রত হতে পারে না। সৌন্দর্যপ্রিয় কবির নিকট তাই নারীর এত সমাদর।

'কড়ি ও কোমলে' কবির প্রাণ বেশি কল্পনাপ্রবণ। কিন্তু, 'সোনার তরীতে' দেখতে পাই তিনি কল্পনা থেকে বাস্তবতার দিকে আকাশ থেকে নীচের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের মধ্যেও তিনি অনন্ত আনন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতে যেন সেই আনন্দই মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সেখানে এক খেয়ালী বিশ্ববিমুখ মানুষ জগতের সুখ-আনন্দ শোভা-সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে আকাশের চাঁদ হাতে পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে চলেছিল। পথে তাকে কত পথিক কত কি জিজ্ঞেস করলে; কিন্তু সবার উত্তরে তার একই কথা—আকাশের চাঁদ চাই।'

> হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ
> এই হল তার বুলি
> দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া
> কাঁদে সে দুহাত তুলি।

কিন্তু যেতে যেতে যখন তার চোখ পড়ল মানুষের দৈনন্দিন সংসারযাত্রার উপর তখন তার অন্তর কি এক অনন্ত রস-পুলকে ভরে উঠল। তখন তার নিকট মানুষের ছোট ছোট কাজ-কারবারও আর তুচ্ছ করবার জিনিষ নয়।

এমন সময়ে সহসা কি ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে,
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধু তীরে।
... ...
দেখিল চাহিয়া জীবন পূর্ণ
সুন্দর লোকালয়
প্রতি দিবসের হরষে বিষাদে
চির কল্লোলময়।
স্নেহ-সুধালয়ে গৃহের লক্ষ্মী
ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতি দিবসেরে করিছে মধুর
প্রতি দিবসের কাজে।
সকাল বিকাল দুটি ভাই আসে
ঘরের ছেলের মত,
রজনী সবারে কোলেতে লইছে
নয়ন করিয়া নত।

এমনি করে অবাক নয়নে সে চেয়ে রইল আর স্বভাব-সুন্দরী তার নয়নে এক অপরূপ রূপের অঞ্জন বুলিয়ে দিল। এমনি করে সম্পূর্ণ অনাদৃত ও অবহেলিত জিনিষের পানে চেয়েও তার অন্তর-আত্মা পুলকে ভরে উঠল। তাই—

যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহেনি কখনো ফিরে
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা
স্মৃতি-সাগরের তীরে।

'বসুন্ধরা' কবিতায় কবিগুরু 'বসন্তের আনন্দের মত' 'দিগবিদিকে আপনারে বিস্তারিয়া' দিবার আকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছেন। বিশ্ব-চেতনা আর বিশ্বানন্দের সঙ্গে নিজের অন্তরের যোগ সাধন করবার এই যে চেষ্টা এই রবিবাবুর কাব্যকে এতটা মোহন ও বরণীয় করে তুলেছে। এত সুখ, এত বৈচিত্র ও এত আনন্দ, তবু কবির স্বদেশবাসীরা বিশ্বের প্রতি এতটা বিমুখ;—এই ভাবটাই এখন তাঁকে মস্ত বড় পীড়া দিচ্ছে। তাই তিনি বলেছেন,—

হারে নিরানন্দ দেশ পরি জীর্ণ জরা
বহি বিজ্ঞতার বোঝা ভাবিতেছে মনে

ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।
লয়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্মহীন রাত্রি দিন বসি গৃহ কোণে
মিথ্যা বলে জানিয়াছ বিশ্ব বসুন্ধরা
গ্রহ-তারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।
যুগযুগান্তর ধরি পশু-পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি;
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই করনা বিশ্বাস।
লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলে খেলা।

প্রেম পূর্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান, এইসব দেবতাদেরই জন্য মানুষের জন্য নয়, এই ভাবটিরও প্রতিবাদ তিনি করেছেন—তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বৈষ্ণবের গানে'।

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান,
অভিসার প্রেমলীলা বিরহ মিলন,
বৃন্দাবন গাথা,—এই প্রণয় স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—একি শুধু দেবতার?
... ...
আমাদেরই কুটির কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে, তাহে তাঁর নাহি অসন্তোষ।
... ...
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে-প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দি দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বিশ্বের মাঝে ভগবানের লীলা চলছে। জাগতিক হর্ষ-বিষাদ-স্নেহ-প্রেমের মধ্যে তাঁরই আমরা অনুভূতি লাভ করি। বস্তুত যা পাই এবং দিই, একটু অনুধাবন

করলেই দেখতে পাব, তা ভগবানের নিকট হতেই পাই এবং তাঁকেই দিই। সুতরাং তাঁকে নিয়েই আমাদের দেওয়া নেওয়া, হর্ষ-বিষাদের খেলা চলছে;—লীলাবাদের এই মর্মোক্তিটিই এই কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

৩

সংসারের সুখঃদুখের দিকে দৃষ্টি দিলেও 'সোনার তরীর' লেখাগুলিও কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু 'নৈবেদ্যর' আমলে তিনি এমন একটি উচ্চস্তরে পা দিয়েছেন যেখান থেকে আরম্ভ হল তাঁর সাধক জীবন। আগেকার কবিতার মত এ কবিতাগুলিতে কল্পনা বিলাস ও চঞ্চলতা নেই। এগুলি ঋষি-দৃষ্ট বাণীর মতই বীর্যবন্ত এবং গম্ভীর। সাধকজীবনের লেখা হলেও এ কবিতাগুলি সাধারণ আধ্যাত্মিক কবিতার মত নয়। বিশ্বপিতার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তিনি জগতকে ভুলে জাননি। কারণ তিনি জানেন ভগবান কোনো বিশেষ আকার ধারণ করে কোনো বিশেষ স্থানে বসে নন। জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে, সর্বত্রই তিনি নিবিড় ভাবে মিশে আছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদের মধ্য দিয়ে তাঁরই লীলা চলছে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের মধ্য দিয়ে তিনি এই লীলাকেই চির-প্রবহমান রেখেছেন। 'আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি', রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এই মন্ত্রটির উপাসক। তাই তিনি জগত হতে বৈচিত্র্যকে উচ্ছেদ করে দিয়ে একের ধ্যানে নিমগ্ন হননি। বরং বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই অরূপ একের সন্ধান পেতে চেষ্টা করেছেন। আকার যে নিরাকারেরই আকার এবং রূপ যে অরূপেরই রূপ এই ধারণা তাঁর অন্তরে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। 'আকার এঁকে এঁকে চলছে নিরাকার' এবং 'রূপের মাঝে অরূপ বীণা লুকিয়ে বাজে', এই দুটি লাইনেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিশ্বের সাথে যে ভগবানের যোগ আছে, এবং বিশ্ব-পরিচয়ের মধ্য দিয়েই যে ভগবানের পরিচয় পাওয়া যায় 'নৈবেদ্যের' নিম্নলিখিত কবিতাটাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।—

> নির্জন শয়ন-মাঝে কালি রাত্রিবেলা
> ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
> গত জীবনের কত কথা। হেন ক্ষণে
> শুনিলাম, তুমি কহিতেছ মোর মনে;—
> ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্ম-ভোলা,
> রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা,
> চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক
> যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখ শোক,
> যত ভালো মন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
> বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।

সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্য বার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।

নানারূপ, নানা আকার, নানা দুঃখসুখের অনুভূতির ভিতর দিয়েই ভগবান মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। তিনি আনন্দরূপে নিজেকে সতত প্রকাশিত করে রেখেছেন; একবার হৃদয় খুলে বরণ করে নিলেই হল। 'ধর্মের' 'আনন্দরূপ' নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলছেন :

সত্যং জ্ঞানমনন্তম। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কৈ? এই যে দশ দিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনিও লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্য্যের অন্ত কোথায়, সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলি নতুন নতুন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে ফুরায় না।...
ধন্য হইলাম—আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম-পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য্য অপরিমেয় প্রাচুর্য্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধুলির সঙ্গে, তৃণের সঙ্গে, কীট পতঙ্গের সঙ্গে, গ্রহ তারা সূর্য চন্দ্রের সঙ্গে, আমরা হইলাম।

উপরের কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আলোছায়া, সন্ধ্যা-প্রভাত এবং ঋতু-পর্যায়ের ভিতর দিয়ে ভগবানের আগমনবার্তা শুনতে পেয়ে তিনি পুলকিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর গানে ও কবিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।
গাছের পাতায় আলো নাচ্‌তে দেখে তিনিবলেছেন :

এইতো তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়-হরণ,
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোণার বরণ।

ভোরের বেলায় তিনি বলেছেন,—

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে গেছ হেসে।

সন্ধ্যায় বলেছেন—

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ
তোমায় করিগো নমস্কার

মম অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ
তোমায় করিগো নমস্কার।

ফাল্গুনে বলেছেন—

বসে ছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।

ঝড়ের রাতে বলেছেন- -

ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

শরতে গেয়েছেন-

শরতে আজ কোন অতিথি
' এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গারে হৃদয়
আনন্দ গান গারে।

এমনি করে খুব কম কবিই বিশ্বের সকল কিছুতে ভগবৎসত্তার সন্ধান লাভ করতে পেরেছেন। বিশ্ব-প্রীতি তাঁর অন্তরে এক মহান পুলকের সঞ্চার করে তাঁকে বৈরাগ্য-বিরোধ করে তুলেছে। তাই 'নৈবেদ্যে' দেখতে পাই—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

ইসলামধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদ ব্যতীত পূর্বে আর কারো মুখ দিয়ে এ হেন মহাবাণী প্রকাশ পায়নি। ইসলামের এই দিকটা রবীন্দ্রনাথের জীবনে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তবিক, শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে জপ তপ ধ্যান ধারণা করলেই যে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায় এ ধারণা মানুষের জীবনে এক মহা অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে। ভগবৎ-লাভ এত সোজা ব্যাপার নয়। কর্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হবে। ভগবান যে উদ্দেশ্যে আমাদের এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে। জগতেরও আমাদের নিকট কিছু পাওনা আছে, সে পাওনা হতে রেহাই পেতে হবে। নইলে মুক্তি নেই। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সন্ন্যাসীর জীবনে তাই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। মুক্তি কখনো ক্লীবতা ও নির্জীবতার দ্বারা আসতে পারে না। সে জন্য জাগ্রত সাধনা চাই। মানবকল্যাণে ও বিশ্বহিতে আপনার শক্তি নিয়োগ করা চাই। কর্ম মুক্তির অন্তরায় নয় বরং সহায়স্বরূপ।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বার মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার পরে।
মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখোরে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধূলা বালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

কর্মকুণ্ঠ বাঙালির জাতীয় জাগরণী-গান হওয়া উচিত এটি।

নির্জীব আলস্যপরায়ণ বাঙালি জাতির অন্তরে কর্ম ও জীবনের সাড়া আনবার জন্যও তিনি অনেক গেয়েছেন। বাঙালি জীবনে বৈচিত্র্যহীনতা দেখে তিনি দুঃখিত। তাই এ জাতিকে জাগাবার জন্য তিনি বঙ্গমাতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

পূণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি! তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিওনা ধরে।
দেশ দেশান্তর মাঝে যার সেখা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়োনা ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে!
সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।

দেশবাসীকে এমনি জীবনের বেগে চঞ্চল করে তুলতে তিনি চেয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাপী এই বহুভঙ্গিম জাগরণের সাড়া যে কতকটা রবীন্দ্র কাব্য প্রেরণারই ফল তা বলা বাহুল্য।

এই বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের সত্তাকে বেমালুম বিস্তৃত করে দিবার ইচ্ছাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য যা অন্য কবি থেকে তাঁকে পৃথক করেছে। বহু কবিতায় তিনি নানা দেশ, নানা কাল ও নানা ধর্মের মানুষের সঙ্গে আত্মীয় রূপে বাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় তাঁর এই ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠেছে, তাতে বিশ্বমানবের সাথে মিলনের সাধটি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

> হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
> মানবহৃদয়ে মিশিতে
> নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
> চলিতে দিবস নিশীথে।
> আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,
> জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
> একটি বিন্দু জীবন অমৃত
> কেগো দিবে এই তৃষিতে।

'গীতাঞ্জলিতে'-ও এর সমভাবের একটি গান আছে—

> আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
> বিশাল ভবে
> প্রাণের রথে বাহির হতে
> পারব কবে।
> প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
> ফিরব ধেয়ে সকল কাজে,
> হাটের পথে সব্বার সাথে
> মিলন হবে।
> প্রাণের রথে বাহির হতে
> পারব কবে।

এমনি গভীর প্রাণের টান নিয়েই তিনি বিশ্বলীলায় যোগ দিয়েছেন এবং শেষে এই বিশ্বলীলার ভিতরেই ভগবানের সন্ধান লাভ করে ধন্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন একখানি সুগীত সংগীতের মত। ওস্তাদ যেমন তা-না-না থেকে আরম্ভ করে মাঝখানে গমক গিটকিরী এবং মীড়ের ছড়াছড়ি করে সমে এসে পৌছোন; রবীন্দ্রনাথও তেমনি ছেলেবেলার খেলাধূলা থেকে আরম্ভ করে কৈশোর ও যৌবনের

ভোগবিলাসিকতার ভিতর দিয়ে এমন একটি স্থানে এসে পৌঁছেছেন যেখান থেকে তাঁর বীণায় বেজে উঠেছে বিরাট একের সুর। কৈশোর ও যৌবনের দাবীগুলি পূর্ণ নাকরলে তাঁর জীবনে এ ধরনের সম্পূর্ণতা আসত কিনা সন্দেহ। কবিগুরুর জীবনে এক অপূর্ব ক্রমোন্নতি দেখতে পাওয়া যায় যায় অন্যান্য কবির জীবনে খুব বিরল; —তিনি যেন ক্রমশঃই প্রাণ থেকে মনে এবং মন থেকে আত্মার উন্নতি লাভ করচেন। তাই তাঁর কাব্য এতটা স স্পূর্ণ এত সুন্দর।

৪

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যকে জীবনে কিরূপ স্থান দেন, এ প্রবন্ধে আমরা তাই আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি যে তিনি কখনো বৈরাগ্যের ভক্ত নন। তিনি সৌন্দর্য ও আনন্দ-বাদী সাধক। সৌন্দর্য ও আনন্দ সংযম ছাড়া লাভ করা যায় না। কিন্তু এ সংযম সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করা নয়, জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সংহত করা মাত্র। তাই তাঁর জীবনে সাধারণ সংসার বিরাগী সুলভ ক্লীবতা ও নির্জীবতা না দেখে অনেকে তাঁর সৌন্দর্য রসাত্মক আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রায়ই বিদ্রূপোক্তি প্রকাশ করে থাকে। তারই প্রত্যুত্তের যেন 'যৌবন-বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' কবিতায় তিনি বলেছেন—

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী!
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়-মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উত্তরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোরগোলাপে গোলাপে জাগে বাণী;
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল কোলাহল আনি
মোর গান হানি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খল খল উঠে অট্ট হাসি,
দেখে মোর সাজ।
হেন কালে মধু মাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সে দিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্য মাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

বাস্তবিক পৃথিবী ব্যাপী যে চির-বিবাহ্-উৎসব, যে চিরন্তন মিলন-মেলা চলেছে সেখানেই তো কবির আসন-সেখানেই তো তিনি পরম বিলাসে 'পুষ্পের মত সংগীতগুলি আকাশ ভালে' ফুটিয়ে তুল্‌বেন। রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য-বিরোধী, কিন্তু তাই বলে তিনি অতিরিক্ত সাংসারিক নন। অতিরিক্ত সাংসারিকতা, যা দেখে Wordsworth বলেছেন 'The world is too much with us' তা যে আধ্যাত্মিকতার পথে বিঘ্নস্বরূপ এ কথা তিনিও বিশ্বাস করেন। তাঁর জীবনে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমন্বয় হয়েছে। এই সমন্বয়ের ফলেই তিনি এই জগতকে স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত দেখেচেন। তাই 'বলাকায়' তিনি বলেছেন—

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটির মায়ের কোলে
বাতাসে তার খবর ছোটে আনন্দ কল্লোলে।

উপসংহারে বলতে চাই, যদিও তিনি এই দৈনন্দিন জীবনের দুঃখসুখময় বিচিত্র ভোগের মধ্য থেকে রস সংগ্রহ্ করে মানসিক পরিপুষ্টি লাভ করেছেন, তথাপি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে ঊর্ধে—অতি ঊর্ধে—এক অচিন্তনীয় অতীন্দ্রিয় চিন্ময় জগতের দিকে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও নগণ্য বস্তুর মধ্যে অনন্তের কম্পন অনুভব করে তাঁর অন্তর-আত্মা অসীমের পানে অভিসারী হয়েছে। তাই Wordsworth-র ভাষায় তাঁকে সম্বোধন করে বলতে ইচ্ছা করছে—

Type of the wise that soar but never roam,
True to the kindred points of heaven and home.

‘শিখা’ পত্রিকা ও ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’

প্রায় দুশো বছরের (উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী) সাময়িকপত্রের ইতিহাসে ‘শিখা’ বার্ষিক পত্রিকাটি একটি অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা মাসিকপত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান-সম্পাদিত ‘দিগদর্শন’ আত্মপ্রকাশ করে। বাঙালি-মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা (আসলে দ্বিভাষিক—বাংলা ও ফারসি) ‘সমাচার সভারাজেন্দ্র’ ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়। মুসলমান-সম্পাদিত সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা সম্ভবত মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)—সম্পাদিত ‘আজীজন নেহার’, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। উনবিংশ শতাব্দীর অজস্র পত্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে নায়কত্ব দিয়েছিল অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬)-সম্পাদিত ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ (১৮৪৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-৯১)-সম্পাদিত ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ (১৮৫১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)-সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭২) প্রভৃতি। মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘নব সুধাকর’ (১৮৮৬ ?), শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘সুধাকর’ (১৮৮৯), শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত ‘মিহির ও সুধাকর’ (১৮৯৫) প্রভৃতি পত্রিকা দিন অনেকখানি সংবাদবাহী। মুসলমানদের চিন্তাবাহী পত্রিকা দেখা দিল আরো পরে—মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০)-সম্পাদিত ‘কোহিনূর’ (১৮৯৮/১৯০৩/১৯১১), মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ-সম্পাদিত ‘ইসলাম প্রচারক’ (১৮৯৯), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬) সম্পাদিত ‘নবনূর’, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৮৬-১৯৬৮)-সম্পাদিত ‘আল-এসলাম’ (১৯১৫) প্রভৃতি।

সাময়িকপত্রের ধারাবাহী ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক অপরিসীম গুরুত্ববহ। প্রথমত, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যের সূচনা এই দশকে; দ্বিতীয়ত, নজরুল ইসলাম-কেন্দ্রিত বাঙালি-মুসলমানের জাগরণ এই দশকে; তৃতীয়ত, কলকাতার মতো ঢাকা থেকেও এই সময়ে বেশ কয়েকটি সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়। বিশের দশকে তরঙ্গে-প্রতিতরঙ্গে উন্মুখর পত্রপত্রিকার একটি তালিকা পেশ করা যাক এখানে।

১৯২০ : ‘বিজলী’ (পাক্ষিক)—সম্পাদক: নলিনীকান্ত সরকার
১৯২০ : ‘মোসলেম ভারত’ (মাসিক)—সম্পাদক : মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর)
১৯২২ : ‘ধূমকেতু’ (অর্ধ-সাপ্তাহিক)—সম্পাদক ; কাজী নজরুল ইসলাম
১৯২২ : ‘আত্মশক্তি’ (সাপ্তাহিক)
১৯২২ : ‘বঙ্গবাণী’

১৯২৩ 'কল্লোল' (মাসিক)—সম্পাদক : দীনেশরঞ্জন দাশ
১৯২৩ 'সাম্যবাদী' (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
১৯২৫ 'লাঙল' (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক: কাজী নজরুল ইসলাম
১৯২৫ 'উত্তরা'—সম্পাদক : সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
১৯২৫ 'অভিযান' (মাসিক)—সম্পাদক: মোহাম্মদ কাসেম
১৯২৬ 'বিজলী' (মাসিক)—সম্পাদক : করীত কুমার ঘোষ
১৯২৬ 'কালিকলম' (মাসিক)—সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র / শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় / মুরলীধর বসু
১৯২৬ 'সওগাত' (মাসিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
১৯২৬ 'সওগাত' (বার্ষিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
১৯২৬ 'গণবাণী' (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মুজফফর আহমদ
১৯২৭ 'বিচিত্রা' (মাসিক)—সম্পাদক : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১৯২৭ 'প্রগতি' (মাসিক)—সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত
১৯২৭ 'শনিবারের চিঠি' (মাসিক)—সম্পাদক: সজনীকান্ত দাস
১৯২৭ 'সাহিত্যিক' (মাসিক)—সম্পাদক : এয়াকুব আলী চৌধুরী / গোলাম মোস্তফা
১৯২৭ : 'শিখা' (বার্ষিক)—সম্পাদক : আবুল হুসেন
১৯২৭ : 'নওরোজ' (মাসিক)—সম্পাদক : আফজাল-উল-হক
১৯২৭ : 'মাসিক মোহাম্মদী' (মাসিক)—সম্পাদক : মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
১৯২৮ : 'রূপছায়া'
১৯২৮ : 'মহাকাল'
১৯২৮ : 'রবিবারের লাঠি'
১৯২৮ : 'মোয়াজ্জিন' (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : সৈয়দ আবদুর রব
১৯২৮ : 'সওগাত' (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
১৯২৯ : 'বিদূষক'
১৯৩০ : 'জয়তী' (মাসিক)—সম্পাদক : আবদুল কাদির

এই বিশের দশকের পত্রপত্রিকার প্রধান ধারা ছিল রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার ধারা—এর প্রধান বাহন ছিল 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'-'ধূপছায়া' ইত্যাদি। দ্বিতীয় ধারাটি ছিল নবোত্থিত বাঙালি-মুসলমানের প্রথম আধুনিকতায় জাগৃত্তির চিহ্নবাহী। প্রায় এক দৈব ঘটনার মতোই মনে হয় আজ যে কাজী নজরুল ইসলাম এই দুই স্রোতেরই কেন্দ্রনায়ক ছিলেন। বস্তুত বাঙালি-মুসলমানের আধুনিকতার প্রথম সৃষ্টিকাল যদি হয় ১৮৭০-১৯২০, তাহলে বিশের দশক তার নবজাগরণের সত্যিকার সূচনা-দশক। প্রায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এর আরম্ভ বিশের দশকে এ চূড়াস্পর্শ করে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'-র একটি বড় ভূমিকা ছিল এই জাগরণের ক্ষেত্রে—এবং সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য সমিতি'র। কলকাতায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে জাগ্রত ঐ

সমিতির কার্যক্রম ছিল ব্যাপক। ঢাকা-র 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র ভূমিকা ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট কিন্তু তীব্র। কলকাতার মুসলিম-সম্পাদিত সাহিত্যপত্রগুলি ছিল মূলত সৃষ্টিশীল; ঢাকার 'শিখা' পত্রিকা মননের ভূমিকা পালন করেছে। সৃষ্টি ও মননের এই যুগ্মধারা প্রবাহিত হয়ে বাঙালি-মুসলমানের জাগরণকে বাংলার জাগরণের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে।

'শিখা' বার্ষিক পত্রিকা হিসেবে পাঁচ বছর বেরিয়েছিল। ১৯২৭-৩১ খ্রিষ্টাব্দে বছর বছর। সব সময়ই উল্লেখ থাকত : 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মুখপত্র।

প্রথম বর্ষের সম্পাদক ছিলেন আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮); প্রকাশকাল ১৩৩৩, [১৯২৭] ; প্রকাশক আবদুল কাদের [কাদির], মুসলিম হল, ঢাকা। ঢাকা সাত রওজা ইসলামিক প্রেসে মুন্সি আহমদ আলি দ্বারা মুদ্রিত। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+১২৪+১২। প্রকাশকাল ১৩৩৩। মূল্য : আট আনা। 'সর্বস্বত্ব সমাজের জন্য সংরক্ষিত' কথাটি নামপৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছিল। প্রথম বৎসরের কর্মী সংসদের নাম মুদ্রিত ছিল :

১. এ.এফ.এম. আবদুল হক (মুসলিম হল)
২. এ.জে. নূর আহমদ (ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ)
৩. আনোয়ার হোসেন (ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ)
৪. আবদুল কাদের [কাদির] (ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ)
৫. আবুল হুসেন এম-এ, বি-এল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

'প্রকাশকের নিবেদনে' বলা হয়েছিল :

আমাদের সম্পাদক সাহেব তাঁর কার্য বিবরণীতে বলেছেন যে এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 'চিন্তাচর্চা করা'। সত্যই পরিপুর্ণ চিন্তাই সাহিত্যের খোরাক জোগায়। আজ এক বৎসর চিন্তা চর্চার ফলে আমার এই 'শিখা' প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন-সাধন। শিখার প্রথম সংখ্যায় আমরা যে প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশ করেছি তার প্রত্যেকটি সমাজের দারুণ অভাবের এক একটি দিক লক্ষ্য করে লিখতে হয়েছে। (সবগুলিই সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মিলনে পঠিত হয়েছিল।) কিন্তু আমরা মনে করি, সমাজের প্রকৃত সাহিত্যবর্গের কেহই সেই অপ্রিয় সত্য হজম করতে নারাজ হবেন না—কারণ নিতান্ত আত্মীয় যে সেই তো আঘাত দিতে পারে। এই প্রবন্ধগুলি কাহারো কাহারো নিতান্ত নীরস মনে হবে—বিশেষত যখন তাঁরা দেখবেন এ সংখ্যায় কোনো হালকা গল্প বা মিষ্টি কবিতা নাই। সেজন্য পাঠকবর্গের নিকট ত্রুটি স্বীকার করি, কেননা আমাদের দুস্থ সমাজের বর্তমান অবস্থা চিন্তা করলে আনন্দের হাসির পরিবর্তে বেদনার অশ্রুতে জীবন ভরে ওঠে। আশা করি, সমাজের সারথিগণ আমাদের এই মনোভাবের প্রতি একটু দরদের দৃষ্টি দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

আজ শিখা নানা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে বের হয়েছে। নানা কারণে ইহা সর্বাঙ্গ সুন্দর করা যায় নাই। আমরা কায়মনে প্রার্থনা করি ভবিষ্যতের সমাজের অধিকতর উদ্যোগী কর্মীসংসদ ইহাকে সর্বতোভাবে সুন্দর ও শ্রীসম্পন্ন করে তুলবেন।

'বার্ষিক বিবরণী'তে সম্পাদক আবুল হুসেন জানিয়েছিলেন, '... স্নেহাস্পদ শ্রীমান আবদুল কাদির প্রমুখ আমাদের কতিপয় নবীন সাহিত্যপ্রাণ বন্ধু মিলে গত বৎসর ১৯শে জানুয়ারী শ্রদ্ধাস্পদ মৌ. মুহম্মদ শহীদল্লাহ সাহেবের পৌরহিত্যে এই সাহিত্য সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তার ১১ দিন পরে এই শিশু সমাজের জাতক্রিয়ার পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন কুলীন ব্রাহ্মণ—আমাদের চুলপাকা নবীন গল্পনিপুণ চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।' 'শিখা' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ সালের ৮ এপ্রিল। সম্পাদকের বিবরণ অনুসারে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারীর 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র ভিত্তিপত্তন হয়েছিলো। প্রথম বছরের কয়েকটি অধিবেশনে আটটি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল :

১. রবীন্দ্র-কাব্যের স্বরূপ : এম. তাহেরুদ্দিন
২. শতকরা পঁয়তাল্লিশ : আবুল হুসেন
৩. সম্মোহিত মুসলমান : কাজী আবুল ওদুদ
৪. বাহাই ধর্ম : আবুল ফজল
৫. সাহিত্যে সৃষ্টি : হেমন্তকুমার সরকার
৬. হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটি দিক : আনোয়ারুল কাদির
৭. ইমদাদুল হক স্মরণে : কাজী আবদুল ওদুদ
৮. বাংলা বাঙালি-মুসলমানের শিক্ষার বাহন : খোন্দকার ফয়জুদ্দীন ও আবুল হুসেন

তৃতীয় অধিবেশনে কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সপ্তম অধিবেশন স্বামী প্রজ্ঞানন্দের মৃত্যুসংবাদে স্থগিত করা হয়েছিল—এই অধিবেশনে আনোয়ারুল কাদিরের প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি।

'রবীন্দ্র-কাব্যের স্বরূপ' প্রবন্ধটি যে-সভায় পঠিত হয়েছিল, সেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন খান সাহেব আবদুর রহমান খাঁ (১৮৯০-১৯৬৪)। আর আলোচক ছিলেন আনোয়ার হুসেন, এ. জেড. এম নূর আহমদ, মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ, কাজী আবদুল ওদুদ, মুহম্মদ ইসমাইল ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাজী ইমদাদুল হকের স্মৃতিসভায় নিবেদিত কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল। কাজী আবদুল ওদুদ পড়েছিলেন 'ইমদাদুল হক স্মরণে' প্রবন্ধ [এই প্রবন্ধটি কাজী আবদুল ওদুদের নবপর্যায় (প্রথম খন্ড, ১৯২৬) এতে অন্তর্ভূক্ত হয়।] এবং এম. তাহেরুদ্দীন পড়েছিলেন 'স্মৃতি-তর্পণ'। 'এই শোকসভার শেষভাগে বাংলা বাঙালি-মুসলমানের শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত' এই কথার আলোচনা শুরু হয়। মৌ. মু: শহীদুল্লাহ সাহেব একথা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলে মৌ. খোন্দকার ফয়জুদ্দীন সাহেব উহা সমর্থন করতে গিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি সন্দর্ভ পড়েন। তারপর স্যার আবদুর রহিমের উক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার ভয়েই হোক বা তাঁর উক্তির প্রতি শ্রদ্ধা করেই হোক সমবেত ভদ্রমন্ডলীর মধ্যে এ সম্বন্ধে একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়। তখন অগত্যা সভা ভেঙে দেওয়া হয়।'

সরকার যে-সভায় 'সাহিত্যে সৃষ্টি' প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, সেখানে উপস্থিত ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি গান নজরুল সেদিন গেয়েছিলেন।

'বাহাই ধর্ম' যে-সভায় পঠিত হয়েছিলো, সেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন আবদুর রহমান খাঁ। ছয়জন লোক প্রবন্ধটি আলোচনা করেছিলেন।

১৯২৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী রোববার 'মুসলিম সাহিত্য সামাজে'র প্রথম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম হল মিলনায়তনে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি সোমবার সকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠান বিস্তৃত হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেছিলেন এ. এফ. রহমান, সম্মিলনের মূল সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ। এই বার্ষিক সভায় প্রবন্ধ পড়েছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ ('সাহিত্য সমস্যা'), কাজী মোতাহার হোসেন ('সংগীতচর্চায় মুসলমান'), কাজী আনোয়ারুল কাদির ('সামাজিক গলদ'), রকীবুদ্দীন আহমদ ('আর্থিক সমস্যা'), শামসুল হুদা ('হজরত মুহম্মদের প্রতিভা'), আবদুর রশীদ ('আমাদের নবজাগরণ ও শরীয়ত'), আবুল হুসেন ('শিক্ষা সমস্যা'), আবদুস সালাম খাঁ ('নাট্যাভিনয় ও মুসলিম সমাজ') প্রমুখ। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের'র তরফ থেকে তাঁদের এই প্রথম বার্ষিক উৎসবে কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতা থেকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। নজরুল ইসলাম প্রথম দিন 'খোশ আমদেদ' নামে স্বরচিত গান গেয়েছিলেন এবং 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, দ্বিতীয় দিনে গান গেয়েছিলেন।

এখানে 'শিখা' পত্রিকার প্রথম বর্ষের পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র উদ্বৃত হল।

দ্বিতীয় বর্ষের 'শিখা'-র সম্পাদক ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১); প্রকাশকাল ১৯২৮ ; প্রকাশক সৈয়দ ইমামুল হোসেন (ম্যানেজার, মর্ডান লাইব্রেরী, ৭৪ নবাবপুর, ঢাকা); মূল্য : আট আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ + ১৩০। দ্বিতীয় বর্ষের কর্মী পরিষদ :

১. আবদুস সালাম খাঁ
২. এ. এম. তাহেরুদ্দীন
৩. বিলায়েৎ আলী খাঁ
৪. খান মুহম্মদ আতাউর রহমান
৫. গোলাম আহাম্মদ
৬. আবদুল কাদির
৭. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
৮. কাজী মোতাহার হোসেন।

দ্বিতীয় বর্ষেও নজরুল ইসলাম আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, এবং উদ্বোধনী সংগীত গেয়েলিনে। দ্বিতীয় বর্ষের পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র :—

দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণীতে বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের উল্লেখ ছিল। প্রাবন্ধিকগণ ছিলেন আবুল হুসেন ('আদেশের নিগ্রহ'), কাজী মোতাহার হোসেন ('আনন্দ ও মুসলমান-গৃহ'), আবদুর রশীদ ('মুক্তির আগ্রহ বনাম আদেশের নিগ্রহ'), আবদুল কাদির ('পল্লীসংগীতে লীলাবাদ'), আবুল হুসেন ('বাঙালি-মুসলমানের ভবিষ্যৎ') প্রভৃতি। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের'র বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধ 'সওগাত' ও 'জাগরণ' পতিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে দ্বিতীয় বর্ষের 'শিখা'-র সূচিপত্রেই উল্লেখিত

হয়েছিল : আবদুর রশীদের 'মুর নির্বাসন', মিসেস ফাতেমা খানমের 'প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান', খুরশীদ জাহাঁ বেগমের 'নারীর কথা', মোখলেস উদ্দীন খাঁ-র 'বাংলার পীর পুজা', আনোয়ার হুসেনের 'কৃষি সমস্যা' প্রভৃতি।

'শিখা' তৃতীয় বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে, সম্পাদক কাজী মোতাহার হোসেন, প্রকাশক সৈয়দ ইমামুল হোসেন, মূল্য এক টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ + ১৪৪। তৃতীয় বর্ষের সম্পূর্ণ সূচিগত উদ্বৃত হল।---

১. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
২. সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ : আবুল মুজফফর আহমদ
৩. তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী
৪. আব্বাসীয় যুগ : কাজী আকরম হোসেন
৫. মুসলিম সাহিত্য সমাজ : মোহিতলাল মজুমদার
৬. দারার ধর্মমত : কালিকারঞ্জন কানুনগো
৭. ইউরোপীয় সভ্যতার মুসলিম স্মৃতি : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
৮. ইউরোপে শিক্ষার আদর্শের ক্রমবিকাশ : খানসাহেব আবদুর রহমান খাঁ
৯. কোরানে মানবের স্থান ও অর্থনীতি : খানবাহাদুর কমরুদ্দীন আহমদ
১০. ফিকাহর উদ্ভব ও পরিণতি : মোতাহার আহমদ সিদ্দিকী
১১. চলার কথা : আকবর উদ্দিন
১২. আরবি ভাষা ও কাব্য : মি: ফসীহ
১৩. দার্শনিক ইবনে রোশদ : মমতাজউদ্দিন আহমদ
১৪. ইসলাম ও শরীরচর্চা : বিলায়েত আলি খাঁ
১৫. মানবপ্রগতি ও মুক্তবদ্ধি : নাজিরুল ইসলাম
১৬. কুসংস্কারের একটি দিক : শামসুল হুদা
১৭. ময়মনসিংহের গীত : মোসলেমউদ্দীন খাঁ
১৮. আরবী কাব্য : মোহাম্মদ কাসেম
১৯. ধর্ম ও সমাজ : কাজী মোতাহার হোসেন
২০. বাংলা সাহিত্যের চর্চা : কাজী আবদুল ওদুদ
২১. স্যার সৈয়দ আহমদ : আবুল হুসেন
২২. তরুণ আন্দোলনের গতি : আবুল ফজল
২৩. Muslim literary conference : My Impression--
K. C. Mookherjee (Reprinted from 'East Bengal Times')
২৪. পরিশিষ্ট।

তৃতীয় বর্ষের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রবন্ধ পড়েছিলেন অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো ('হিন্দি সাহিত্য ও মুসলমান'), আবুল হুসেন ('বাঙালি-মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা'), নাজিরুল ইসলাম ('নারী-সমস্যা'), আবদুল গনি ('পর্দা প্রথা'), আবদুল কাদির ('পল্লীগানে বৌদ্ধ প্রভাব') প্রমুখ। তৃতীয় অধিবেশনে সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৯) জীবন-কথা বিশেষভাবে পর্যালোচিত হয়। একটি অধিবেশনে বিলেত গমনের

প্রাক্কালে মিস ফজিলতননেসা-কে (১৮৯৯-১৯৭৭) অভিনন্দন জানানো হয় ; আর একটি অধিবেশনে ইউরোপ-প্রত্যাগত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে (১৮৮৫-১৯৬৯)।

চতুর্থ বৎসরের বিভিন্ন অধিবেশনের প্রাবন্ধিকগণ ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন ('সাহিত্যিকের সাধনা'), মোহাম্মদ কাসেম ('স্বভাবকবি ইমরুল কায়েস'), আনোয়ার হোসেন ('ঢাকার বাহিরে কয়েকদিন'), মোসলেমউদ্দিন খান ('একেই কি বলে ইসলাম') প্রমুখ। এই চতুর্থ বৎসরে আবুল হুসেন শিখা-গোষ্ঠির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। চতুর্থ বৎসরের সূচিপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ হস্তগত হয়নি বলে প্রকাশ করা যায়নি : অধ্যাপক পরিমলকুমার ঘোষের 'অতি আধুনিক সাহিত্য', অধ্যাপক আবদুস সাদেকের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো' ও আবদুস সালামের 'ভারতীয় মুসলমানের রাজনীতি'। চতুর্থ বর্ষ 'শিখা'-র প্রকাশকাল ১৩৩৭ [১৯৩০], সম্পাদক মোহম্মদ আবদুর রশীদ, প্রকাশক সৈয়দ ইমামুল হোসেন, দাম আট আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪+৮৪। পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র :

১. অভ্যর্থনা : ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
২. অভিভাষণ : খানবাহাদুর নাসির উদ্দিন আহমদ
[এই অভিভাষণের নির্বাচিত অংশ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'জয়তী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩৭ সংখ্যায় পূর্নমূদ্রিত হয়েছিল। 'যুক্তিবাদ ও ইসলাম' নামে।]
৩. সম্পাদকের কথা
৪. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে জগৎ ও জীবন : উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫. প্রাচ্য ও প্রতীচ্য : কামালউদ্‌দীন
৬. তরুণের দায়িত্ব : ফাতেমা খানম
৭. ধর্ম ও শিক্ষা : কাজী মোতাহার হোসেন
৮. বর্তমান বাংলার মহিলা ঔপন্যাসিক : করুণাকণা গুপ্তা
৯. গ্যেটে : কাজী আবদুল ওদুদ
১০. সাহিত্যে শুচিতা : প্রিন্সিপাল সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
১১. ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান-আইন : আবুল হুসেন
১২. মুসলিম জাগরণ : নাজির উদ্দিন মাহমদ।

'শিখা' পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৮ [১৯৩১] এ, সম্পাদক আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩), সৈয়দ ইমামুল হোসেন, দাম বারো আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ + ১২৮। পঞ্চম বৎসরে পাঁচটি সভা মন্দর হয়। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সভাপতিত্বে কাজী মোতাহার হোসেন ও মোক্তার আহমদ সিদ্দিকী দুটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন, দুটিই শিরোনাম 'মানুষ মোহাম্মদ'। [কাজী মোতাহার হোসেনের 'মানুষ মোহাম্মদ' প্রবন্ধটি 'জয়তী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।] ঐ অনুষ্ঠানের আলোচক ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেন। কাজী আবদুল ওদুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ পড়েছিলেন কামালউদ্‌দীন, বিষয় 'অর্থনৈতিক কলহ', আলোচক ছিলেন আবদুস সালাম, আলী নূর, মোসলেমউদ্দীন খাঁ, আমিনউদ্দিন, বিলায়েৎ উদ্দিন খাঁ, নাজিরউদ্দীন ও আবদুর রশীদ। তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় খান সাহেব আবদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে। ঐ অনুষ্ঠানে আবদুস সালাম খান প্রবন্ধ পড়েন

'সেভিং ব্যাংকের সুদ' এবং এ. জেড. নূর আহমদ 'মুসলিম জগতে লাইব্রেরী'। ঐদিন আলোচক ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, হাবীবুল্লাহ, আবদুর রব চৌধুরী, নূরুজ্জামান খান, নাজিরউদ্দিন, মোসলেমউদ্দিন খান প্রমুখ। কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে পঞ্চম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। মোতাহার হোসেন চৌধুরীর 'আমাদের দৈন্য' প্রবন্ধটি ঐ অনুষ্ঠানে তাঁর অনুপস্থিতিতে পড়ে শোনান আলী নূর। আলোচক ছিলেন কামালউদ্‌দীন, কাজী আবদুল ওদুদ, নাজির উদ্দীন প্রমুখ। 'সাহিত্য সমাজে'র চতুর্থ অধিবেশন হয়েছিল অন্যরকম—'মীর মুশায়েরা'র আয়োজন—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। কবিতা, রসরচনা, নাটিকা ইত্যাদি পঠিত হয়েছিল, গান তো ছিলোই। পঞ্চম বর্ষ 'শিখা'-র সম্পূর্ণ সূচিপত্র :

'শিখা' পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যা বেরিয়েছিল পর-পর পাঁচ বছর– ১৯২৭, ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০ এবং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। আরো পাঁচ বছর—১৯৩২-৩৬—'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সক্রিয় ছিল ; কিন্তু পত্রিকা বের করতে পারেনি আর। একটানা কেউ পাঁচ বছর সম্পাদক থাকেননি, তা থেকে বোঝা যায় 'শিখা' পত্রিকা ছিল একটি গোষ্ঠির। পাঁচটি সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন (দু-বার), মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ও আবুল ফজল। প্রথম বছরের প্রকাশক হিসেবে উল্লিখিত হয়েছিলেন আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪)। সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে অবতীর্ণ না হয়ে সবসময় নেপথ্যে থেকেছেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। [আবদুর রব চৌধুরী ও হাকিম হাকিম হবিবর রহমানের অভিভাষণ দুটির নির্বাচিত অংশ 'জয়তী' পত্রিকার ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩৭ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। আবুল হুসেনের 'আমাদের রাজনীতি' প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গ পাঠ

বরং পাওয়া যাবে 'জয়তী' পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই। আবদুল ওহাবের 'পাটের কথা' প্রবন্ধটিও 'জয়তী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।]

নবাব আবদুল লতিফ-প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম লিটারারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে; আর আবুল হুসেন-কাজী আবদুল ওদুদ প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বিংশ শতাব্দীতে। প্রথমটির কার্যক্রম চলত ইংরেজিতে, দ্বিতীয়টির বাংলায়। কিন্তু দুয়েরই লক্ষ্য ছিল বাঙালি-মুসলমানের জাগরণ-উন্নয়ন। মুসলমান সমাজ যে ইতোমধ্যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' তারই সাক্ষ্য দেবে। মাত্র এক দশক-ধরে এর কার্যক্রম চললেও এবং মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ করলেও বাঙালি-মুসলমান সমাজে এবং সমগ্র বাঙালি সমাজে এর প্রভাব বহুদূর প্রভাবীপ্রসারী। কালই তা প্রমাণ করেছে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় বাংলাভাষায় চর্চা করার ক্ষেত্রে 'শিখা' পত্রিকা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকার পূর্বগামী।

আনুষঙ্গিক একটি পত্রিকা : 'জয়তী'

'জয়তী' ছিল প্রকৃতার্থে লিটল ম্যাগাজিন। লেখকের নিজের টাকায় বেরিয়েছিল। আব্দুল কাদিরের সমসাময়িক এবং 'জয়তী'র নিয়মিত লেখক আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩) তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, কী অমানুষিক কষ্ট করে আবদুল কাদির তাঁর পত্রিকাটি চালিয়ে গিয়েছিলেন। চলেওনি বেশিদিন। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, চলেছিল বছর দুয়েক। মাসিক পত্রিকা হিসেবে বেরিয়েছিল। কিন্তু, লিটল ম্যাগাজিনে হয় যেমন, নিয়মিত বেরোতে পারেনি। সব শুদ্ধ মাত্র তেরোটি সংখ্যা বেরোতে পেরেছিল—যতোদূর মনে হয়। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৩৭, সর্বশেষ সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৩৯।

অল্পায়ু হলেও 'জয়তী' ছিল উৎকৃষ্ট পত্রিকা। সম্পাদক হিসেবে তরুণ যৌবনেই আবদুল কাদির তাঁর প্রৌঢ়িতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। 'জয়তী' প্রকাশের অল্পদিন আগে মাত্র সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন আবদুল কাদির। কিন্তু তখনই তাঁর সম্পাদন কুশলতা বিস্ময়কর।

১৯২৬ সালে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা' বেরিয়েছিল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম সংখ্যার প্রকাশক হিসেবে আবদুল কাদিরের নাম মুদ্রিত হয়েছিল। 'শিখা' ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মুখপত্র। পত্রিকায় মটো ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ,বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এক কথায় মুক্তবুদ্ধির চর্চা ছিল এঁদের লক্ষ্য। 'জয়তী' পত্রিকায় 'শিখা' গোষ্ঠী বা বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের লেখকদেরই প্রাধান্য ছিল, পত্রিকার মূল উদ্দেশ্যও ছিল সেটি ; তবে সৃষ্টিশীলতার প্রতিও সমান নজর ছিল। মুসলমান লেখকদেরই প্রাধন্য ছিল; তবে হিন্দু লেখকদের রচনাও প্রকাশিত হতো। পত্রিকায় প্রধান লেখক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম—প্রথম সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত প্রায় প্রতি সংখ্যায় তিনি উপস্থিত ছিলেন, এক বা একাধিক রচনা সমেত। প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর তখন-পর্যন্ত প্রকাশিত ও আশু-প্রকাশিতব্য সমস্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ছিল, তাঁর সদ্যপ্রকাশিত রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ-এর বিজ্ঞাপন ছিল এক সংখ্যায়। 'জয়তী'-র পৃষ্ঠায় কবিতা ও গান লিখেছিলেন : নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, প্রণব রায়, কল্পনা মিত্র, আবদুল কাদির, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিলীপ কুমার রায়, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, সুরেশ্বর শর্মা (সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র), বন্দে আলী মিয়া, সতীশ চন্দ্র ঘটক প্রমুখ। গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন : আবদুল ফজল, প্রবোধ কুমার

সান্যাল, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, ডাক্তার লুৎফর রহমান, নাজিরুল ইসলাম, মাহবুব-উল আলম প্রমুখ। 'খেলাধূলা' নামে কাজী আবদুল ওদুদের ধরাবাহিক উপন্যাস বেরিয়েছিল কয়েকটি সংখ্যায় : 'গ্যেটে' নামে তাঁরই ধারাবাহিক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধ লিখেছিলেন : কাজী আবদুল ওদুদ, মাহবুব-উল-আলম, ডাক্তার লুৎফর রহমান, কাজী মোতাহার হোসেন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রিজাউল করিম, কাজী আনোয়ার-উল কাদীর, নাজিরুল ইসলাম, এম. নাসির আলী, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, আবদুল ওহাব, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, রবীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঠিত বেশ কয়েকটি ভাষণ-প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল 'জয়তী'র পৃষ্ঠায়; এগুলির রচয়িতা ছিলেন : আবুল হুসেন, খানবাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ, আবদুর রব চৌধুরী, হাকিম হাবিবুর রহমান, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, খানবাহাদুর কমরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ। নজরুল ইসলামের সঙ্গে আর-একজন প্রধান লেখক ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। 'জয়তী'র পৃষ্ঠায় বিভিন্নভাবে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ৭০-তম জন্মবার্ষিকীতে কার্তিক-পৌষ ১৩৩৮ (২ : ৭-৯) সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-জয়তী' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় অভিনন্দনসূচক বাণী পাঠিয়েছিলেন : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বারীন্দ্রকুমার শেষ। পত্রাকার প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল যাঁদের, তাঁরা হচ্ছেন : প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, দিলীপকুমার রায়, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখের।

এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার—সব-মিলিয়ে 'জয়তী' ছিল একটি রুচিশীল সৃজনমননশীল উৎকৃষ্ট পত্রিকা।

২

'জয়তী' ব্যতিরেকে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' তথা 'শিখা'-গোষ্ঠির ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়।—'জয়তী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঠিত ভাষণ-প্রবন্ধগুলি এই :

১. 'আল মামুন' : আবুল হুসেন। ঢাকা মুসলিম হলের বর্ধমান হার্ডসের আল মামুন ক্লাবের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম অধিবেশনে লেখক-কর্তৃক পঠিত।
২. 'যুক্তিবাদ ও ইসলাম' : খানবাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণের সারংশ।
৩. 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' : আবদুর রব চৌধুরী। পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।
৪. 'অভিভাষণ' : হাকিম হাবিবুর রহমান। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ।
৫. 'আমাদের রাজনীতি' : আবুল হুসেন। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে মুসলিম হল মিলনায়তনে ১৩ই এপ্রিল মঙ্গলবার গঠিত।

৬. 'আনন্দ' : সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। মুসলিম সাহিত্য সমাজের ১৯৩১ সালের 'মুশায়েরা' অধিবেশনে 'মীর মুশায়েরা'র অভিভাষণ।
৭. 'জীবন-সমস্যা' : খান বাহাদুর কমরুদ্দিন আহমদ। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ।

খলিফা হারুনুর রশিদের দ্বিতীয় পুত্র আল-মামুনকে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮) এজন্যে যে, 'তাঁর জাগতিক কীর্তির মধ্যে সবচেয়ে স্থায়ী কীর্তি তাঁর মানসিক বিকাশের মালমশলা—যা তিনি তাঁর রাজত্বের দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যাবৎ সংগ্রহ ও সৃষ্টি করতে নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন।' খলিফা আল মামুনের জ্ঞানচর্চা, অসাম্প্রদায়িকতা, যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণের প্রকাশ করেছেন আবুল হুসেন। তাঁর মনে হয়েছে, আধুনিক কালে মোস্তফা কামাল পাশা ও বাদশা আমানুল্লাহ মামুনের ... অনুসরন করেই ইসলামকে নতুন তেজে জোশে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। 'যুক্তিবাদ ও ইসলাম' প্রসঙ্গে খানবাহাদুর নাসিরউদ্দীন আহমদ দেখিয়েছেন ইসলামের মূল বিষয় ছিল একদিন দুর্দমনীয় জ্ঞানস্পৃহা, সত্যানুসন্ধান, উদারতা, সৌভ্রাতৃত্ব, যুক্তিবাদ ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি। তিনিও আধুনিককালে ইসলামের প্রাণশক্তি প্রজ্বলিত দেখেছেন কামাল পাশা, রেজা শাহ, আমানুল্লাহ প্রমুখের মধ্যে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' শীর্ষক অভিভাষণে অধ্যাপক আবদুর রব চৌধুরী বাঙালি-মুসলমানের জাতীয় উন্নতির জন্যে সাহিত্য চর্চার আবশ্যিকতার কথা বলেছেন, ইংরেজি ও উর্দুর মোহ পরিত্যাগের কথা বলেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, 'সাহিত্যের উৎস প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে। কাজেই হিন্দু লেখকগণের লেখায় যে কতক হিন্দুয়ানি থাকিবে তাহা অনিবার্য।' তিনি সেজন্যে হিন্দু লেখকদের দোষ না-দিয়ে মুসলমান লেখকদের নিজ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নাসিরউদ্দীন আহমদের বক্তব্য স্বল্প। হাকিম হাবিবুর রহমানের ভাষণে ভারতবর্ষে ইসলামের ইতিহাস বর্ণিত, বিশেষত বাংলাদেশে। 'আমাদের রাজনীতি' অভিভাষণে আবুল হুসেনের বক্তব্য বাঙালি-মুসলমানকে বাঙালি-হিন্দুর সমকক্ষতা অর্জন করতে হবে। তিনি বলছেন, 'আপনারা এখন আপনাদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করুন, মুসলিম সমাজের কোলে ইসলামের আদর্শে এমন মানুষ তৈরি হতে পারে যার সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতীয় রাষ্ট্র একেবারেই সার্থক হতে পারে না।' সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের 'আনন্দ' প্রবন্ধটি অন্যরকম। কারণ বিষয়টিই ছিল ভিন্ন। কবিতা ও গান সহযোগে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ফারসি ও উর্দু মুশায়েরার ধরনে যে-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, তাতেই এই আনন্দবাদী প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। খানবাহাদুর কমরুদ্দিন আহমদের 'জীবন-সমস্যা' অভিভাষণে জাড্য ও অবসাদ ঘুচিয়ে সেবাধর্মে আত্মনিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সম্বন্ধে অনেকেরই একটি ভ্রান্ত ধারনা আছে যে, তারা বোধহয় বিভ্রান্ত। কিন্তু এই সাতটি ভাষণ-প্রবন্ধে প্রতিপাদিত হয় যে তাঁরা বাঙালি-মুসলমান সমাজের উন্নতি নিয়েই অবিশ্রাম চিন্তা করেছেন। যুক্তিশীলতা, গোঁড়ামিমুক্ততা, অসাম্প্রদায়িকতা এইসব ছিল তাঁদের অস্ত্র; কিন্তু সমস্তই বাঙালি-মুসলমানের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সব প্রধান লেখকই ছিলেন 'জয়তী'-র লেখক। কাজী নজরুল ইসলাম তো তাঁদের পরোক্ষ দলগুরুর মতো ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন যাঁরা—আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), কাজী আনোয়ার-উল কাদীর (১৮৮৭০১৯৪৮), আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩) প্রমুখ—তাঁরাই ছিলেন 'জয়তী'-র নিয়মিত লেখক। নজরুল ইসলাম ও কাজী আবদুল ওদুদেরই সর্বাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে 'জয়তী'র পৃষ্ঠায়।

'রবীন্দ্রকাব্যপাঠের ভূমিকা' নামে তাঁর যে প্রবন্ধ 'জয়তী'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা সুচেতন কাজী আবদুল ওদুদ ইচ্ছা করেই গ্রন্থর্ভুক্ত করেননি। ১৯২৬ সালে রচিত হয়েছিল এই প্রবন্ধটি—রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকা শহরে এসেছিলেন, তখন। তাঁর দু'একটি মন্তব্য আজো ভাবনাউদ্রেকী। যেমন : 'তাঁর প্রতিভা কবিপ্রতিভাই বটে, তবে সে প্রতিভার প্রকাশ রূপের চাইতে মানস-গতিতেই বেশি। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য পাঠ না করলে তাঁর প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না।' তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'জ্ঞান ও প্রেম' প্রবন্ধটি আসলে পত্র-প্রবন্ধ, তবে প্রাপকের নাম উল্লিখিত হয়নি। শুধুমাত্র এই প্রবন্ধের নিকষেই বোঝা যায়, কাজী আবদুল ওদুদ কী-পরিমাণে যুক্তিবাদী ছিলেন। এই রচনায় জ্ঞান ও প্রেম অর্থাৎ মানুষের শুভত্ব ও কল্যাণকেই সবচেয়ে বড় করে দেখানো হয়েছে। উদ্ধৃতিযোগ্য কয়েকটি সদুক্তি : 'সত্যকার সাহিত্যিকের দেশ সব সময়ে তার চারপাশের দেশই নয়।' 'আমাদেরও কাজ সমস্ত মোহ (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সব মোহ) থেকে যথাসম্ভব মুক্ত হয়ে সত্য ও কল্যাণের বীজ দেশে ছড়ানো।' 'মতামত মানুষের খুব বড় জিনিস নয়, বড় জিনিস হচ্ছে সেই মতামত সার্থক করার জন্য তার আয়োজন কেননা, সেই আয়োজনেই ফুটতে পারে তার, ব্যক্তিত্ব—আর এই ব্যক্তিত্ব থেকেই রূপ পায় সব মতামত; নইলে, মতামত কথা মাত্র।' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোনো মোহে আবদ্ধ না-হয়ে জ্ঞান ও কল্যানের পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান ছড়িয়ে আছে এই প্রবন্ধে। পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমাদের কথা' প্রবন্ধটি 'মাসিক মোহাম্মদী'—সম্পাদককে লিখিত। 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙালি-মুসলমানের সাহিত্য-সাধনা' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ। ওদুদ জানিয়েছেন, 'সাহিত্যিক ধর্মহীন নন। তবে এ-সত্য যে তাঁর ধর্মের ধারণা ও সাম্প্রদায়িকের ধারণা এক পর্যায়ের নয়।' ওদুদের এ প্রতিবাদী-প্রবন্ধ সম্ভবত মোহাম্মদী-কর্তৃপক্ষ ছাপতে রাজি না-হওয়ায় 'জয়তী'-তে এটি প্রকাশিত হয়।

সপ্তম-অষ্টম সংখ্যায় কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছিলেন 'মানুষ মোহাম্মদ' নামে একটি প্রবন্ধ। ঠিক একই শিরোনামে দ্বিতীয় বর্ষ সপ্তম-নবম সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৯৮৬-১৯৫৪)। (এই শিরোনামেই কবি শাহাদাৎ হোসেন অন্যত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন।) হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর মনুষ্যত্ব সন্ধানের মধ্যে পাওয়া যাবে এইসব লেখকের আধুনিক মানসতা। তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'অহঙ্কার' প্রবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর স্বভাবশোভন স্বচ্ছতায় আত্মসম্মান ও দাম্ভিকতার পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন। একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের ভিটামিন' প্রবন্ধে একইরকম স্বচ্ছ-

স্বচ্ছ বিশ্লেষণ কাজী মোতাহার হোসেনের; 'কোন্‌টি সাহিত্যের বিষয় কোন্‌টি নয়, এ নিয়ে সমালোচকরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু এসব নিয়ম কানুন সাধারণের জন্য খাটে। প্রতিভা নিজের নিয়ম নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। তাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য বাস্তবপন্থী, আদর্শপন্থী, মিশ্রপন্থী যা খুশি তাই হতে পারে; চাই শুধু প্রাণ! এক কথায় বলতে গেলে সাহিত্য জীবনপন্থী,—জীবনের স্পন্দনে স্ফূর্ত, অথচ রহস্যময়।'

কাজী আনোয়ার-উল কাদীর অল্প লিখেছেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনাই কোনো-না-কোনো দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা 'জয়তী'-র একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয় নিয়ে লিখেছেন। পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত কাজী আনোয়ার-উল কাদীরের 'সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা' বা অন্য সংখ্যায় প্রকাশিত 'নবশক্তি' থেকে পুনর্মুদ্রিত আবদুল কাদিরের 'ভাববাদীর ভাবুকতা' একই বিষয়ভিত্তিক। একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যায় কাজী আনোয়ার-উল-কাদীরের প্রবন্ধ 'বাঙালি-মুসলমানের অর্থ সমস্যা' 'চিত্র'-উপশিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালি-মুসলমানের বহু দুঃখের একটি মূল কারণকে তিনি এখানে যথার্থতই চিহ্নিত করেছেন।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবেই তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল রিজাউল করিমের 'মার্টিন লুথার' প্রবন্ধটি।

স্বদেশ-স্বজাতি-স্বকাল-স্বধর্ম-চিন্তিত 'জয়তী'-র প্রবন্ধগুলিতে সেকালের বাঙালি-মুসলমানের চিন্তাচর্চা'র একটি প্রগাঢ় স্বাক্ষর রয়ে গেছে। কিছু বাদানুবাদ আছে—সেও প্রাণেরই লক্ষণে বিশিষ্ট।

৩

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ছিলেন 'জয়তী' পত্রিকার প্রধান লেখক। 'জয়তী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা শুরু হয়েছিল তাঁর রচনায়, শেষ সংখ্যাও শুরু হয়েছিল তাঁর রচনায়। এই পত্রিকায় কবির সর্বাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুল ইসলামের সাহিত্যজীবনের তখন সন্ধিমূহূর্ত। তাই বলে সৃষ্টিকর্মে ক্লান্তি নেই কোনো। সাহিত্যজগৎ থেকে সংগীতজগতে চলে আসছেন, সাংবাদিকতায় যতি পড়েছে, গদ্যরচনায় দাড়ি টেনে দিচ্ছেন, এমনকি সারা তিরিশের দশকে কবিতাও লেখেননি বলা চলে, তাঁর মনঃপ্রাণ তখন সংগীতে নিবেদিত। 'জয়তী'-র রচনাগুলিও তার সাক্ষ্য দেবে। যে-ক'টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ('চাদনী রাতে', 'নবীনচন্দ্র,' 'প্রথম অশ্রু', 'শিশু যাদুকর' ইত্যাদি), তার রচনাকাল কিছুকাল আগের। 'চাঁদনী রাতে' কবিতাটি কবি লিখেছিলেন আবদুল কাদিরকে নিয়ে 'জয়দেবপুরের পথে' রেলগাড়িতে যাবার সময় 'জয়দেবপুরের পথে'ই প্রথম নাম ছিল, পরে কবিতার শিরোনাম ও অন্তরাংশ ঈষৎ পরিবর্তিত হয়। 'নবীনচন্দ্র', 'শিশু যাদুকর' ইত্যাদি চট্টগ্রামে প্রণীত, হয়তো হবীবুল্লাহ বাহারের সূত্রেই আবদুল কাদির কবিতাগুলি পেয়েছেন। [হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহার সম্পাদিত 'বুলবুল' প্রকাশিত হয়েছিল 'জয়তী' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে—১৯৩৩ সালে। তাতেও 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের একটি পরিবহন ছিল—তবে আরো প্রমুক্ত।

১৯৩০ সালে নজরুলের পুত্র বুলবুলের অকালমৃত্যু ঘটে, মাত্র চার বছর বয়সে। নজরুল সর্বাবস্থায় তাঁর কাজ করে গেছেন—তাঁর জাগ্রত চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত অবধি, সমস্ত দুর্যোগ-দুর্বিপাক উপেক্ষা করে না-বলে সহ্য করে বললেই যথাযথ হবে। কেননা নজরুল উদাসীন বা বিবিক্ত ছিলেন না—বরং ছিলেন সংসক্ত ও অতিসংবেদী। তার মধ্যেও তার কাজে এক মুহূর্তের ছেদ পড়েনি। তাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

ফারসি ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে নজরুলের ছিল গভীর পরিচয়। ইরানি মহাকবি হাফিজ ছিলেন নজরুল ইসলামের প্রিয়তম কবি। হাফিজের দ্বারাই নজরুল সর্বাধিক প্রভাবিত সন্দীপিত হয়েছিলেন। তাঁর কবিজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হাফিজের প্রতিভার মুগ্ধতা দেখা গেছে। প্রথম জীবনে দিওয়ান-ই-হাফিজের তর্জমায় নিবিষ্ট ছিলেন কবি। অনেকগুলি অনুবাদই করেছিলেন; সম্ভবত দিওয়ান-ই-হাফিজ-এর একটি রূপান্তর গ্রন্থকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। করাচি থেকে আসার সময় দিওয়ান-ই-হাফিজ-এর যে-সংস্করণটি নিয়ে এসেছিলেন (তাতে উর্দু তর্জমাও ছিল—নজরুল উর্দুও জানতেন), সেটি হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ায় এবং সদাচঞ্চল নজরুল অন্যত্র ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার অনুবাদ থেমে যায়। দিওয়ান-এর তরজমাগুলিও ছড়িয়ে থাকে পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায়—কয়েকটি মাত্র কবির সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থ নির্ঝর (১৯৩৮)-এ সংকলিত হয়েছিল। অকালমৃত হন বুলবুলকে উৎসর্গিত রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ১৯৩০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তারই দশটি স্তবক 'জয়তী'র জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ (১:২) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ গ্রন্থের একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছিল 'জয়তী' পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

মুসলিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলাম-প্রণীত
উপহারের একমাত্র পুস্তক বিশ্ববিশ্রুত মরমী-কবি হাফিজের
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ
বাংলার কাব্যানুবাদ করিয়া প্রকাশিত হইল।
ভারতের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত চারিবর্ণে
রঞ্জিত প্রচ্ছদপট, সমস্ত বইখানির ছবি ও কবিতা তিন রঙে ছাপা।
দাম দুই টাকা
প্রকাশক—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এন্ড সন্স, ২১নং নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

যতীন্দ্রকুমার সেন (১৮৮২–১৯৬৬) ছিলেন আসলেই সেকালের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, পরশুরামের (রাজশেখর বসু) বইগুলির ছবি এঁকে বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছিলেন। কবি কাদের নওরাজ (১৯০৯-৮৩) 'জয়তী'র আষাঢ় ১৩৩৭ সংখ্যায় নজরুলের রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজের গ্রন্থের একটি গুণালোচনা করেন।

সমালোচনাটি উদ্ধৃত হল :

অমর কবি হাফেজের 'রুবাইয়াৎ' ফার্সি-সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। পাশ্চাত্য সমালোচক লিকক তাঁহার প্রত্যেকটি রুবাইকে এক একটি পদ্মরাগ-মনির সহিত তুলনা করেছেন। আর একজন সমালোচক তাঁহার রুবাইয়াৎ সম্বন্ধে বলেছেন 'There is a soaring imagination,

triumphant over intellect and intense passion expressed in the most passionate lyrical forms.'

ফার্সি সাহিত্যের 'তাজ জেরাতুস শোয়ারা' 'মশাহীরে এসলাম' 'খাজানায়ে আমেরা' প্রভৃতি কবি জীবনী ও কাব্য সমালোচনা পড়লে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ বাস্তবিকই কবির অবকাশ সময় কাটানোর জন্যই লেখা। কবিবর নজরুল ইসলামও তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, যে হাত শিবের জটার ন্যায় চির-রসনিষ্যন্দী ছিল সেই হাতের লেখাই এই রুবাইগুলি, কাজেই এইগুলিতেও যে হাফেজের কবি প্রতিভার যথেষ্টই ছাপ আছে তা স্বীকার না করে পারা যায় না। বাস্তবিকই, মৌচাকের ছোট ছোট কক্ষের মতই যেন এক একটি রুবাই মধুর ও রসপূর্ণ। অনুবাদে মূল ফার্সি কবিতার রূপ-রসও মাধুর্য্য বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন, তাই নজরুল ইসলাম সাহেবের অনুবাদ পড়ে যুগপৎ মুগ্ধ ও আশ্চর্য্য না হয়ে পারছিনে। তাঁর অনুবাদে হাফেজের কবিতার মাত্র একটু রসাস্বাদই পাবো মনে করেছিলাম, কিন্তু এখন পড়ে দেখছি—অনেক জায়গাতেই কবি মূল ফার্সি কবিতার স্পিরিটও বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অনুবাদের দিক দিয়ে এতটা কৃতকার্য্য অনেকেই হ'তে পারেন না।

আমরা বাঙলার রস-পীপাসু তরুণ-তরুণীদের ইহার প্রত্যেকটি উৎকৃষ্ট রুবায়ের নিবিড় রসাস্বাদনে তৃপ্ত হতে আহ্বান করছি।

প্রিয় পুত্রের অকালমৃত্যুতে নজরুলের কবিতায়-গানে তখন একটি ধার্মিকতা আধ্যাত্মিকতায় জোয়ার এসেছিল। কবিতায় হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর জীবনী প্রণয়নের কাজ শুরু করেছিলেন—শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। কবির অসুস্থতার পরে ১৯৫০ সালে মরু-ভাস্কর নামে নজরুল-রচিত রসূল (স.) চরিত্রটি প্রকাশিত হয়। অসম্পূর্ণ কিন্তু অসাধারণ সেই গ্রন্থ—নজরুলের কবি প্রতিভার এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'জয়তী'-র আষাঢ় ১৩৩৭ সংখ্যায় 'অভিবন্দনা' নামে হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবমুহূর্তটিকে অসামান্য ছন্দে-ছন্দে-চিত্রকল্পে মন্ডিত-চিত্রিত করেছেন কবি। রসুল (সা.) কে অভিবন্দিত করে দুটি গজল প্রকাশিত হয় কার্তিক-পৌষ ১৩৩৮ (২:৭-৯) সংখ্যায়—তার মধ্যে 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর' নজরুল-রচিত প্রথম না'ত; দ্বিতীয়টি 'দেখে যা রে দুলা সাজে সেজেছেন মোদের নবী' হজরত মুহম্মদ (সা.) এর বিবাহের বর্ণনা, কিন্তু অসাধারণ কবির হাতে তার বর্ণনাও হয়ে উঠেছে অনন্য সাধারণ। এই সময় কবি 'সূরা ফাতেহা'-র একটি অনুবাদ করেন। লক্ষণীয়: এই অনুবাদে কবি তাঁর স্বভাবশোভন শব্দ-ছন্দ-চিত্রকল্প-উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকার চাঞ্চল্য শাসিত রেখে তরজমা করেছেন। কাব্য আমপারা (১৯৩৩)-র অনুবাদেও আমরা দেখেছি কবির এই সংযম। এখানে নজরুল-কৃত সূরা ফাতেহা-র অনুবাদ উদ্ধৃত হল:

তোমারি মহিমা গাই, বিশ্বপালক করতার!
করুণা-কৃপার তব নাহি সীমা, নাহি পার!
বিশ্বপালক করতার!
রোজ হাশরের বিচারের দিনে তুমি মালিক, এয়্ খোদা!
আরাধনা করি প্রভো আমরা কেবলি তোমার
বিশ্বপালক করতার!

সহায় যাঁচি তোমারি ন াম, দেখাও মোদের সরল পথ ;
তাঁদের পথে চালাও খোদা, বিলাও যাদের পুরস্কার।
বিশ্বপালক করতার।
অবিশ্বাসী ধর্মহারা যাহারা সে প্রাণ, পথ
চালাইওনা তাদের পথে, এই চাহি পরওরদেগার!
বিশ্বপালক করতার!

তিরিশের দশকের সূচনা থেকে নজরুল যুক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন নাট্যদলগুলোর সঙ্গেও। বিশেষত মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) ও নজরুল মিলে একটি ত্রিবৃত্ত রচিত হয়। অন্য নাট্যকার ও নাট্যদলগুলোর সঙ্গেও যোগ ছিল নজরুলের। সাংগীতিক হিসেবেই প্রধানত। সংগীত-রচয়িতা, সুরস্রষ্টা ও সংগীত-পরিচালক হিসেবে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কারাগার ও আলেয়া নাটকের গানগুলো লিখেছিলেন কবি। 'জয়তী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় কারাগার ও আলেয়া-র গানগুলি মুদ্রিত হয়েছিল।

এছাড়াও নজরুলের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়েছিল 'জয়তী' পত্রিকায়। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের তিনটি কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধা-র আলোচনা বেরিয়েছিল। অস্বাক্ষরিত এই আলোচনাটি সম্ভবত করেছিলেন সম্পাদক স্বয়ং। আলোচনায় বলা হয়েছিল, 'মৃত্যুক্ষুধা কবি নজরুল ইসলামের অপূর্ব রচনা। গত কয়েক বৎসরে অতি-আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের যে-কয়খানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মৃত্যুক্ষুধা-কে শ্রেষ্ঠতম বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। ঘটনা-গতি, বর্ণনা-বৈচিত্র্য ও শব্দ-সৌষ্ঠবের দিক দিয়া ইহার একটি নিজস্বতা আছে। ভাষার স্বচ্ছন্দ-গতির জন্য ইহা সুখপাঠ্য হইয়াছে।' এই সমালোচনায় মৃত্যুক্ষুধা-র মেজো বৌ চরিত্রটিকে বলা হয়েছিল 'অভূতপূর্ব সৃষ্টি'—এবং তাকে শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছিল।

'জয়তী'-র প্রধান লেখকই ছিলেন না নজরুল ইসলাম, ছিলেন প্রধান আকর্ষনও।

৪

সম্পাদক আবদুল কাদির স্বনামে খুব কমই অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'জয়তী'-র পৃষ্ঠায়।

তার কেবল একটি কবিতা স্বনামে মুদ্রিত হয়েছিল, 'পুরাতনী' (পৌষ ও মাঘ ১৩৩৭)। ঐ ১৯৩০ সালেই আবদুল কাদিরের কবিচারিত্র চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল— ধ্রুপদস্বভাবী। সমকালীন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অগ্রজ কবি শাহাদাৎ হোসেনের দ্বারা প্রাথমিকভাবে উদ্বোধিত হয়েছিলেন তিনি। তবে সুধীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা ছিলনা তাঁর, শাহাদাৎ হোসেনের ধ্রুপদস্বভাবের মধ্যে যে-ধ্রুপদভেদী রোমান্টিকতা তাও নয়—বরং তিনি ছিলেন অনেকখানি মোহিতলাল মজুমদারের মতো শরীরী প্রেমে উজ্জীবিত-উদ্দীপিত। 'পুরাতনী' কবিতায় শরীর-মন একীভূত। আবদুল কাদিরের চিরকালের প্রিয়তম কাব্যমাধ্যম, মনে হয়, সনেট। তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতাটিও একটি সনেট। 'পুরাতনী' সনেট নয়—পরস্পর-সংযুক্ত দুটি চতুর্দশপদী, দুই পঙক্তির অন্তমিল গ্রথিত,

আবার দুটি চতুর্দশপদীই অষ্টক ষটকে বিভাজিত। সনেট-মাধ্যমটি নিয়ে বাংলা সাহিত্যেও অজস্র পরীক্ষা-সমীক্ষা হয়েছে। 'পুরাতনী' কবিতাটিকে বলা যেতে পারে, একটি পরীক্ষামূলক সনেট-যুগ্মক।

নিজের নামে 'জয়তী'-তে আবদুল কাদিরের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। একটি 'ভাববাদীর ভাবুবকতা' (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩৮)—সেও 'নবশক্তি' পত্রিকায় ১১ বৈশাখ ১৩৩৮ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রণ। আর-একটি 'ব্যক্তিগত চিঠি'- ধূর্জটিপ্রসাদ মুখ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৬১) উদ্দেশ্যে।

'ভাববাদীর ভাবুকতা' একটি জবাবী প্রবন্ধ। 'নবশক্তি'র দ্বিতীয় বর্ষ ছাব্বিশতম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিশ্বসভ্যতায় ভারতের দান' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর এই রচনাটি। তেজি, তীব্র লেখা। যুক্তিশীলিত। ভাববাদী বলতে আবদুল কাদির সেদিন আক্রমণ করেছিলেন গোঁড়া হিন্দুয়ানিকে—-বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ তো বটেই, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকেও তিনি রেহাই দেননি। এঁদের বলেছিলেন 'সনাতনী'। ডিরোজিয়ো, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী শ্রেয়ান্বেষণকেই আবদুল কাদির আদর্শ বিশেষে উল্লেখ করেছিলেন ঐ প্রবন্ধে। আর আদর্শ হিশেবে ঘোষণা করেছিলেন ইবনে রুশদ, নানক, কবীর, আকবর, দারা, দাদু-কে—রাজা রামমোহন রায়কে তিনি মনে করেছিলেন পূর্বোক্তদেরই যথার্থ উত্তরাধিকারী। ঐ প্রবন্ধে আবদুল কাদিরের শেষ কথা ছিল এই—'সন্ন্যাস, অবতারবাদ মূর্তিপূজা জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা অনুষ্ঠানপ্রিয়তা তত্ত্ববিলাসিতা বস্তুবিমূখতা, এমনতরো বহু মোহ-সংস্কার হইতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া এদেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্যই চাই স্বাধীনতা।' ধূর্জটিপ্রসাদ মুখ্যোপাধ্যায়ের একটি 'ব্যক্তিগত চিঠি' মুদ্রিত হয়েছিল বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩৮ সংখ্যায় (রচনাকাল : লক্ষ্ণৌ, ৬-৯-৩০)। কবি জসীমউদ্‌দীনের নকশীকাঁথার মাঠ কাব্যগ্রন্থের আলোচনা। প্রাসঙ্গিক নানা কথা এসেছিল। হয়তো মূল পত্রটি দেখেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। ঐ সংখ্যাতেই 'যুক্তি ও মধ্যযুগীয়তা' শিরোনামে যে-তিনটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি কাজী আবদুল ওদুদের। তাতে লেখা হয়েছিল 'ধূর্জটিবাবুর চিঠিখানি পড়লাম। লোকটি বেশ, তবে Sentimnental। এ Sentmentalism-এর ঘোর কাটিয়ে ওঠাও সহজ নয়। মধ্যযুগ dark age না-হয় হল, কিন্তু সে-যুগ তো আমাদের জন্য অতীত যুগ!' কাজী আবদুল ওদুদের চিঠির সূত্র ধরেই আবদুল কাদির ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখেছিলেন তাঁর 'ব্যক্তিগত পত্র'। আবদুল কাদির এখানেও কাজী আবদুল ওদুদকে সমর্থন কবে ধূর্জটিবাবুকে আখ্যা দিয়েছেন 'সেন্টিমেন্টাল'। (চল্লিশের দশকে আমাদের কবি-কথাশিল্পীদের রচনায় যে ভাবাবেগ-মুক্ততা সৃজিত হয়েছিল, সেই চিন্তাশীলতার বীজ বপন করেছিলেন 'শিখা'-গোষ্ঠী। এই গ্রুপের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা কবি আবদুল কাদির তাঁর সমকালীন মুসলমান কবিদের মধ্যে এক বিরাট ব্যতিক্রম—এই চিন্তাশীলতার দিক থেকে।) পৌষ সংখ্যার (তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা) অর্থাৎ 'জয়তী' পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার জবাব দিয়েছিলেন, 'বিজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব' শিরোনামে মুদ্রিত

(ধূর্জটিপ্রসাদ-রচনাবলীর তিন খন্ডে ধূর্জটিপ্রসাদ-আবদুল কাদিরের এই চিঠিগুলি গৃহীত বা উল্লিখিত হয়নি। তেমনি ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থে 'জয়তী' প্রত্রিকায় প্রকাশিত মোহিতলালের কবিতাগুলি গ্রন্থিত হয়নি।)

'জয়তী'র সম্পাদকীয়গুলির মধ্যে কবি আবদুল কাদিরের তদানীন্তন ভাবনা বেদনার ছাপ রয়ে গেছে। শুধু সম্পাদকীয়গুলির শিরোনাম উল্লেখ করি এখানে 'স্বাদেশিকতা ও মুসলমান', 'স্বাধীনতা আন্দোলন', 'রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য', 'হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ' 'জাতীয় রাষ্ট্র', 'সওগাত ও জাতীয়তা', 'ভারতীয় জাতীয়তা' ইত্যাদি। আবদুল কাদির রচিত এই সম্পাদকীয়গুলির কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্বদেশ-ও-স্বজাতি-ভাবনা। এইসব সম্পাদকীয় সম্পর্কে মাঝে মাঝে কাজী আবদুল ওদুদের (বেনামেও প্রকাশিত হয়েছে একবার—আবদুল্লাহ আল আজাদ ছদ্মনামে) প্রত্রাঘাত বিষয়টি ঘিরে উদ্দীপন বিভাব সৃষ্টি করেছে। অস্বাক্ষরিতভাবে একবার রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তীতে একটি সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হয়েছিল; আর একবার 'আর্টের গাঁথুনি' শিরোনামে মন্তব্য। 'আর্টের গাঁথুনি'তে সাহিত্য সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য—তখনই বিস্ময়করভাবে স্বচ্ছ-স্থির ইতিহাস চেতনার ঋদ্ধ। তবে নজরুল সম্পর্কে মন্তব্যে খানিকটা কাজী আবদুল ওদুদের ছায়া আছে। নজরুল-মুগ্ধতা আবদুল কাদিরের জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রবাহিত। উত্তরকালে তাঁর নজরুল বিবেচনা সম্পূর্ণ নিজস্ব। এমনকি 'শিখা'-'জয়তী'-র প্রধান লেখকদের (আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ) থেকে অন্য জায়গায় চলে এসেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত আবদুল কাদির আত্মচারিত্রিক।

'জয়তী' প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক তিরিশের দশকের সূচনালগ্নে। বিশের-তিরিশের দশকের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঠিক মধ্যমুহূর্তে। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'কবিতা', 'চতুরঙ্গ', 'রিক্ত', 'ধূপছায়া', ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্য—রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্য—ডানা মেলেছিল। আবার এই সময় পরিসরেই মুসলমান-সম্পাদিত 'মোসলেম ভারত', 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী', 'সওগাত', 'শিখা', 'নওরোজ', 'মাসিক মোহাম্মদ', 'মোয়াজ্জিন, 'বুলবুল' প্রভৃতি আধুনিক পত্রিকা জন্ম নিয়েছিল। দেখা যাবে : কাজী নজরুল ইসলাম এর প্রায় সবগুলি পত্রিকারই লেখক।

এরমধ্যে সব পত্রিকাই কলকাতা থেকে বেরোতো—একমাত্র বার্ষিক 'শিখা' প্রকাশিত হতো ঢাকা থেকে। আবদুল কাদির যেমন 'কল্লোল'-'পরিচয়' ইত্যাদি পত্রিকার লেখক ছিলেন, তেমনি লেখক ছিলেন 'গণবাণী', 'শিখা', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'মোয়াজ্জিন', 'বুলবুল' প্রভৃতি পত্রিকারও লেখক। 'জয়তী' পত্রিকাকে আবদুল কাদির করে তুলেছিলেন আধুনিক সাহিত্যের বাহক—আবার তার মুসলমান সত্তাটি এবং প্রমুক্ত মননশীল সত্তাটি বজায় রেখেছিলেন। ফলে লেখক-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মোহিতলাল মজুমদার, জসীমউদ্‌দীন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আবদুল কাদিরের সমকালীন মুসলমান লেখকরা তো আছেনই—আবুল ফজল, জসীমউদ্‌দীন, বন্দে আলী মিয়া, মাহবুব-উল আলম, কামালউদ্‌দীন, মহীউদ্দীন প্রমুখ, তেমনি সমকালীন চিন্তাজীবীদেরও

অনেককে তিনি একত্রিত করেছিলেন, 'শিখা'-গোষ্ঠীর লেখকদের তো বটেই সেই সঙ্গে অন্য চিন্তাজীবী লেখকদেরও—ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখকেও। আবদুল কাদির মুজফফর আহমদ-সম্পাদিত পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন, সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়েছেন, কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন একসময়। কবি মহীউদ্দীন (১৯০৬-৭৫) অনূদিত আঁরি বারবুশের 'সৈনিকের গান' অনুবাদ-গল্পে, নোয়াখালি জেলা কৃষক-ও-শ্রমিক কনফারেন্সে প্রদত্ত হেমন্তকামার সরকারের 'কৃষক-রাষ্ট্র' শীর্ষক সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ প্রকাশ করার মধ্যে তাঁর সেই ছায়া রয়ে গেছে। সম্পাদককে লেখা বেশ কয়েকটি পত্র বা পত্রাংশ প্রকাশিত হয়েছে 'জয়তী'তে—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, মোহিতলাল মজুমদার, দিলীপকুমার রায় প্রমুখের। কাজী আবদুল ওদুদ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদকের নিজের বেশ কয়েকটি বিতর্কমূলক পত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'সম্পাদকের পাঁজি' নামে বা ভিন্ন নামে মাঝে মাঝেই সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে আজো 'জয়তী' মনে হয় আস্বাদ্য।

পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসে আজকের পাঠক তেমন আকর্ষণ বোধ করবেন না হয়তো; কবিতা-গানে একা মাতিয়ে রেখেছেন নজরুল ইসলাম। নজরুলের-ভাস্বর কবিতা-গানগুলি বাদ দিলে 'জয়তী'র প্রধান আকর্ষণ তার মননের দিক। বাঙালি-মুসলমানের উজ্জীবন, হিন্দু-মুসলমান মিলন, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র-ভাবনা, ইতিহাসের দৃশ্যপট মনে রেখেই নির্মুক্ত আধুনিকতার—এইসবই ছিল 'জয়তী'র প্রাণসম্পদ। নজরুল ইসলামের সৃজনশীলতা আর তাঁর সমসাময়িক অনেক লেখকের মননশীলতার জন্যে 'জয়তী'র মূল্য আজো অশেষ—বিশেষত বাঙালি-মুসলমানের সাময়িকপত্রের দীর্ঘ-ব্যাপ্ত ইতিহাসে।

'জয়তী' পত্রিকার সূচিপত্র

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ ১৩৩৭।

১. চাঁদনী রাতে (কবিতা) : নজরুল ইসলাম
২. আল মামুন (ভাষণ) : আবুল হুসেন
(ঢাকা মুসলিম হলের বর্ধমান হাউসের আল-মামুন ক্লাবের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম অধিবেশনে লেখক-কর্তৃক পঠিত)
৩. গান (জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা) : নজরুল ইসলাম
৪. বিংশ শতাব্দী (গল্প) : আবুল ফজল
৫. গান (বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে বাঁধবো গো : নজরুল ইসলাম
৬. 'রবীন্দ্রকাব্যপাঠের' ভূমিকা (প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
(এটি লেখা হয় ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী সালে। তখন রবীন্দ্রনাথ ঢাকায়। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তিনি দুটি বক্তৃতা দেন, তার একটির নাম 'The

Meaning of Art' এখানে যে-কথাটি বলতে চেষ্টা করা হয়েছে তা আরো বিস্তৃতভাবে বলা দরকার, এই ধারণা থেকে এটি রবীন্দ্রকাব্যপাঠ বইখানির অংগীভূত হয় নাই।)

৭. প্রাতিকা (গদ্যরচনা) : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮. সোনার মেয়ে (কবিতা) : জসীম উদ্‌দীন
৯. যুক্তিবাদ ও ইসলাম (ভাষণ) : খানবাহাদুর নাসিরউদ্দীন আহমদ (ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষনের সারাংশ)
১০. গ্রন্থ-সমালোচনা
(ক) মৃত্যুক্ষুধা (কাজী নজরুল ইসলাম) : অস্বাক্ষরিত
(খ) আজ এবং আগামীকাল (শিবরাম চক্রবর্তী) : ঐ
(গ) আফগানিস্তান (লেখকের নাম নেই) : ঐ
১১. সম্পাদকের পাঁজি (সম্পাদকীয়)
স্বাদেশিকতা ও মুসলমান / স্বাধীনতা আন্দোলন
১২. অভিনন্দন : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭।

১. রুবাইয়াত-ই-হাফিজ (অনুবাদ-কবিতা) : কাজী নজরুল ইসলাম
২. যোগ-বিয়োগ (গল্প) : প্রবোধকুমার সান্যাল
৩. খেলাধূলা (ধারাবাহিক উপন্যাস) : কাজী আবদুল ওদুদ
৪. গান (মধুময় ফাগুনের কুঞ্জের মাঝে) : গোলাম মোস্তফা
৫. রাষ্ট্রীয় সভ্যতার প্রগতি (প্রবন্ধ) : মাহবুব-উল-আলম
৬. গান (ভূললো মন ভুলালো) : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
৭. গ্যেটে (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
৮. কবিতার কাঁটা (গল্প) : আবুল ফজল
৯. একখানি পত্র : কাজী আবদুল ওদুদ
১০. রতি-দেবতা (কবিতা) : হেমচন্দ্র বাগচী

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। আষাঢ় ১৩৩৭।

১. বধূ-প্রসাধন (কবিতা) : মোহিতলাল মজুমদার
২. খেলাধূলা (ধারাবাহিক উপন্যাস) : কাজী আবদুল ওদুদ
৩. অভিবন্দনা (খবিতা) : কাজী নজরুল ইসলাম
৪. মার্টিন লুথার (প্রবন্ধ) : রিজাউল করীম
৫. আমি পথ (অনুবাদ-কবিতা) : ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (Alice Meyncll)
৬. মেয়েলোক (একাঙ্ক) : আবুল ফজল

৭. অহঙ্কার (প্রবন্ধ) : কাজী মোতাহার হোসেন
৮. আষাঢ়ে (কবিতা) : কল্পনা মিত্র
৯. বলি (গল্প) : প্রবোধকুমার স্যান্যাল
১০. অবেলায় (কবিতা) : জসীমউদ্‌দীন
১১. জ্ঞান ও প্রেম (প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
১২. গ্যেটে (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
১৩. গ্রন্থ-সমালোচনা
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (কাজী নজরুল ইসলাম) : কাদের নওয়াজ
১৪. সম্পাদকের পাঁজি
রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য / হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। শ্রাবণ ১৩৩৭।

১. গান (আরো নূতন নূতনতর শোনাও গীতি গানেওয়ালা) : কাজী নজরুল ইসলাম
('মোত্‌রেবে খোশ্‌নওয়া বগো তাজা-ব-তাজা নও বনও'-এর অনুবাদ)
২. সৃষ্টি-রহস্য (প্রবন্ধ) : কাজী মোতাহার হোসেন
৩. হিতে বিপরীত (কীর্তন) : কাজী নজরুল ইসলাম
৪. জন্ম-জন্ম (গল্প) : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৫. সার্থক জীবন (প্রবন্ধ) : ডাক্তার লুতফর রহমান
৬. খেলাধূলা (উপন্যাস) : কাজী আবদুল ওদুদ
৭. হিন্দু-মুসলমান সমস্যা (প্রবন্ধ) : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
৮. একখানি পত্র : আবদুল্লাহ-আল-আজাদ
৯. গ্রন্থ-সমালোচনা
হারামণি (মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন) : কাজী নজরুল ইসলাম
১০. কালরাতে (কবিতা) : প্রণব রায়

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা। ভাদ্র ১৩৩৭।

১. গান (করিয়া পরান শুনিতেছি গান) : কাজী নজরুল ইসলাম
২. সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা (প্রবন্ধ) : কাজী আনোয়ার-উল-কাদীর
৩. খেয়ালের খেলা (গল্প) : আবুল ফজল
৪. আমাদের কথা (পত্র-প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
('মাসিক মোহাম্মদী'-সম্পাদককে লিখিত)
৫. পল্লী-বর্ষা (কবিতা) : জসীমউদ্‌দীন
৬. সম্পাদকের পাঁজি (সম্পাদকীয়)
জাত ও জাতি / 'সম্মিলনী' ও আমরা
৭. বিদায় দেহ গো রূপসী নগরী (কবিতা) : রামেন্দু দত্ত
৮. নবীনচন্দ্র (কবিতা) : কাজী নজরুল ইসলাম

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা। আশ্বিন ১৩৩৭।

১. প্রথম অশ্রু (কবিতা) : কাজী নজরুল ইসলাম
২. উভয় সংকট (প্রবন্ধ) : নাজিরুল ইসলাম
৩. খেলাধূলা (ধারাবাহিক উপন্যাস) : কাজী আবদুল ওদুদ
৪. গান (ওগো ফুলের মতন) : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
৫. মায় ভুখা হুঁ (গল্প) : আবুল ফজল

প্রথম বর্ষ, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা। কার্তিক-অগ্রহায়ন ১৩৩৭।

১. কবি-নমস্কার (কবিতা) : মোহিতলাল মজুমদার
২. মানুষ মোহাম্মদ (প্রবন্ধ) : কাজী মোতাহার হোসেন
৩. কারাগারে'র গান (তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী) : কাজী নজরুল ইসলাম
৪. অমাবস্যা (গল্প) : ডাক্তার লুতফর রহমান
৫. অতি-বিবাহ (একাঙ্ক) : কামাল উদ্‌দীন
৬. গ্রন্থ-সমালোচনা
ভৈরব চক্র (কালভৈরব) : প্রেমেন্দ্র মিত্র
৭. খেলা-ধূলা (ধারাবাহিক উপন্যাস) : কাজী আবদুল ওদুদ
৮. অর্ঘ্য (কবিতা) : জসীম উদ্‌দীন
(শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ও-সীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণারবিন্দে : —রচয়িতা।)

প্রথম বর্ষ, নবম-দশম সংখ্যা। পৌষ ও মাঘ ১৩৩৭।

১. 'কারাগারে'র গান : কাজী নজরুল ইসলাম
(ক) কারা-পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ।
(খ) পূজা-দেউলে, মুরারী, শঙ্খ নাহি বাজে।
(গ) নাহি ভয়, নাহি ভয়।
২. লেখা (পত্র-প্রবন্ধ): কাজী আবদুল ওদুদ
৩. পুঁথি-সাহিত্যের নায়িকা (প্রবন্ধ) : এম. নাসির আলী
৪. পুরাতনী (কবিতা) : আবদুল কাদির
৫. দিদারুল আলম স্মৃতিবার্ষিকী (প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
৬. পরদেশিয়া (গল্প) : আবুল ফজল
৭. খেলাধূলা (ধারাবাহিক উপন্যাস) : কাজী আবদুল ওদুদ
৮. সম্পাদকের পাঁজি (সম্পাদকীয়)
জাতীয় রাষ্ট্র / 'সওগাত' ও জাতীয়তা

প্রথম বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা। ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৭।

১. শিশু যাদুকর (কবিতা) : কাজী নজরুল ইসলাম
২. সাহিত্যের ভিটামিন (প্রবন্ধ) : কাজী মোতাহার হোসেন
৩. খেলাধূলা (ধারাবাহিক উপন্যাস) : কাজী আবদুল ওদুদ
৪. মোরে কান্দালি তুই (গান) : জসীম উদ্‌দীন
৫. বাঙালি-মুসলমানের অর্থসমস্যা (প্রবন্ধ) : কাজী আনোয়ার-উল কাদীর
৬. গ্যেটে (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
৭. গান (হানো হানো বেদনা হানো) : জসীম উদ্‌দীন
৮. ব্যক্তিগত চিঠি : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৯. একটি সকাল (একাঙ্ক) : আবুল ফজল
১০. মোর শাজাহান কাঁদিয়া গড়ুক তাজমহল (কবিতা) : প্রেমেন্দ্র মিত্র
১১. মুসলিম সাহিত্য সমাজ (ভাষণ) : আবদুর রব চৌধুরী
(পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ)
১২. অভিভাষণ : হাকিম হবিবুর রহমান
(ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ)
১৩. আমাদের রাজনীতি (ভাষণ) : আবুল হুসেন
(ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে মুসলিম হল মিলনায়তনে পঠিত)
১৪. নির্বাচন-প্রবন্ধ (পত্র-প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
১৫. গান (কুসুম-সুকুমার শ্যামল-তবু হে ফুল-দেবতা) : কাজী নজরুল ইসলাম
১৬. সম্পাদকের পাঁজি (সম্পাদকীয়)
ভারতীয় জাতীয়তা

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩৮।

১. গান (প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূর) : কাজী নজরুল ইসলাম
২. পত্র : প্রমথ চৌধুরী
৩. গজল (অনুবাদ) : মোহিতলাল মজুমদার
(জালালউদ্দিন রুমি)
৪. খেলাধূলা (ধারাবাহিক উপন্যাস) : কাজী আবদুল ওদুদ
৫. আলোছায়া (কবিতা) : দিলীপকুমার রায়
৬. অব্যক্ত ভালবাসা (প্রবন্ধ) : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
৭. চাঁদের আলো (গল্প) : নাজিরুল ইসলাম
৮. দুইজন (কবিতা) : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৯. ব্যক্তিগত চিঠি : ধূটর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১০. আজ একজন এসেছিল (কবিতা) : জসীমউদ্‌দীন
১১. কারে আমি চাই (কবিতা) : জসীম উদ্‌দীন
১২. আবহাওয়া (গল্প) : মাহ্‌বুব-উল-আলম
১৩. পাটের চাষ (প্রবন্ধ): আবদুল ওহাব
১৪. গান (গানগুলি মোর আহত পাখির সম) : কাজী নজরুল ইসলাম
১৫. মরা তারা (গল্প): আবুল ফজল
১৬. পলাশী হইতে অমৃতসর (প্রবন্ধ): মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
১৭. মুক্তি ও মধ্যযুগীয়ত্ব (চিঠিপত্র)
(ক) দিলীপকুমার রায়
(খ) মোহিতলাল মজুমদার
(গ) কাজী আবদুল ওদুদ

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ-ষষ্ঠ সংখ্যা। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩৮।

১. বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ (প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
২. ভজন (নাচিছে নটনাথ শঙ্কর মহাকাল) : কাজী নজরুল ইসলাম
৩. সংঘর্ষ-তত্ত্ব (প্রবন্ধ): কাজী মোতাহার হোসেন
৪. ভজন (দোলে নিতি নবরূপের ঢেউ পাথার) : কাজী নজরুল ইসলাম
৫. খেলাধূলা (ধারাবাহিক উপন্যাস) : কাজী আবদুল ওদুদ
৬. আশ্বাস (কবিতা) : সুরেশ্বর শর্মা
৭. বাঙালি সৈন্য-বিভাগের যোগ্য কি না? (প্রবন্ধ) : ম. অ.
৮. মেঘ-রঙা মেয়ে (কবিতা) : বন্দে আলি মিয়া
৯. মরা তারা (গল্প) : আবুল ফজল
১০. গ্যেটে (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
১১. যে-জীবন সম্ভোগ স্পৃহায় (গল্প) : কামালউদ্দীন
১২. অভিনন্দন গীতি (তুমি কোন্ পথে এলে) : কাজী নজরুল ইসলাম
(কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সংবর্ধনা-সভায় গীত)
১৩. ভাববাদীর ভাবুকতা (প্রবন্ধ) : আবদুল কাদির
১৪. আর্টের আঁটুনি (সম্পাদকীয় মন্তব্য)
(ক) অতি-আধুনিকদের ধর্ম-মোহ
(খ) কাব্যে গ্যাগান ম্যানারিজম

দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম-নবম সংখ্যা। কার্তিক-পৌষ ১৩৩৮।

১. প্রেমের ডাক (প্রবন্ধ) : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
২. মন-কাঙাল (কবিতা) : মোহিতলাল মজুমদার
৩. আনন্দ (প্রবন্ধ) : সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
('মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র ১৯৩১ সালের 'মুশায়েরা' অধিবেশনে 'মীর

মুশায়েরা'র অভিভাষণ। ১৯৩০ সালে ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ইহার পত্তন করেন। ...—সম্পাদক, 'জয়তী'।)

৪. খেলাধূলা (ধারাবাহিক উপন্যাস) : কাজী আবদুল ওদুদ

৫. গজল : কাজী নজরুল ইসলাম
(ক) দেখে যা'রে, দুলা সাজে
(খ) ইসলামের ঐ সওদা লয়ে

৬. বাইরন (প্রবন্ধ) : কাজী আনোয়ার-উল কাদীর

৭. অজানিতা (কবিতা) : বন্দে আলি মিয়া

৮. মরা তারা (গল্প) : আবুল ফজল

৯. সংসার-বৈরাগ্য (কবিতা) : সতীশচন্দ্র ঘটক

১০. মানুষ মোহাম্মদ (প্রবন্ধ) : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

১১. ঊষা-কীর্তন (কবিতা) : সতীশচন্দ্র ঘটক

১২. অভ্যাস (গল্প) : শামস্-উল-আলম

১৩. 'আলেয়া'র গান : কাজী নজরুল ইসলাম
(ক) ভোরের হাওয়া, এলে ঘুম ভাঙাতে কি
(খ) দুলে আলো-শতদল ঝলমল ঝলমল
(গ) আজিকে তনু-মনে লেগেছে রঙ
(ঘ) কেমনে কহি প্রিয় কি ব্যথা প্রাণে বাজে
(ঙ) কেন রঙিন নেশায় মোরে মাতালে
(চ) কে এলে গো চির-চেনা অতথি দ্বারে মম

১৪. কৃষক-রাষ্ট্র (প্রবন্ধ) : হেমন্তকুমার সরকার
(নোয়াখালি জেলা কৃষক-ও-শ্রমিক কনফারেন্সে প্রদত্ত সভাপতিব অভিভাষণের সারাংশ)

১৫. সৈনিকের গান (অনুবাদ-গল্প): হেন্‌রি বারবুস্ (অনুবাদক : মহীউদ্‌দীন)

১৬. বিপ্লব প্রসঙ্গে (পত্র) : কাজী আবদুল ওদুদ

১৭. ব্যক্তিগত পত্র : আবদুল কাদির

১৮. সোনার দেশের মেয়ে (কবিতা) : জসীম উদদীন

১৯. 'রমলা' (গ্রন্থালোচনা) : কাজী মোতাহার হোসেন

২০. রবীন্দ্র-জয়ন্তী (সম্পাদকীয় মন্তব্য)

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ ১৩৩৯।

১. গজলগুচ্ছ : কাজী নজরুল ইসলাম
(ক) নিরালা কানন-পথে কে তুমি চল একেলা।
(খ) এল ফুলের মরসুম শারাব ঢালো সাকী।
(গ) প্রিয়, তব গলে দোলে যে হার কুড়িয়ে-পাওয়া।

২. বিজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব (প্রবন্ধ) : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৩. আশার মৃত্যু (গল্প) : আবুল ফজল
৪. গান (তোমায় যদি পাই) : গোলাম মোস্তফা
৫. জীবন-সমস্যা (প্রবন্ধ) : খানবাহাদুর কমরুদ্দিন আহমদ
(ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ)
৬. শোষিতের ব্যথা (গল্প) : মহীউদ্‌দীন
৭. আসা-যাওয়া (গান) : জসীমউদ্‌দীন
৮. গজল-গান (সুরা ফাতেহা) : কাজী নজরুল ইসলাম
(তোমারি মহিমা গাই, বিশ্বপালক করতার!)
৯. বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ) : শচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
১০. বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ) : কাজী আবদুল ওদুদ
১১. গান (হাস্নাহেনা, হাস্নাহেনা) : গোলাম মোস্তফা
১২. গান (আয়ুর বেসাতি যারে দিনু আমি) : বন্দে আলী মিয়া
১৩. সম্পাদকের পাঁজি।